ہم مزار محمد پہ مر جائینگے
زندگی میں یہی کام کر جائینگے

আশেকে রসুল (স.) মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)

হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

Chunati.com
Pioneer in village based website

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے
زندگی میں یہی کام کر جائینگے

আশেকে রসুল (স.) মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)

হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

Chunati.com
Pioneer in village based website

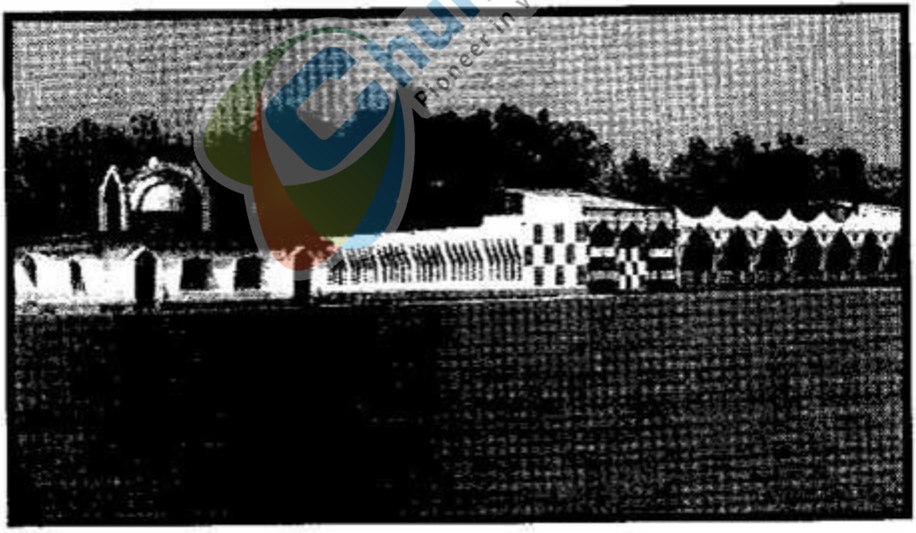

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী

Asheke Rasul (S.) Mujaddede Mahfile Siratunnabi (S.)
Hazarat Mowlana Hafez Ahmad Sha Shaheb (Rh.) Chunati
Written by Ahmadul Islam Chowdhury
in Bangla From Chittagong, Bangladesh on April 2007

❑ প্রকাশক
মাইন উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
মাহতাব উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী
পিতা- মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী
(সাবেক মেয়র ও এম.পি. চট্টগ্রাম)
২৭/ক, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম। ফোন: ০৩১-৬৫২৬৩২

❑ রচনা ও প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতায়:
মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম
মুহাম্মদ রুহুল কাদের, সহকারী অধ্যাপক: বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ইপিজেড, চট্টগ্রাম

❑ প্রথম প্রকাশ:
২৪ রবিউল আউয়াল ১৪২৮ হিজরি, ১৩ এপ্রিল ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
৩০ চৈত্র ১৪১৩ বাংলা

❑ দ্বিতীয় প্রকাশ:
১২ রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরি, ২১ মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
০৭ চৈত্র ১৪১৪ বাংলা

❑ তৃতীয় প্রকাশ :
১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিজরি, ১০ মার্চ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
২৬ ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা

❑ চতুর্থ প্রকাশ:
১৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হিজরি
১ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
১৮ পৌষ ১৪২২ বাংলা

❑ সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

❑ প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ আলী, চুনতী

❑ বর্ণসজ্জায়: এস.এম. দেলোয়ার হোছাইন, আলপনা, ০১৮২৮৮৯৭৪৪০
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন:

❑ হাদিয়া : ৪০০/- (U.S. # 7)

Chunati.com
Pioneer in village based website

সমর্পণ

আশেকে রাসূল (স.)
হযরত ওয়াইস আল-করনি [illegible] এর
রফে' দরজাত ক[illegible]
অত্র গ্রন্থ মহা[illegible]হের
দর[illegible] সমর্পণ
[illegible] হল

Chunati.com
Pioneer in village based website

◆ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ :

- ❑ তাওয়াফ ও যেয়ারত- ১৯৯৮ (দ্বাদশ প্রকাশ)-২০১৪
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত ১ম ও ২য় খন্ড- ১৯৯৯
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৩য় ও ৪র্থ খন্ড- ২০০১
- ❑ হজ্ব ও যেয়ারত- ২০০২
- ❑ গারাংগিয়া হযরত বড় হুজুর (রহ.)-২০০৩ (২য় প্রকাশ)-২০০৪
- ❑ চট্টগ্রামের কথা- ২০০৪
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড- ২০০৪
- ❑ মকতুবাতে হামেদী-মজিদি-২০০৪
- ❑ গারাংগিয়া হযরত ছোট হুজুর (রহ.) (সেমিনার স্মারক)-২০০৪
- ❑ মোবারক স্মৃতি- ২০০৫ (২য় প্রকাশ)- ২০০৬
- ❑ পাক-ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ ১ম খন্ড-২০০৫
- ❑ শানে ওয়াইসী (রহ.) ২০০৫
- ❑ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী- ২০০৭ (৪র্থ প্রকাশ)- ২০১৬
- ❑ Shan-E-Waisi (Published from India) 2007
- ❑ বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ১ম খন্ড (মিশর, জর্দান, ইরাক, ফিলিস্তিন) ২০০৭
- ❑ Hajj: Omrah: Ziarah 2007
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৭ম খন্ড-২০০৯
- ❑ ধর্ম কথা ১ম খণ্ড-২০০৯
- ❑ আয়নায়ে দরবারে গারাংগিয়া-২০১১
- ❑ ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের দেশ তুরস্ক-২০১১
- ❑ শানে রাহমতুললিল আলামিন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত) ২০১১ (২য় প্রকাশ-২০১৪)
- ❑ পারস্য থেকে ইরান- ২০১২
- ❑ ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ (২য় খন্ড) ২০১২
- ❑ Turkey : An Osmanian Empire 2012
- ❑ শানে ওয়াইসী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত) ২০১২
- ❑ নিষ্প্রাণ ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ২০১২
- ❑ চট্টগ্রাম থেকে হজ্বযাত্রী পরিবহণ: ইতিকথা-অধিকার-দাবী-২০১৩
- ❑ ইস্তাম্বুল কোনিয়ার পথে প্রান্তরে- ২০১৪
- ❑ In and around Istanbul & Konya-2015

প্রকাশের পথে

- ❑ হেজাজ থেকে সৌদি আরব
- ❑ ঐতিহ্যের চট্টগ্রাম
- ❑ ভারত মহাসাগরীয় দেশে দেশে
- ❑ ভারতে যেয়ারত ও ভ্রমণ (৩য় খন্ড)
- ❑ বিশ্বের প্রাচীন জনপদ সফর ২য় খণ্ড (ইয়েমেন)
- ❑ পশ্চিমবঙ্গের আউলিয়ায়ে কেরাম
- ❑ ধর্ম কথা ২য় খন্ড
- ❑ কালান্তরে দৃষ্টিপাত ৮ম খণ্ড
- ❑ চট্টগ্রাম ও ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ
- ❑ মানবতা
- ❑ ইউরোপ, আমেরিকায় ৬৮ দিন

Chunati.com Pioneer in village based website

সূচি

◈ ভূমিকা ০৭
◈ পবিত্র কুরআন শরিফ ১১
◈ পবিত্র হাদিস শরিফ ১২
◈ শ্লোক ১৪
◈ সুফি সাধনা ১৭
◈ চুনতীর পরিচিতি ২১
◈ পূর্বপুরুষগণের পরিচিতি ২৩
◈ হযরত কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) ২৬
◈ জন্ম ও ভাই-বোন ৩২
◈ শিক্ষা জীবন ৩৩
◈ দাম্পত্য জীবন ৩৫
◈ সন্তান-সন্ততি ৩৬
◈ বার্মা সফর ৩৮
◈ আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ (বন জঙ্গলে) ৩৯
◈ নতুন ভিটায় বসবাস ৪২
◈ হজ্বে গমন ৪৩
◈ ভারত সফর ৪৯
◈ পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)
- মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ৫৩
- মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) ১ দিন থেকে ১৯ দিন ৫৫
- মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর খাদ্য বিভাগ ৫৭
- মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ আগত ওলামায়ে কেরামের ক'জন ৫৮
- পরিদর্শন বইতে লিখিত ক'জন ওলামায়ে কেরামের অভিমত ৬৩
- মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ আগত মেহমানগণের ক'জন ৭৮
- পরিদর্শন বইতে লিখিত ক'জন মেহমানের অভিমত ৮১
- মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ আলোচিত বিষয়সমূহ ৯১

Chunati.com pioneer in village based website

◈ পবিত্র মে'রাজুন্নবী (স.) ও অন্যান্য মাহফিল	১১৭
◈ সীরত ময়দান ক্রয় ও ভরাট	১১৯
◈ মসজিদে বায়তুল্লাহ নির্মাণ	১২১
◈ গাড়ি দুর্ঘটনা	১২৩
◈ ইন্তেকাল	১২৬
◈ জানাজা ও দাফন	১২৭
◈ মাযার নির্মাণ	১২৯
◈ সীরত ময়দান নিয়ে দলিল সম্পাদন	১৩০
◈ সূরত মুবারক	১৩২
◈ লেবাস (পোষাক পরিচ্ছদ)	১৩৩
◈ খাওয়া দাওয়া	১৩৪
◈ মেহমানদারী	১৩৫
◈ দৈনন্দিন কার্যাবলি	১৩৬
◈ আত্মীয়তার হক আদায় ও কৃতজ্ঞতাবোধ	১৩৮
◈ শিশুদের প্রতি মমতা	১৩৯
◈ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি	১৪০
◈ চুনতী মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্টতা	১৪২
◈ চুনতীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদ	১৫১
◈ করামত, স্মৃতি ও স্বপ্ন	১৫২
◈ কসিদা	৩৫৩
◈ Life Sketch	৩৬৭

Gunati.com
pioneer in village based website

ভূমিকা

আশেকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) (হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী) এর জীবনী গ্রন্থ মহান আলাহ পাকের অশেষ মেহেরবানিতে প্রকাশিত হল।

২০০৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে আমার ছোট ভাই সাবেক মেয়র ও এম.পি মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী একদিন আমার সাথে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবনী গ্রন্থ লেখার ব্যাপারে আলাপ করে। এতে আমি হতচকিত হয়ে ইতস্তত বোধ করি। যেহেতু আমাদের বাড়ি বাঁশখালী, অপরদিকে চুনতী একটি বিখ্যাত গ্রাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সংশ্লিষ্ট বহু আলেমেদ্বীন ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ চুনতীসহ বিভিন্ন জায়গায় রয়েছেন। আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নগণ্য ভক্তগণের অন্তর্ভুক্ত, এতে ইতস্ততের অবকাশ নেই। কিন্তু অতি কাছের কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা জীবনী গ্রন্থ রচিত হলে হয়ত গ্রন্থটি আরো অধিকতর তথ্যবহুল ও উঁচুমানের হত।

সাম্প্রতিককালে ইন্তেকাল হওয়া মহান আল্লাহর আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী গ্রন্থ রচনা করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য। একইভাবে তাঁর মোবারক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানান তথ্য-উপাত্ত তালাশ করে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা সহজতর নয়।

ছোট ভাই মাহমুদুল ইসলামের সাথে কিছুদিনের ব্যবধানে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবনী গ্রন্থ রচনা নিয়ে ২য় বার আলোচনা হয় গত বছর (২০০৬ খ্রিস্টাব্দ) মাহফিলে সীরতুন্নবীর (স.) এর ক'দিন আগে। এ ব্যাপারে উভয় ভ্রাতার মধ্যে আলাপ হয় মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর পরে মাহমুদুল ইসলামের পাঁচলাইশস্থ বাসায় শাহ সাহেব (রহ.) এর অতি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ নিয়ে একটি বৈঠক করার। সে অনুসারে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর পর গত ২জুলাই ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রাথমিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তথায় প্রায় ১০/১২ জন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীকে সভাপতি করে পরবর্তীতে কো-অপ্ট সহ ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। সাথে সাথে আমি গ্রন্থ রচনা করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়। গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের যাবতীয় খরচ মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী নিজ তহবিল হতে ব্যয় করবেন এবং ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আমাকে তথ্য উপাত্ত প্রদানসহ নানাভাবে সহযোগিতা করবেন। পরবর্তীতে ১২/৮/২০০৬ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীর বাসভবনে তাঁরই সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে আমার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট হলেও তখনকার কর্মকাণ্ডের সাথে আমি কোন সময় জড়িত ছিলাম না। ফলে গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তাঁর অতি ঘনিষ্টজনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে সচেষ্ট হই এবং চট্টগ্রাম শহর থেকে বারেবারে চুনতী গমন করি। তাঁর আত্মীয় ও নিকটতম ঘনিষ্টজনের মধ্যে অনেকে ইন্তেকাল করে গেছেন। যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে ২/১ জন বাদে বাকি সবাই কম বেশি সহযোগিতা করেছেন।

মূলতঃ ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মোবারক নূরানি চেহারা অবলোকন করতে সক্ষম হই। যেহেতু ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এস. এস. সি পাশ করার পর বাঁশখালীতে কোন কলেজ না থাকায় আমাদের বড় ভাই ও অভিভাবক আমাকে সাতকানিয়া কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। বড় ভাই মরহুম আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম চৌধুরী তখন সাতকানিয়া কলেজের গভর্ণিং বডির মেম্বার ছিলেন। আমি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ হতে একটানা ৪ বছর সাতকানিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে কলেজ হোস্টেলে থাকতাম। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে বারেবারে সাতকানিয়া কলেজে আসতে দেখতাম। তিনি সাতকানিয়াস্থ জলিল শেঠের কারে করে কলেজ গেইটে আসতেন। সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয় আবুল খায়ের চৌধুরী কলেজ গেইটে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে স্বাগত জানাতেন এবং কলেজের বিভিন্ন উন্নয়ন ও নানান কর্মকাণ্ড অবলোকন করাতেন। উপরের তলায় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কক্ষে তা'যিমের সাথে তাঁর চেয়ারে বসাতেন এবং উপযুক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন। আমি এ দৃশ্য একাধিকবার অবলোকন করেছি।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ৩ দিনব্যাপী বার্ষিক মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর রবিবার দিন সকাল ১০টার দিকে চুনতী শাহ মঞ্জিলস্থ উপরের তলায় তাঁর মোলাকাত লাভ করি। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দোয়া প্রার্থী হই। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ হতে নিয়মিত মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ যাওয়া-আসা করে চলেছি। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ইন্তেকাল হওয়ার সংবাদ বাঁশখালী গ্রামের বাড়িতে জানতে পারি। তৎক্ষণাৎ গ্রামের বাড়ি থেকে চুনতী গমন করে জানাযা-দাফনে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের পরও মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ প্রায় যাওয়া- আসা হয়েছে।

এ মহান আশেকে রসূল (স.) মোজাদ্দেদে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর জীবনী গ্রন্থ আমি রচনা করব তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। তার কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ মহান আশেকে রসূল (স.) এর জীবনী গ্রন্থ রচনা করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ইপিজেড,

চট্টগ্রাম এর বাংলা বিভাগের বর্তমান সহকারী অধ্যাপক চুনতীস্থ মুহাম্মদ রুহুল কাদের (প্রকাশ রুহু রুহেল) ও বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা আলীয়া মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা কার্যক্রমে আমাকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। এছাড়া আরও যারা সময়, শ্রম , তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ মহান ওলির ইন্তেকালের প্রায় ২৩/২৪ বছর পর তাঁর জীবনী গ্রন্থ রচনা করায় তাঁর মোবারক জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু তাঁর অনেক নিকটতম আত্মীয়স্বজন ইন্তেকাল করে গেছেন। তারপরও যতটুকু সম্ভব আমি তথ্য তালাশ করেছি গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করতে ও সাজাতে। তবে সম্মানিত পাঠকগণই সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) 'চুনতী' শব্দটি লিখার ক্ষেত্রে দীর্ঘ-ঈ-কার ব্যবহার পছন্দ করতেন তাই অত্র গ্রন্থে তা ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা বানান (আংশিক) অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া গ্রন্থে তথ্যগত, ভাষাগত ও বানানে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। এ ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে প্রথম প্রকাশ হিসেবে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে সম্মানিত পাঠকমহলের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুগ্রহ করে আমাকে জানালে আগামীতে শুধরিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের সকলের দোয়া কামনায়-

আহমদুল ইসলাম চৌধুরী
রোজ ভ্যালী রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া
বাড়ী ১০, রোড-৩,
জাকির হোসেন রোড, চট্টগ্রাম
ফোন: ০৩১-২৫৬৬১১০
মোবাইল: ০১৭১৩-১১৫৬০১
০১৮৪১-২৪৪৩৫৫
ই-মেইল: aislam@kbhouse.info

দ্বিতীয় প্রকাশ প্রসঙ্গে দু'কথা

মাত্র এক বছরের ব্যবধানে প্রথম প্রকাশের প্রায় সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় সীরত মাহফিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দকে সামনে রেখে দ্বিতীয় প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম। এতে ক'জনের প্রদত্ত স্মৃতি সন্নিবেশিত হল। তাছাড়া গ্রন্থের কভারে প্রদত্ত শ্লোক প্রসঙ্গে সম্মানিত পাঠক মহলের বিভ্রান্তি এড়াতে গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে তৎসংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকাশে প্রয়োজনের তাগিদে গ্রন্থের প্রথম দিকে ও মাঝামাঝি স্থানে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া প্রথম প্রকাশকে অবিকল রাখা হল। যেহেতু প্রথম প্রকাশে মুদ্রণ জনিত কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও বর্ণনা বা তথ্যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরও দ্বিতীয় প্রকাশের পর কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে সম্মানিত পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাকে অবহিত করলে মহান আল্লাহ পাক চাহেঁতো পরবর্তীতে শুধরিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকব। আপনাদের শুভদৃষ্টি কামনায়-

গ্রন্থকার

তৃতীয় প্রকাশের কথা

দ্বিতীয় প্রকাশের এক বছর পর পূনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় যৎসামান্য সংশোধনী সহ পাঠক মহলের কাছে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

গ্রন্থকার

চতুর্থ প্রকাশের কথা

তৃতীয় প্রকাশের গ্রন্থগুলো নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় চতুর্থ প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রায় ছয় বছরের ব্যবধানে গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হল। এতে যতকিঞ্চিৎ সংযোজন বিয়োজন হয়েছে মাত্র।

গ্রন্থকার

পবিত্র কুরআন শরিফ

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا

আর যে আল্লাহ ও রসূল (স.) এর আনুগত্য করবে সে তাঁদের সঙ্গী হবে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন। তাঁরা হলেন নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ।

-সূরা নেসা- ৬৯

انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض، والله ولى المتقين.

আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ পরহেযগারগণের বন্ধু।

-সূরা জাছিয়া-১৯

الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، اولئك اصحاب النار، هم فيها خالدون.

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করেছে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত, এরা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হল দোযখের অধিবাসী। চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

- সূরা বাক্বারা- ২৫৭

والمؤمنون والمومنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله، اولئك سيرحمهم الله ، ان الله عزيز حكيم.

আর মুমিন নর ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে নিবৃত্ত করে, সালাত কয়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.) এর আনুগত্য করে; এদেরকে আল্লাহ কৃপা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা-৭১)

- সূরা তাওবা-৭১

ألا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون — الذين آمنوا وكانوا يتقون.

মনে রেখো যারা আল্লাহর বন্ধু তাঁদের না কোন ভয়ভীতি আছে, না তাঁরা চিন্তান্বিত হবে, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে

- সূরা ইউনুস- ৬২-৬৩

Chunati.com Pioneer village based website

পবিত্র হাদিস শরিফ

عن ابي هريرة – رضى الله تعالى عنه – قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدى بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم – متفق عليه

হযরত আবু হুরাইরা (র.) হতে বর্ণিত: তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক বলেন, আমি আমার বান্দাহর নিকট ঠিক তদ্রুপ যদ্রুপ সে আমাকে মনে করে। আমি তাঁর সাথে অবস্থান করি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে নিজে স্মরণ করে আমিও তাঁকে নিজে স্মরণ করি । আর যদি সে আমাকে স্মরণ করে দলের মধ্যে আমিও তাঁকে স্মরণ করি তদপেক্ষা উত্তম দলের মধ্যে। - বুখারী

عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وازيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها او اغفر ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا ومن آتاني يمشي آتيته هرولة ومن لقيني بقراب الارض خطيئة لايشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة – مسلم

হযরত আবু যর গিফারী (র.) হতে বর্ণিত: তিনি বলেছেন, হুযুর পাক (স.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহপাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট একটি উত্তম কাজ নিয়ে আসবে, তার জন্য সে কাজের দশগুণ বিনিময় রয়েছে। আমি তাকে তদপেক্ষাও বেশি দিব। আর যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তার প্রতিফল অনুরূপ একগুণই রয়েছে। অথবা আমি তাকে মাফ করে দিব। যে ব্যক্তি আমার এক বিঘত নিকটে আসবে, আমি তার এক হাত নিকটে যাব, আর যে ব্যক্তি আমার এক হাত নিকটে আসবে, আমি তার দুই হাত নিকটে যাব। যে ব্যক্তি আমার নিকট হেঁটে আসবে, আমি তার নিকট দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি আমার নিকট শিরক ব্যতীত পাহাড় সমান গুণাহ নিয়ে আসবে, আমি তার নিকট সে পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করব। -মুসলিম

Chhunati.com Pioneer in village based website

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال من عادى لي وليا آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيئ احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التى يمشي بها وان سألني لاعطينه لئن استعاذني لاعيذنه وما ترددته عن شيئ انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مسائته ولابد له منه – بخاري

হযরত আবু হুরাইরা (র.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে শত্রু মনে করবে আমি তার সাথে জিহাদ ঘোষণা করি। আমার বান্দাহ আমার নৈকট্য লাভে সক্ষম হয় না এমন কোন বস্তু দ্বারা যা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে, আমি যা তার উপর ফরজ করেছি তা অপেক্ষা। আর আমার বান্দা সর্বদা আমার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল এবাদত দ্বারা। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন হয়ে যাই তার কান, যদ্বারা সে শ্রবণ করে। আমি হয়ে যাই তার চক্ষু, যদ্বারা সে দর্শন করে। আমি হয়ে যাই তার হাত, যদ্বারা সে ধরে। আমি হয়ে যাই তার পা, যদ্বারা সে চলে এবং যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাকে দান করি। আর যদি সে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় দান করি। আর আমি দ্বিধাগ্রস্ত হইনা যা আমি করতে চাই তাতে। মুমিনের রুহ কবজ করার ন্যায় ইতস্ততঃ না করার মত। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি অপছন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করাকে। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য আবশ্যক। (কেননা মৃত্যুর মাধ্যমেই সে আমার নিকট আসতে পারবে।)- বুখারী

শ্লোক

হাম মাজারে মুহাম্মদ (স.) পে মর জায়েঙ্গে
জিন্দেগি মে ইয়েহি কাম কর জাঁয়েঙ্গে

অলিকুল শিরোমণি, আশেকে রসূল, মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) মহানবী ও বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ দূত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর প্রেমে ডুবে গিয়ে সুদীর্ঘ প্রায় ২৫ বৎসর পাহাড় পর্বতে, গহীন অরণ্যে সময় কাটিয়ে উপরোক্ত শ্লোক বারবার ধ্বনিত করতেন। প্রায় সময়ই এই পদগুলি মুখে আওড়াতেন, যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে মুহাম্মদ (স.) এর উদ্দেশ্যে আমার জীবন উৎসর্গিত, সারাজীবন তাঁর ধ্যানেই আমি থাকব নিয়োজিত।

পৃথিবীতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা কিছু বিষয়কে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যা অলৌকিক শক্তির ক্ষমতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। যা আমাদের সাধারণ লৌকিক তথা দৃশ্যমান শক্তিতে অনুভূত হয় না। এমনিভাবে কিছু সংখ্যক মানবসত্তা যারা স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালবাসেন এবং মহান আল্লাহর প্রেরিত মহান পুরুষ বিশ্বনবীকে ভাল বেসেছেন, তাদের মধ্যেও অনেক ধরনের শ্রেণীভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেউ ভালবাসেন প্রিয় মানুষটিকে, কেউ ভালবাসেন জীব বৈচিত্র্যকে, কেউ ভালবাসেন প্রকৃতিতে বসবাসরত প্রকৃতির অসীম নৈসর্গিকতাকে, কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু সংখ্যক আল্লাহর প্রিয় বান্দা আছেন, যারা কেউ ফানা ফিল্লাহ , কেউ ফানাফির্ রসূল। অর্থাৎ কেউ আল্লাহর জন্য পাগল যেমন আমাদের অনেকের জানা আছে, মনসুর হাল্লাজ এমনই ফানা ফিল্লাহ ছিলেন যে, মুখে মুখে উচ্চারণ করতেন আনাল হক (আমি স্রষ্টা)। এই কথাটি বারবার মুখে মুখে আওড়াতেন, ফলে তাঁকে হত্যা করেছিল নিজেকে স্রষ্টা দাবী করেছে ভেবে। অথচ শহীদ হওয়ার পর তাঁর শরীরের অংশও যখন একই ধ্বনি উচ্চারণ করছে, ঘোষণা দিচ্ছে তখনই মানুষ বুঝতে পারল, ইনিত মোশরেক নন। স্রষ্টার অংশীদারিত্ব ঘোষণা করছেন না। স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন হতে হতে আল্লাহর যিকরে মশগুল হতে হতে নিজেই স্রষ্টার মধ্যে বিলীন হয়েই ধ্বনি করলেন আনাল হক, আনাল হক। আশেকে রসূল (স.) হযরত ওয়াইস আলকরনি (রহ.) এর মত হযরত শাহ সাহেব (রহ.)ও একজন ফানাফির রসূল এর অনন্য দৃষ্টান্ত।

কর্মময় জীবনে তিনি শরিয়তের বিধি বিধান, ইলম, নামাজ , রোজা ইত্যাদির সঙ্গে বাতেনি ইবাদতও আবশ্যক মনে করতেন। এ ধরনের বাতেনি ইবাদতের মধ্য

দিয়ে এক সময় তিনি লোকালয় ত্যাগ করে বেছে নিলেন অরণ্যানী ঘেরা পাহাড়, জঙ্গল, গ্রাম-গঞ্জ, কখনো কখনো শহর-বন্দর।

এই সময় তিনি সর্বদা মুখে মুখে উপরে বর্ণিত পংক্তিগুলি প্রায়ই পড়ে থাকতেন। কী ধরনের নবীপ্রেমে সিক্ত হলে এ রকম কাব্যময় ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত উক্তি পড়ে পড়ে থাকতেন তা মহান আল্লাহপাকই জানেন সবচেয়ে বেশি। আমরা অতটুকুই বুঝি রসূল (স.) এর প্রতি তাঁর প্রেমবোধ অত্যন্ত প্রগাঢ় ও গভীর ছিল।

উক্ত শ্লোকের পূর্ণাঙ্গ রূপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলঃ

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے
زندگی میں یہی کام کر جائینگے
عرصۂ حشر میں دھوم ہوگی بڑی
حور و غلماں منائینگے ملکر خوشی
خلد میں جب شاہ بحر و بر جائینگے
بخشوانے کو امت کی جرم و خطا
تاج پہنے شفاعت کا روز جزا
پیش معبود خیر البشر جائینگے
آ نبیا اولیا ہونگے سب ساتھ ساتھ
لیتی جائیگی رحمت بلا ساتھ ساتھ
حشر میں میرے مولی جدھر جائینگے
نور و یگانا جینے یہ رنج ہمیں
گر بلائیں نہ آ قا مدینے ہمیں
ہند و میں جان سے ہم گزر جائینگے

Ghunati.com Pioneer of village based website

শ্লোকের অনুবাদ

আমরা হযরত রসূলুল্লাহ (স.) এর মাযার শরিফে মৃত্যুবরণ করে ফানা হয়ে যাব
পুরো জীবনের মধ্যে এই কাজটিই শুধু করে যাব
যখন হাশরের ময়দানে খুব বড় রকমের ধুমধাম হবে
হুর ও গিলমান সকলে মিলেমিশে আনন্দ উদযাপন করবে
যখন জল- স্থলের বাদশাহ বেহেশতে যাবেন
উম্মতের গোনাহ পাপ সমস্ত মাফ করাবার উদ্দেশ্যে
বিচার দিবসে শাফাআতের তাজ পরিধান করে
মাবুদে হাকিকির সামনে তখন খাইরুল বশর রসূলুল্লাহ স. যাবেন
তাঁর সাথে আম্বিয়া ও আউলিয়া সকলে থাকবেন
সাথে সাথে রহমত সমূহ নিতে যাবেন
আমাদের মুনিব হাশরের ময়দানে যেদিকেই যাবেন
হায় একাকিত্ব ও অসহায়ত্বের কারণে আমাদের এত দুঃখ কষ্ট
যদি আমাদের সরদার আমাদেরকে মদিনা শরিফে তলব না করেন
তবে হিন্দুস্থানে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও চলে যাব।

এভাবে মনের গভীরতর আকুতিতে এই শে'র বা কবিতার শ্লোক এর মর্মার্থ উপলব্ধি করে পরিতৃপ্ত হতেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রায়ই।

সুফি সাধনা

সুফির অন্যতম ব্যাখ্যায় বলতে হয়, নবীজী (স.) এর গারে হেরায় আল্লাহর ধ্যানে মত্ত থাকার মধ্য দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদী (স.) এর মধ্যে সুফি ইজমের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। সুফি মতবাদ বা তাসাউফ তত্ত্বের বিকাশ নবীজী (স.) এর আমল থেকেই পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে জারি রয়েছে।

নবীজী (স.) নবুওয়ত প্রাপ্তির আগে থেকে খানায়ে কাবার প্রায় ৩ থেকে ৪ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে 'জবলে নূর' নামক অতি উচ্চ পাহাড়ের শীর্ষে 'গারে হেরা' বা হেরাগুহায় গমন করতেন। তথায় তিনি মহান আল্লাহপাকের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর ধ্যানে বিঘ্ন ঘটবে বিধায় তিনি তথা হতে ঘরে ফিরে আসতেন না। ফলে উম্মুল মোমেনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (র.) যথাযথভাবে তথায় খাবার পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন।

উক্ত গারে হেরায় মহান আল্লাহপাকের ধ্যানে নিমগ্ন থাকাবস্থায় মহান আল্লাহপাকের সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দূত বা ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল আ. তথায় উপস্থিত হন। তিনি মহান আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে তাঁরই অতি প্রিয় হাবিবের নিকট মহান বাণী নিয়ে আসেন। পবিত্র কুরআনে হাকিমের সর্বপ্রথম বাণী "ইকরা" এ গারে হেরায় নাজিল হয়।

সুফি শব্দটার উৎপত্তি নিয়ে জ্ঞানীবর্গের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন সাধক মত প্রকাশ করেছেন, আরবি ভাষায় "সাফা" (পবিত্র) শব্দ থেকে সুফি শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে। অনেকে আবার মনে করেন নবীজী (স.) এর যামানায় 'আসহাবুসসোফফা' নামে পরিচিত সাধকগণের সহিত সুফি শব্দের সম্পর্ক রয়েছে। তৃতীয় আরেক মতে আরবি "সূফ" (পশম) শব্দ থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। যেহেতু সে যুগে সাধকগণ পার্থিব ভোগ বিলাস ত্যাগ ও স্বেচ্ছা দারিদ্র্যের নিদর্শন স্বরূপ মোটা পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। পরবর্তীতে এ পোশাকই তাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। লাহোরে শায়িত হযরত দাতা গঞ্জে বখশ (রহ.) তাঁর রচিত বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ "কাশফুল মাহজুব" গ্রন্থে অনুরূপ অভিমতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

নবীজী (স.) এর আমলে কতেক সাহাবায়ে কেরাম দরিদ্রতা ও কৃচ্ছতা সাধনের পথ অবলম্বন করে জীবনযাপন করেছিলেন। তৎমধ্যে "আসহাবুস্‌সোফ্‌ফা" এর

সাধকগণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সমস্ত মহান সাহাবায়ে কেরাম ঘর সংসার পরিত্যাগ করে মসজিদে নববীর পার্শ্বে অবস্থিত হুজরায় এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। নীরবে আল্লাহর এবাদত করা, নবীজী (স.) এর চরিত্রের আলোকে নিজেদের ব্যক্তি জীবনকে গড়ে তোলার প্রয়াস এবং কুরআন হাদিসের অনুশীলনেই তারা নিয়োজিত থাকতেন। কোন প্রকার পার্থিব কার্যকলাপের সঙ্গেই তাদের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল না। লজ্জা রিবারণের জন্য একান্ত অপরিহার্য অতি সামান্য বস্ত্র তাঁরা ব্যবহার করতেন। চরম দরিদ্রতাকে তাঁরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন।

ইবনে খলদুন তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন, প্রাচীনকালীন মুসলমানেরা এবং তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে নবীজী (স.) এর সাহাবা, তাবেয়িন, তবে-তাবেয়িন সুফি মতবাদকে সত্য ও মুক্তির পথ বলে মনে করতেন। গভীর নিষ্ঠার সহিত আল্লাহর উপর নির্ভর করা, সর্বস্ব ত্যাগ, পার্থিব জাঁকজমক, ভোগ-বিলাস, আমোদ-আহলাদ, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা প্রভৃতি যাকিছু মানুষের কার্য তা সবই ত্যাগ করে নির্জনে আল্লাহর আরাধনায় নিয়োজিত থাকাই হল সুফি মতবাদের মৌলিক নীতি। সাহাবাগণ ও প্রথম যুগের মুসলমানগণ এ নীতি সমর্থন করতেন।

নবীজী (স.) এর অন্যতম সাহাবা হযুরত আবুদারদা (র.) সম্পর্কেও বলা হয় যে, তিনি সর্বদাই বলতেন, মৃত্যুর পর তুমি কি দেখবে তা যদি জানতে তাহলে তৃপ্তির সঙ্গে কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হত না। নবীজী (স.) এর অপর অন্যতম সাহাবা তামিমুদ্দারী আগে খ্রিস্টান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর নিজের পূর্বতন কৃতকর্মের সম্ভাব্য পরিণতির ভয়ে তিনি সর্বদা অত্যন্ত অস্থির থাকতেন। কথিত আছে যে, সমগ্র রাত্রি জেগে থেকে তিনি কুরআন মজিদের সূরা "জাসিয়ার" ২১তম আয়াত পুনঃপুনঃ তেলাওয়াত করতেন। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, "দুষ্কৃতকারীরা কি মনে করে যে, আমি তাদের প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল লোকদের মত আচরণ করব তাদের জীবনকালে ও মৃত্যুতে ? তারা কি মনে করে আমি তাই করব?"

সুফি তত্ত্বের উন্মেষযুগের শ্রেষ্ঠতম সাধক হচ্ছেন হযরত হাসান বসরী (র.)। ইরানের দক্ষিণে শাতিল আরবের নিকটে বসরা নগরে তিনি বাস করতেন বলেই তাঁর নামের শেষে বসরী বিশেষণটি যুক্ত হয়েছে। নবীজী (স.) এর অন্যতম বিবি হযরত উম্মে সালমা (র.) এর এক পরিচালিকার গর্ভে হযরত হাসান বসরী (র.) এর জন্ম হয়। হযরত রাবেয়া বসরী (র.) তাঁর সমসাময়িক

মহিয়সী ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (র.) ১৩০ জন সাহাবার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষায় তিনি ছিলেন হযরত আলী (ক.) এর অন্যতম প্রধান শিষ্য। সম্ভবত এ জন্যই সুফি তরিক্বার শজরায় হযরত আলী (ক.) এর নামের পরেই তাঁর নামটি স্থান লাভ করে।

কাদেরিয়া, চিশ্তিয়া ও সোহরাওয়ারদিয়া এ তিন প্রধান সুফি তরিক্বার সাধকগণ হযরত আলী (ক.) এর পরেই হযরত হাসান বসরী (র.) কে তাদের পথ প্রদর্শক বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

হিজরি প্রথম শতকের শেষ দিকে তাসাউফ সাধকগণের মধ্যে এমন অনেকের আবির্ভাব হয়, যারা শুধু নীরব সাধনায় সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধ্যানানুশীলনেও আত্মনিয়োগ করেন এবং ধ্যানের মাধ্যমে ক্বলব জারি করে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন। এতে চরম আনন্দের সন্ধানই তাদের পথ হয়ে দাঁড়ায়। সংসার ত্যাগ ও স্বেচ্ছা দরিদ্রতাকে ইতোপূর্বে সওয়াবের কাজ মনে করা হলেও তাদের ধারণার সৃষ্টি হয় যে, রাত দিন আল্লাহ তা'য়ালার পথে আত্মসমর্পণের বাহ্যিক রূপই হচ্ছে বৈরাগ্য ও দরিদ্রতা অবলম্বন করা। সেকালে সকল সুফি সাধকগণই কঠোর শরিয়তের পাবন্দ ছিলেন। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অনুসরণে নামাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মীয় এবাদত তাঁরা গভীর নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করতেন। হযরত ওয়াইস আল করনী (র.), হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম (র.), হযরত ফুজায়েল বিন আয়াছ (রহ.), হযরত রাবেয়া বসরী (র.), হযরত আবু সোলাইমানুদ্ধারানি (রহ.), হযরত ইবনে আরবি (রহ.), হযরত যুন্নুন মিসরী (রহ.), হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.), হযরত মনসুর হাল্লাজ (রহ.) সেকালে বিখ্যাত বিখ্যাত সাধক পুরুষগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

অপরদিকে, সুফিতত্ত্বের মধ্যে কবিত্বের দিক দিয়ে হযরত শেখ সাদী (রহ.), হযরত হাফিজ (রহ.), হযরত জামি (রহ.), হযরত মাহমুদ সাবিস্তারী (রহ.), হযরত জালালুদ্দিন রুমি (রহ.), হযরত ফরিদুদ্দিন আত্তার (রহ.) অন্যতম ছিলেন।

অপরদিকে, আল্লাহর অস্তিত্ব সত্তার বাস্তব অনুভূতি, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে পরম সত্তার মধ্যে বিলীন করে "ফানা" প্রাপ্তি এবং অবশেষে "বাকা" বা অমৃত আহরণই সুফি সাধনার মূলকথা। কাজেই কোন অবলম্বন ব্যতীত নিছক শূণ্যের মধ্যে ফানা'য় পৌঁছা সহজতর নয়।

সেকালে মনীষীগণ "ফানা" কে ২ ভাগে ভাগ করেছেন, এক "ফানাফিল্লাহ" দুই "ফানাফির রাসূল (স.)" আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে আগে "হাকিকতে মুহাম্মদী (স.)" বা "নূরে মুহাম্মদী (স.)" সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে হবে। সুফি সাধকগণ এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করে থাকেন। তাঁরা আরো বিশ্বাস করে থাকেন সৃষ্টির আগে ছিল শুধু আল্লাহর নূর। সে নূর থেকেই আল্লাহ পাক সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করেছেন "নূরে মুহাম্মদী (স.)"। অতঃপর এ "নূরে মুহাম্মদী (স.)" থেকেই সৃজিত হয়েছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তার মধ্যস্থ সবকিছু। বহুল প্রচলিত এ ধারণা সুফি বিশ্বাসের এক প্রধান অঙ্গ। সকল সুফি সাধকই মনে করে থাকেন যে, আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হলে "নূরে মুহাম্মদী (স.)" সম্পর্কে অবশ্যই পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে হবে।

নবীজী (স.) সম্পর্কে এরূপ সুউচ্চ ধারণা পোষণ করেন বলেই সুফি দরবেশগণ "হাকিকতে মুহাম্মদী (স.)" বা "নূরে মুহাম্মদী (স.)" সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে সে জ্ঞানের মাধ্যমেই আল্লাহপাকের মহান সত্তার সত্যিকার অনুভূতি ও নিজেদের আন্তর্লোক জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়ে এসেছেন।

চুনতী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) দাম্পত্য জীবনে পা বাড়াতে না বাড়াতেই মহান আল্লাহপাকের ধ্যানে নিজেকে মশগুল করে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, মান-মর্যাদা সবকিছু ত্যাগ করেন। মানব কোলাহল থেকে দূরে পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গলে মহান আল্লাহপাকের ধ্যানে দীর্ঘকাল কাটিয়ে "ফানাফিল্লাহ" ও "ফানাফির রসূল (স.)" এর অতি উচ্চ আসনে পৌঁছে যান এবং তিনি 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াত' এর মর্যাদা লাভ করেন। ফলে লোকজন ওনার সান্নিধ্যে এসে দোয়ালাভে ধন্য হন। পর্যায়ক্রমে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এদিকে, মানব সমাজ তিনি যে একজন মহান 'ফানাফিল্লাহ' ও 'ফানাফির রসূল (স.)' তা অনায়াসে বুঝে নেন।

চুনতীর পরিচিতি

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রামের মধ্যে চুনতী অন্যতম একটি। বিশ্বের বুকে চট্টগ্রামের যেমনি স্বীয় পরিচিতি রয়েছে তেমনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে চুনতী গ্রামেরও একটি আলাদা পরিচিতি রয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চল সাহাবা, তাবেয়িন, তবে-তাবেয়িনের পদচারণা লাভ করে গর্ভ অনুভব করে। সাথে সাথে পাহাড়-সমুদ্রবেষ্টিত নয়নাভিরাম চট্টগ্রাম মহান আউলিয়া-দরবেশগণের অঞ্চল বলে খ্যাতি রয়েছে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ চট্টগ্রামের চুনতী গ্রামকে মহান আউলিয়াগণের গ্রাম বললে মনে হয় বাড়িয়ে বলা হবে না। সাধারণ শিক্ষিতজনের পাশাপাশি এ গ্রাম তার মাটির বুকে ধারণ করে রেখেছে বেশ কয়েকজন মহান আল্লাহর ওলিকে।

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার আরাকান মহাসড়ক চুনতী গ্রামের উপর দিয়ে পথ ধারা। চট্টগ্রাম শহর থেকে ৭৪ কিলোমিটার দক্ষিণে কক্সবাজার শহর থেকে ৮৬ কিলোমিটার উত্তরে চুনতী গ্রামের অবস্থান, অনুরূপভাবে চট্টগ্রাম জেলার সর্বদক্ষিণে লোহাগাড়া উপজেলার সর্বদক্ষিণে চুনতী গ্রাম। চুনতী গ্রামের দক্ষিণ সংলগ্ন কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার সীমানা।

৭ম শতাব্দীতে হযরত উমর ফারুক (র.) এর খেলাফতকাল থেকে শুরু করে যে সকল সাহাবা, তাবেয়িন, তবে-তাবেয়িন ও আউলিয়ায়ে কেরামের দল বা উপদল অমুসলিম দেশ চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন তাদের দ্বীন প্রচারের কেন্দ্রটি নগরীতে সীমাবদ্ধ না রেখে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষকদের উদঘাটিত তথ্যাবলীতে অনেক আউলিয়ার মাজারের নামের সন্ধান পাওয়া যায়। জনশ্রুতি ও প্রাপ্ত দলিলাদির পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে, উল্লিখিত আউলিয়া ও মুবাল্লেগিনের একটি দল চট্টগ্রাম জেলার সর্বদক্ষিণাংশে আরাকান রোডের পূর্ব পার্শ্বে লাল মাটির ছোট ছোট অনুচ্চ টিলা-পাহাড়ে বা এর পাদদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিকভাবে নির্দেশিত হয়ে পূণ্যভূমি চুনতীর টিলা পাহাড়ের রূপ, এর মাটির লালিত্য ও গন্ধ শুঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এ স্থানকে তাঁদের ইবাদত, রিয়াজত, মুরাকাবা, মুশাহাদা, দ্বীন প্রচার ও কায়েমের কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত করেছিলেন।

প্রকৃতির লীলাভূমি এই চুনতী গ্রামের নামকরণে রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এলাকার অন্য কোন নামের সঙ্গে এই নামটির মিল নেই। এটি গ্রামের আদি নাম নয় এটি প্রদত্ত নাম। চুনতী নামটি উৎপত্তি 'চুনিদাহ' হতে। শব্দটি মূলতঃ ফার্সি, যার অর্থ নির্বাচিত। অন্য এক বর্ণনা মতে এখানে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর মঠ ছিল। একজন বহিরাগত লোক একদা এ অঞ্চল দিয়ে গমনের সময় এখানকার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে তার কাছে জানতে চান এ সুন্দর অঞ্চলটির নাম

কি? ভিক্ষুটি মনে করেন তিনি তার নাম জানতে চেয়েছেন এবং বললেন, চুনুটিয়া। লোকটি তা এ অঞ্চলের নাম মনে করেন ও অন্যদের কাছে চুনুটিয়া নামের এ অঞ্চলটির খুব প্রশংসা করেন। তখন থেকে এ অঞ্চলটি চুনুটিয়া ও কিছুদিন পর চুনতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আর এক অভিমত অনুযায়ী সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা যখন আরাকানে চলে যাচ্ছিলেন তখন চট্টগ্রাম হয়ে আরাকান যাওয়ার পথে থেমেছিলেন, ঐ পাহাড় পরিবেষ্টিত ছায়াঘেরা ভূমি নৈসর্গিকতায় বিমুগ্ধ হয়ে একটি খুঁটি গেড়ে দিয়ে যান সুচিহ্নিতের রেখাঙ্কিত স্পর্শে যা ফার্সি শব্দের মূল শব্দ 'চুনিদন' অর্থাৎ সুচিহ্নিত। এই চুনিদন শব্দেরই পরিবর্তিত অপভ্রংশ রূপ চুনতী শব্দে রূপান্তরিত হয়ে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে চুনতী নামে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে চুনতী গ্রাম প্রসিদ্ধ হওয়ার পেছনে যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষার পরিবেশ ও প্রাকৃতিক অপার অপরূপতাই প্রধান। কোন গ্রাম মহল্লা বা এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কতগুলো পূর্বশর্ত কাজ করে। যেমন অধিবাসীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা, সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা গ্রহণের অদম্য আগ্রহ ও ঐতিহ্য।

এই ঐতিহ্য চুনতীর পূর্বপুরুষগণ সাথে নিয়ে এসেছিলেন। যে কারণে জেলা শহর থেকে দূরের একটি গঞ্জ-গ্রাম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মুসলিম শাসন আমলে চুনতীর অধিবাসীরা শাসক শ্রেণীর শিক্ষা (আরবি-ফার্সি) গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সি চালু ছিল। এই সময় বহু আলেম সরকারের উচ্চপদে চাকুরীরত ছিলেন। অনেকে আলেম হিসেবে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে চুনতীতে বেসরকারি পর্যায়ে মাদরাসা ছিল। বর্তমানে চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা, চুনতী মহিলা কলেজ (বর্তমানে সরকারি), চুনতী উচ্চ বিদ্যালয়, চুনতী ফাতেমা বতুল মহিলা মাদরাসা ও চুনতী হাকিমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমাহার অত্র গ্রামকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ইংরেজ সরকার যখন এদেশে ইংরেজি শিক্ষা চালু করে তখন মুসলমানরা বিপদে পড়ে। সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশত বছর তাঁরা ছিলেন শাসক। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের চেয়ে কোন অংশে কম সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল ছিল না। ফলে হঠাৎ করে ফার্সি বাদ দিয়ে ইংরেজি গ্রহণে তাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বাধা সৃষ্টি হয়। কিন্তু চুনতীর অধিবাসীদের একটি অংশ এই সময় আশ্চর্যজনক দূরদর্শিতা ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেন। তাঁরা অহমিকা ও গোঁড়ামি বাদ দিয়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন।

পূর্বপুরুষগণের পরিচিতি

হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) ইবনে হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ (রহ.) ইবনে হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) ইবনে হযরত মুন্সি কাশেম আলী শিকদার (রহ.) ইবনে হযরত সুফি মুহাম্মদ মুকীম (রহ.) ইবনে হযরত মুহাম্মদ আবদুল গণী শিকদার (রহ.) ইবনে হযরত মুহাম্মদ আবদুর রশিদ তালুকদার (রহ.) ইবনে হযরত মুহাম্মদ ইব্রাহিম খোন্দকার (রহ.) (চুনতীতে বসতি স্থাপনকারী) ইবনে হযরত শাহ আলম খোন্দকার আল মুহাজির আল মুবাল্লিগ আল আরবী (রহ.) (আরব দেশ থেকে এদেশে আগমনকারী) ইবনে হযরত সাদত হোসাইন খোন্দকার (রহ.) ইবনে হযরত আমজাদ হোসাইন খোন্দকার (রহ.) ইবনে হযরত আবদুন নবী (রহ.) ইবনে হযরত কাজী নজিবুল্লাহ (রহ.) ইবনে হযরত আমানুল্লাহ (রহ.) ইবনে হযরত নজির হোসাইন (রহ.) ইবনে হযরত বুরহান (রহ.) ইবনে হযরত কাজী ইছহাক (রহ.) ইবনে হযরত কাজী ইউসুফ (রহ.) ইবনে হযরত জাফর আলম (রহ.) ইবনে হযরত রঈছ উদ্দিন (রহ.) ইবনে হযরত আবদুল হামিদ (রহ.) ইবনে হযরত জাবের (রহ.) ইবনে হযরত মুহাম্মদ তকী (রহ.) ইবনে হযরত মুসলিম (রহ.) ইবনে হযরত নাজেম (রহ.) ইবনে হযরত জাফর উল্লাহ (রহ.) ইবনে হযরত ছাজেদ আলী (রহ.) ইবনে হযরত আশরাফ উল্লাহ (রহ.) ইবনে হযরত আব্বাস (রহ.) ইবনে হযরত জানে আলম (রহ.) ইবনে হযরত সৈয়দ আকবর (রহ.) ইবনে হযরত আক্কাস (রহ.) ইবনে হযরত তালহা (রহ.) ইবনে হযরত জাইদ (রহ.) ইবনে হযরত মুসলিম (রহ.) ইবনে হযরত আবদুল্লাহ (রহ.) ইবনে আমিরুল মো'মেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

হযরত শাহ আলম খোন্দকার আল মুহাজির স্বীয় পীর মুর্শিদের আদেশে আরব দেশ থেকে এদেশে আগমন করে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আনোয়ারা উপজেলার গহিরা গ্রামে তশরিফ আনেন। সেখান থেকে বাঁশখালী উপজেলার কালীপুর গ্রামে বসবাস করেন। কালীপুর থেকে তাঁর পুত্র হযরত

Dhunati.com Pioneer village based website

মুহামম্দ ইব্রাহিম খোন্দকার চুনতী গ্রামে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

অপর একটি সূত্রমতে হযরত ইব্রাহিম খোন্দকার এর পিতা হযরত শাহ আলম খোন্দকার, তাঁর পিতা মাওলানা সাদত হোসাইন খোন্দকার তাঁর পিতা আমজাদ হোসাইন খোন্দকারই প্রথম চুনতীতে আগমন করেন। তাঁরা প্রথমত আরবভূমি হতে দিল্লি আসেন। পর্যায়ক্রমে দিল্লি থেকে আসেন গৌড়ে, গৌড় হতে লক্ষ্মণাবতী, সেখান থেকে নৌপথে ঢাকা, ঢাকা হতে স্থলপথে কুমিল্লা, কুমিল্লা হতে চট্টগ্রাম আসেন শাহসুজা চট্টগ্রাম আগমনের পরপর। চুনতীর অতি পুরাতন ঈদগাহ (বর্তমানে সেখানে মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) পাহাড়ের উপর মধ্যখানে যে শত বৎসরের পুরানো বড় বড় আমগাছ ছিল সেগুলো হযরত মুহাম্মদ ইব্রাহিম খোন্দকারের পাকঘরের নিকটেই ছিল বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে। তাঁর একমাত্র পুত্র আবদুর রশিদ তালুকদার তৎকালীন মোঘল সম্রাট কর্তৃক বিশাল জায়গির প্রাপ্ত হন। তাঁর চার ছেলে এক মেয়ে। ঐ মেয়েকে শাদি দেয়া হয়েছে আধুনগরে। চার ছেলের নাম যথাক্রমে: ১) আবদুল গণি শিকদার, ২) আবদুস সামাদ শিকদার, ৩) আহমদ কবির শিকদার, ৪) মুহাম্মদ তকি শিকদার।

আবদুল গণি শিকদারের চার পুত্র: ১) মুহাম্মদ মুকিম ২) শাহামত আলী ৩) ওমেদ আলী ৪) আবদুল আজিজ ওরফে কালু শিকদার। মুহাম্মদ মুকিমের চার পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা বড় মাওলানা মরহুম আবদুল হাকিম (রহ.) এর প্রথমা স্ত্রী এবং খানবাহাদুর ওয়াজি উল্লাহ খান (সামী) এর মাতা। চার পুত্রের নাম যথাক্রমে : ১) কাশেম আলী ২) মোবারক আলী ৩) আহমদ আলী ৪) বেশারত আলী।

কাশেম আলীর প্রথম পুত্র হলেন ১) শাহ সাহেব (রহ.) এর দাদা হযরত কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.)।

মুন্সী মুহাম্মদ কাশেম আলী সিকদার

- হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.)
  - মাওলানা ফয়েজ আহমদ
  - মাওলানা সৈয়দ আহমদ
    - ১ম পুত্র হযরত শাহ সাহেব (রহ.)
  - মাওলানা বশির আহমদ
  - মাওলানা নুর আহমদ
  - মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুন
  - মোছাম্মৎ নুরজাহান খাতুন
  - মোছাম্মৎ জহিরা খাতুন
  - মুছাম্মৎ খানম
- মুন্সী মুহাম্মদ ওয়াহেদ আলী
  - ১. খান বাহাদুর মাওলানা মুহাম্মদ হাসান
  - ২. মুহাম্মদ মোহসেন
- মোছাম্মৎ ফরহাতুননেছা খাতুন
  স্বামী-
  খান বাহাদুর ওয়াজি উল্লাহ খান (সামী)

হযরত কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.)

(হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দাদা)

দক্ষিণ চট্টগ্রামের চুনতী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রসিদ্ধ আলেমেদ্বীন, আকিয়াবের বিশিষ্ট জমিদার, হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.)। তিনি চুনতীতে অবস্থানকারী উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের মধ্যে ৬ষ্ঠতম অধঃস্তন ব্যক্তি।

হযরত কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) এর যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য তা হল এলাকার মানুষ ও আশেপাশের দূরদূরান্ত হতে আগত মানুষের মেহমানদারীর জন্য এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, এলাকায় কেউ বেড়াতে আসলে সবাই দেখিয়ে দিত, ওবা য ইউসুফ মাওলানা সাহেবের বাড়িতে য।

এই বাড়ি হতে কাউকে খালিমুখে ফিরে আসতে হতো না। আতিথেয়তার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তা হযরত কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) এর ঘরে নিত্য প্রচলন ছিল। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল আরাকান। আরাকানে তাঁর জমিদারি ছিল, ছিলেন সেখানকার কাজীও। বিভিন্ন মসজিদের খতিবের দায়িত্বও পালন করেন।

চুনতীর কুতুবে জমান আশেকে নবীয়ে আখেরুজ্জামান হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর বংশ অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত। তাঁর বংশ পরিচয়ের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা আসলে আরবি বংশধর। সারাদেশের সুপ্রসিদ্ধ এই চুনতী গ্রামের অন্যান্য প্রসিদ্ধ খান্দান ও নসবের উৎকৃষ্ট গুণাবলীর মধ্যে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নসব খান্দান একটি পৃথক গুণে গুণান্বিত। তা হল একমাত্র মেহমান নেওয়াজি অর্থাৎ মুসাফির অতিথিদের বিশেষভাবে খেদমত করা। বিদেশী মুসাফিরদের খানাপিনার ইন্তেজাম, আতিথেয়তা তাঁরই বংশে বহুকাল হতে বেশি প্রসিদ্ধ। সব সময় মাদরাসার কয়েকজন ছাত্র, আলেম ওলামা এ সুপ্রসিদ্ধ ইউসুফ মঞ্জিলে থাকতেন। তাঁদের অভ্যর্থনা মরুওয়াত ও ব্যবহার পূর্ব হতেই আরবি লোকের মত বিখ্যাত। যে কোন মুসাফির বা গরিব লোক আহার ও রাত্রি যাপনের জন্য ঐ মঞ্জিলে যেতেন।

পাক ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে চুনতী হয়ে আরাকান বার্মার লোকের যাতায়াত বেশি হত। চুনতীর খান দীঘির পূর্ব-দক্ষিণ পাশে নিয়মিত বাজার ও স্থায়ী দোকান-পাট চালু ছিল। তখন আরাকান ও বার্মার বহু মুসলমান ইউসুফ মঞ্জিলেই বেশি থাকত দু'টি কারণে প্রথমত: বার্মায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দাদাজানের যমানা হতে তাঁদের বিরাট জমিদারি ছিল। দ্বিতীয়ত: হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দাদাজানের যমানা হতে অনেক শাগরিদ-মুরিদান বার্মা হতে

দ্বীনি এলম ও মা'রেফত শিক্ষা লাভের জন্য চুনতীতে আসা-যাওয়া করত এবং তিনি সে সময় আকিয়াবের কাজী নিযুক্ত ছিলেন।

একদা কাজী মাওলানা মুহামমদ ইউসুফ আলী (রহ.) মনস্থির করলেন মহান স্রষ্টা আল্লাহপাকের ঘর তওয়াফ করবেন এবং মহান আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) এর রওজা মুবারকও যিয়ারত করবেন। অত:পর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র নগরী মক্কাতুল মোকাররমার উদ্দেশ্যে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য রওয়ানা হয়ে যান। সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁর সন্তানের মধ্য হতে হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ (রহ.) কে যিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পিতা।

মহান আল্লাহর কী আশ্চর্য মহিমা হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদকে উনার সঙ্গে পবিত্র হজ্জব্রতে সঙ্গে নিলেন। যথাযথভাবে হজ্বের পবিত্র ভূমি মক্কা মোয়াজ্জমায় পৌঁছলেন এবং হজ্ব পালন শেষে হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ তথায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) এবং জন্নাতুল মোয়াল্লাতে ওনাকে দাফন করা হয়। কী অসীম আল্লাহর মেহেরবানি, চুনতীর এই কৃতীপুরুষ শুয়ে আছেন পবিত্র ভূমি মক্কাতুল মোকাররমায়। অতএব, শাহ সাহেব (রহ.) এর বাবা হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ (রহ.) পবিত্র নগরী মক্কা মোকাররমা থেকে হজ্ব পালন শেষে একাই ফিরে আসলেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে চুনতীতে।

হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) এর আর এক সৃষ্টি যা এক প্রকার হাকিমী ঔষধ ছিল, যার নাম দিয়েছিলেন আসলী এয়াকুতী বরশ ভেষজ ও জওহারী ঐষধ। এ ঐষধের মূল নোসখা হযরত কাজী মাওলানা ইউসুফ আলী (রহ.) তাঁর কোন উর্ধ্বতন পুরুষ কর্তৃক এক কাশ্মীরী বুজুর্গের কাছে পেয়েছিলেন বলে অনেকে ধারণা পোষণ করেন।

এ উপমহাদেশের বিখ্যাত সাধক পুরুষ আধ্যাত্মিক জগতের এক মহান ব্যক্তি হযরত হামেদ হাসান আলভী (রহ.) যিনি হযরত আজমগড়ী (রহ.) হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ, তিনি তশরিফ আনতেন চুনতীর এই মাওলানা ইউসুফ এর বাড়িতে, যার নামানুসারে ইউসুফ মঞ্জিল। কারণ হযরত কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) এর বড় সন্তান হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ (রহ.) ছিলেন হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর মুরিদ। সে সুবাদে বৎসরে একবার তিনি তশরিফ আনতেন।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত আজমগড়ী (রহ.) আকিয়াবে থাকতেন। সে সুবাদে তথায় তাঁর কর্মস্থলে ত্বরিকতের তবলিগের খেদমত করতেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

এর জেঠা পিতার বড় পুত্র হিসেবে জমিদারি দেখাশুনা করতে আকিয়াব গমন করতেন। সে সুবাদে জেঠা হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ আজমগড়ী (রহ.) এর মোলাকাত পেয়ে থাকতেন। বারেবারে মোলাকাতে আকৃষ্ট হয়ে হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর হাতে মুরিদ হয়ে যান।

অপরদিকে, হযরত আজমগড়ী (রহ.) তাঁর জন্মভূমি ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড় থেকে চট্টগ্রাম হয়ে আকিয়াব ও মায়ানমার (বার্মা) গমন করতেন। চট্টগ্রামে যাত্রাবিরতিতে তবলিগে ত্বরিকতের খেদমত করতেন। ফলে তাঁর প্রিয় মুরিদ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জেঠা হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ নিজ পীর সাহেবকে তবলিগে ত্বরিকতের খেদমত করার নিয়তে চুনতী নিয়ে যেতেন। চট্টগ্রাম শহর থেকে চুনতী গমন করতেন নৌপথে গাটিয়াডাঙ্গা হয়ে। বড় নৌকা বা সাম্পানে গাটিয়াডাঙ্গা পৌঁছে তথা হতে ছোট নৌকায় করে আধুনগর খাঁন হাটে পৌঁছতেন। তথা হতে চুনতী গমন করতেন।

১৯৩০/৩১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম- দোহাজারী রেল সার্ভিস চালু হলে হযরত আজমগড়ী (রহ.) রেলযোগে দোহাজারী হয়ে চুনতী গমন করতেন। একবার দোহাজারী থেকে পায়ে হেঁটে চুনতী গমন করেছিলেন।

হযরত আজমগড়ী (রহ.) প্রতি বছর একবার করে চুনতী গমন করে ইউসুফ মঞ্জিলে অবস্থান নিয়ে অন্যত্র যাওয়া- আসা করতেন। হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর চুনতী সফর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জারি ছিল। অতঃপর তিনি দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম সফর করেননি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ত্বরিকতের বিশেষ প্রয়োজনে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সপ্তাহখানেকের জন্য চট্টগ্রাম সফর করেছিলেন।

হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর আগমন বিষয়ে একটি ঘটনা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হাফেজ হারুনুর রশিদ সাহেবকে বলেছিলেন। সেই ঘটনাটি উল্লেখ করা হল। ইউসুফ মঞ্জিলে একটি এবাদতখানা ছিল সেখানে 'শববেদারি' চলত। একদিন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিজ যবানীতে হাফেজ হারুনুর রশিদ সাহেবকে বললেন, চল, ইউসুফ মঞ্জিলে যাই। হুকুম অনুযায়ী তথায় গেলেন অতঃপর তিনি বললেন,

"একদিন আজমগড়ী (রহ.) আসলেন, এসে পুটিবিলার হাফেজ ওজীহুল্লাহ (রহ.) কে তালাশ করলেন, সেই সময় হাফেজ ওজীহুল্লাহ (রহ.) এর প্রচণ্ড অসুখ, কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে শুরু করে অনেক মারাত্মক রোগ শোকে ভুগছিলেন, এমনকি একমাস ধরে ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়াও করতে পারছেন না। যখন আজমগড়ী (রহ.) এর ডাক পড়ল তৎক্ষণাৎই হাফেজ ওজীহুল্লাহ (রহ.) অনতিবিলম্বে পুটিবিলা (লোহাগাড়া) থেকে বসে বসে হামাগুড়ি দিয়ে প্রচুর কষ্টভোগ করে ডাকে

সাড়া দিয়ে উপস্থিত হলেন চুনতীতে। সে রাতে রুহুল্লাহর পিতা মাওলানা এহছান আলীর বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত ছিল। দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে ডাক দিলেন হযরত আজমগড়ী (রহ.) ওজীহুল্লাহ কাহা? সাথে সাথে জবাব- জ্বী হুজুর আয়া। অতঃপর মাওলানা এহছান আলীর বাড়িতে দাওয়াত খেতে উপস্থিত হলেন সঙ্গে হযরত ওজীহুল্লাহ (রহ.) ও উপস্থিত হলেন এবং সামনে বসালেন। খাওয়া শুরু করে দিলেন এবং হযরত আজমগড়ী (রহ.) ওজীহুল্লাহ (রহ.) কে খেতে বলছেন, তিনি খাচ্ছেন, খেতে বলছেন, আর তিনি খাচ্ছেন। প্রায় একমাস ধরে তিনি ভাত খেতে পারছিলেন না প্রচণ্ড অসুস্থতার দরুণ। অথচ হযরত আজমগড়ী (রহ.) বলছেন খাও, তিনি খাচ্ছেন, আর খাচ্ছেন। খাওয়া শেষে সবাই ইউসুফ মঞ্জিলে চলে আসলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ ও যিকিরের জন্য জাগ্রত হলে হযরত আজমগড়ী (রহ.) জিজ্ঞেস করলেন আভি কেয়সা হে, প্রত্যুত্তরে হযরত ওজীহুল্লাহ (রহ.) বললেন, হাল মিন মজীদ কা না'রা হে হুজুর। অর্থাৎ আরো অধিক ভক্ষণ করার ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। ওজীহুল্লাহ (রহ.) এর রোগ একেবারে দূরীভূত হয়ে গেল।

হযরত আজমগড়ী (রহ.) আসলে খুবই খুশি হতেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.)। অতএব, আমরা অবশ্যই বলতে পারি চুনতী ইউসুফ মঞ্জিলের সাথে হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর একটি রূহানি যোগাযোগতো ছিলই এমনকি নিজে উপস্থিত হয়ে ত্বরিকতের সিলসিলা জারি রেখে ওই স্থানকে পবিত্র ও বরকতময় করে তুলেছেন।

হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ (রহ.) এর স্ত্রী হলেন মোছাম্মৎ আমিরুন্নেছা খাতুন বিনতে হযরত মাওলানা মুইনুদ্দীন (রহ.), গ্রাম: আধুনগর, উপজেলা: লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) এর সন্তান-সন্ততি

১ম পুত্র- হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ (রহ.)

হযরত মাওলানা ফয়েজ আহমদ (রহ.) এর দুই পুত্র সন্তান। এক. হযরত হাকিম মাওলানা মুনির আহমদ (রহ.), তিনি অলীয়ে কামেল হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর খলিফা ছিলেন। দুই. মাওলানা রশিদ আহমদ (রহ.)। মাওলানা ফয়েজ আহমদ (রহ.) এর এক কন্যা মোছাম্মৎ খায়রুননেছা- স্বামী হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.)। অপর কন্যা মোছাম্মৎ খোদেজা খাতুন- স্বামী মাওলানা আহমদ হোছাইন (সাতগড় বুড়া মাওলানা সাহেবের বাড়ী)।

২য় পুত্র হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ (রহ.)

হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ (রহ.) এর তিন স্ত্রী, ১ম স্ত্রী মোছাম্মৎ হাজেরা খাতুন। এ গর্ভে প্রথম পুত্র হযরত শাহ সাহেব (রহ.), দ্বিতীয় পুত্র হযরত মাওলানা ছালেহ আহমদ (রহ.)। ২য় স্ত্রী মোছাম্মৎ মায়মুনা খাতুন। এ গর্ভে প্রথম পুত্র মাওলানা জহুর আহমদ (রহ.), ২য় পুত্র শুকর আহমদ (রহ) (মায়ানমারে থাকতেন)। ৩য় স্ত্রী মোছাম্মৎ হাফেজা খাতুন। এ গর্ভে প্রথম পুত্র মাওলানা নেছার আহমদ, ২য় পুত্র মাওলানা আবছার আহমদ (রহ.)।

৩য় পুত্র হযরত মাওলানা বশির আহমদ (রহ.)

হযরত মাওলানা বশির আহমদ (রহ.) এর স্ত্রী মোছাম্মৎ চেমন আরা (চকরিয়া ইলিশিয়ার জমিদার খান সাহেব মকবুল আলী চৌধুরীর কন্যা।) তাঁর ৫ পুত্র ও ৪ কন্যা। ১ম পুত্র হযরত মাওলানা শফিক আহমদ (রহ.), ২য় পুত্র মাওলানা আমির আহমদ, ৩য় পুত্র মাওলানা আজিজ আহমদ, ৪র্থ পুত্র অধ্যক্ষ দ্বীন মুহাম্মদ মানিক, ৫ম পুত্র মাহমুদুল হাসান মুখতার। ১মা কন্যা মোছাম্মৎ মাহমুদা খাতুন, (তিনি ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় এবং হযরতশাহ সাহেব (রহ.) এর (১ম স্ত্রী), ২য় কন্যা মোছাম্মৎ মাছুমা খাতুন, ৩য় কন্যা মোছাম্মৎ বিজলিস খাতুন। চতুর্থ কন্যা খালেদা বেগম।

৪র্থ পুত্র হযরত মাওলানা নুর আহমদ (রহ.)
হযরত মাওলানা নুর আহমদ (রহ.) অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর কোন বংশধর নেই।

১ম কন্যা মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুন
মোছাম্মৎ ফাতেমা খাতুন, স্বামী হযরত মাওলানা আবদুল করিম (রহ.), দক্ষিণ মিঠাছড়ি, রামু কক্সবাজার। (হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর মাতা।)

২য় কন্যা মোছাম্মৎ নুরজাহান খাতুন
মোছাম্মৎ নুরজাহান খাতুন, স্বামী হযরত মাওলানা আবদুল গণী সিদ্দিকী, চুনতী (মাওলানা মুহাম্মদ শামসুল হুদা খান সিদ্দিকীর মাতা)

৩য় কন্যা মোছাম্মৎ জহিরা খাতুন
মোছাম্মৎ জহিরা খাতুন, স্বামী হযরত মাওলানা মফজলুর রহমান, চুনতী মুন্সিবাড়ী (হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর একমাত্র সাহেবজাদা হযরত শাহ জমাল আহমদ এর দাদী শ্বাশুড়ী, তথা মাওলানা তফসির উদ্দীনের মাতা।)

৪র্থ কন্যা মোছাম্মৎ খানম
মোছাম্মৎ খানম, স্বামী বিখ্যাত জমিদার মৌলভী মুহাম্মদ শের আলী খান, তথা ওয়াজেদ আলী খানের মাতা, হাবরাং, চকরিয়া, কক্সবাজার।

Gunati.com pioneer in village based website

জন্ম ও ভাই-বোন

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জন্মের সনের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কারো মতে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে, কারো মতে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে, আবার কারো মতে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কারো মতে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। যারা ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মতামত ব্যক্ত করেছেন ওনাদের প্রমাণ হলো হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিজেই নাকি একবার বলেছেন তাঁর জন্ম সন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আব্বাজান হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ (রহ.) প্রথমে স্বগ্রাম নিবাসী শাহ মঞ্জিলের নিকটস্থ বাড়ি মরহুম মাওলানা গোলাম মোস্তফা (রহ.) এর ভগ্নী মোছাম্মৎ হাজেরা খাতুনকে প্রথমা স্ত্রী হিসেবে শাদি করেন। তাঁর গর্ভে ১ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ২ হযরত মাওলানা ছালেহ আহমদ (রহ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা দু'জনকে রেখে তাঁদের আম্মাজান আল্লাহর হুকুমে ইন্তেকাল করেন। তারপর আব্বাজান সাতকানিয়া উপজেলার অন্তর্গত করইয়ানগর থেকে তৎকালীন প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবদুল ফত্তাহ (রহ.) এর একমাত্র কন্যা মোছাম্মৎ মায়মুনা খাতুনকে ২য় স্ত্রী হিসেবে শাদি করেন। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ১ মাওলানা জহুর আহমদ ২ মাওলানা শুকুর আহমদ। বার্মায় (মায়ানমারে) থাকতেন।

মুনিবের ফায়সালায় এ দুজন ছেলে রেখে ২য় স্ত্রীও জান্নাতবাসী হলেন। অতএব, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আব্বাজান ৩য় শাদি করেন লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের আমতলির মাওলানা মনির আহমদ (রহ.) এর কন্যা মুছাম্মৎ হাফেজা খাতুনকে। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ১ মাওলানা নেছার আহমদ ২ মাওলানা আবছার আহমদ ও ৩ রাহেলা বেগম।

উল্লেখ্য যে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আম্মাজান যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স সাত বৎসর এবং তাঁর ছোট ভাই হযরত মাওলানা ছালেহ আহমদ এর বয়স পাঁচ বৎসর এর কাছাকাছি।

শিক্ষাজীবন

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বাল্যকাল স্বীয় পিতার বিশেষ তত্ত্বাবধান ও যোগ্য অগ্রজগণের আদর-যত্নে বেড়ে ওঠেন। এসময় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমিরাবাদ নিবাসী হযরত মাওলানা বজলুর রহমান (প্রকাশ নোয়া মৌলভী সাহেব) নিযুক্ত হন। তিনি নিজ গৃহের শান্ত পরিবেশে জ্ঞানার্জনের বিশেষ সুযোগ পেয়ে পবিত্র কুরআন মজিদের প্রথম সবক হতে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করে অল্পদিনের মধ্যে পবিত্র কুরআন মজিদ খতম করলেন এবং প্রচলিত মাতৃভাষা, উর্দু, ফারসি এবং আরবি ইত্যাদি বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর প্রাথমিক ওস্তাদের খেদমতে থেকে হাশতুম (বর্তমানে ৭ম শ্রেণী) পর্যন্ত সুন্দরভাবে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন।

এরপর সাতকানিয়া উপজেলার অন্তর্গত আফজল নগরের হযরত মাওলানা আবদুল বারী (রহ.) (প্রকাশ ফকির মৌলভী সাহেব আফজলনগর) এর মাদরাসায় ১২ বৎসর বয়সে জমাতে হাফতুম (বর্তমানে ৮ম শ্রেণী) পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে বাঁশখালীর ছনুয়া মাদরাসায় চলে যান। যেহেতু সেখানে হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর এতদঞ্চলের প্রথম খলিফা হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) চুনতী, প্রায় ১০/১১ বৎসর মাদরাসা প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) বাঁশখালী ছনুয়া মনু মিয়াজি বাড়ীর মুরব্বি ও প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা গোলাম কাদের (রহ.) এর সাথী ও বন্ধু ছিলেন। সে সুবাদে তিনি তথায় কর্মরত ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ছনুয়া মাদরাসায় দ্বীনি এলম শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলেন। যেহেতু বর্তমান ছনুয়া কাদেরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় তখনকার সময়ে হাই মাদরাসা ছিল।

হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে এক বৎসর জ্ঞান অর্জন করে সেখান থেকে চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত প্রথম (ওল্ড স্কিম) বড় মাদরাসা দারুল উলুম চন্দনপুরায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ, হযরতুল আল্লামা ফজলুর রহমান (রহ.),

Chunati.com

হযরতুল আল্লামা নজির আহমদ (রহ.), হযরতুল আল্লামা মীর মছউদ আলী (রহ.), হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ আমিন (রহ.), হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ ফোরকান (রহ.) প্রমুখ আসাতিযায়ে কেরামগণের ছোহবতে ইলমেদ্বীন হাসিল করেন। সেখানে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে জামাতে ছিওম (আলিম ২য় বর্ষ) পাশ করলেন।

আল্লাহর হুকুমে তিনি সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারলেন না। সেখান থেকে সে যুগের একমাত্র সরকারি মাদরাসা কলকাতার প্রসিদ্ধ আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে সুফি সাধক হযরতুল আল্লামা ছফিউল্লাহ (রহ.) এর তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ফাজিল ডিগ্রি লাভ করেন।

ফাজিল পাশ করার পর দরসে হাদিস শরিফ (টাইটেল) আরম্ভ করবার নিয়তে রয়ে গেলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আব্বাজানের অনুরোধে সেখানে চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ নুরুল হোসাইন (রহ.) (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট গোল্ড মেডালিস্ট) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মুরব্বিয়ানা ও দেখাশুনা করতেন।

তখন সুখছড়ি নিবাসী হযরত মাওলানা আহমদ কবির (রহ.), হযরত মাওলানা তজম্মুল হোসেন (রহ.), হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ায় টাইটেল জামাতের আর পরীক্ষা দেয়া সম্ভব হয়নি।

দাম্পত্য জীবন

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত অবস্থায় ফাজিল পাশ করার পূর্বে আপন চাচাত বোন হযরত মাওলানা বশির আহমদ (রহ.) এর কন্যা মোছামম্‌ৎ মাহমুদা খাতুনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এ শাদিয়ে মোবারক অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। চকরিয়া উপজেলার ইলিশিয়ার প্রখ্যাত জমিদার খান সাহেব মকবুল আলী চৌধুরীর উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে এ বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে চারটি গরু জবাই করা হয়। সেদিন ঝড়-তুফানে আবহাওয়া কিছুটা প্রতিকূল ছিল বলেও জানা যায়। উল্লেখ্য, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ১ম স্ত্রী খান সাহেব মকবুল আলী চৌধুরীর নাতনী।

এরপর তিনি দ্বিতীয় শাদি করেন। ২য় স্ত্রীর নাম মোছাম্মৎ জয়নব বেগম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দ্বিতীয় শ্বশুর হযরত মাওলানা আবদুর নুর সিদ্দিকী (রহ.) চুনতী । ওনার লিখিত "হায়াতে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.)" গ্রন্থে নিজেই বলেছেন, "তাঁর দ্বিতীয় শাদি সম্পর্কে আরকানী (রহ.) অন্তত: ৩৩ বৎসর আগে আমাকে ইশারা করে গেছেন।" হযরত মাওলানা বদিউর রহমান আরকানী (রহ.) ও ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন যে, তিনি খেদমতের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় শাদির সুন্নত পালন করবেন। সে মতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন মোতাবেক ২৭ জমাদিউসসানি শনিবার দিবাগত রাত্রে শাদিয়ে মোবারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

উক্ত বিয়েতে তাঁর অনেক করামত প্রকাশ হয়ে যায়। উক্ত রজনী সম্পর্কে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভাতিজা জনাব নুরুল ইসলাম প্রকাশ জসিম উদ্দীন সাহেব থেকে জানতে পারি; ওনাকে সে রাত্রে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, বাইরে বড় মাওলানা সাহেব এসেছেন কিনা দেখ। তখনও আসেননি। কিন্তু একটু পরে তশরিফ আনলেন। এরপর হযরত মাওলানা মোবারক আহমদ সাহেবও তশরিফ আনেন। ওনাদেরকে চা নাস্তা দিতে বললেন অতঃপর শাহ সাহেব হুযুর বের হয়ে মেহমানের সাথে এক/দেড় ঘন্টা কথা বলে আবার রুমে এসে যান। এর আগে আমাকে জনাব জলিল শেঠের কাছে পাঠিয়ে গাড়ি আনান। কিছুক্ষণ পর টুপি, জামা, পায়জামা বদলায়ে দিতে বললে তা দিলাম। অতঃপর সকলকে নিয়ে হযরত মাওলানা আবদুর নুর সিদ্দিকী সাহেবের বাড়িতে তশরিফ আনলেন। ৩ ঘন্টা পর খবর হয়ে গেল হযরত শাহ সাহেব হুযুর মোছাম্মৎ জয়নব বেগমকে শাদি করেছেন। উল্লেখ্য, ওনাকে কোথাও বিয়ে না দেয়ার জন্য নাকি হযরত শাহ সাহেব অনেক আগে থেকে বলে রেখেছেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রথম বিয়ের পর কিছুদিন চকরিয়া ইলিশিয়া নানাশ্বশুরের মসজিদে ইমামতি করেছিলেন এবং হযরত শাহ জমাল আহমদের জন্মের পর কিছুদিন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিবিষ্ট থেকে পুনরায় স্বাভাবিকতায় ফিরে এসেছিলেন।

সন্তান-সন্ততি

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর স্ত্রী ছিলেন ২ জন। ১. মোছাম্মৎ মাহমুদা খাতুন ২ মোছাম্মৎ জয়নব বেগম। ১ম স্ত্রীর গর্ভে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ঔরসে ২ পুত্র ও ১ কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেন। ১. হযরত শাহ জমাল আহমদ ২ মোছাম্মৎ আমেনা বেগম। ৩ বহুদিন পরে আর একজন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেছিলেন নাম জাকের আহমদ। কিন্তু ১৮ দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন। ২য় স্ত্রী মোছাম্মৎ জয়নব বেগম এর গর্ভে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ঔরসে কোন সন্তান সন্ততি ছিল না।

প্রথম স্ত্রী মোছাম্মৎ মাহমুদা খাতুন ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ২০ এপ্রিল সোমবার দুপুর ১টায় চট্টগ্রাম শহরের একটি ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। শাহ মঞ্জিল সংলগ্ন পূর্ব উত্তর পার্শ্বে কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের পরে ২য় স্ত্রী মুছাম্মৎ জয়নাব বেগমকে অন্যত্র শাদি দেয়া হয়।

হযরত শাহ জমাল আহমদ (ইন্তেকাল ০২.০৫.২০০৭ বুধবার ভোর রাতে)

হযরত শাহ জমাল আহমদ এর স্ত্রী মোছাম্মৎ নুরজাহান বেগম (লুলু) ১৫ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে কানাডায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর লাশ মোবারক কানাডা থেকে ২৩ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ২৯ রমযান সোমবার দেশে এনে বাদে জোহর নামাজে জানাজা আদায়ের পর চুনতীতে উনার শ্বাশুড়ির কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

হযরত শাহ জমাল আহমদ এর সন্তান-সন্ততি:

(১) হামিদা নুসরাত (নুসরাত) স্বামী মাওলানা আমিনুর রহমান সিদ্দিকী

(২) মাওলানা হাফিজুল ইসলাম আবুল কালাম আজাদ (আজাদ), স্ত্রী সৈয়দা আশরাফুন্নুর (ঝুমুর),

(৩) সাজেদা সুরাত (সুরাত)
(৪) মাওলানা আবদুল মালেক মুহাম্মদ ইবনে দিনার (নাজাত), স্ত্রী কৌকবা জাহান (সাক্কী)
(৫) মুহাম্মদ আনওয়ার উল্লাহ (সুজাত) স্ত্রী আতহারে করিম সারাহ
(৬) মুহাম্মদ আসমা উল্লাহ (ইমরাত) স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা ইশার
(৭) ইবনুল হাযর আসকালানী (সম্রাট) স্ত্রী হোযাইফা আমেনা
(৮) মাওলানা ইমাম বায়হাক্কী (ইতমাম) স্ত্রী নাফিসা আব্বাসী
(৯) জমিলা সুবাতা ইবরত (জমিলা)। স্বামী সোহাইব তারেক

মোছাম্মৎ আমেনা বেগম (শাহজাদী)

মোছাম্মৎ আমেনা বেগমের স্বামী মাওলানা শামসুল হক মুহাম্মদ শিবলী (রহ.) ২১ জুলাই ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ মুহররম রোজ বুধবার ইন্তেকাল করেন।

মোছাম্মৎ আমেনা বেগমের সন্তান-সন্ততি

(১) শাফেয়া বেগম (শাফু), স্বামী মাওলানা সৈয়দ আমিনুল ইসলাম (ইসলাম কাওয়াল)
(২) শায়েকা বেগম (হিরা), স্বামী মাওলানা শফিক আহমদ চৌধুরী (শফিক)
(৩) মাওলানা দিদার-ই-হক শাহী (দিদার), স্ত্রী সৈয়দা মাশকাৎ আরা (মাশকাৎ)
(৪) তৈয়বুল হক বেদার (বেদার), স্ত্রী খালেছা বেগম (রুমা)
(৫) আসরারুল হক (আবদার), স্ত্রী নুসরিন ফাতেমা হীরা
(৬) মাহবুবা খানম (চুন্নি), স্বামী একরামুল হক (একরাম)
(৭) আবরারুল হক (মুকুট), স্ত্রী লতিফুননাহার (ছন্দা)
(৮) রিফাতুননেসা (লিজা), স্বামী এনামুল কবির (শামিম)।

Ghunati.com Pioneer in village based website

বার্মা সফর

গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার উল্লেখ করা আছে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দাদা হযরত কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) এর জমিদারী এস্টেট ছিল বার্মায়। সে সুবাদে তাঁর জীবনে এক বা একাধিকবার আকিয়াব যাওয়া-আসা থাকা স্বাভাবিক।

ভামু্র প্রকৃত অবস্থান কোথায় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। তবে মায়ানমারের (বার্মা) চীন সীমান্তে একটি ছোট শহর বা গ্রামের নাম ভামু। ভামুর এক বড় মসজিদে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আম্মার ফুফাত ভাই মাওলানা ইব্রাহিম (রহ.) খতিব ছিলেন। প্রতিকূল যোগাযোগ অবস্থায়ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আকিয়াব থেকে ভামু যান। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে পেয়ে উক্ত মসজিদের ইমামতি ও খতিবের দায়িত্ব অর্পণ করে আম্মার ফুফাত ভাই মাওলানা ইব্রাহিম কিছুদিনের জন্য দেশের গ্রাম চুনতীতে এসেছিলেন।

ঐ অবস্থায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রায় ছয়মাস পর্যন্ত ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালন করেন। ওখানে ইমামের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তিনি পবিত্র রমজান মাসের ২৭ তারিখ শবে ক্বদর এর সন্ধান পান বলে জানা যায়। তিনি তখন প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পান যে, ক্বদর রজনীর কোন এক মুহূর্তে গোটা দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয় এবং দুনিয়ার রং যেন হলুদ বর্ণ হয়ে যায়।

তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন - "নিশিরাতে শবে ক্বদরে আমি একা আমার রুমে তাহাজ্জুদ নামাজে রত ছিলাম। ঐ সময় হঠাৎ করে আমি দেখতে পাই আমার চৌকি, রুমের আসবাবপত্রসহ সবকিছু সেজদায় পড়ে আল্লাহ আল্লাহ যিকরে রত আছে। ঐ রাতে বিশ্বজগতের মুনিব লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমার ক্বলবের উপরে এসে বসলেন। তখন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন থেকে কয়েকটি জিনিস চেয়েছিলাম। যা চেয়েছিলাম আল্লাহ পাক আমাকে তা দান করেছেন।"

আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ (বন-জঙ্গলে)

আল্লাহ তায়ালার হুকুমে ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বার্মার ভামুর জামে মসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় শবে ক্বদরে মহান আল্লাহর সাক্ষাত ও সান্নিধ্য পাওয়ার পর ঐ প্রেমে বিভোর হয়ে আধ্যাত্মিক জগতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন, কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাঁর এ হালত দিনদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অনেকে তাকে হয়ত না চিনে মারধর করতে পারে এ আশংকায় সাতগড় নিবাসী মাওলানা আতাউল্লাহ হোসাইনী বোগদাদী প্রকাশ বুড়া মাওলানা সাহেবের নাতি মাওলানা গোলাম মোস্তফা (তিনি তখন সেই মসজিদের ছানি ইমাম) তাকে হিফাজত ও নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেও প্রহৃত হয়েছেন।

অতঃপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ ও ধ্যানমগ্নতা দিনদিন বেড়ে গেলে উক্ত ছানি ইমাম দেশে খবর পাঠালে ওনার ছোট ভাই মাওলানা ছালেহ আহমদ, ইমাম সাহেবের সহযোগিতায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কোমরে ও হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় স্টিমারে তুলে অনেক কষ্টের মাধ্যমে দেশের বাড়িতে নিয়ে আসেন।

ভামু থেকে চুনতী এনে পরিবারের পক্ষ থেকে নানান চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সফল হয়নি। এ অবস্থায় ঘরে খুঁটি দিয়ে আটকে রাখা হয়। একবার তাঁর পুত্র হযরত শাহ জমাল এর জন্মের পরও কিছুদিনের জন্য আধ্যাত্মিক জগতে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তখন শাহ সাহেব (রহ.) কে আটক রাখা অবস্থায় হযরত আজমগড়ী (রহ.) এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জেঠা হাকিম মাওলানা মুনির আহমদ (রহ.) এর আব্বা আজমগড়ী হুযুরকে বলেন, আমার ভাতিজার এ অবস্থা আপনি একটু দেখেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও। বেধেঁ রাখতে হয় এ রকম পাগল তিনি নন। এক সময় তোমরা বুঝতে পারবে।

এভাবে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রায় ২০/২৫ বৎসর পর্যন্ত হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সাংসারিক জীবন ত্যাগ করে মালেকে হাকিকির সন্ধানে সাধনা করে নানা ধরনের ও বিভিন্ন পর্যায়ের করামত ও আল্লাহতায়ালার কঠিন পরীক্ষায় জয়ী হন। তখন তিনি পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, নদীতে, অলিতে-গলিতে, শহরে-বন্দরে উঁচু নীচু জায়গায়, শীতে-গরমে, ঝড়ে-বৃষ্টিতে, তুফানে, অন্ধকারে আল্লাহর যিকর করে এবং হযরত রসূলে করিম (স.) এর প্রশংসা করে বেড়াতেন।

তাঁর দুঃখ কষ্ট বা অশান্তি দেখলে সকলেই তাঁর জন্য ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য হায় হায় করত। তখন তিনি পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি অসার সংসারের সব রকম আরাম আয়েশের বহু উর্ধ্বে ছিলেন। পার্থিব জগতের

সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছেদ করে একাকীত্ব বরণ করে নেন। এজন্য তিনি তৎকালীন সমাজে হযরত ওয়াইস আলকরনি (রহ.) এর মত পাগল বলে সকলের নিকট বিবেচিত হতেন। কিন্তু কারো কথায় তিনি কর্ণপাত করতেন না। অরণ্য জঙ্গলে বিলে খালে অবস্থান করতে করতে একটি বাক্যই বারেবারে পড়ে থাকতেন।

হাম মাজারে মুহাম্মদ (স.) পে মর জায়েঙ্গে
জিন্দেগি মে ইয়েহি কাম কর জায়েঙ্গে

সে সময় উনার পরিবার অসহায় বোধ করলে উনার সহধর্মিণীর নানা চকরিয়ার বিখ্যাত জমিদার খান সাহেব মকবুল আলী চৌধুরী নাতনীকে ছেলেমেয়েসহ তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে থাকাকালীন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর একমাত্র পুত্র হযরত শাহ জমাল আহমদ চকরিয়া স্কুলে লেখাপড়া করেছিলেন। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নানাশ্বশুর চকরিয়ার একটি মসজিদে ওনাকে চাকরি দেন। কিন্তু হালতে চলে আসলে ওখানে বেঁধে রাখেন। অবশেষে মসজিদের রুম থেকে পালিয়ে যান।

ঐ সময় একবার মকবুল আলী চৌধুরীর বেয়াই বৃহত্তর চকরিয়ার মগনামার জমিদার সাবেক এমপি মাহমুদুল করিম চৌধুরীর পিতা ঠাণ্ডা মিয়া চৌধুরী ইলিশিয়া বেয়াই এর বাড়িতে থাকা অবস্থায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে দুইদিন আটকিয়ে রেখে দাঁড়ি, গোঁফ ও চুল কাটায়ে গোসলের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে জানা যায়।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে কেন্দ্র করে লোকের অবস্থাদি দেখে হযরত মাওলানা আবদুসসালাম আরকানী (রহ.) একাধিকবার বলেছিলেন, তোমরা হাফেজকে ছোট মনে করো না। তিনি একদিন স্বাভাবিক হয়ে আপন পরিচয় দিবে এবং বড় বুযুর্গ হিসেবে গণ্য হয়ে জমালি হালত ইখতেয়ার করবে। উল্লেখ্য, হযরত আরকানী (রহ.) হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) ইন্তেকালের আগে আগে আরাকান থেকে চুনতী আসেন। পরবর্তীতে মাঝেমাঝে তবলিগে ত্বরিকতের উদ্দেশ্যে চুনতী সফর করতেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বৎসরের অধিকাংশ সময় রোজা রাখতেন। খাবারের তেমন প্রয়োজন হত না। খাওয়া-দাওয়া ও পরার প্রতি তাঁর-তিলমাত্র ঝোঁক ছিল না। কেউ ভক্তি করে লুঙ্গি, কোরতা এবং জুতা খরিদ করে দিলে আল্লাহর রসূলের (স.) সুন্নাত মতে হাদিয়া আদায় করে দিতেন অথবা নিজে ব্যবহার করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো এমন ধ্যানমগ্ন হালতেও তিনি সবসময় আলেমানা পোষাক পরিধান করতেন। অনেক সময় মসজিদের বাইরে হেলান দিয়ে বসে বসে কবিতা পড়তেন। জুতা ছাড়া চলতেন না। ঝড়-বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করতেন না

Ghurati.com Pioneer in village based website

অথচ অনেকে দেখেছেন ওনার কাপড় চোপড়ও ভিজে নাই। আবার জমালি হালতে চলে আসার পর মধ্যে মধ্যে ছাতা ব্যবহার করতেন।

তিনি হালতের অবস্থায় গভীর বনজঙ্গলের পাশাপাশি লোকালয়ে যে সমস্ত জায়গায় বেশি ঘুরাফেরা করতেন সেগুলো হলো-

১- খানদীঘি জামে মসজিদ, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

২- দরগাহ মুড়া, ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

৩- ছিরা মুড়া, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

৪- শাহ ওমর (রহ.) এর মাযার ও মসজিদ, কাকারা, চকরিয়া, কক্সবাজার

৫- ইসলামপুর দুলাহাজারা, কক্সবাজার (বর্তমানে দুলা ফকিরের মসজিদ ও মাযার নামে খ্যাত)

৬- ছনুয়া মনু মিয়াজি বাড়ি মসজিদ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

৭- ইলিশিয়া মনু মিয়াজি বাড়ি মসজিদ, চকরিয়া, কক্সবাজার

৮- নলবিলা ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন মাযার, চিরিঙ্গা, চকরিয়া, কক্সবাজার

৯- ভোয়ালিয়া পাড়া মসজিদ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

১০- বাগিচাহাট মসজিদ, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

১১- শায়ের শাহ (রহ.) এর মাযার, গাইনাকাটা, আজিজনগর, চকরিয়া, কক্সবাজার

১২- আওলিয়া মসজিদ, রোহিঙ্গাঘোনা, চুনতী, চট্টগ্রাম

১৩- ছিনগী শাহ (রহ.) এর মাযার , বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১৪- খানহাট মসজিদ (আধুনগর বাজার এর ভিতরে) লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১৫- শাহপীর আওলীয়ার মাযার, দরবেশহাট, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

১৬- সাতগড় বুড়া মাওলানা সাহেবের মসজিদ ও মাযার, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

নতুন ভিটায় বসবাস

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দাদাজান হযরত মাওলানা কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (রহ.) এর তিন পুত্রের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির কারণে বাড়ি-ভিটায় ঘনবসতি হয়ে যায়। অপরদিকে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পূণ্যবতী সহধর্মিণী তাঁর শিশু পুত্র-কন্যাকে নিয়ে চকরিয়ার ইলিশিয়ায় নানার বাড়িতে থাকতেন। যেহেতু ঐ সময় দীর্ঘদিন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মজযুব হালতে ছিলেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সহধর্মিণী সন্তানাদির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ইলিশিয়া থেকে চুনতীতে ফিরে আসেন। কিন্তু পুরাতন বাড়িতে বসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় তথা হতে সরে আসাটা সমীচীন মনে করলেন। অতএব, বর্তমান বাড়ি (শাহ মঞ্জিল) এর ভিটায় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে একটি মাটির গৃহ নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। নয় হাত প্রস্থ, চৌদ্দ হাত লম্বা মাটির উক্ত ঘরটি ছিল ছনের ছাউনীবিশিষ্ট। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পুন্যবতী সহধর্মিণী নানান প্রতিকূলতাকে মাথা পেতে নিয়ে এ ছোট ঘরটিতে বসবাস করে যেতে থাকেন।

কিছুদিনের ব্যবধানে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভক্তবৃন্দ পাকা গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার নিমিত্তে এগিয়ে আসেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের দিকে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রথম তলার কাজ সম্পন্ন হয়। ক'বছরের ব্যবধানে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই ভবনের ২য় তলার কাজ সম্পন্ন হয়।

দ্বিতল বিশিষ্ট এ দালানটি বর্তমানে 'শাহ মঞ্জিল' হিসেবে সমধিক পরিচিত।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ৬০ এর দশকের শুরু থেকে ধ্যানমগ্ন হালত থেকে পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক হালতে চলে আসতে থাকেন এবং ইন্তেকাল অবধি এ শাহ মঞ্জিলে বসবাস করে ছিলেন।

এই শাহ মঞ্জিল থেকেই মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.), মাহফিলে মেরাজুন্নবী (স.) সহ নানান ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। এ শাহ মঞ্জিলের সম্মুখ চত্বরেই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর যাত্রা শুরু হয়।

হজ্বে গমন

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) জীবনে সর্বমোট ৬ বার হজ্বব্রত পালন করেন। সন হল ১৯৭০, ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৭৬, ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে হজ্বব্রত পালন:

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তথা পাকিস্তান আমলে জীবনে প্রথম হজ্বব্রত পালন করেন। এ সময় তাঁর সফরসাথী ছিলেন লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের তৎকালীন সদস্য জয়নুল আবেদীন চৌধুরী প্রকাশ জনু মিয়া, সাথে আরো ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলার বাজালিয়া নিবাসী মকবুল আহমদ চৌধুরীর বড়ভাই ডা. মনির আহমদ চৌধুরী।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় সকল হজ্বযাত্রী চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে পানির জাহাজযোগে হজ্বে গমন করতেন। ঐ জাহাজগুলোতে তিনটি শ্রেণী থাকত। ডেক বা ৩য় শ্রেণী, ২য় শ্রেণী, ১ম শ্রেণী। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে ডেক শ্রেণী যাত্রীদের হজ্বে সর্বমোট খরচ ছিল ১৯০০/-টাকা প্রায়। ২য় শ্রেণীর যাত্রীগণের হজ্ব করতে সর্বমোট খরচ ছিল ৪০০০/- টাকার উর্ধ্বে এবং ১ম শ্রেণীর সর্বমোট খরচ ছিল ৭০০০/-টাকা প্রায়। যাওয়া-আসাসহ হজ্ব করতে সময় লাগত প্রায় ৩ মাস। কিন্তু পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বল্প সংখ্যক হজ্বযাত্রী বিমানযোগে হজ্ব করতে যেতেন। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানের হজ্বযাত্রীগণকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ঢাকা থেকে করাচি পৌঁছতে হত। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে একজন হজ্বযাত্রীর হজ্ব করতে সর্বমোট ৬০০০/- টাকা খরচ পড়ত।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অপর দুই সফরসাথী নিয়ে প্রথমে ঢাকা থেকে করাচি পৌঁছেন। করাচিতে হজ্বে গমনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে হজ্বে কেরানের নিয়ত করে এহ্‌রাম বেঁধে জেদ্দা গমন করেন। জেদ্দা থেকে মক্কায়ে মোকাররমা পৌঁছে তখনকার বিখ্যাত মুয়াল্লিম হাসান মুরাদের নিয়ন্ত্রণে ও তাঁর দালানে অবস্থান করেন।

অপরদিকে, তাঁর আপন চাচাত ভাই ও শ্যালক মাওলানা আজিজ আহমদ (আনু) রমজান মাসে হজ্ব যাত্রী বাহী প্রথম জাহাজে চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দা পৌঁছেন। জনাব আনু মক্কা মোকাররমায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে সংযুক্ত হন। পরবর্তীতে আরো সংযুক্ত হন মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ দরবেশকাটা, চকরিয়া। তিনিও পানির জাহাজের ২য় ট্রিপে চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দা পৌঁছে হযরত শাহ সাহেব

(রহ.) এর সাথে যুক্ত হন। হজ্বের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে জেদ্দা থেকে করাচি পৌঁছেন এবং করাচি থেকে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ঢাকা চলে আসেন।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে হজ্বব্রত পালনঃ

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ২য় বার হজ্বে গমন করেন সরকারি ব্যবস্থাপনায়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র তিন হাজার ভাগ্যবান ব্যক্তি লটারীর মাধ্যমে বিমানে ঢাকা থেকে জেদ্দা গমন করে হজ্ব করতেন। বাংলাদেশ সরকার শুধুমাত্র ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মুহাম্মদী নামক পুরানো সেকেলে পানির জাহাজটি ভাড়ায় এনে হজ্বযাত্রী পরিবহন করেছিল। পরবর্তী বৎসর থেকে তা বাদ দেওয়া হয়। পরে অবশ্য সরকার হিজবুল বাহার নামক (পরবর্তীতে শহীদ সালাহ উদ্দিন নামকরণ) একটি পানির জাহাজ ক্রয় করে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে মাত্র ৫/৬ বছর হজ্বযাত্রী পরিবহন এর ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরাতন ঐ জাহাজটি নৌবাহিনীকে হস্তান্তর করে নাম পরিবর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে স্ক্র্যাপ (পরিত্যক্ত) হিসেবে কেটে ফেলা হয়।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রেক্ষিতে ঢাকায় সৌদি দূতাবাস ছিল না। ফলে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থাপনায় লটারির মাধ্যমে মাত্র ৩০০০ ব্যক্তি হজ্বে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতেন। এর অতিরিক্ত স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি অন্য কোথাও গিয়ে তথা হতে হজ্ব ভিসা নিয়ে স্বউদ্যোগে হজ্ব করতেন, এ সংখ্যা খুবই স্বল্প। অবশ্য পরবর্তীতে ঢাকায় সৌদি দূতাবাস চালু হওয়ায় সরকারি কোটা ৩০০০ জন থাকলেও বেসরকারিভাবে তথা পি-ফর্ম এর মাধ্যমে ট্রাভেল্স এজেন্সির সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে হজ্বে গমন প্রথা শুরু হয়ে যায়। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসে শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম যে কোন ব্যক্তির হজ্বব্রত পালনে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দ্বিতীয়বারের হজ্বের সফরে সাথে ছিলেন বাজালিয়া সাতকানিয়ার আলহাজ্ব মকবুল আহমদ চৌধুরীর বড় ভাই ডা. মনির আহমদ চৌধুরী। সেবারের হজ্বের সফরে সাথে আর কেউ ছিলেন কিনা জানতে পারা যায়নি। তবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা থেকে জেদ্দা গমন করেছিলেন।

ঐ বছর বিমানে হজ্ব করতে প্রতি হজ্বযাত্রীর সর্বমোট খরচ ছিল ৫০০০/-টাকা।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে হজ্বব্রত পালনঃ

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ৩য় বার হজ্বব্রত পালন করেন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। হজ্বের সময় শীতকাল হওয়ায় হজ্বযাত্রীগণ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে গমন করে হজ্ব সম্পাদন করে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ঐ বছর

তাঁর হজ্বের সফরসঙ্গী ছিলেন বিচারপতি ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম ও মকবুল আহমদ চৌধুরী, বাজালিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা থেকে জেদ্দা গমন করে হজ্বব্রত পালন করেছিলেন। একই বছর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অন্যতম ভক্ত সন্দ্বীপ নিবাসী এ. বি. এম. আশরাফ উল্লাহ সাহেব দেরীতে হজ্বে গমনের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে হজ্বে গমন করতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে জরুরি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট তৈরী করে ভারত, দুবাই হয়ে অনেক কষ্ট ঝামেলা পোহায়ে ঢাকা থেকে জেদ্দা পৌঁছেন এবং মক্কা মোকররমা পৌঁছে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সঙ্গে মিলিত হন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে হজ্বে গমন করতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্বের যাবতীয় ব্যয় ছিল ৯০৩৮ টাকা।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে হজ্বব্রত পালন:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ৪র্থ বার হজ্বে গমন করেন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। হজ্বের কয়েক মাস আগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভক্ত জনাব শাহাব উদ্দিন চেয়ারম্যান, মেখল হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ওমরাহ করতে সৌদি আরব গিয়েছিলেন। শাহাব উদ্দিন চেয়ারম্যান, হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) এর নাতী এবং মেখল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। শাহাব উদ্দিন চেয়ারম্যান ঢাকা থেকে লন্ডন গমন করেন। তথা হতে ওমরাহ ভিসা নিয়ে জেদ্দা আসেন।

তিনি মে'রাজ রজনীতে রওজা পাকে যেয়ারতের সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে তথায় নামাজরত অবস্থায় দেখতে পান। কিন্তু নামাজের পর সাক্ষাতের চেষ্টা করেও পাননি। অথচ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মেরাজ রজনীতে মেরাজুন্নবী (স.) মাহফিল উপলক্ষে চুনতীতে উপস্থিত ছিলেন। শাহাব উদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেব দেশে ফিরে চুনতী গমন করেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মোলাকাতের উদ্দেশ্যে। ঐ মোলাকাতকালে শাহাব উদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে হজ্ব করানোর আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

এতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সম্মতি প্রকাশ করায়, সাথে হাফেজ হারুন সাহেব ও কাজী মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেবও যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সফরসাথী হিসেবে মাওলানা মুহাম্মদ ইসলাম হালিশহর, চট্টগ্রামও সংযুক্ত হন। যে সময় হজ্বে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তখন সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্বে গমনের সিদ্ধান্তের সময় শেষ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে জরুরিভাবে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করে ভারতের ভিসা নিয়ে শাহাব উদ্দিন সাহেবসহ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা গমন করেন।

ঢাকায় বিচারপতি ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরীর বাসভবনে ২দিন থেকে ঢাকা থেকে বিমানযোগে কলকাতা গমন করেন। কলকাতায় ৭/৮ ঘন্টা অবস্থান করে দিল্লি গমন করেন। ঐ সময় সাথে এডভোকেট লোকমান আহমদ চৌধুরীও ছিলেন। কলকাতা থেকে দিল্লি পৌঁছে সৌদি দূতাবাস থেকে হজ্ব ভিসা নেন। দিল্লি থেকে এডভোকেট লোকমান আহমদ সাহেব কলকাতা ফিরে আসেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) দিল্লি থেকে বিমানযোগে মুম্বাই পৌঁছেন। মুম্বাই থেকে শাহাব উদ্দিন চেয়ারম্যান দেশে ফিরে আসেন এবং হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মুম্বাই থেকে দাহরান হয়ে জেদ্দা পৌঁছেন।

জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে টেক্সিযোগে সরাসরি মদিনা মুনাওয়ারা গমন করেন। মদিনা মুনাওয়ারা যেয়ারত শেষ করে মক্কা মুকাররমা আসেন। হজ্বের পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) জেদ্দা পৌঁছে এক হোটেলে অবস্থান নেন এবং জেদ্দা হতে দুবাই পৌঁছেন।

দুবাইতে এক সপ্তাহ অবস্থান করে আরব আমিরাতের বিভিন্ন শহরে সফর করেন। অতঃপর দুবাই থেকে ঢাকা আসেন। ঢাকার বিমান বন্দরে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে স্বাগত জানান।

(এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের হজ্বে শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে তাঁর অন্যতম প্রিয় ভক্ত ও খাদেম হাফেজ হারুন সাহেব ও কাজী মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেব ছিলেন। গ্রন্থের শেষের দিকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর এ দু'জন খাদেমের স্মৃতিসমূহের মধ্যে এ হজ্বের সফর এবং সাথে হজ্বের আগে ভারত, হজ্বের পরে দুবাই সফর- এর বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে- গ্রন্থকার)

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে হজ্বব্রত পালন:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৫ম বারের মত হজ্বব্রত পালন করেন। সে বারে হজ্বের সফরসাথী ছিলেন মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, হেমসেন লেন, চট্টগ্রাম। সাথে আরো ছিলেন মাওলানা শফিক আহমদ, সাবেক চেয়ারম্যান, আধুনগর, লোহাগাড়া ও মাওলানা রহমত উল্লাহ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

সেবার হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্বব্রত পালন করেন। ঐ খ্রিস্টাব্দে একজন হজ্বযাত্রীর সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিমানযোগে হজ্ব করতে সর্বমোট খরচ পড়ত ২০,০০০/- টাকা।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে হজ্ব যাত্রীবাহী পানির জাহাজ "হিজবুল বাহর" চালু হওয়ায় এবং ঢাকায় সৌদি দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করে ট্রাভেল এজেন্সির সহযোগিতায় স্বউদ্যোগে বেসরকারিভাবে হজ্ব করার ব্যাপক সুযোগ চালু হয়। ফলে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের পর

থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিমানে হজ্ব করতে লটারির বাধ্যবাধকতা অনেকটা গৌণ হয়ে গিয়েছিল।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ৮নং হজ্ব ফ্লাইটে ঢাকা থেকে গমন করেন। আমি গ্রন্থকার ঐ বছর ১২নং ফ্লাইটে হজ্বে গমন করি এবং হজ্বের পূর্বে জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে সরাসরি মদিনা মুনাওয়ারা চলে যাই। মদিনা মুনাওয়ারায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ও তাঁর সহযাত্রীগণের সাথে নিয়মিত মোলাকাত হত। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ব্যাপক আকারে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন কাজ শুরুর আগে তথায় অবস্থিত চট্টগ্রামের দানবীর ইসলাম খানের মোসাফিরখানায় থাকতেন। ঐ মোসাফিরখানা তখন মসজিদে নববীর পূর্ব-উত্তর দিকে ৩০/৪০ মিটার দুরত্বে ছিল। বর্তমানে আরো দূরত্বে এসে তা মসজিদে নববীর পশ্চিম-উত্তর কোণায় এক দালানে অবস্থিত। চট্টগ্রামের আরেক দানবীর চাঁন্দ মিয়া সওদাগরের মুসাফিরখানা ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের আগে মসজিদে নববীর পূর্ব-উত্তর মাত্র ১০০/১৫০ মিটার দূরত্বে ছিল। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দর পর আরো কিছুটা দূরত্বে গিয়ে তা মসজিদে নববীর ৫০০/৭০০ মিটার দুরত্বে পূর্ব- উত্তরে ছিল। কিন্তু গত ৩/৪ বছর আগে তাও মদিনা মুনাওয়ারা শহর সাজানোর বৃহত্তর স্বার্থে ভেঙ্গে ফেলা হয়। গত বছর (২০০৬ খ্রিস্টাব্দ) সৌদি সরকারের দেয়া ক্ষতিপূরণের অর্থে মসজিদে নববীর উত্তর পার্শ্বে কিছুটা দূরত্বে চাঁন্দ মিয়া সওদাগরের মুসাফিরখানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি দালান ক্রয় করেছে বলে শুনেছি।

আমি গ্রন্থকার মদিনা মুনাওয়ারা অবস্থানকালে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে নিয়মিত মোলাকাত করতাম। যেহেতু আমি ঐ সময় মসজিদে নববীর পূর্বপার্শ্বে জন্নতুল বক্বীর পশ্চিম পার্শ্বে একটি দালানে থাকতাম।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে দেখতাম ইউসুফ মিয়ার পুত্র শাহনেওয়াজকেও। তিনি ঐ সময় সৌদি আরবে থাকায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর হজ্বের সফরে সার্বক্ষণিক সঙ্গে থেকে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হজ্বের আগে মদিনা মুনাওয়ারা সফর সমাপ্ত করে মক্কা মুকাররমা পৌঁছেন এবং যথানিয়মে হজ্ব করে দেশে ফিরে আসেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ঢাকা থেকে যাওয়ার পথে দুবাইতে যাত্রাবিরতি দিয়ে জেদ্দা যাওয়ার পথে বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। ফলে চালক বিমানকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না। এতে বিমান যাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক, অস্থিরতা ও হা-হুতাশ দেখা দেয়। চালক বিমানকে মাটিতে নামিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিল অস্বাভাবিকভাবে যা বিমানটি দেখেশুনে নিশ্চিত দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে বলা যাবে। বিমান মাটি স্পর্শ করার আগে আগে হঠাৎ করে ত্রুটিমুক্ত হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে চালক বিমানকে চালিয়ে আকাশ পানে উড়াল দিয়ে পুনরায় দুবাই বিমান বন্দরে জরুরিভাবে অবতরণ করায়। আমি মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছে

ইউসুফ মিয়া ও অন্যান্যদের কাছ থেকে এ বিবরণ জানতে পারি। এও জানতে পারি, এ রকম জীবনের ঝুঁকি ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম তথা স্বাভাবিক।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে হজ্বব্রত পালন:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ৬ষ্ঠ ও শেষবার হজ্বব্রত পালন করেন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। সেবার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে সরকারি অতিথি হিসেবে হজ্বে গমন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরই অন্যতম খাদেম কাজী মাওলানা নাসির উদ্দিন। মাওলানা নাসির উদ্দিন ঢাকা গমন করে হজ্বে গমনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং সরকারি মেহমান হিসেবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে সাথে নিয়ে ঢাকা থেকে জেদ্দা রওয়ানা হন। জেদ্দা বিমান বন্দরে তখনকার সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত পরবর্তীতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (বর্তমানে মরহুম) জেদ্দা বিমান বন্দরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে স্বাগত জানান।

জেদ্দা বিমান বন্দরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বিশেষ টেক্সিযোগে মদিনা মুনাওয়ারা গমন করেন। ১১ দিন মদিনা মুনাওয়ারা অবস্থান করে মক্কা মুকাররমায় আসেন। মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে হজ্বব্রত পালন করেন। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়েও রাষ্ট্রীয় আরাম আয়েশ ভোগ করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।

এ বছর স্বউদ্যোগে হজ্বে গমন করেছিলেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অন্যতম ভক্ত সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা শফিক আহমদ, আধুনগর, লোহাগাড়া ও গোলাম কবির কন্ট্রাক্টর, নোয়াখালী। তাঁরা উভয়ে স্বউদ্যোগে হজ্বে গমন করলেও হজ্বের সফরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে ছিলেন। পরবর্তীতে অন্যদেশ ঘুরে তথায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে মিলিত হন তাঁরই অন্যতম ভক্ত সাহেবুর রহমান চৌধুরী (সাহেব মিয়া) বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

যথানিয়মে হজ্বব্রত পালন করে যথাসময়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) দেশে ফিরে আসেন। (এ হজ্বের সফরের বিস্তৃত বিবরণ তাঁরই অন্যতম খাদেম আলহাজ্ব কাজী মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেবের দেয়া বিবরণীতে রয়েছে অত্র গ্রন্থের শেষের দিকে।)

ভারত সফর

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বৃটিশ আমলে কলকাতা আলীয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। সে সুবাদে তাঁর কলকাতা যাওয়া-আসা থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু তখনকার আমলে ছাত্রাবস্থায় কলকাতার পাশাপাশি ভারতের অন্যত্র গিয়েছিলেন কিনা তা তথ্য তালাশ করেও জানতে পারিনি।

পাকিস্তান আমল পেরিয়ে বাংলাদেশ আমলে তিনি ২ বার ভারত সফর করেন। একবার ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে হজ্বে গমনকালে দিল্লী থেকে সৌদি আরবের ভিসা নেওয়ার জন্য ভারত গমন করেছিলেন। আরেকবার ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শুধুমাত্র ভারত সফরের উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে হজ্বে গমনকালে ভারত সফর:

হজ্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করা আছে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) জীবনে ৬ বার পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেছিলেন। তৎমধ্যে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে হজ্বে গমন করেছিলেন ভারত হয়ে। ঐ খ্রীস্টাব্দে হজ্বে গমন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করা হয়। পাসপের্ট নং- বি ১৭৯১৩৫। পাসপোর্ট ইস্যু হয় ১২ অক্টোবর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও তখন পর্যন্ত ঢাকায় সৌদি দূতাবাস খোলা হয়নি। ঐ সফরে তাঁর সাথী ছিলেন হাফেজ হারুনুর রশীদ, কাজী মাওলানা নাসির উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ ইসলাম, হালিশহর, শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, মেখল হাটহাজারী, এডভোকেট লোকমান আহমদ চৌধুরী, বাজালিয়া সাতকানিয়া। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হজ্বের উদ্দেশ্যে প্রথমে চট্টগ্রাম থেকে বিমানযোগে ঢাকা যান। ঢাকায় বিচারপতি ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরীর বাসভবনে ২ দিন অবস্থান করে বিমানযোগে ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে কলকাতা যান। ঐ বিমানের পাইলট ছিলেন চুনতী নিবাসী খুররম সাহেব।

কলকাতা দমদম নেতাজী সুভাষ বসু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকালে একজন নিরাপত্তা অফিসার হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন। অতঃপর পা ছুঁয়ে সালাম করে দোয়া চাইলেন। সাথে সাথে নিকটস্থ অন্যান্য অফিসার-কর্মচারীরাও এসে দোয়া চাইলেন। বিমান বন্দর থেকে চুনতী নিবাসী ইসলাম খান সাহেবের কলকাতাস্থ বাসভবনে গমন করেন। তাঁর বাসায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। কলকাতা অবস্থানকালে কলকাতাস্থ হযরত মাওলানা ছফি উল্লাহ (রহ.)

এর মাজার যেয়ারত করেন। ঐ দিন আসরের নামাজ পড়েন টিপু সুলতান মসজিদে।

কলকাতা থেকে দিনেদিনে সন্ধ্যার ফ্লাইটে দিল্লি গমন করেন। দিল্লি জামে মসজিদের নিকটে হোটেলে অবস্থান করেন। দিল্লিতে ৪দিন অবস্থান করে হজ্ব ভিসা নেন। দিল্লি অবস্থানকালে দিল্লি জামে মসজিদে নামাজ পড়েন। তথায় জামে মসজিদের ইমাম সাহবের সাথে মোলাকাত হয়।

দিল্লিতে হযরত নিজামুদ্দিন (রহ.), হযরত কুতুবুদ্দিন বখতেয়ার কা'কী (রহ.), হযরত হামিদ উদ্দিন নাগুরী (রহ.) হযরত নাসির উদ্দিন চেরাগে দেহলভী (রহ.), হযরত আবদুর রহমান জামী (রহ.) সহ তথাকার মহান আল্লাহর ওলীগনের মাযার যেয়ারত করেন। দিল্লি হোটেলে অবস্থান করে হজ্ব ভিসা নিয়ে বিমানযোগে মুম্বাই গমন করেন। দিল্লি থেকে এডভোকেট লোকমান আহমদ চৌধুরী কলকাতা ফিরে এসেছিলেন।

মুম্বাইতে হোটেলে অবস্থান করে সফরের মধ্যে হযরত হাজী আলীর যেয়ারতসহ বিভিন্ন স্থানে গমন করেছিলেন। মুম্বাই থেকে সফরসাথী শাহাবুদ্দিন চৌধুরী দেশে ফিরে এসেছিলেন। মুম্বাইতে ৩ দিন অবস্থান করে হাফেজ হারুন সাহেব, কাজী মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সফরসাথী হয়ে পবিত্র হজ্ব ও যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাঁরা মুম্বাই থেকে সৌদি আরবের দাহরান বিমান বন্দর হয়ে জেদ্দা পৌঁছেন।

দ্বিতীয়বার ভারত সফর:

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট সোমবার শাহ সাহেব (রহ.) গাড়ি দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহত হন। মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরও তিনি যেয়ারতের উদ্দেশ্যে অতি গুরুত্ব দিয়ে ভারত গমন করেন। এটি তাঁর জীবনে শেষ বিদেশ সফর। এ সফরে তাঁর সফরসাথী ছিলেন মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া (মরহুম), রমজু মিয়া সওদাগর (মরহুম), মাওলানা মুসলিম খান, মুহাম্মদ গোলাম কবির (কন্ট্রাক্টর) ও মুহাম্মদ শাহনেওয়াজ।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাঁর সফরসাথীগণ নিয়ে ৩ ডিসেম্বর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ বুধবার চট্টগ্রাম থেকে বিমানযোগে কলকাতা পৌঁছেন। কলকাতায় সপরিবারে বসবাসকারী চুনতীস্থ জনাব ইসলাম খানের বাসভবনে উঠেন। পরদিন বৃহস্পতিবার হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাঁর সফরসাথীদের নিয়ে বান্ডেল গমন করেন হযরত সৈয়দ আবদুল বারী (রহ.) এর যেয়ারতের

উদ্দেশ্যে। তথায় যেয়ারত সমাপ্ত করে ঐ দিনই পুনরায় কলকাতা ফিরে আসেন।

বান্ডেল রেলওয়ে জংশনের নিকটেই হযরত সৈয়দ আবদুল বারী (রহ.) এর মাযার। কলকাতা থেকে সড়কপথেও যাওয়া যায়। তবে হাওড়া থেকে রেলযোগে মাত্র ১ ঘন্টা সময় লাগে বান্ডেল পৌঁছতে। তিনি হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর পীর সাহেব হন।

৫ ও ৬ ডিসেম্বর জুমাবার ও শনিবার কলকাতা অবস্থান করেন। ওখানে অবস্থানকালে বিখ্যাত নাখোদা মসজিদে গমন করেন এবং নামাজ পড়েন। মহান ওলী হযরত মাওলানা ছফিউল্লাহ (রহ.) এর যেয়ারত করেন। যার মাজার কলকাতা শিয়ালদহ রেল স্টেশনের নিকটে। ৭ ডিসেম্বর রবিবার হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর মাযার যেয়ারতের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীণ দুপুরের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে বারানস গমন করেন। কলকাতা থেকে বানারস গমণকালে জনাব মুসলিম খান কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন। অপর সফরসাথী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে ছিলেন।

বানারস বিমান বন্দর থেকে টেক্সিযোগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আজমগড় গমন করেন। আজমগড় শহরে পৌঁছে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ও সফরসাথীরা জানতে পারেন যে হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর কবর শরিফ তাঁর মেয়ের শ্বশুর বাড়ি গোন্ডাতে। কাজেই আজমগড় শহরে বিলম্ব না করে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সফরসাথীগণসগহ আজমগড় থেকে গোন্ডার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। গোন্ডা পৌঁছতে পৌঁছতে রাত অনেকটা গভীর হয়ে যায়।

আজমগড় ভারতের উত্তর প্রদেশের জেলা শহর। ঐ শহরের কিছুটা দূরত্বে কোহান্ডায় হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর বাড়িঘর।

তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর বিবি ইন্তেকাল করায় শেষ বয়সে সেবা শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে গোন্ডা তাঁর মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করেন মেয়ের অতি আগ্রহের কারণে। গোন্ডা ভারতের উত্তর প্রদেশের বিভাগীয় শহর। এ শহরের মাঝখানে জীগর মেমোরিয়াল কলেজের নিকটে Uttrala Cold Storage এ চলে যান। তথাকার মালিক / ব্যবস্থাপক উপস্থিত থাকায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে মেহমানদারী ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থাপনায়

সচেষ্ট হন। ভারতে কাওয়ালি প্রচলন বেশি। Uttrala Cold Storage এর ব্যবস্থাপক হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যেয়ারতে আসছেন, কাওয়ালি পছন্দ করবেন এ ভেবে সংবাদ দিয়ে রাত্রে কাওয়ালি আসরের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তথায় কাওয়ালি গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফিরিয়ে দেন।

রাত্রে সফরসাথীরা খাওয়া-দাওয়া করলেও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কোন খাওয়া-দাওয়া না করে যেয়ারতে মোরাক্কাবায় রাত কাটিয়ে দেন। ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভোরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) গোন্ডা হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর কবর শরিফ এরিয়া থেকে সরাসরি বানারস বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। ঐ দিন দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটের ফ্লাইটে তিনি সফর সাথীগণসহ বারানস থেকে দিল্লি রওয়ানা হন।

দিল্লিতে মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি তিন দিন অবস্থান ও যেয়ারতে কাটিয়ে ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে বিমানে জয়পুর গমন করেন। জয়পুর থেকে সড়কপথে আজমীর যান। আজমীরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ৪ রাত ছিলেন। তথায় সুলতানুল হিন্দ গরিবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আজমিরী (রহ.) এর যেয়ারতসহ নিকটতম এলাকায় যেয়ারত করে সফরের সময় কাটান। অতঃপর ১৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার আজমীর থেকে সড়কপথে জয়পুর এসে জয়পুর থেকে বিমানে দুপুরের ফ্লাইটে দিল্লি ফিরে আসেন। দিল্লি থেকে কলকাতা হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)

পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত নবীগণের শুভাগমনে পৃথিবী নামক এই গ্রহে ইসলাম তথা মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্মের যে ভিত গড়ে ওঠেছিল সেই ভিত্তির পূর্ণতা বিধান করেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মহামানব সাইয়েদুল মুরসালিন, খাতেমুন নবীয়্যিন, রহমতুল্লিল আলমীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)।

পবিত্র কুরআনুল করিমের মধ্যে দিয়ে নবুয়্যতের সিলসিলার সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই নবুয়্যতের ধারা হযরত মুহম্মদ (স.) এর পর চিরতরে রুদ্ধ। তবে ইসলামের প্রসারে দাওয়াতি কাজ চলতে থাকবে। সমাজের সংস্কার সাধনে সমাজের পঙ্কিলতা দূর করার জন্য বিভিন্ন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আবির্ভূত হবেন অনেক আউলিয়া, বুযুর্গ, মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ। যাদের পরশে পরম প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে দ্বিধাবিভক্ত এই মানব বিশ্ব।

হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের চরম দুর্দশা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ে খেলাফতের ধ্বজাধারী তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সাথে সাথে খেলাফতের অবসানে ইসলামের ঐক্যবদ্ধ শক্তির উৎস নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্বের জড়বাদ, বস্তুবাদ তথা সমাজতন্ত্র এবং ক্রমবিবর্তনবাদ বিশ্বে মুসলমানদের তওহিদি প্রেরণাকে বিপর্যস্ত করে তোলে্ বাংলাদেশের মুসলমানরাও ষড়যন্ত্রে পড়ে ইসলামের মূল সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে, ইহুদিরা বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করে ইসলামকে ধ্বংস করার নানান ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। বিভিন্ন মতবাদের প্রভাবে মুসলমানদের অন্তঃকরণও অনেক দ্বিধার দ্বৈরথে দোলায়মান, সর্বোপরি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজকে উপহার দিলেন হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) (প্রকাশ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী)

নতুন এক প্রবর্তনা, "মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)" যা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে অধ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। নবীজি (স.) এর আগমনের মাস পবিত্র রবিউল আউয়ালের ১১ তারিখ হতে ২৯ তারিখ পর্যন্ত ১৯ দিনব্যাপী এই মাহফিল চলে আসছে যা এখন ঐতিহাসিকতায় উত্তীর্ণ এক সমুদ্ভাসিত পবিত্র মাহফিল বিশেষ। নবীপাকের এই জীবন পর্যালোচনাকে ঘিরে অনুষ্ঠিত ও আয়োজিত পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর রূপরেখা বিশ শতক পার হয়ে একুশ শতকের এক মহাবিস্ময় বললে অত্যুক্তি হবে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, যে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে মাহফিলে সীরতুন্নবী সা. ও মেরাজুন্নবী (স.) উদযাপনে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে আসছিলেন স্থানীয় নবীপ্রেমিকগণের পাশাপাশি চুনতী মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণ, সাথে সাথে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভক্তগণও। চুনতী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ খোলামনে কঠোর পরিশ্রম করে সহযোগিতা করে আসছিলেন। তখন মেহমান সাধারণ সকলের খাওয়া দাওয়া হত মাদরাসা ক্যাম্পাসে। অতিথিগণের অবস্থানও মাদরাসায় হত। তেমনিভাবে মাহফিলের ওসিলায় দেশের ও আন্তর্জাতিক বিখ্যাত ব্যক্তিগণ চুনতী মাদরাসা পরিদর্শন করে মাদরাসার মান শান বাড়িয়ে দেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে সাথে সরকারি-বেসরকারি ভক্তবৃন্দের ওসিলায় মাদরাসা আর্থিকভাবে লাভবান হতে থাকে। ঘটে মাদরাসার নানান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড।

পরবর্তীতে শাহ মঞ্জিলের পশ্চিম দিকে বিশাল সীরত ময়দান হয়ে ঐ ময়দানের উত্তর পাশে মাহফিলের এন্তেজামের ব্যবস্থা চালু হয়। ফলে আগের মত মাদরাসাকে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

তবে এলাকার নবীপ্রেমিকগণের এবং হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভক্তগণের পাশাপাশি মাহফিল আঞ্জাম দিতে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ এখনো সক্রিয় খেদমত করে আসছেন।

এক কথায় এলাকার নবীপ্রেমিক, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভক্তগণ, চুনতী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) সহ সমস্ত মাহফিলের এন্তেজাম করে আসছেন।

Ghunati.com pioneer in village based website

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) ১ দিন থেকে ১৯ দিন

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ই আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও দ্বীন দরদী মানুষদের একই প্ল্যাটফরমে জড়ো করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে সারারাতব্যাপী মাহফিলের প্রবর্তন করেন। ১ দিনের এ মাহফিল শাহ মঞ্জিলের সামনের চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় । এতে প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন সাতকানিয়া বারদোনা ইউনিয়নের ফখরুল মুহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহ সাহেব। ওয়াজ আরম্ভ হবার পূর্বে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নির্দেশে হাফেজ হারুনুর রশিদ সাহেব খতমে সবিনা শুনান। সে রাতের খানার জন্য দুটি খাসি জবেহ করে গোশত তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় হাফেজ হারুনুর রশিদ সাহেবকে।

পাক করার জন্য অন্য লোক আসবেন বলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ইশারা করেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর মাগরিবের পূর্বক্ষণে জনাব এবিএম আশরাফুল্লাহ (সন্দ্বীপি) সপরিবারে পৌঁছলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তার স্ত্রীকে রান্না করার জন্য নির্দেশ দেন।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাহফিল ৩ দিন মতান্তরে ২দিন শাহ মঞ্জিলের দক্ষিণ পার্শ্বের বিলে অনুষ্ঠিত হয়। সে বৎসর মাহফিলের নামকরণও করা হয় এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিন দিনব্যাপী মাহফিল অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে শাহ সাহেব (রহ.) এর নির্দেশে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উক্ত বৈঠকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.), ফখরুল মুহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহ (রহ.), নাজেমে আ'লা হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) ও আরো অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মাহফিলের নাম মীলাদুন্নবী না ইয়ামুন্নবী না সীরতুন্নবী (স.) হবে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তৎক্ষণাৎ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) অভিমত ব্যক্ত করলেন সীরতুন্নবীই হবে।

আরো উল্লেখ্য, ৩ দিনব্যাপী মাহফিলের ঘোষণার পর চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার সাবেক নাজেমে আ'লা হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) প্রস্তাব করলেন বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ হলে ভাল হবে। তখন হযরত নাজেম সাহেব এর প্রস্তাবটি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে অবগত করলে তিনি অত্যন্ত খুশিমনে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন এবং নাজেমে আ'লা সাহেবকে বিষয় ঠিক করার জন্য পরামর্শ দিলেন।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ৫দিন, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ১০দিন, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ১২ দিন, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দেও ১২ দিন, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫দিন, কিন্তু শাহ সাহেব (রহ.) কর্তৃক সে বছর আরো ২দিন বাড়িয়ে ১৭দিন, আবার আরো ২দিন বাড়িয়ে ১৯ দিনে গিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ হতে মাহফিল ১৯ দিন ব্যাপীই চলে আসছে।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের বছর পর্যন্ত এভাবে চলেছে। বলাবাহুল্য, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে সীরত মাহফিলের মাত্র ১৯ দিন পূর্বে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ইন্তেকাল করেছিলেন।

অতঃপর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সীরত মাহফিলের সময়কাল নিয়ে ভক্ত মহলে বিভিন্ন মতামত নিয়ে আলোচনা হলে ভক্ত ও বড় দাতা, ৩দিন বা ৫দিন করার পক্ষে জোরালো মত ব্যক্ত করেন। সাধারণ শ্রোতা ও ভক্তরা কিন্তু শাহ সাহেব (রহ.) এর স্মৃতিবিজড়িত উনিশ দিনের মাহফিলে কমবেশি করতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত অবশেষে ১৯ দিন বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর খাদ্য বিভাগ

পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) শুরু হয়েছে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। সেদিন থেকে চলমান অবস্থায় রয়েছে মেহমান নওয়াজী তথা উন্মুক্ত আতিথেয়তা। এই মাহফিলে যারা আসবেন সবার জন্য খাওয়ার আয়োজন রয়েছে। ১ম বৎসর দু'টি খাসি জবেহ করে শাহ মঞ্জিলে খাওয়ানোর সূচনা হয় । এর পরে কয়েক বছর মাদরাসার মাঠে খাওয়ানো হয়। পরবর্তীতে একদিকে মাহফিল তথা বক্তৃতা মঞ্চ, মসজিদে বায়তুল্লাহর সামনে, অন্যদিকে সীরত ময়দানের পূর্ব উত্তর কোণে রন্ধন বিভাগসহ খাওয়ার ঘর যা একেবারে টিনের ছাউনি দিয়ে ঘর বেঁধে রাখা হয়েছে। সে ঘরে এক সঙ্গে দুই হাজার মানুষ এর খাওয়ার সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এবং অবিরাম খাওয়ানো হয়।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে শিশুদের খাবারেরও সুব্যবস্থা যেমন আছে তেমনি মহিলাদেরও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। শিশুরা দূর-দূরান্ত হতে খাওয়ার খেতে আসে। অনেকে খেয়ে যায় আবার প্রায় শিশুর হাতে একটি করে পলিথিন ব্যাগও নজর এড়িয়ে যায় না। অনেকে একাধিকবারও খায়। শিশুদের মধ্যে অনেকে যা পারে খেল বাকি অংশটুকু পলিথিন ব্যাগে করে তবরুক হিসেবে বাড়িতে নিয়ে যায়। এভাবে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন বাধা নেই।

কোন একদিন শিশুদের জন্য খাবারের সময় নির্ধারিত ছিল বিকেলে আসরের নামাজের পর তখনও খুব দূর-দূরান্ত হতে শিশুরা দল বেধে বেধে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ আসত। সীরতুন্নবী মাহফিল পরিচালনা কমিটির পক্ষে কেউ কেউ এই শিশুদের খাবার বন্ধ করে দিলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এমনভাবে রেগে গেলেন কেউ তাঁর কাছে যেতে আর সাহস করে না। যারা এই শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা রোধ করলেন তাদের উপর খুব বেশি ক্রোধ ও রাগের স্বরে অনেক কথা বলেছিলেন যা চট্টগ্রামের ভাষায় লিখলে এই দাঁড়ায়-

"ওড়া তরে নলই; ওড়া তরে নলই; যাহ্ যাহ্
ওড়া তরে নলই যাহ যাহ"

পুনরায় আবার শিশুদের খাবার বন্দোবস্ত হলেই তিনি শান্ত হন।

মেয়েদেরও খাবার সুব্যবস্থা রয়েছে। শাহ মঞ্জিলের উঠানে প্যান্ডেল টাঙিয়ে খাবারের জন্য হাই বেঞ্চ, লোবেঞ্চ দিয়ে এই সুব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়েদের খাবারের ব্যাপারেও এক সময় বন্ধের জন্য অনেকে মতামত দিয়েছিলেন। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন,

"ওডা ইন মেয়েদের মেলা দি দে ওডা
খন মিক্‌ক্যা মাইয়্যাক্‌কলর্ মেলা আছেনে"

এগুলি মেয়েদের মেলা দিয়েছি যে, পৃথিবীর কোথাও মেয়েদের জন্য কোন মেলার ব্যবস্থা আছে? খাবারের ব্যবস্থা নাই।" আর তাই মেয়েদের জন্য এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ আগত ওলামায়ে কেরামের ক'জন

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবদ্দশায় ও পরবর্তীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক পীর মশায়েখ, বুযুর্গানেদ্বীন ও হক্কানি বরেণ্য ওয়ায়েজিনে কেরাম মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ তাশরিফ এনেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক'জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো:

✡ হযরত আবদুল আজিজ বিন ছালেহ, প্রধান বিচারপতি, মদিনা মুনাওয়ারা ও ইমাম, মসজিদে নববী (স.)

✡ হযরত ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব, বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত।

✡ আওলাদে রসূল হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবদুল আহাদ আল মাদানী (রহ.), চট্টগ্রাম।

✡ শাহসুফি হযরত মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.), হযরত বড় হুযুর, গারাংগিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

✡ শাহসুফি হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ (রহ.), হযরত ছোট হুযুর, গারাংগিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

✡ শাহসুফি হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.), পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম।

✡ হযরত মাওলানা জিয়াউল হক (রহ.), মাইজভাণ্ডারী, চট্টগ্রাম।

✡ হযরত মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.), ঢাকা।

✡ হযরত মাওলানা ওবাইদুল হক, খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।

✡ শাহসুফি হযরত মাওলানা হাকীম মুনির আহমদ (রহ.), চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

✡ শাহসুফি হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.), পীর সাহেব, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

✡ হযরত সুফি দায়েম উল্লাহ (রহ.), পীর সাহেব, ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা।

✡ ফখরুল মোহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমীনুল্লাহ (রহ.), বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

✡ হযরত শাহ মাওলানা বদিউর রহমান আরাকানী (রহ.), টেকনাফ, কক্সবাজার।

✡ হযরত শাহ মাওলানা এলাহী বখশ (রহ.), পীর সাহেব, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

✡ হযরত মাওলানা শফিকুর রহমান (রহ.), বড় হুযুর, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

✡ হযরত মাওলানা আবদুল লতিফ, পীর সাহেব, ফুলতলী, সিলেট।

- ✡ খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.), চকরিয়া, কক্সবাজার।
- ✡ হযরত মাওলানা মোজাহের আহমদ রহ., কক্সবাজার।
- ✡ হযরত মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাসেমী (রহ.), মুহাদ্দেস, ঢাকা আলীয়া মাদরাসা।
- ✡ হযরত মাওলানা আতিকুল্লাহ খান (রহ.), প্রতিষ্ঠাতা, ওয়াজেদীয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।
- ✡ হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন আল কাদেরী, অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদরাসা ও খতিব, জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম।
- ✡ হযরত শাহ মাওলানা জমির উদ্দীন, নানুপুর, চট্টগ্রাম।
- ✡ আওলাদে রসুল হযরত মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের জাবেরী আল মাদানী, খতিব, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
- ✡ হযরত মাওলানা কুতুব উদ্দীন, পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম।
- ✡ শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আজীজুল হক, ঢাকা
- ✡ হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.), প্রধান মুহাদ্দিস, দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
- ✡ হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ঢাকা।
- ✡ হযরত মাওলানা সাইয়েদ কামাল উদ্দীন জাফরী, ঢাকা।
- ✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ মেসবাহ (রহ.), নোয়াখালী।
- ✡ হযরত মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ঢাকা।
- ✡ হযরত মাওলানা আবদুল মন্নান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
- ✡ হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.), নাজেমে আ'লা, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
- ✡ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবী (রহ.), কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
- ✡ হযরত মাওলানা মোবারক আহমদ (রহ.), বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
- ✡ হযরত মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা (রহ.) রূপকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
- ✡ হযরত মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, ঢাকা।
- ✡ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খান, ঢাকা।

✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল আরাকানী, মুহাদ্দিস, দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা।
✡ হযরত মাওলানা মোখতার আহমদ, কক্সবাজার।
✡ হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ আযাদ (রহ.), লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব, মহাপরিচালক, জিরি মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা মহি উদ্দীন খান, সম্পাদক , মাসিক মদিনা, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা এয়াকুব শরীফ, অধ্যক্ষ, ঢাকা আলীয়া মাদরাসা।
✡ হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ (রহ.), মুহাদ্দিস, গারাংগিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা আবদুস সোবহান, পাবনা।
✡ হযরত মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা আবদুল গফফার, বিক্রমপুর, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা বদিউল আলম, মুহাদ্দিস, গারাংগিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা আবুল হাসান যশোরী, যশোর।
✡ হযরত মুফতি মাওলানা আবদুচ্ছত্তার, অধ্যক্ষ, খুলনা নেছারিয়া আলীয়া মাদরাসা।
✡ হযরত মাওলানা আবু তাহের, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা বদিউর রহমান, মাদার্শা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা আবুল মামুন, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের, অধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা আবুল খায়ের যুক্তিবাদী, যশোর।
✡ হযরত হাফেজ মাওলানা আইয়ুব, মুহাদ্দিস জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা আলা উদ্দীন আল আজহারী, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা আবদুল হাই নেজামী, মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা।
✡ হযরত মাওলানা মোসলেহ উদ্দীন, অধ্যক্ষ, সোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবু নোমান, অধ্যক্ষ, বায়তুশ শরফ আদর্শ আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

✡ হযরত মাওলানা মোস্তফা আল হোসাইনী, কুমিল্লা।
✡ হযরত মাওলানা কামালুদ্দীন খান, অধ্যক্ষ, রায়পুর আলীয়া, নোয়াখালী।
✡ হযরত মাওলানা শফিউর রহমান, জোয়ারা, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা কেফায়েত উল্লাহ, নাজেমে তালিমুল কুরআন, বাংলাদেশ।
✡ হযরত মাওলানা সৈয়দুর রহমান, সৈয়দপুর আলীয়া মাদরাসা, কুমিল্লা।
✡ হযরত মাওলানা হোছাইন আহমদ, ময়মনসিংহ।
✡ হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন, মুহাদ্দিস, ঢাকা আলীয়া মাদরাসা।
✡ হযরত মাওলানা হাফেজ সাঈদ আহমদ মোজাদ্দেদী, কুমিল্লা।
✡ হযরত মাওলানা মোশতাক আহমদ ফারুকী, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা আবদুল কাদের, ১নং চেরাই মার্কেট, খুলনা।
✡ হযরত মাওলানা শামসুদ্দীন, মীরেশ্বরাই, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা আবু বকর মুহাম্মদ সিদ্দিক উল্লাহ, খতিব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
✡ হযরত মাওলানা আখতার ফারুক, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা হাবিব উল্লাহ, তেজগাঁও, ঢাকা।
✡ হযরত অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা আবুল হোসেন, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা আল আজাদ মুহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন, বরিশাল।
✡ হযরত মাওলানা আবদুল গফুর এছলাহী, কুমিল্লা।
✡ হযরত মাওলানা ইউনুছ সিকদার, অধ্যক্ষ, মাদরাসায়ে আলীয়া, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা আহমদুল্লাহ, মসজিদ মিশন, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা সর্দার আবদুচ্ছালাম, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা রুহুল আমিন, ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা মুফতি হাবিবুর রহমান, ফেনী।
✡ হযরত মাওলানা নোমান ছিদ্দিকী, পীর সাহেব, মাইজদী, নোয়াখালী।
✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রব চিশতী আল কাদেরী, পটুয়াখালী, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা মুদ্দাচ্ছেরুল হক আনছারী, মুহাদ্দিস, কেরামতিয়া আলীয়া মাদরাসা, নোয়াখালী।
✡ হযরত মাওলানা জিল্লুর রহমান, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা সুলতান যওক, পরিচালক, দারুল মা'আরিফ, চট্টগ্রাম।

◆ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

✡ হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদুর রহমান, ঢাকা
✡ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ, মেসবাহুল উলুম আলীয়া মাদরাসা, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পীর সাহেব, রামগঞ্জ, নোয়াখালী।
✡ হযরত মাওলানা মুফতি মোজাফফর আহমদ, অধ্যক্ষ, নেছারিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হালিম বোখারী, সহ-পরিচালক, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ তারিক মুনাওয়ার, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা আবদুল হালিম যুক্তিবাদী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা হাবিব উল্লাহ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সাতকানিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা হাফেজ শহীদুল ইসলাম বরকতী, মুহাদ্দিস, রহমতে আলম মিশন আলীয়া মাদরাসা, ঢাকা।
✡ হযরত মাওলানা রুহুল আমিন, খতিব, চাঁদপুর কোর্ট জামে মসজিদ, ঝিনাইদহ।
✡ হযরত মাওলানা শায়খ আহমদ ফৌজী ইব্রাহিম (আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর)।
✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশিদ, মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমিন, মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা শফিক আহমদ, অধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।
✡ হযরত মাওলানা ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের, অধ্যাপক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
✡ হযরত মাওলানা আজিজুল হক, উপাধ্যক্ষ, হাশেমিয়া আলীয়া মাদরাসা, কক্সবাজার।
✡ হযরত মাওলানা এয়াহিয়া, সাবেক খতিব, চুনতী জামে মসজিদ।
✡ হযরত মাওলানা সিরাজুল হক, বদরখালী, চকরিয়া, কক্সবাজার।
✡ হযরত মাওলানা আবু নছর, শাহারবিল, চকরিয়া, কক্সবাজার।
✡ হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান শরীফ, পীর সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
✡ হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহ, অধ্যক্ষ, করামতিয়া আলীয়া মাদরাসা, নোয়াখালী।
✡ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার কামাল আজিজী, অধ্যক্ষ, পদুয়া হেমায়াতুল ইসলাম মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ আগত সম্মানিত পীর মশায়েখ, বুযুর্গানেদ্বীন ও প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ক'জনের স্বহস্তে লিখিত অভিমতসমূহ

শাহসুফি হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ হামেদী ছিদ্দিকী (রহ.)

হযরত ছোট হুযুর (রহ.), গারাংগিয়া, চট্টগ্রাম

الحمد لله وکفی وسلام علی سیدنا محمد نالمصطفی وعلی آله المجتبی

اما بعد۔ خداوند قدوس کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ شمس العلماء رئیس السالکین مخدومی معالی شاہ مولانا حافظ [illegible] صاحب مدظلہ العالی کے خلوص نیت کے ساتھ [illegible] بلیغ کی بدولت نہ صرف [illegible] بلکہ سارے عالم [illegible] حیات النبی کی زندگی [illegible] نمونہ [illegible] موقع [illegible] لوگوں کو صحیح مسلمان بنانا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عنقریب [illegible] قوم اس [illegible] سے خوشی خوشی دائرہ [illegible] میں داخل ہوگی۔ [illegible]

[illegible]

[illegible] محمد عبد [illegible] خادم [illegible]

শাহসুফি হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.), পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

حامداً ومصلیاً ومسلماً

اما بعد۔ جلسہ سیرت النبی ایک قابل یادگار عبرت آموز زندہ و روح افزا محفل ہے جہاں ہر فریق کو سعادت دارین حاصل کرنے کا بہتر موقع حاصل ہوتا ہے

[illegible]

হযরত ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব, বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত

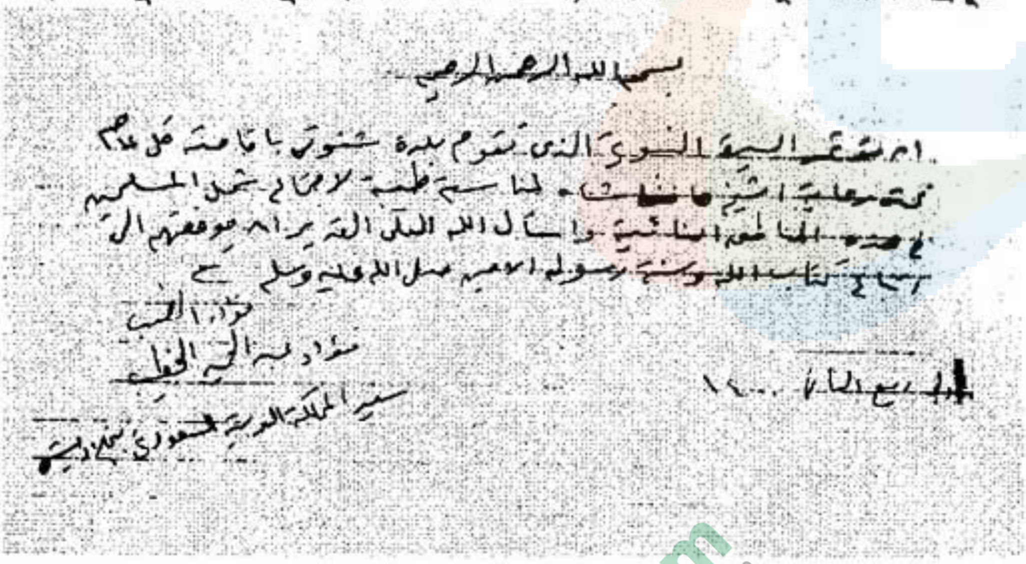

শাহসুফি হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.), চুনতী, চট্টগ্রাম

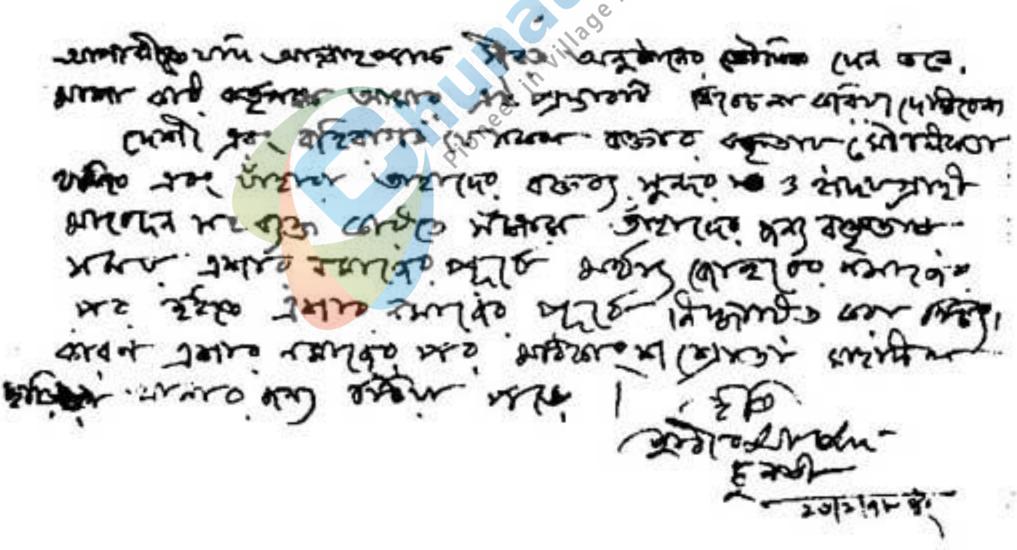

Ghunati.com Pioneer in village based website

খতিবে আজম হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) চকরিয়া, কক্সবাজার

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وحدہ والصلوۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم
فببغضی ابغضہم اما بعد خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور تعلیمات تمام شعبہائے
زندگی کا مکمل نقشہ ہیں تمام مسلمانوں کے لئے اسوہ حسنہ ہے کما قال اللہ تعالی ولقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنۃ اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس کو تحریری، تقریری، علمی اور عملی
ہر ممکن صورت سے امت میں زندہ وجاوید رکھنا امت پر واجب ہے اس اصول کے ماتحت
جن پرخلوص بزرگان خدا نے سیرت کے مضامین کو کتابوں میں جمع کر دیا ہے اور جو حضرات سیرت
نبی کے مطابق عمل پیرا ہوئے اور جن بزرگوں نے لوگوں کو بلا کر محافل اور مجالس منعقد
کرنے کے ذریعہ سے بیان سیرت کا اہتمام کیا ہے امت مرحومہ پر ان بزرگوں کا
بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالی ان سب کو اجر جزیل اور ثواب کثیر بخشے آمین
ساتھ ہی ساتھ ان مقدس کاموں کی انجام دہی میں بڑی بیداری کے ساتھ احتیاط برتی جائے
کہ اس میں ہرگز قرآن وسنت کے خلاف شرک وبدعت قبر پرستی عرس اور کسی پیر کی تشبیہ
اور کسی بزرگ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا خیال ہرگز نہ کیا جائے خصوصاً سیرت پاک
کو ہر قسم کی نمود ونمائش سے پاک رکھا جائے متبع سنت علماء وفضلاء کو رکھا جائے
انتخاب مقررین کے وقت توحید پر مضبوط اتباع سنت کے جذبے والے حضرات کو
چنے جائیں مبادا بدعت دنیا پرست طالب زر فتنہ پرداز علماء کو اس میں دخل
دینے کا موقع ہرگز نہ دیا جائے اور ذمہ داران سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار
رہنا پڑے گا کہ یہ محفل آج نہیں آئندہ جاکر کبھی کسی فتنہ اور خلاف شریعت امور کا
ذریعہ نہ بنے ان شرائط کا لحاظ کر کے بندہ محفل سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں
کبھی کبھی شرکت کرتا ہے واللہ ما اقول وکیل حق تعالی مجھے اور تمام مسلمانوں کو
راہ حق پر اخیر دم تک ثابت قدم رکھتے ہوئے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے

خدا ما دعا کرد

مراد ما نصیحت بود و کردیم + حوالت با خدا کردیم و رفتیم

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

[illegible]

হযরত মাওলানা ওবাইদুল হক, হেড মাওলানা, ঢাকা আলীয়া মাদরাসা
ও খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা

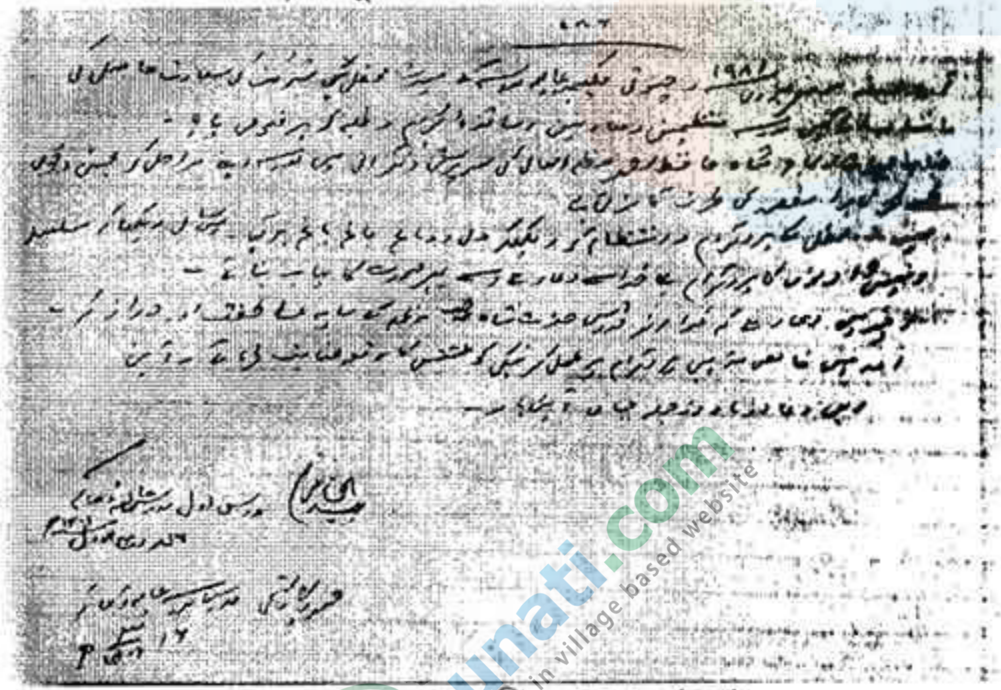

হযরত মাওলানা আতিকুল্লাহ খান (রহ.)
প্রতিষ্ঠাতা, ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম

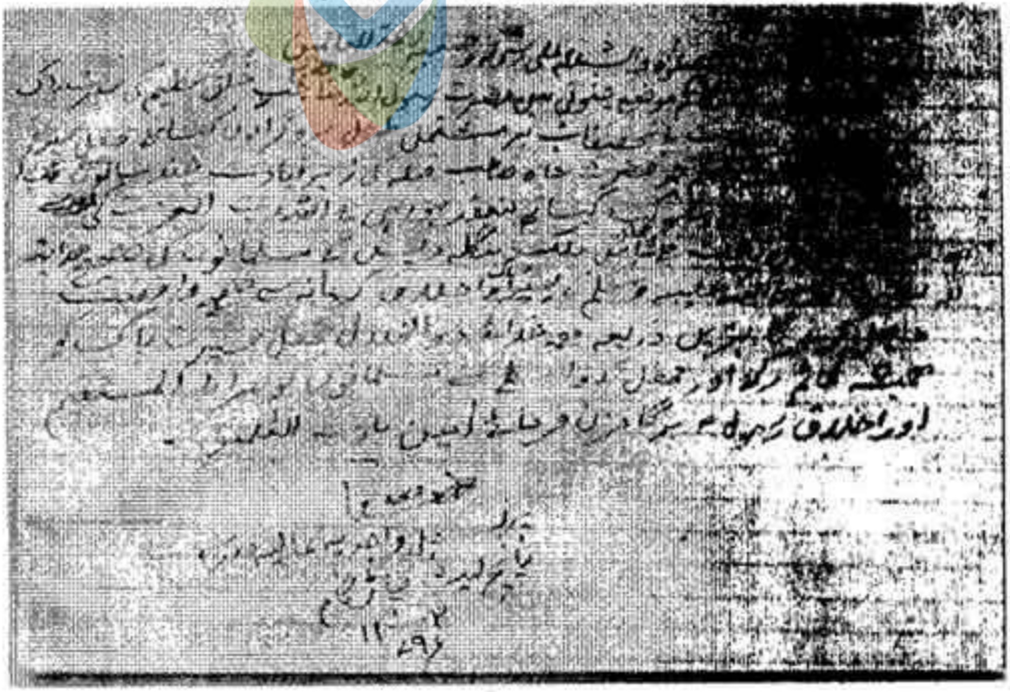

Gunati.com
One in village based website

হযরত মাওলানা ইউনুছ সিকদার (রহ.), অধ্যক্ষ, মাদরাসায়ে আলীয়া ঢাকা
পরবর্তীতে চেয়ারম্যান, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

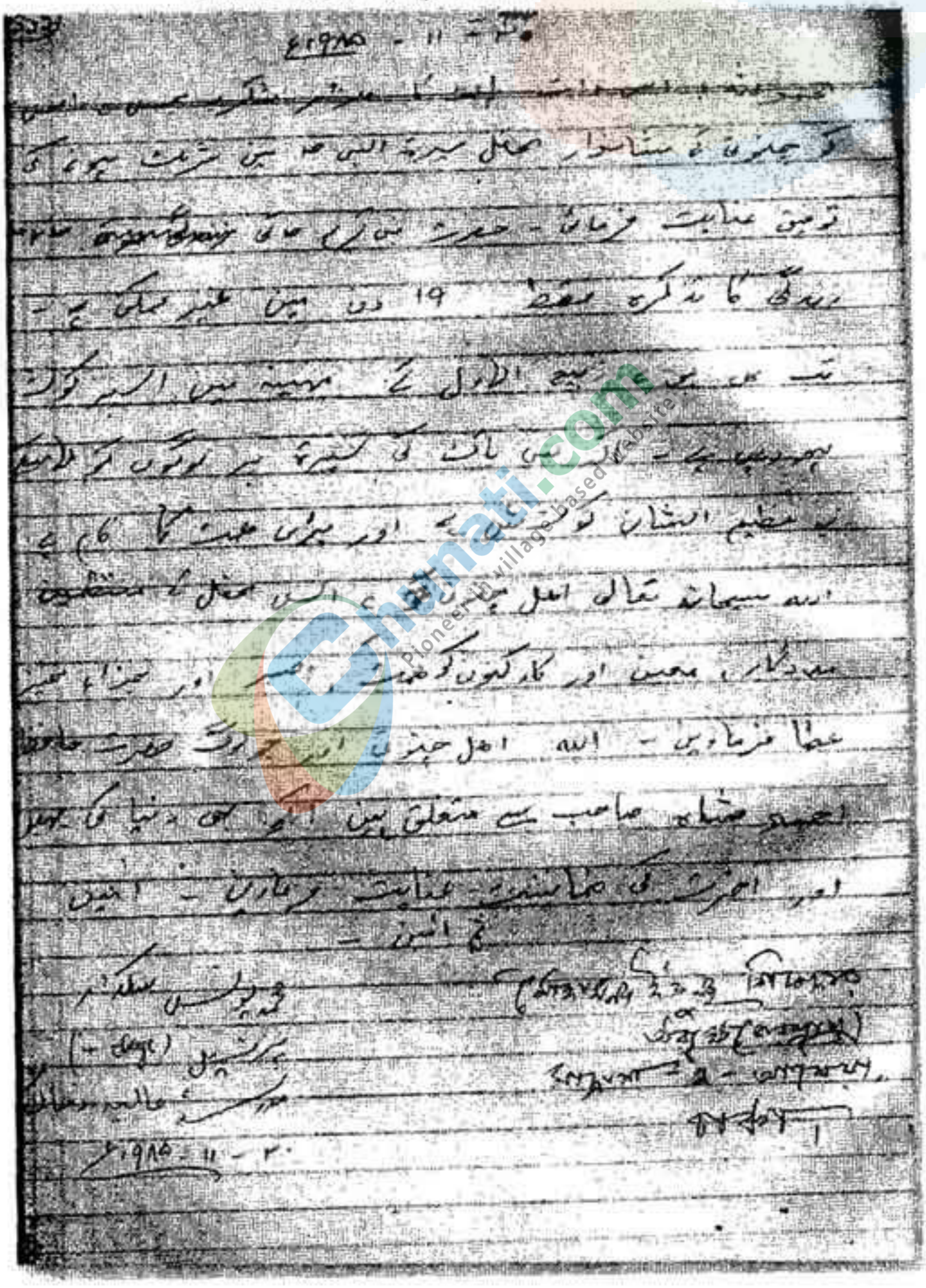
[illegible]
کو جلوۂ [illegible] محفل سیرۃ النبی صلعم میں شریک ہونے کی
توفیق عنایت فرمائی - حضرت [illegible]
زندگی کا تذکرہ فقط ۱۹ دن میں غیر ممکن ہے
[illegible] ربیع الاول کے مہینہ میں [illegible]
[illegible]
[illegible] عظیم الشان [illegible] اور [illegible] کام ہے
اللہ سبحانہ تعالی اہل [illegible] اس محفل کے [illegible]
[illegible] معین اور کارکنوں کو [illegible] اور [illegible]
عطا فرماویں - اللہ اہل [illegible] حضرت [illegible]
[illegible] صاحب سے متعلق ہیں [illegible] دنیا کی [illegible]
[illegible] عنایت فرماویں - آمین
[illegible]

হযরত মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রহ.), ঢাকা

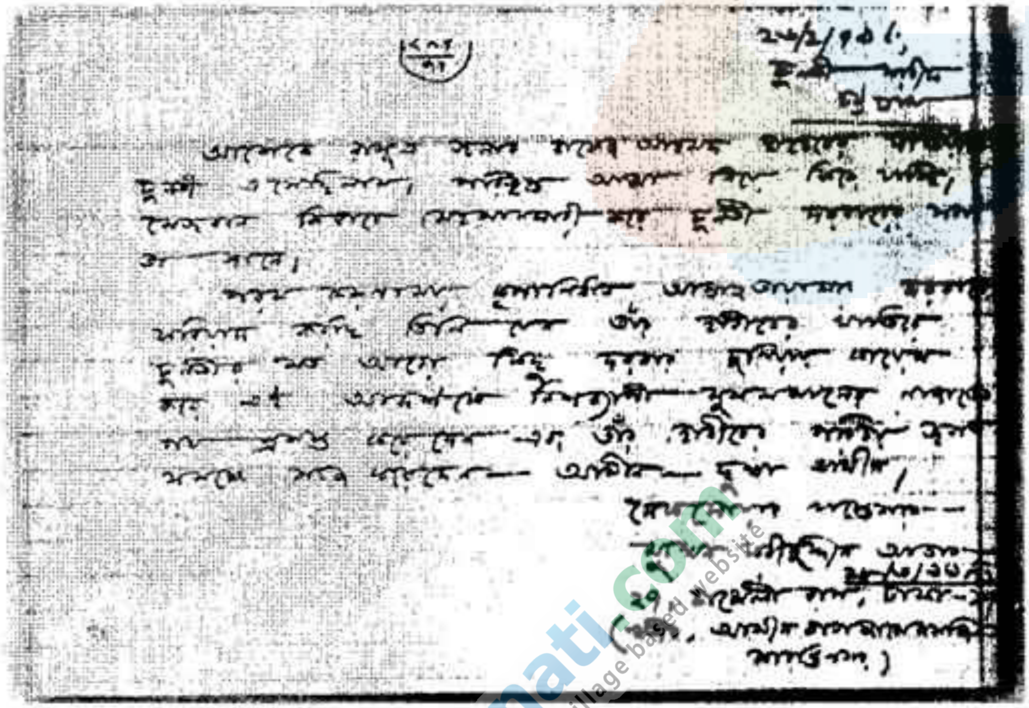

হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী, ঢাকা

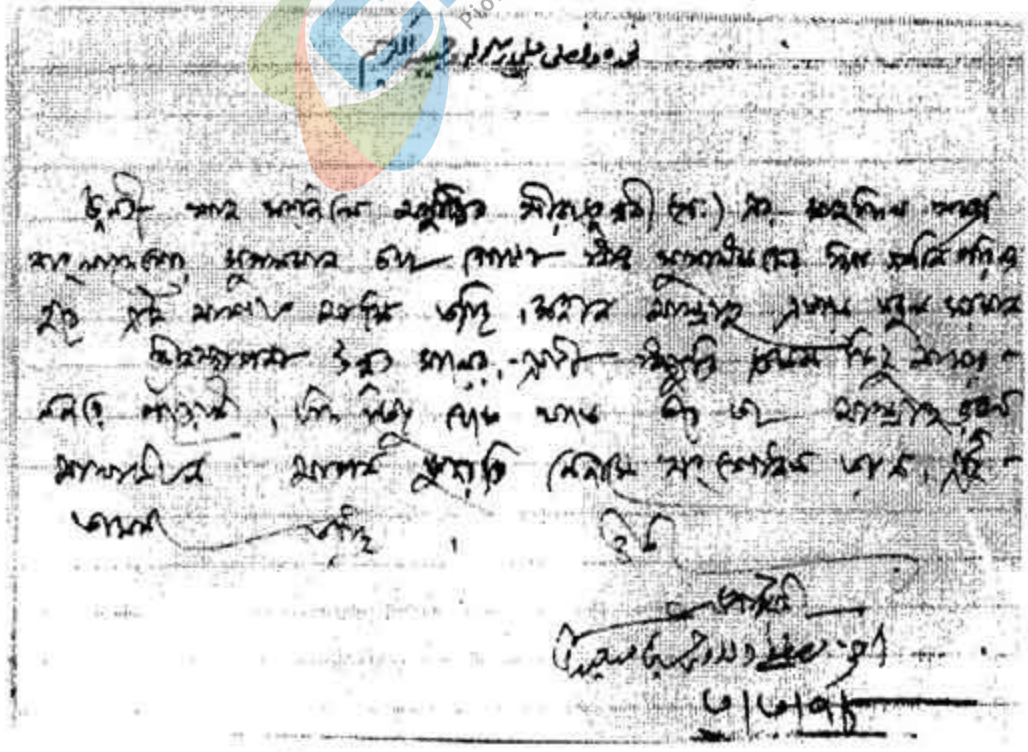

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার
অধ্যক্ষ, খুলনা নেছারিয়া আলীয়া মাদরাসা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

চুনতি শাহ সাহেবের বাড়ী অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল একটি অনন্য কার্যক্রম, বাংলা দেশের বেনজীর ও তুলনা হীন, একাধারে ১৯ দিন ৮/১০ হাজার লোকের ২ বেলা মেহমানদারী [illegible] তাবারুক খাওয়ানো এ বিষয়ের নজির পূর্ণ দ্বীনী পরিবেশে "সিরাত" মাহফিল অভূতপূর্ব নজিরবিহীন ও বিরল। মরহুম শাহ সাহেব কেবলার দোয়া ও বরকতেই এদেশবাসীকে এহেন মহৎ অনুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ করেছে। এরই অনুকরণে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সিরাত মাহফিল, ও সিরাত সম্মেলন শুরু হয়েছে। কিন্তু তাও চুনতির তুলনায় অতি নগণ্য ও অনুল্লেখ্য।

অর্থ-ব্যবস্থা দেশ ও দুর্গম জীবনে, ধর্মীয় কাজের মত আর্থিক ব্যয় বাহাদুরী তারা নৈতিক দায়িত্ব ও সর্বক্ষণ সাধ্য করে যাচ্ছে, এক ইসলাম মাহাত্ম্য ইসলামের খেদমত ও ধর্মনিরপেক্ষতা যখন অপ্রতিরোধনক, রসুলের বিদেশীর বিজাতীয় চরিত্র এদেশে প্রচলিত হচ্ছে একদিন বাংলার ঘরে ঘরে রসুলের বিদেশী ও সুন্নাতে নববী পৌঁছে যাবে, এবং বিজয় লাভ করবে এ প্রত্যাশায় আমি অবশ্যই আশাবাদী। আল্লাহর দরবারে মরহুম শাহ সাহেবের মত অতি মহৎ ব্যক্তিত্বের সিরাত মাহফিল কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিবে তার দোয়ায় প্রার্থনা করি। উল্লেখিত মহান [illegible] প্রতিষ্ঠান [illegible] কামনা করি।

والله المستعان على ما تصفون

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার
প্রিন্সিপাল, খুলনা নেছারিয়া
আলীয়া মাদ্রাসা
(পো: বি, বি, ও (খুলনা সদর))
খুলনা
১১/০২/৮৫।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম (রহ.)
চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন (সাবেক আই, ডি, এল)

[illegible]

[illegible] ... ছিলেন, আমি মনে করি, তিনি [illegible] ইসলাম সংস্কারের [illegible] ... [illegible] ছিলেন। কাজেই [illegible] ইসলাম [illegible] ... [illegible] উচিৎ।

এখন যাঁরা এই সিলসিলা চালিয়ে যাচ্ছেন, [illegible] ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম
চেয়ারম্যান ইসলামী ঐক্য আন্দোলন
(সাবেক আই.ডি.এল)

হযরত মাওলানা আবদুল ওহাব জাদবপুরী (রহ.), নোয়াখালী

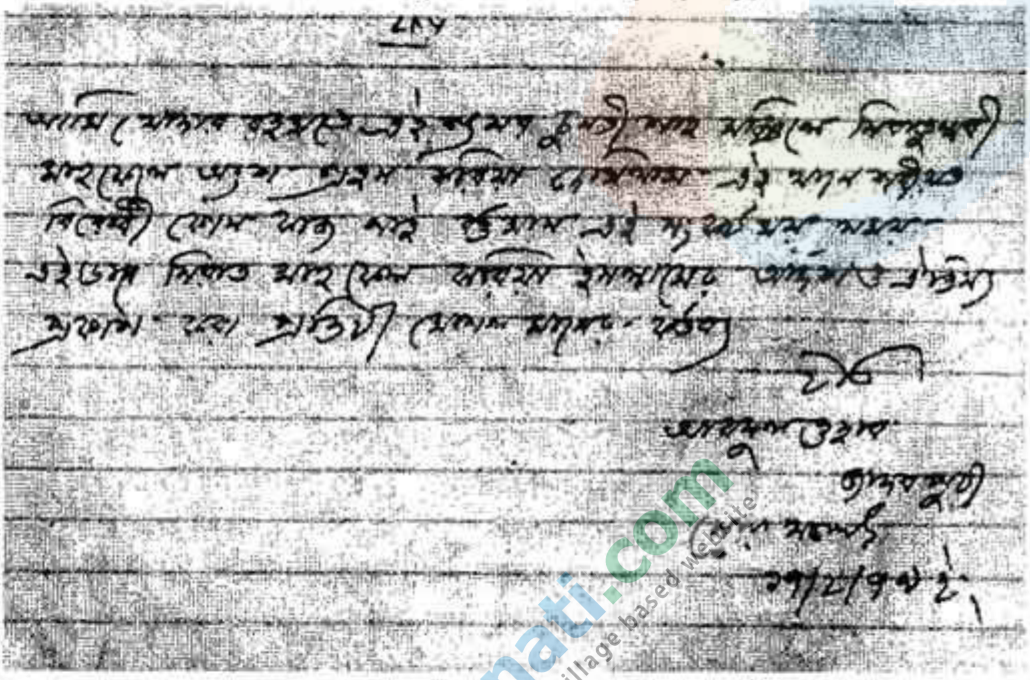

আমি মোহতরম হযরতের এই বৎসর চুলতী শাহ সাহেবের মজলিসে মিলাদুন্নবী মাহফেল অংশ গ্রহণ করিয়া দেখিলাম এই স্থানে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হয় নাই। [illegible] এইভাবে মিলাদ মাহফেল করিয়া ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্য প্রকাশ করা প্রত্যেকটি মোসলমানের কর্তব্য

ইতি

আবদুল ওহাব

জাদবপুরী

[illegible]

[illegible] ইং

হযরত মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ কাছেমী (রহ.)

মুহাদ্দিস, মাদরাসায়ে আলীয়া ঢাকা

باسمہ تعالیٰ

[illegible]

হযরত মাওলানা হাবিব উল্লাহ মিছবাহ
বাদলকোট, নোয়াখালী

۲۳/۱۱/۱۹۸۷ء

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

موافق ہے

হযরত মাওলানা ছালাহ উদ্দীন, মুহাদ্দিস, মাদরাসায়ে আলীয়া ঢাকা

٧٨٦

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

واللہ مجھے جلوس عالیہ میں اور محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شعبہ کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔
تین چار سال سے مجھے محفل میں آنے کی سعادت حاصل ہے۔ میں نے یہاں کے ہر شعبہ کو بہت منظم پایا۔ یہاں
کا ہر کام وقت پر ہوتا ہے۔ یہاں منتظمین بڑی مستعدی اور ہوشیاری سے ہر کام انجام دیتے ہیں۔ میں محفل کی
روزانہ ... میں ... ہوں۔ یہاں کی قرأت، حمد، نعت سے قلب میں خاص حال پیدا ہوتا ہے۔
شاہ صاحب قبلہ کی روحانیت، عشق رسول اور وجود بابرکت نے محفل کی رونق کو اور بڑھا دیا۔ میں کہتا ہوں
کہ پوری دنیا میں اس قسم کا شاندار محفل سیرت النبی ... نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی و شرافت
قابل داد ہے۔
رب العالمین کے دربار عالی میں دل سے دعا ہے کہ اللہ اس پاک محفل سیرت النبی کو مقبول فرما
اور تا قیامت قائم رکھے اور تمام مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ آمین ——

محمد صلاح الدین
محدث مدرسہ عالیہ
ڈھاکہ
۲۲-۲-۷۹

হযরত মাওলানা এলাহি বখ্শ (রহ.), পীর সাহেব, বাঁশখালী

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم

بر الواح خواطر اهل بصیرت و خبرت مخفی نماند که در دور حال سیرت النبی صلی الله علیه وسلم
در هر اطراف و امصار منعقد میشود هرگز خلاف شرع شریف و مذهب حنیف مناسب نمی‌انگارم
بلکه لازم می‌پندارم چه بدان مرده دلها را زنده کرده می‌آید بدربار کردگار بعجز
وانکسار بر ثبات و استقامت این محفل سیرت النبی صلی الله علیه وسلم عند الله
مناجات می‌نمایم فقط

الٰہی بخش عفی عنہ
یکے از خدام اسلامیہ ...
بوئجری بانسکھالی
چاٹگام
۱-۲-۷۹

Chunati.com Pioneer in village based website

হযরত মাওলানা কামাল উদ্দীন খান ছিদ্দিকী
অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد شاہ منزل چنوتی کی عظیم الشان
محفل سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گذشتہ دو سال سے احقر کو شرکت کا موقع ملا۔
دربار رب العزت میں دلی دعا ہے کہ اس پاک محفل کو تا ابد قائم رکھے اور اسے بندگان
امت مسلمہ کی نجات کا وسیلہ بنائے۔ آمین
محفل کی انتظامی صورت حال خدا کے فضل و کرم سے ہر طرح قابل ستائش ہے۔
حضرت شاہ صاحب قبلہ کا وجود گرامی قدر باعث فیوضات و برکات ہے۔

[illegible] 29/3/15

(خاکسار کمال الدین خان صدیقی)
پرنسپل مدرسہ عالیہ رائپور
نواکھالی۔

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম (রহ.), চুনতী , লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔
اگرچہ چنوتی کی سیرۃ محفل گذشتہ چند سالوں سے منعقد ہو رہی ہے مگر بندہ باشندۂ چنوتی ہونے کے باوجود
شرکت کا اتفاق نہیں ہوا۔ اس سال سیرۃ [illegible] شرکت [illegible]
بعد شرکت بندہ کو یقین ہوا کہ یہ سیرۃ محفل ہدایت عالم کی ایک اہم راہ ہے [illegible] خلاف شرع
کوئی کام نہیں [illegible] اہم مضامین پر تقریریں ہوئیں [illegible] انتظام [illegible]
دعا گو ہوں کہ حق تعالیٰ اسکو ہدایت عالم کا وسیلہ بنائے اور اسکے بانی اور تمام کارکنوں کی
نجات آخرت کا ذریعہ بنائے اور اسکی ہر خدمت کو قبول فرمائیں وما ذلک علی اللہ بعزیز

راقم السطور
عبدہ محمد ابراہیم غفرلہ الرحیم مفتی الجامعۃ الاسلامیۃ [illegible]

بتاریخ [illegible] ۱۴ ربیع الاول ۱۳۹۳ھ

[illegible] سال گذشتہ کی سیرۃ محفل میں [illegible] شرکت [illegible]
[illegible] سیرت کی شان کا ہم اندازہ نہیں کر سکے [illegible]
[illegible] انتظام [illegible] اور خلاف شرع کوئی معمولی کام [illegible]
[illegible] نہیں آیا۔

محمد ابراہیم
۱۵ ربیع الاول ۱۳۹۶ھ

হযরত মাওলানা মোজাহের আহমদ (রহ.), রেক্টর, হাশেমিয়া কামিল মাদরাসা, কক্সবাজার

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ۔ اما بعد حضرت قبلہ کعبہ کا ختنہ جو دوبس کا
مخطوطہ سوا ہی ہے الحمد للہ مجھے رسالہ شریف کا مطالعہ نصیب ہوا جس سے تصوف کے بہت سے معانی
سے واقف ہو گیا اسوہ حسنہ پاک ملی عالم کو امتحان کیا ایک زریں موقعہ ہے اسمیں
تصوف شریعہ کوئی کام میں نہیں دیکھا بلکہ ایمان کے لطیفہ وسیعوں شعبوں پر تقریر کر دیا
ایک تحریر انتفاع ہے جو لوگ انہیں بد دیکھتے ہیں وہ انکی جنابی کی کمی کے تعبیر اور
کچھ نہیں ہیں رسائل عالیوں کو اللہ پاک اسکو ہدایت عامۃ المسلمین کا ایک قوی
وسیلہ بنائیں اور اسکے بانی مرحوم قطب شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ وجعل الجنۃ مثواہ
اور تمام مخلص کارکنان خصوصا حضرت حکیم عالم صاحب کے خواست مدرسین کرام اور جملہ
مدرسین کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی اور زیادہ دارین کشائش آمین ۔

الفقیر
الفقیر محمد عالم
۲۹ نومبر ۱۹۸۴ء

হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
প্রধান মুহাদ্দিস, দারুল উলুম আ্লীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম

আমি মুনীর আব্দুল্লাহকে দিয়ে সীরাত মাহফিলে যোগদান
ও জয়িয়া সহ আনন্দ উপভোগ করিয়াছি,
মাহফিলের উদ্যোগ আয়োজন বেশ প্রশংসনীয়
আমি আশা করি, বিশ্বাস এই মাহফিল বিভ্রান্ত
মুসলিম জনগণ এখানে আসিয়া সুন্নাহ ও শিরক বিদআত
পরিহার হইবে। বিশেষ করে যদি সুযোগ থাকে
তবে হযরত (সা:) দ্বীন ইসলামকে সুন্দর সামঞ্জস্য
ও আর নির্ভর শান্তি জীবন ব্যবস্থা দিয়াছেন, বেশীর
পক্ষ এই মিশনে অনেক বিভ্রান্ত মুসলমান কবলিত হইতেছেন,
এই বিষয়ে কিছু বলার অভিপ্রায় করিলাম।

ইতি দোয়াগো
মুহাম্মদ মতিউর রহমান নিজামী
প্রধান মুহাদ্দিস, দারুল উলুম
আলীয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম
১১/২/৮৩ ইং

হযরত মাওলানা মহিউদ্দিন খান, সম্পাদক, মাসিক মদিনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি দ্বিতীয় বারের মত চুনতি শাহ্ সাহেবের মাহফিলে আয়োজিত জলসায়-সীরতুন্নবী (সাঃ) তে শরীক হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। অত্যন্ত আনন্দিত ও [illegible] মনে করেছি। আল্লাহর এক ওলী আল্লামা-হেকীম হযরত শাহ সাহেব [illegible] এর প্রবর্তিত এ মাহফিল যে সুন্নী তরিকায় এবং [illegible] মাহফিলের দোআর [illegible] সকল আলেমের ও তরিকতপন্থী [illegible]; তা [illegible] হয়।

দুঃখের বিষয় [illegible] এ যুগে আলেমদের [illegible] হযরত শাহ সাহেবের [illegible]। আল্লাহ তা'লা তাঁর [illegible] যে [illegible] হন, তা তিনি [illegible]। তবে আমরা [illegible] এ [illegible] অনুসরণ [illegible]। দোয়া করি [illegible] দেশবাসীর এই [illegible] সুযোগ দেন।

সীরাত [illegible] তাফসীরুল [illegible] সাথে [illegible] দুনিয়া থেকে [illegible] সন্তুষ্টি [illegible] অনুসরণ [illegible] হয়। হযরত শাহ সাহেবের [illegible] এ [illegible] হয়, এটা আমার [illegible]।

আল্লাহ পাক তাঁর [illegible] সাহেবের [illegible] কবুল করুন [illegible] এই দোয়া।

[illegible]
সম্পাদক: মাসিক মদীনা
ঢাকা
[illegible]

হযরত মাওলানা আবুল খায়ের যুক্তিবাদী, যশোর

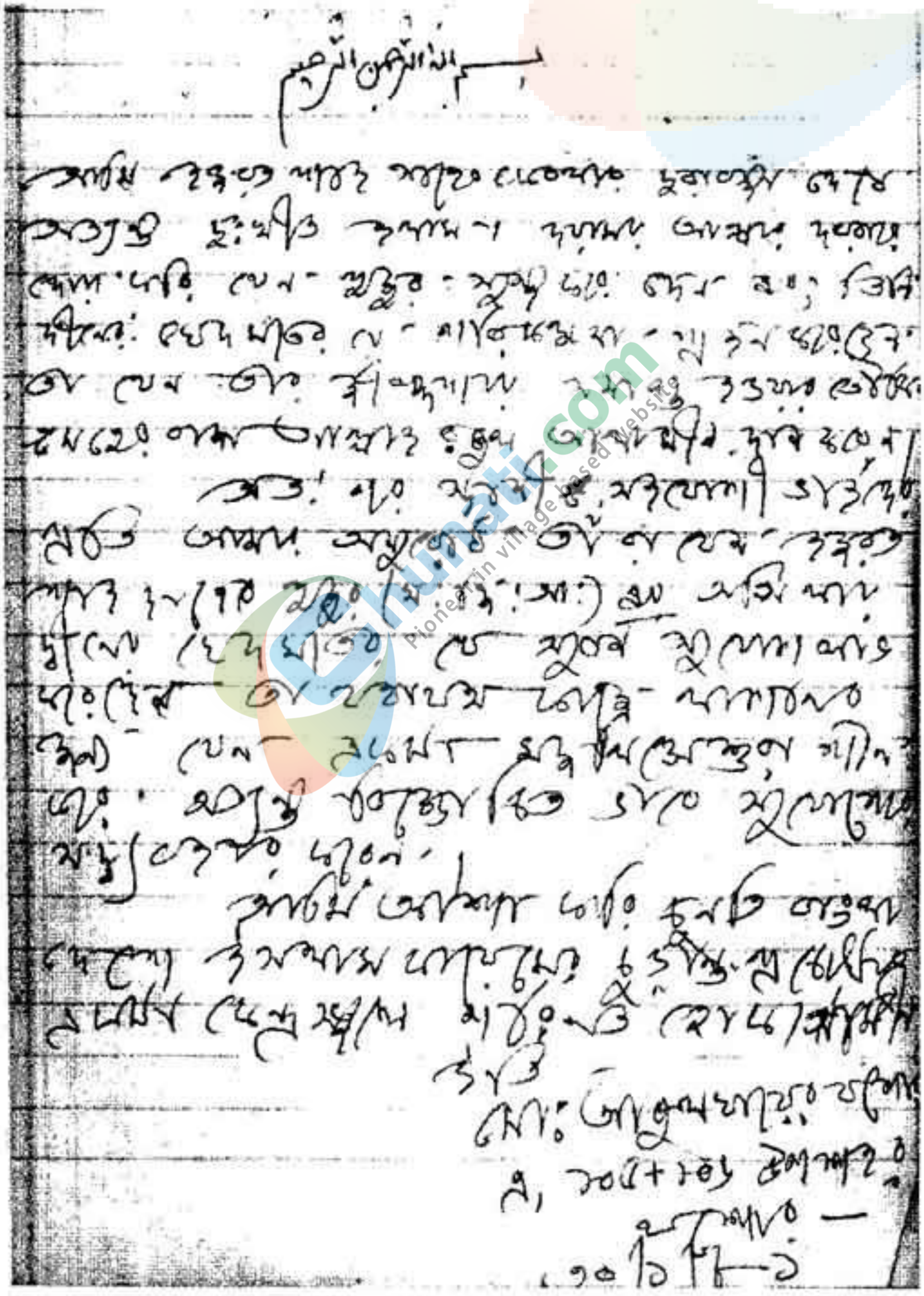

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) -এ আগত মেহমানগণের ক'জন

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবদ্দশায় ও তৎপরবর্তী সময়ে পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ তৎকালীন সরকারি ও বেসরকারি অনেক বড় বড় ব্যক্তিবর্গের শুভাগমন হয়েছিল।

তন্মধ্যে-সর্বজনাব

- শহীদ জিয়াউর রহমান, রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
- বিচারপতি আবদুচ্ছত্তার, রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
- মির্জা গোলাম হাফিজ, স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
- সৈয়দ এ. বি. মাহমুদ হোসাইন, প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ।
- জামালুদ্দিন আহমদ, উপ-প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- শফিউল আযম, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- ক্যাপ্টেন নুরুল হক, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- আবদুর রাজ্জাক, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- আবদুস সালাম তালুকদার, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- আবদুল মোমেন, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, শিক্ষা উপদেষ্টা।
- শামসুল হুদা চৌধুরী, তথ্য উপদেষ্টা।
- সুলতান আহমদ চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।
- মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী, এমপি ও মেয়র, চট্টগ্রাম।
- ড. আফতাবুজ্জামান, প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- আরিফ মঈন উদ্দীন, উপমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- বিচারপতি সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ।
- বিচারপতি এ. কে. এম. বাকের, সুপ্রিম কোর্ট, বাংলাদেশ।
- এয়ার আলী খান, এম. এন. এ., চট্টগ্রাম।
- আবু ছালেহ চৌধুরী, এম. এন. এ., চট্টগ্রাম।
- আতাউর রহমান খান কায়সার, এম. এন. এ ও রাষ্ট্রদূত।
- মুশতাক আহমদ চৌধুরী, এম.পি, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
- শাহজাহান চৌধুরী, এম.পি, সাতকানিয়া- লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

◈ এম. ছিদ্দিক, এম.পি, সাতকানিয়া-লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
◈ আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, এম.পি, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
◈ খানে আলম খান, বিভাগীয় কমিশনার , ঢাকা।
◈ বজলুর রহমান, জেলা দায়রা জজ, চট্টগ্রাম।
◈ আবু বকর ছিদ্দিক, জেলা জজ, নোয়াখালী।
◈ ড. বাকি বিল্লাহ, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
◈ ড. মুহাম্মদ আইয়ুব, রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
◈ মীর হাসন আলী, রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
◈ আবুল হোসাইন ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা।
◈ অধ্যাপক গোলাম আযম, ঢাকা।
◈ এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী, অধ্যক্ষ, এম. ই. এস. কলেজ, চট্টগ্রাম।
◈ সাইয়েদ মুহাম্মদ মাসুম, ঢাকা।
◈ ড. মোস্তাফিজুর রহমান, ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ প্রফেসর ড. আবদুল গফুর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
◈ প্রফেসর ড. মঈন উদ্দীন আহমদ খান, প্রথম মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
◈ এডভোকেট ফরমান উল্লাহ খান, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
◈ প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
◈ অধ্যাপক ড. আবু বকর রফিক আহমদ, প্রো-ভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
◈ প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
◈ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইসহাক, অধ্যক্ষ, বাংলা কলেজ , চট্টগ্রাম।
◈ আবু নোমান মুহাম্মদ আবদুল মন্নান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
◈ আবদুল কাদের মোল্লা, ঢাকা।
◈ এম. আহমদ হোসাইন, ডাইরেক্টর, ইসলামী একাডেমী, ঢাকা।
◈ সাইফুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম।
◈ মুহাম্মদ আইয়ুব খান, শিক্ষাবিদ, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
◈ মাহবুবুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, চট্টগ্রাম জজ আদালত।
◈ প্রফেসর আলী হায়দার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
◈ অধ্যক্ষ আবদুল মন্নান, মুরারীচাঁদ কলেজ, সিলেট।
◈ রুহুল আমীন খান, প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক, ঢাকা।

ghunati.com Pioneer in village based website

◈ অধ্যাপক মুহাম্মদ হিজবুল্লাহ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ এ. কে. এম. সিরাজুল ইসলাম, ধর্ম বিষয়ক গবেষণা ও সমাজকল্যাণ সংস্থা, ঢাকা।
◈ এডভোকেট মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, সিলেট।
◈ অধ্যাপক জাকির হোসাইন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়, কুষ্টিয়া।
◈ মুহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, দৈনিক পূর্বকোণ লিঃ, চট্টগ্রাম।
◈ সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, পি. এইচ.পি.গ্রুপ।
◈ ড. আবু নাসের মুহাম্মদ মনির, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
◈ আবুল বশর মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ অধ্যাপক ড. শমশের আলী, ভিসি, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
◈ আবু জাফর, অধ্যাপক, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুষ্টিয়া।
◈ মাহবুবুর রহমান ওসমানী, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সুনামগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ।
◈ লেঃ কর্ণেল (অব.) মুহাম্মদ জিয়া উদ্দীন বীর উত্তম, চেয়ারম্যান সিডিএ, চট্টগ্রাম।
◈ ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ এ. এম. এম. বাহাউদ্দীন, সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।
◈ মঞ্জুর কাদের, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ ড. আবদুল মোনায়েম আল বিররী, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।
◈ শেখ ড. ওমর ইবনে আবদুল আজিজ কোরাইশী, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিশর।
◈ ড. ফারুক আহমদ, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ ড. মাহফুজুর রহমান, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ ড. মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
◈ ড. এ. কে. এম. নুরুল আলম, অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মাহফিলে সীরাতুন্নবী (স.) এ আগত রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও বিশিষ্ট সম্মানিত মেহমানগণের মধ্যে ক'জনের স্বহস্তে লিখিত অভিমত সমূহ

শহিদ জিয়াউর রহমান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

chunati.com
Pioneer in village based website

মির্জা গোলাম হাফিজ, স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

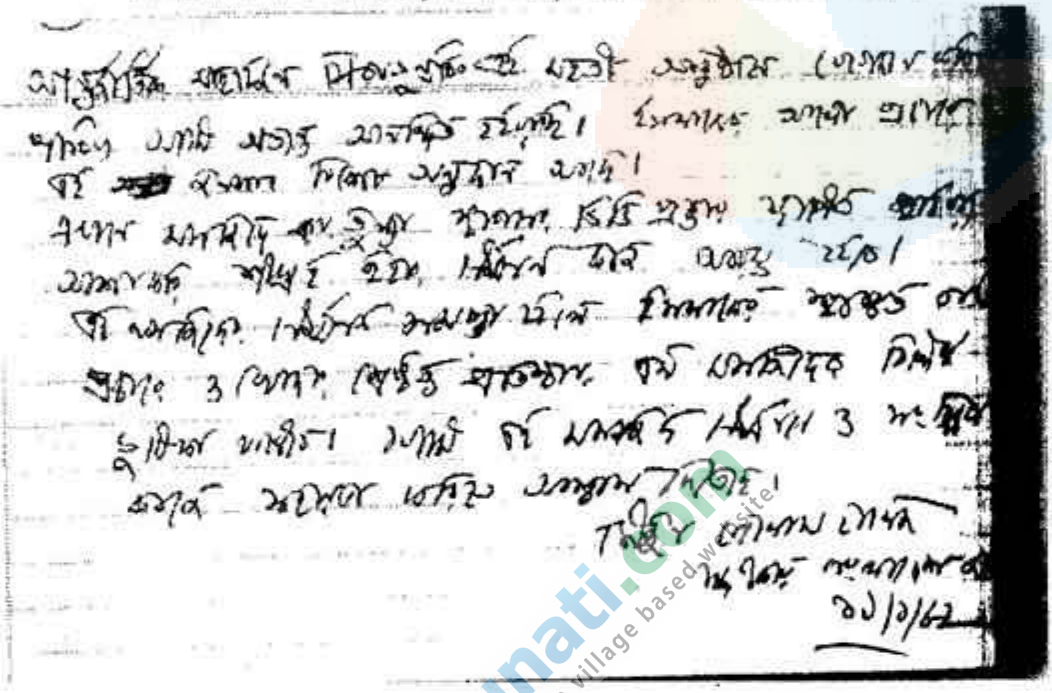

মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

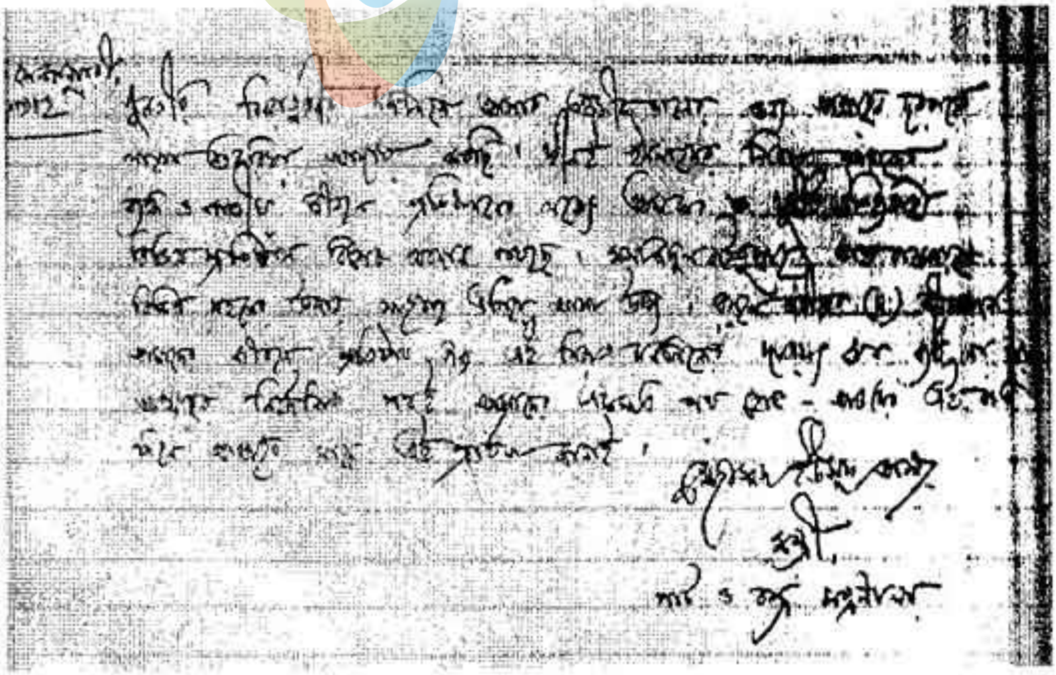

Chunati.com
pioneer in village based website

শফিউল আজম, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চুনতীর সীরাতুন্নবী উপলক্ষে সবে আমি
এখানে আসিতে পারিয়া আল্লাহ তা'আলার
দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। এই
সীরাতুন্নবী অনুষ্ঠান বাংলাদেশে প্রথম
এখানেই সূচনা হয়। হযরত মাওলানা
হাফেজ আহমদ সাহেবের প্রচেষ্টায়
ও চেষ্টার ফলে দ্বীনের এক দিক
এই সীরাতুন্নবী অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি
লাভ করিয়াছে। আমি এই
মহতী অনুষ্ঠানের সাফল্য ও
আরও বেশী সমৃদ্ধি কামনা
করি। আশা করি যে এই
অনুষ্ঠানের ফলে ও মাধ্যমে
দেশের ও দশের মধ্যে
ইসলামী জিন্দেগী কায়েম হইবে।

শফিউল আজম
১১/১২/৮২

আবদুল মোমেন খান

মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

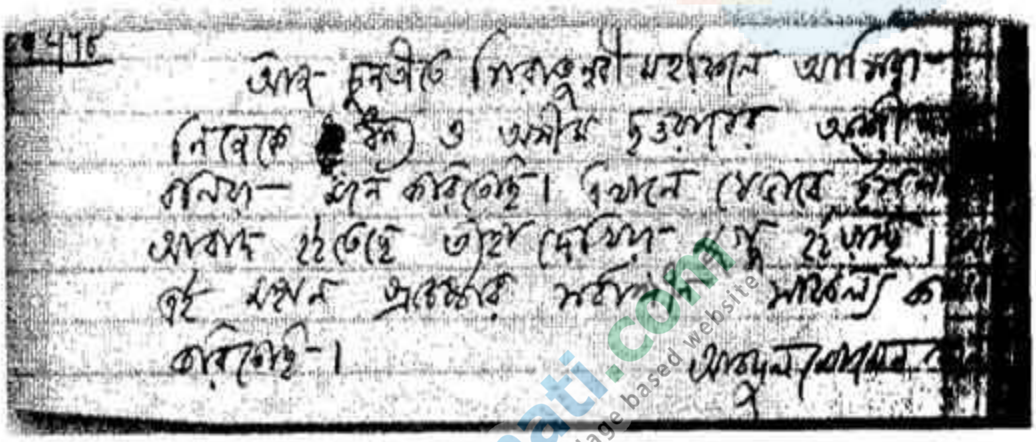

আজ চুনতীতে সিরাজুম্মুনীরা মহফিলে আসিয়া নিজেকে ধন্য ও অসীম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। এখানে যেভাবে ইসলাম আবাদ হইতেছে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই মহান প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করিতেছি।

আবদুল মোমেন

নুরুল হক, মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

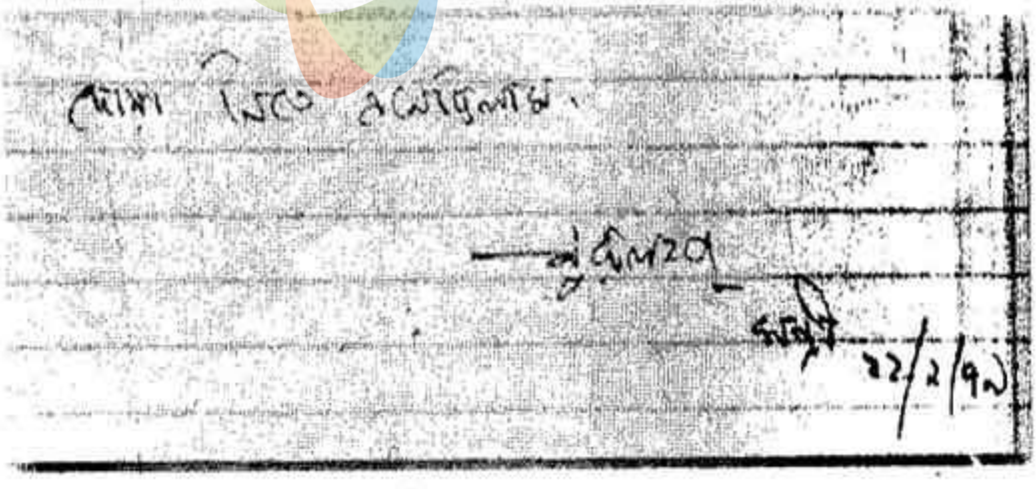

সোনা নিতে এসেছিলাম।

নুরুল হক

সুলতান আহমদ চৌধুরী
ডেপুটি স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

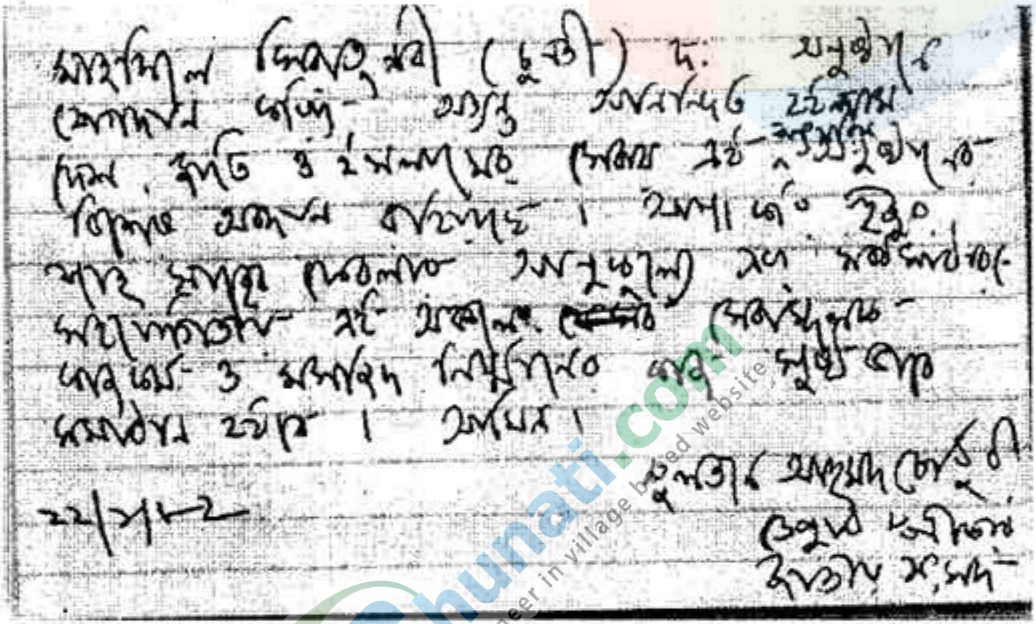
সুলতান আহমদ চৌধুরী
ডেপুটি স্পীকার
জাতীয় সংসদ

আবদুস সালাম তালুকদার, প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

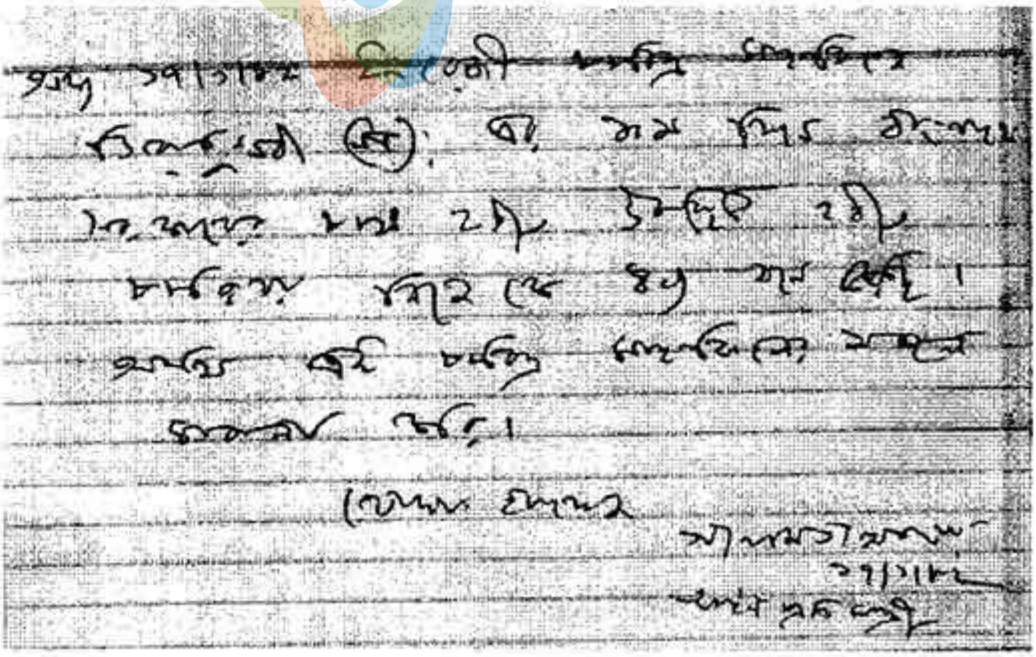

মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী এম.পি. ও মেয়র চট্টগ্রাম

অভিমত

এই মহাত্মার লেখার জন্য যোগ্যতা আমার — আছে বলে মনে হয় না। তবুও বন্ধুদের অনুরোধে কলম হাতে নিলাম।

সাধারণত আমাদের আলেম সমাজের সাথে কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী বা নেতাদের বলতে দেখা [illegible]। দেশের রাজনৈতিক নেতা যারা ইসলাম [illegible] দ্বারা ধারে যারা [illegible] থাকেন তাদের উচিৎ দেশের [illegible] (দেশ-[illegible]) করা যায় না [illegible] ইসলাম [illegible] তাহাদের উচিৎ [illegible] করা উচিৎ।

হযরত শাহ সাহেব কেবলার জীবদ্দশায় উনার পাশে থাকা কিছু লোকের থাকা উচিত, যাতে উনার মুখ দিয়ে যখনই গুরুত্বপূর্ণ কথা আসতো তৎক্ষণাৎ উহা লিপিবদ্ধ হত, তাহলে ইতিহাস বহুলাংশে সমৃদ্ধ হত।

ধন্যবাদ।

১/৩/৯৭ ইং

[illegible]

(মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী
সাংসদ, মেয়র চট্টগ্রাম)

ডা. আফতাবুজ্জমান, প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

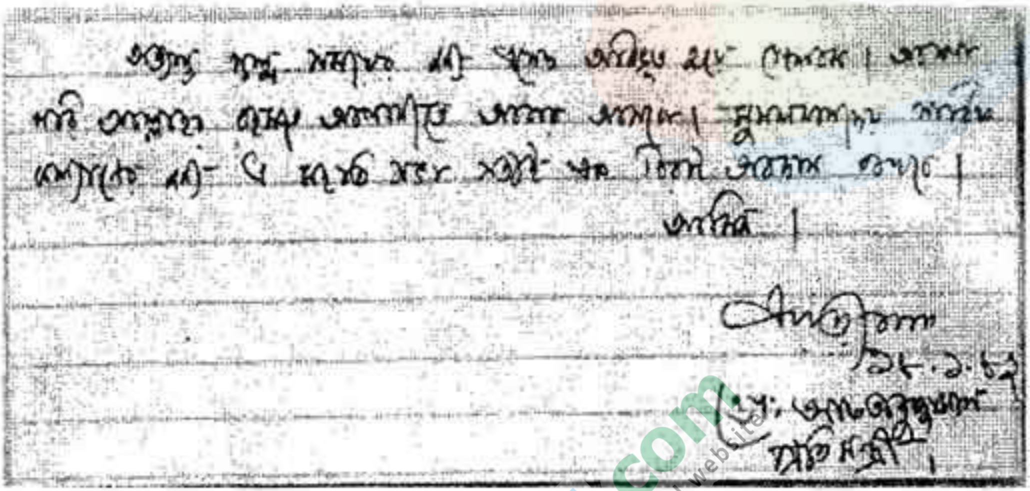

বজলুর রহমান, জেলা ও দায়রা জজ, চট্টগ্রাম

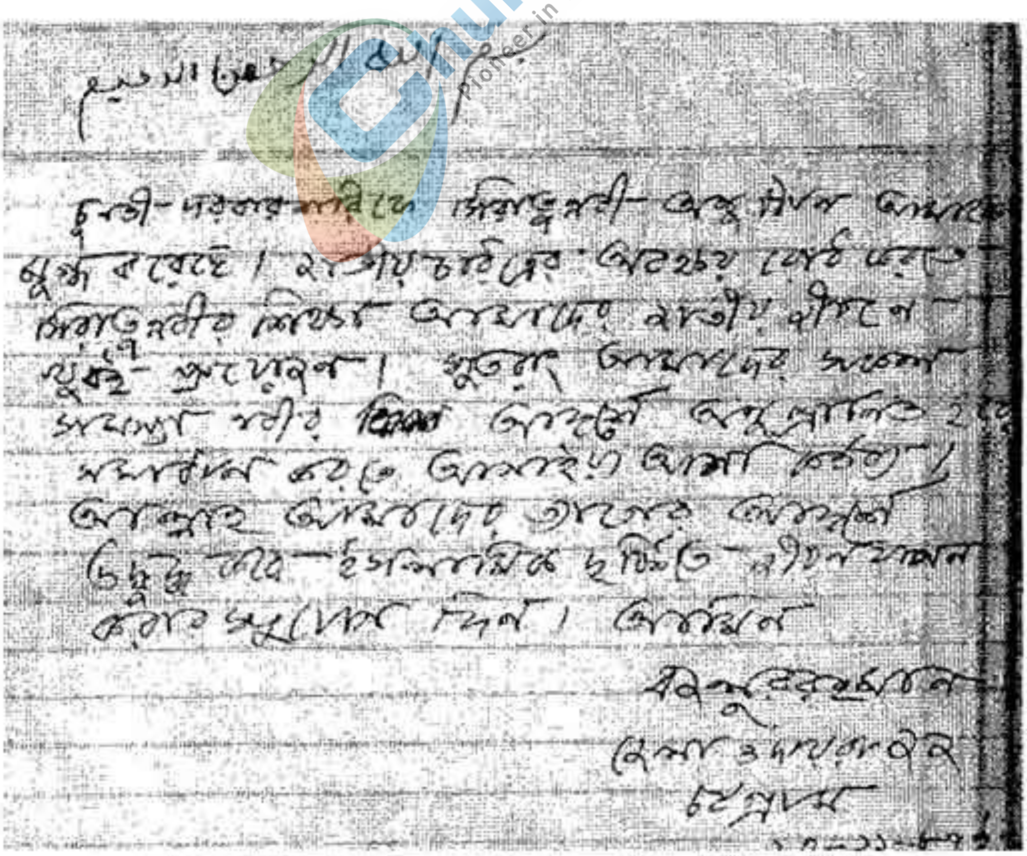

প্রফেসর ড. মঈন উদ্দিন আহমদ খান
প্রথম মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং দুরূদ ও সালাম বিশ্বজগতের করুনার প্রতীক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

চুনতীর সীরত মাহফিল (দঃ) আল্লাহর রহমতে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চুনতির মহান অলিকুল মরহুম হাফেজ শাহ ছাহেব এই সীরত মাহফিলের উদ্যোক্তা। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী যুগে ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক চক্রান্তকে ইসলামী চেতনাবোধ রক্ষা করে রসূলুল্লাহর জন্মদিনের মাধ্যমে রসূল প্রেম ও ঈমানী চেতনার উজ্জীবনের জন্য প্রভূত চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন এখন পর্যন্ত রসূল প্রেমিক এবং এই গ্রাম রসূল প্রেমের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেছে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর মাগফিরাত ও রহমতের ছায়ায় তাঁকে আবৃত রাখুন। আজ চুনতির সীরত মাহফিল (দঃ) একটি মহান প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ চুনতির সীরত মাহফিলকে এই ভাবে তাঁর অফুরন্ত রহমত দ্বারা আবৃত করুন এই প্রার্থনা করি।

স্বাক্ষর ১৫-১১-৮৭

মুঈন উদ্দিন আহমদ খান
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, মহকুমা প্রশাসক, পটিয়া, চট্টগ্রাম

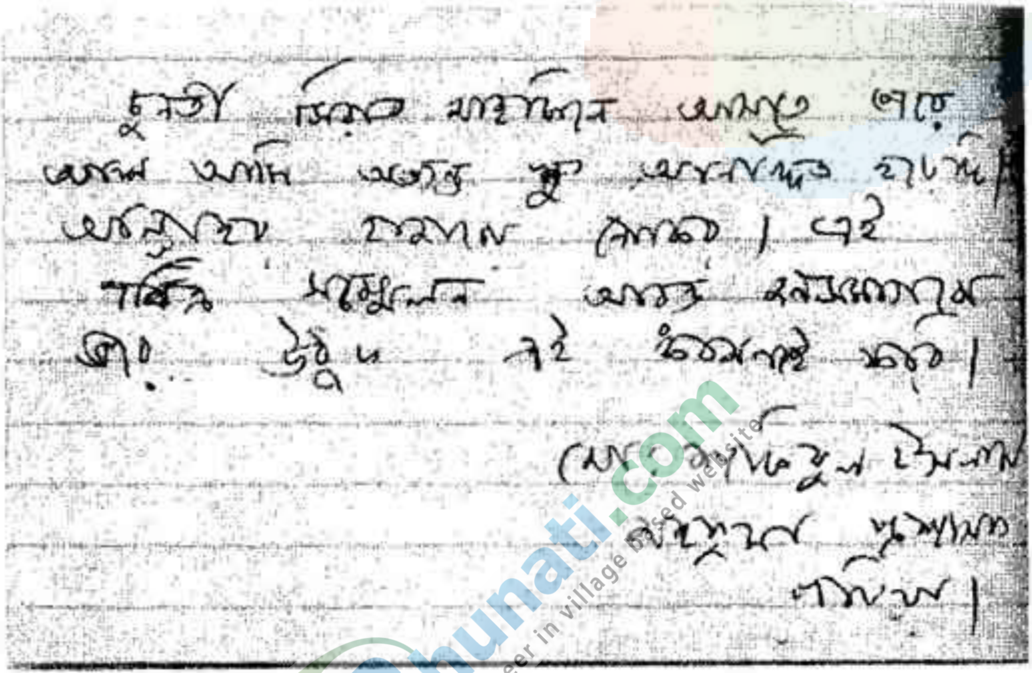

চুনতী সিরাত মাহফিলে আমন্ত্রিত হয়ে এসে আমি অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত হয়েছি। অনুষ্ঠান চমৎকার লেগেছে। এই বার্ষিক সম্মেলন আরও [illegible] [illegible] উন্নয়ন হই [illegible] করি।

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)
মহকুমা প্রশাসক
পটিয়া।

সা'দ আহমদ, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা

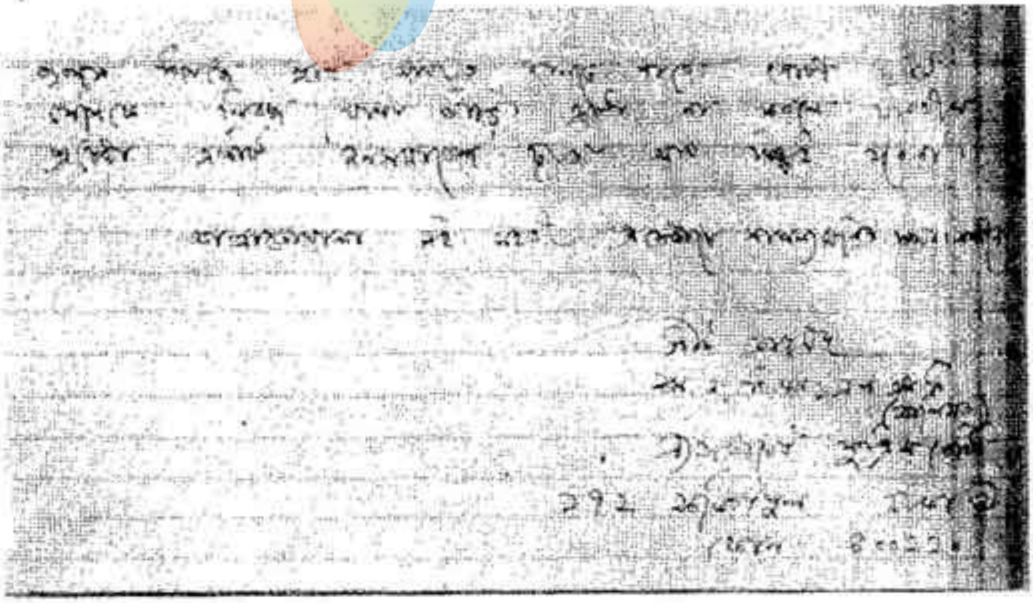

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য
চেয়ারম্যান, ইসলাম প্রচার সমিতি, ঢাকা

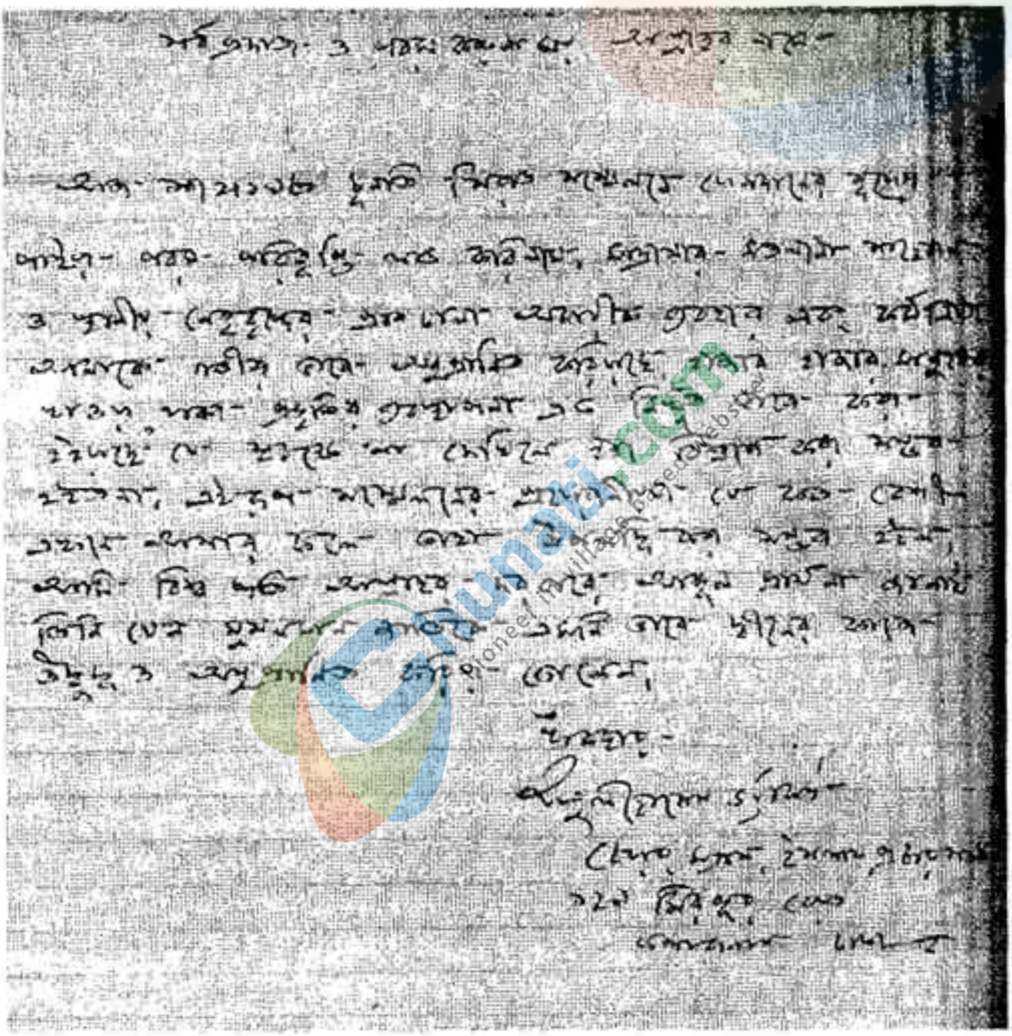

এ পর্যন্ত মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)-এ আলোচিত বিষয়সমূহ

◈ মহানবী (স.) এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা।

◈ মিরাজঃ শারীরিক মি'রাজ-এর সম্ভাব্য প্রমাণাদি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উহার তাৎপর্য।

◈ মহানবী (স.) এর সমর নীতিঃ বিশ্বের বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতীক।

◈ হিযরত-ইসলামের প্রসার কার্যে ইহার গুরুত্ব এবং ইহার জন্য মদিনা নির্বাচন।

◈ মহানবী (স.) এর নবুওয়াতঃ তিনি সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবী। মহানবী (স.) এর নবুয়ত ও অন্যান্য নবীদের নবুয়তের মধ্যে পার্থক্য।

◈ মহানবী (স.) এর আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্বের অবস্থা। তখনকার বিশ্ব একজন মহান সংস্কারকের অত্যধিক পিপাসু ছিল? তিনি এহেন অধঃপতিত অবস্থার কি কি পরিবর্তন সাধন করেছিলেন ও তাঁর অবদান।

◈ ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য বিরোধী জাতির প্রতি হযরত (স.) এর ব্যবহার ও অপূর্ব উদার আচরণ।

◈ আঁ হযরত (স.) এর দ্বারা প্রকাশপ্রাপ্ত মোজেযাসমূহ অকাট্য সত্য। পবিত্র কুরআন তাঁর চিরবিদ্যমান জ্বলন্ত মোজেযা। বিশেষ বিশেষ মোজেযার বর্ণনা।

◈ নবুওয়াতের পূর্বে মহানবী (স.) এর পবিত্র সত্তারপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ যা তাঁর নবুওয়ত প্রাপ্তির যোগ্যতার ইঙ্গিত বহন করেছিল।

◈ খতমে নবুওয়ত, কাদিয়ানীদের রদ ও তাঁর অপব্যাখ্যাদির জওয়াব।

◈ দ্বীন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

◈ মহানবী (স.) মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক।

◈ মানব কল্যাণে যুগে যুগে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব।

◈ ইসলামের নারীর মর্যাদাঃ পর্দার হাকিকত ও গুরুত্ব। পর্দা কি উন্নয়ন ও সুশিক্ষার পরিপন্থী?

◈ ইসলাম ও ন্যায়বিচার।

◈ আদর্শ চরিত্রের ব্যবস্থাপনায় মানবজাতির কল্যাণ ও তার পরিত্যাগে অধঃপতন।

◈ মহানবী (স.) কোন বিশেষ এলাকা বা গোত্রের প্রতি প্রেরিত নন, তিনি ছিলেন বিশ্বনবী।

◈ রেসালতের তাৎপর্য বর্ণনা। মানব জীবন বিধান বাস্তবায়নের নিমিত্তে নবুওয়তের প্রয়োজনীয়তা। পয়গাম্বরী খোদায়ী দান বিশেষ। উহা চেষ্টার্জিত নহে। তিনি শেষ নবী।

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

◈ ধর্ম হিসাবে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের বিচার বিশ্লেষণ।

◈ মাহফিলে সীরত এবং এর যিয়াফত শরিয়তসম্মত ও যুক্তিসংগত।

◈ ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য। অন্যান্য অর্থনীতির ব্যর্থতা।

◈ ইসলাম স্বীয় সৌন্দর্যে আপন গুণে বিস্তার লাভ করেছে, তরবারীর জোরে নয়।

◈ জাতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্য বিধ্বংসী সুদ ও জুয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা বিনষ্টকারী মদ্যপান, রাষ্ট্রব্যবস্থায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী ঘুষ ও দুর্নীতি ইত্যাদি হারাম।

◈ মহানবী (স.) এর হিজরতের পটভূমিকা ও ফলাফল বর্ণনা।

◈ হযরত (স.) এর সমরনীতি, জেহাদের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা। অন্যান্য জাতিসমূহের সমরনীতির সাথে তুলনামূলক আলোচনা।

◈ হুব্বে নবী (স.)।

◈ ইসলামি দণ্ডবিধিসমূহের যৌক্তিকতা বর্ণনা। অপরাপর দণ্ডবিধির সাথে তুলনা ও বিচার।

◈ হায়াতুন্নবী (স.) সম্বন্ধে প্রমাণসহ আলোচনা।

◈ আল কুরআন সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ সার্বভৌম ও সার্বজনীন বিধান। আল কুরআন ও হাদিসের মধ্যকার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও হাদিস অবিশ্বাসকারীদের যুক্তির অসারতা প্রমাণ।

◈ মহানবী (স.) এর সাহাবায়ে কেরামের জীবনী ইসলামের জন্য ত্যাগের একটি জ্বলন্ত ইতিহাস।

◈ ঈমান ও ইসলামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। মৌখিক স্বীকৃতির সাথে নিজের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর ছাঁচে ঢালাইয়ের প্রয়োজনীয়তা।

◈ মহানবী (স.) এর ২৩ বৎসরের কর্মময় আদর্শ জীবন পবিত্র কুরআনেরই বাস্তব রূপায়ন। এই আদর্শ জীবনের অনুসরণ কুরআনেরই অনুসরণ।

◈ মহানবী হযরত (স.) সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাহমতুল্লিল আলমিন রূপে সর্বকালের জন্য প্রেরিত।

◈ বিশ্বের বুকে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারে মহানবী (স.) ও তাঁর অনুগামীবৃন্দের অপূর্ব প্রচেষ্টা। এক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর উপর মুসলমানদের অবদান।

◈ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ হতে এমন কতেক ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা যা এ যাবত ঘটে গেছে।

◈ বিশ্বনবী হযরত (স.) মানবহৃদয়ে খোদাপ্রেমের যে নূর রৌশন করেছেন তা চিরকালের। আওলিয়ায়ে কেরাম ও ওলামায়ে কেরামও এ পথের দিশারী।

◈ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা খেলাফতে রাশেদা ও অপরাপর রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

◈ ওলামায়ে ইসলামের মর্যাদা এবং ইসলাম প্রচারে তাদের ভূমিকা "আলেমরাই নবীগণের ওয়ারিছ" রাসূল (স.) এর এ হাদিসের উপর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ।

◈ অতুলনীয় মানবদরদী, সমকক্ষহীন উদার ও অদ্বিতীয় ক্ষমাশীল হযরত মোহাম্মদ (স.)।

◈ মিলাদ মাহফিলের ফজিলত ও ফুয়ুজ বর্ণনা।

◈ তরিকতের মশায়েখবৃন্দের জীবনী আলোচনা ও তাদের আধ্যাত্মিক অবদান।

◈ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ব।

◈ বিশ্ববাসীর নিকট বিশ্বনবী (স.) এর মহান দাওয়াতের তাৎপর্য।

◈ পারস্পরিক মৈত্রী ও শত্রুতা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

◈ দরূদ শরিফের ফজিলত ও সর্বক্ষণ দরূদ পাঠের গুরুত্ব।

◈ জ্ঞানের অতল সমুদ্র উম্মীনবী, নজীরবিহীন দানশীল ও অদ্বিতীয় ক্ষমাশীল বিজয়ী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)।

◈ আল্লাহর বিধান ও মানব রচিত বিধানের মৌলিক পার্থক্য, ইসলামি ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা।

◈ ইসলাম একটি স্বভাবজাত জীবন ব্যবস্থা, সর্বযুগে সর্বস্তরে ইসলামের বাস্তব রূপায়ন সম্ভব।

◈ বিশ্বের বুকে ইসলামের প্রচার প্রতিষ্ঠায় আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এর ভূমিকা এবং ইহার পূর্ণতা বিধানে মহানবী (স.) এর অবদান।

◈ নিজের কৃত পাপকার্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তওবার উপদেশ-এর তাগিদ এবং তওবা মকবুল হওয়ার শর্তাবলী।

◈ ইসলামে আত্মসমালোচনার শিক্ষা ও ব্যক্তিচরিত্র গঠনে এর গুরুত্ব।

◈ মহানবী (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে সহজ ও অনাড়ম্বর বিবাহ অনুষ্ঠানাদি যেমন ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের জন্য কল্যাণকর, অপরপক্ষে আধুনিক যুগের আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠানে অর্থের অপচয় মারাত্মক ক্ষতিকর।

◈ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইসলামের পয়গাম্বরের ভূমিকা ও ইসলামি জাতীয়তাবাদ।

◈ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অবদান।

◈ ইসলামি সাম্যনীতি একান্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী, আধুনিক সাম্যবাদের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা, তথাকথিত আধুনিক সাম্যবাদের নীতিসমূহ মানবতা বিধ্বংসী ও অপ্রযোজ্য।

◈ পবিত্র কুরআনকে সর্বপ্রকার বিকৃতি থেকে রক্ষার ব্যাপারে খোদাপাক প্রদত্ত ওয়াদা ও মহানবী (স.) এর কঠোর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং হাদিস সংরক্ষণে সাহাবায়ে কেরাম (র.) ও পরবর্তীগণের যথাযথ ব্যবস্থা।

Chunati.com pioneer in village based website

◈ ভারতবর্ষে মুসলমানদের আবির্ভাব ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

◈ মানবসেবা ইসলামি চরিত্রের সোনালী চিত্র বটে।

◈ বর্তমান বস্তুবাদী বিশ্বে ইসলামি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা।

◈ ইসলামের ইতিহাসে হযরত আবু বকর (র.) ও হযরত ওমর (র.) এর খিলাফতের গুরুত্ব ও তাঁদের অবদান।

◈ মহানবী (স.) ওফাতের পরও সশরীরে জীবিত আছেন, এ বিষয়ে প্রমাণাদিসহ আলোচনা।

◈ অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, গালমন্দ, পরনিন্দা চর্চা, পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যাচার ও অমূলক কুধারণা ইত্যাদি দূষিত আচরণসমূহ হারাম। জাতীয় ও ব্যক্তিজীবনে এর ধ্বংসাত্মক কুফলতা।

◈ ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য।

◈ খোদার উপর ভরসা, ধৈর্য ও আত্মসংযমের উপকারিতা।

◈ ইসলামি বাণিজ্যনীতি, মজুতদারী ও কালোবাজারী প্রভৃতি ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের জন্য মারাত্মক।

◈ হযরত মহানবী (স.) এর জন্মরাত্রি, শবে বরাত ও শবে ক্বদর ইত্যাদি মুবারক রাত্রিসমূহের চেয়ে বহুগুণে মর্যাদাপূর্ণ এবং রওজা শরিফে তাঁর দেহ সংলগ্ন মাটি খোদাপাকের সৃষ্টিতে মহান আরশের চাইতেও অধিকতর মর্যাদাশীল।

◈ পবিত্র আল কুরআনের অলৌকিকত্ব ও অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং উহার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তেলাওয়াতের ফজিলত।

◈ দানশীলতা একটি প্রশংসিত চারিত্রিক গুণ এবং কার্পণ্য অতীব ঘৃণ্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

◈ ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ ও আর্থিক কোরবানির নাম জেহাদ।

◈ মীরাস বন্টনে হক বিধ্বংস করা এবং মহিলাদের মিরাস প্রদানে ইচ্ছাকৃত অবহেলা জঘন্য নারকীয় অপরাধ এবং তা গোত্রীয় ও জাতীয় সংহতির প্রধান অন্তরায়।

◈ ইসলাম ও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব।

◈ তসাউফ ও দরবেশীর ছদ্মাবরণে বিদআতসমূহের বিস্তার-সাধন ও পার্থিব স্বার্থসিদ্ধি ধর্মের নামে ডাকাতি বটে।

◈ তাহাজ্জুদ, দোহা, ইশরাক এবং অন্যান্য নফল ইবাদতসমূহের ফজিলত

◈ এই বিশ্বের বুকে বালুকণা আর তরুলতা যত আছে, নিদর্শন তব বিকশিত সদা সকল তরুর মাঝে।

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

◈ কোরবানির বুনিয়াদি ইতিহাস, ইহার বৈশিষ্ট্য, উপকারিতা, এই কর্ম কি সত্যিই প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ।

◈ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে মহানবী (স.) এর আদর্শ।

◈ বিশ্বসভ্যতার উন্নয়নে মুসলমানদের অবদান এবং এ বিষয়ে অমুসলিম জ্ঞানীদের স্বীকারোক্তি।

◈ আল্লাহর মুহাব্বত লাভের একমাত্র উপায় হযরত মহানবী (স.) এর পদাংকানুসরণ। সশ্রদ্ধ ভালবাসা ব্যতীত কারো যথাযথ অনুসারী হওয়া অসম্ভব। তাই মাহফিলাদি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা এবং সাহিত্য প্রকাশনার মাধ্যমে তাঁর পবিত্র সীরতের বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রচার একান্ত কর্তব্য।

◈ মহানবী (স.) এর সমাজ সংস্কার পদ্ধতি।

◈ মহানবী (স.) আল্লাহর সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ। মহানবী (স.) এর নবুওয়ত সংক্রান্ত আলোচনা। ভূয়া নবুওয়তের দাবিদারদের অসারতা প্রমাণ।

◈ সুরা ফাতিহার মর্ম উদঘাটন ও ফজিলত বর্ণনা।

◈ মহানবী (স.) এর জীবনাদর্শ ও ইসলামের প্রচার প্রসারে হযরত ওলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানেদ্বীনের কর্তব্য।

◈ মানবতা প্রতিষ্ঠায় হযরত মহানবী (স.) এর অনন্য অবদান।

◈ মহানবী (স.) এর প্রতি সাহাবায়ে কেরাম (র.) এর অকৃত্রিম ও সশ্রদ্ধ ভালবাসা দ্বীন ইসলামের রক্ষা ও প্রচারে তাদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ।

◈ ধর্মীয় শিক্ষার যথাযথ প্রচার এবং মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে জাতির পূর্ণ দৃষ্টি ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা।

◈ লোভ, ক্রোধ ও অত্যাচারের কুফল।

◈ মহিলাদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা এবং জাতীয় চরিত্র গঠনে তাদের গুরুত্ব।

◈ ইসলামের হাকিকত।

◈ অন্যান্য ধর্মের কথা বিভিন্ন। ইসলাম কিন্তু শাশ্বত মানবতার বিধানস্বরূপ সম্পূর্ণ একটি ঐতিহাসিক ধর্ম।

◈ যাকাতের হুকুম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ন্যায়ভিত্তিক। এ বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণাদি। যাকাতদানে অস্বীকারকারীদের পরিণাম।

◈ মহানবী (স.) এর নবুয়তের নিদর্শনসমূহ বর্ণনা ও বাস্তবক্ষেত্রে সংঘটিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা।

◈ হাশর, কৃতকর্মাদির হিসাব নিকাশ, মিযান, পুলসিরাত, বেহেশত, দোযখ, হাওজে কওসর, শাফায়াত ইত্যাদি বিষয়সমূহের উপর সপ্রমাণ আলোচনা। এর প্রতি বিশ্বাস ঈমানের মূল অঙ্গ।

◈ বিবাহ শাদি, কর্ণচ্ছেদ, খতনা ইত্যাদি উপলক্ষে মাইক বাজানো এবং শরিয়ত মারফতের নামে কবিগান ইত্যাদি পাপ প্রথাসমূহের কুফল বর্ণনা। এর প্রতিরোধ কর্তব্য।

◈ হজ্বব্রতের রুকনসমূহ, এর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব। হজ্বের প্রত্যেক রীতির ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

◈ আল কুরআনের বাণী "তোমরা ভীত হয়ো না, বিপর্যস্ত হয়ো না, যদি তোমরা প্রকৃত ঈমানের অধিকারী হয়ে থাক" এর তাৎপর্য।

◈ সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। শরিয়ত ও যুক্তির দৃষ্টিতে আধিপত্য ও বিধান একমাত্র তাঁরই। সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর তাঁরই আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য।

◈ উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় হযরত খাজা আজমিরী (রহ.), হযরত শাহজালাল (রহ.), হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এবং অপরাপর বুজুর্গানেদ্বীনের গৌরবময় ভূমিকা।

◈ ইসলামের প্রতি হযরত খদিজাতুল কুবরা (র.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (র.) এর অবদান।

◈ কলেমায়ে তাইয়্যেবার তাৎপর্য।

◈ সম্রাটদের প্রতি মহানবী (স.) কর্তৃক ইসলামের দাওয়াত দান, মহানবী (স.) এর অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয়।

◈ ইবাদতের তাৎপর্য ও এর দার্শনিক যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ।

◈ মহানবী (স.) এর বাল্যজীবন ও শৈশবে সংঘটিত তাঁর অলৌকিক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

◈ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ের গুরুত্ব।

◈ ধর্ম ও রাজনীতি একই মায়ের যমজ সন্তান।

◈ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এর চিন্তাধারা। ইসলাম ও মুসলিম সমাজের উপর এর প্রভাব।

◈ মহানবী (স.) এর পবিত্র বাণী "আল-হাদিসের" যথাযথ বর্ণনা ও সংকলনের ইতিবৃত্ত। এ ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়িন ও মুহাদ্দিসগণের অনন্য অবদান।

◈ মহানবী (স.) এর বংশ পরিচিতি। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে তার আগমন সম্পর্কিত সুসংবাদসমূহ।

◈ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে মহানবীর (স.) আদর্শ শিক্ষা।

◈ মুসলিম সমাজের সাথে মসজিদের সম্পর্ক নির্ণয়।

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

◈ ইসলামের প্রাথমিক যুগ মুসলমানদের জীবন আলোচনা, নানা নির্যাতন ও উৎপীড়নের মুখে তাদের দৃঢ় ঈমানি শক্তির অনন্য দৃষ্টান্ত।

◈ ইতিহাসের আলোকে নবীকূল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রেরণের জন্য বনু ইসমাইলের মধ্যে কোরাইশ গোত্রের নির্বাচন ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা "ইসলাম" এর প্রবর্তনের জন্য আরব উপদ্বীপের নির্বাচনের গুরুত্ব।

◈ মযহাব ও ধর্মের পরিচয় ও ইহার প্রয়োজনীয়তা।

◈ বর্তমান যুগে মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব।

◈ আদর্শ মানব সমাজ গঠন ও এর সার্বিক কল্যাণ সাধনে ইসলামের নৈতিক বিধানসমূহের ভূমিকা।

◈ আপন প্রভুর প্রতি দায়িত্ব প্রকাশ ও বান্দাকে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে নামাজের বৈশিষ্ট্য।

◈ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে মুসলিম মিল্লাতের জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক ঐক্যের গুরুত্ব।

◈ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে নারী স্বাধীনতা, নারী জাতির অধিকার ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা।

◈ ইসলাম ও মহানবী (স.) এর বিরুদ্ধে কোরাইশীয় কাফিরদের হীন ষড়যন্ত্র। কাফেরদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সমরের অনুমতি লাভ

◈ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামি আহকামে তাহারাৎ একান্ত বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত।

◈ অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতে ইসলাম একটি সার্বজনীন নমনীয় শাসনতন্ত্র পেশ করেছে।

◈ বাইআতুর রিদওয়ান ও হোদাইবিয়ার সন্ধি আল কোঁরআন এর ভাষায় ইসলামের সুস্পষ্ট বিজয়ের সূচনা।

◈ ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব ও এর প্রয়োজনীয়তা।

◈ সৎকর্মের পরিচিতি ও ব্যাখ্যা। মানবজীবনে এর গুরুত্ব।

◈ নামাজ, রোজা, ওজু ও গোসলের প্রয়োজনীয় মাসায়েল বা কর্তব্য বিষয়সমূহ: একটি ফিকহ শাস্ত্রীয় পর্যালোচনা।

◈ মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও একের প্রতি অন্যের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব।

◈ গণতান্ত্রিক ও পরামর্শভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনে মহানবী (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদিনের গৌরবোজ্জ্বল অবদান।

- ◈ যুবসমাজকে দেশের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব।
- ◈ সত্য, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (স.) এর ভূমিকা।
- ◈ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রতিরক্ষা একটি মহৎ ধর্মীয় কর্তব্য।
- ◈ মুসলমানদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে মশায়েখে তরিকতের অনন্য অবদান।
- ◈ শরিয়তের বিধানসমূহের অস্বীকৃতি, অবমাননা ও বিদ্রুপ প্রদর্শন কুফরী কার্য।
- ◈ সুরা ক্বদরের ব্যাখ্যা। লায়লাতুল ক্বদরের ফজিলত ও এ রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার তাৎপর্য।
- ◈ আল কুরআনের বাণী "মানব জাতির জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর যা মক্কায় অবস্থিত" এ উক্তির আলোকে কাবাগৃহের বিস্তারিত ইতিহাস এবং ইসলামে এর গুরুত্ব ও হজ্বের রুকনসমূহের তাৎপর্য বর্ণনা।
- ◈ নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তিন বছরে মহানবী (স.) এর অবস্থা
- ◈ মক্কা বিজয়ের ইতিহাস। মক্কাবাসীদের প্রতি মহানবী (স.) এর অনন্যসাধারণ মহানুভবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
- ◈ মুসলিম জাতির ধর্মীয় অধঃপতনের যুগে মহানবী (স.) এর সুন্নতের পুনরুজ্জীবন শাহাদাতের চেয়েও পুণ্যময়।
- ◈ ঈমান বা আক্বিদা বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা। ঈমান বিলগায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াবলীর প্রতি ঈমান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা।
- ◈ ইসলামি বিচারব্যবস্থা অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধে একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা।
- ◈ মহানবী (স.) এর পররাষ্ট্রনীতি পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
- ◈ ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক সাম্য। একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা।
- ◈ প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় অধঃপতনের ইতিবৃত্ত। একজন সংস্কারকের আশু প্রয়োজনীয়তা।
- ◈ মহান প্রভূ আল্লাহ প্রদত্ত উপাধি " ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আজিম" (নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী) এ আয়াতের আলোকে মহানবী (স.) এর উন্নত মহান চারিত্রিক বিষয়সমূহ।
- ◈ নবীজীর শিক্ষাসমূহ এবং ধর্মীয় বিধানসমূহের প্রবর্তন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের গুরুদায়িত্ব। ইতিহাসের আলোকে এ দায়িত্ব পালনে ঔদাসীন্য ও অলসতা প্রকাশের ফলে খ্রিস্টানদের শোচনীয় পরিণতি।

◈ ঈমানের হাকিকত এবং ঈমানে মুজমল ও ঈমানে মুফসসলের পূর্ণ ব্যাখ্যা।

◈ হিজরতের পটভূমিকা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দেয়া শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় হিজরতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

◈ বদর ও উহুদ যুদ্ধের পটভূমি ও ফলাফল। ইসলামের ইতিহাসে এ দুই যুদ্ধের গুরুত্ব ও ইহার শিক্ষাসমূহ।

◈ আল্লাহ তা'লার সত্তা ও গুণাবলীতে তাঁর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের প্রমাণ। বুজুর্গানে দ্বীনের মাজার ও দরগাহসমূহে প্রচলিত শিরক বিদআতসমূহ একত্ববাদের পরিপন্থী হওয়ার বিশদ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কে সমাজের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা।

◈ পৃথিবীর ভাষাসমূহের মধ্যে আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আল- কুরআন এর ভাষাকে নির্বাচনের তাৎপর্য। কুরআনের ভাষা ও মানুষের ভাষার তুলনামূলক পর্যালোচনা।

◈ তওবা তথা পাপ কার্যাদির উপর অনুশোচনার তাৎপর্য ও এর পদ্ধতি। তওবা কবুলের শর্তাবলী এবং পাপ কার্যাদি থেকে বিরত থাকার জন্য আত্মসমালোচনার গুরুত্ব।

◈ পানাহার, পোষাক, পরিচ্ছদ, সালাম, কালাম ইত্যাদি সম্পর্কে মহানবী (স.) এর শিক্ষা ও আদর্শ। ইসলামি সংস্কৃতি ও আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব এবং বিজাতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ পরিহারের প্রয়োজনীয়তা।

◈ "ভয়-ভীতি ও আশার মাঝখানেই ঈমান।" রসুলুল্লাহ (স.) এর এ অমর বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা।

◈ সমাজ জীবনে যাকাতের গুরুত্ব। যাকাত অমান্যকারী, অনাদায়কারী সম্পর্কে শরিয়তের সিদ্ধান্ত।

◈ ইসলামে রোজার ফজিলত ও গুরুত্ব। এর আত্মিক, দৈহিক ও সামাজিক উপকারিতা। রোজার প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কুফল।

◈ তরবারী নয় বরং চরিত্রই ইসলাম প্রচার করেছে।

◈ ইসলামি জিহাদের মর্মকথা ও উদ্দেশ্য। জিহাদ কি নিছক অস্ত্রের শক্তি প্রদর্শন না মানবতার বাস্তবায়ন।

◈ ইসলামে নারীর মর্যাদা ও নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব। নারীশিক্ষা ব্যবস্থার কুফল। প্রগতির নামে পর্দাহীনতা নারী জাতির অমর্যাদার নামান্তর।

◈ মহানবী (স.) এর এবাদত ও মুয়ামেলাত (পারস্পরিক লেনদেন) সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা।

◈ আপন আপন প্রিয়জনের সাথেই মানুষের হাশর হবে। মহানবী (স.) এর এ হাদিসের ভিত্তিতে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়।

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

◈ পঞ্জগানা নামাজ জমাতের সাথে আদায়ের ফজিলত এবং এর শারীরিক, আত্মিক ও চারিত্রিক উপকারিতাসমূহ বর্ণনা। মসজিদ, মাদরাসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জমাত কায়েমের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা।

◈ বরজখ, হাশর, বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা।

◈ হিজরত পূর্বকালে ইসলাম প্রচারে মুসলমানদের উপর কাফেরদের অকথ্য জোর জুলুম, ও লাঞ্ছনার করুণ ইতিহাস। ইসলাম প্রচারে 'বাইয়াতে আকাবা' এর গুরুত্ব।

◈ মহানবী (স.) এর পবিত্র আকৃতি ও প্রকৃতিসমূহের বর্ণনা।

◈ আল্লাহর নির্দেশে রসুলুল্লাহ (স.) কেবল ঐ সমুদয় চরিত্রকেই হারাম ঘোষণা করেছেন "যা সমাজকে কলংকিত ও দূষিত করে" এ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা।

◈ মদিনায় ইসলমি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন। বিশ্বের ইতিহাসের সর্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠতম "মানবাধিকর সনদ" হিসাবে "মদিনা সনদ" এর গুরুত্ব এবং এ সনদের ধারাসমূহের পর্যালোচনা।

◈ পারিবারিক জীবন ও সন্তান-সন্ততিদের নাম নির্বাচনে রসুলুল্লাহ (স.) এর আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা। ইসলামি নাম রাখার গুরুত্ব এবং অনৈসলামিক ও বিকৃত নাম রাখার কুফল। আক্বিকা ও খতনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা।

◈ কুরআন ও হাদিসের আলোকে জনসেবার গুরুত্ব।

◈ হযরত (স.) এর অমর উক্তি- "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়" এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা।

◈ "আশারায়ে মুবাশশরাহ" তথা বেহেস্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবায়ে কেরামের ফজায়েল আলোচনা।

◈ সিহাসিত্তা বা ছয়টি প্রামাণ্য হাদিসগ্রন্থের নাম নির্ণয় এবং এদের সংকলনকারীদের ঐকান্তিকতা ও সতর্কতা অবলম্বণের বিবরণ। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের জীবনী আলোচনা।

◈ "অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলাই উত্তম জিহাদ" রাসুলুল্লাহ (স.) এর এ উক্তির আলোকে ইসলামি জিহাদের উপর আলোকপাত।

◈ রসুলে মকবুল (স.) এর পবিত্র জীবনই একমাত্র আদর্শ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

◈ সার্বভৌমত্বের অকপটে স্বীকৃতি এবং ধর্মে অটল থাকার গুরুত্ব।

◈ বিদায় হজ্বে প্রদত্ত মহানবী (স.) এর ঐতিহাসিক খুতবার বিবরণ এবং এতে বর্ণিত বিষয়াদির তাৎপর্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা।

◆ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

◈ বর্তমান ধর্মবিমুখিতা ও নাস্তিক্যবাদের যুগে ধর্ম রক্ষার্থে সাধারণভাবে মুসলমান এবং বিশেষভাবে সমাজের কর্তব্য।

◈ "তওয়াক্কুল", "সবর" এবং "শোকর" এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা।

◈ কুরআন পাঠক, তেলাওয়াতের ফজিলত ও উপকারিতা। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য।

◈ 'তবুক' যুদ্ধের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। এ যুদ্ধ থেকে মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য শিক্ষাসমূহের বর্ণনা।

◈ পবিত্র হজ্ব সমাপনান্তে হুযুর আকরাম (স.) এর রওজায়ে পাক জিয়ারতের গুরুত্ব এবং মসজিদে নববী (স.) এর ফজিলত বর্ণনা।

◈ ইসলামি আইন ও বিধি বিধান বিশ্বশান্তির একমাত্র সহায়ক।

◈ নামাজের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যেবোধ। শরিয়তের দৃষ্টিতে নামাজ পরিত্যাগের শোচনীয় পরিণতি।

◈ হুযুর আকরাম (স.) এর তেইশ বছরের রেসালত একটি সর্বাত্মক আন্দোলন, একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব।

◈ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি মতাদর্শের বাস্তবায়ন ও ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করে মহানবী (স.) এর জীবনাদর্শ ও সীরতে পাকের বিভিন্ন দিক আলোচনার জন্য "সীরত মাহফিল" ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি কায়েম করার প্রয়োজনীয়তা এবং বাতিল পন্থীদের মুকাবিলায় এ সমুদয় অনুষ্ঠানাদির গুরুত্ব বিশ্লেষণ।

◈ ইসলামি আদর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে মানবতার উন্নতি অসম্ভব।

◈ পবিত্র আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও ঐক্য বিধানের গুরুত্ব।

◈ আলেমরাই আল্লাহ তা'য়ালাকে যথাযথভাবে ভয় করেন। পবিত্র আল-কুরআনের এ আয়াতটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

◈ পবিত্র আল কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (স.) এর মোজিযাসমূহের বর্ণনা। মহানবী (স.) ও অপরাপর নবীগণের মোজিযাসমূহের পারস্পরিক পর্যালোচনা।

◈ "খোলাফায়ে রাশেদিন" এর শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের স্বীকারোক্তি।

◈ "আমি মহত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণতা বিধানকল্পেই প্রেরিত" রসুলুল্লাহ (স.) এর এ উক্তির আলোকে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা।

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

◈ "অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি পরিহার মানুষের ইসলামি সৌন্দর্যের অন্যতম।" মহানবী (স.) এর অমূল্য বাণীর আলোকে বর্তমান মুসলিম সমাজের চরিত্র ও এর পরিণতি বিশ্লেষণ।

◈ শাদি-বিবাহের ইসলামি পদ্ধতি ও মহরের পরিমাণ। বর্তমানে প্রচলিত যৌতুক প্রথা ইসলামি বিধানের পরিপন্থী হওয়ার প্রমাণ।

◈ "তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্তদের সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।" রসুলুল্লাহ (স.) এর অমিয় বাণীর আলোকে মুসলমানদের দায়িত্ব বিশ্লেষণ।

◈ ইসলামের দৃষ্টিতে তাকওয়াহ (খোদাভীতি) ও এখলাস (আন্তরিকতা) এর গুরুত্ব আলোচনা।

◈ বর্তমান বস্তুবাদী বিশ্বে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা। ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা এবং ইসলামি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা।

◈ মুমিন ও মুনাফিকের পরিচিতি। মুনাফিকের নিদর্শনসমূহের বর্ণনা। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। দুনিয়া ও আখিরাতে মুনাফিকদের শোচনীয় পরিণতি।

◈ হযরত উম্মুহাতুল মুমেনীন (র.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাদের বিশেষ গুণাবলী ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা।

◈ সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ আলোচনা। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথে তাঁদের অনন্য ত্যাগ ও কুরবানির ইতিহাস বর্ণনা।

◈ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আল্লাহর গযব ও আযাব নাযিলের কারণসমূহ বিশ্লেষণ। অতীত ইতিহাসের আলোকে বর্তমান যুগের নাস্তিকাবাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী।

◈ ইসলামই একমাত্র মুক্তির পথ এবং এটাই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম।

◈ সমগ্র সৃষ্ট জগতের উপর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

◈ মদ্যপান, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, যেনা ইত্যাদি অভ্যাসসমূহ সমাজ জীবনের মারাত্মক ব্যাধি। এতদসম্পর্কে শরিয়তের নির্দেশিত শাস্তির বিধানসমূহ অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও যুক্তিসঙ্গত। এ সমুদয় অভ্যাসমূহের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা।

◈ হাশরের দিন আল্লাহর দরবারে নেক বান্দাদের 'শফাআত' এর অধিকার ও 'শাফাআতে কুবরা' (সবচাইতে বড় সুপারিশ) এর অধিকার একমাত্র রসুলুল্লাহ (স.) এর জন্য সংরক্ষিত।

◈ "সবুজ বৃক্ষের পত্ররাজি দার্শনিকের দৃষ্টিতে স্রষ্টার পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে এক একটি গ্রন্থ বিশেষ" শেখ সাদীর এ তত্ত্ববাণীর মর্ম উদঘাটন

◈ সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধাদান সম্পর্কে মুসলিম সমাজের গুরুদায়িত্ব। এ গুরুদায়িত্বভার গ্রহণের কারণেই বিশ্ববাসীর উপর উম্মতে মুহাম্মদী (স.) এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ দায়িত্বে অবহেলা প্রদর্শনের ভয়াবহ পরিণতির বর্ণনা।

◈ আল্লাহর প্রতি মহব্বত ও মহানবী (স.) এর আনুগত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ মুহাব্বতের সীমারেখা নির্ধারণ এবং আক্বিদাহ, মুহাব্বত ও ইবাদতে সীমা লঙ্ঘনের কুফল।

◈ "বস্তুতঃ আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সবই বিশ্বনিয়ন্তা আল্লাহরই প্রতি নিবেদিত" কুরআনের এ আয়াতের আলোকে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্কের বাস্তব মূল্যায়ন।

◈ আদর্শ চরিত্র গঠনে ইসলামের শিক্ষা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইহার প্রভাব ও কৃতকার্যতা।

◈ ইসলামের দৃষ্টিতে "জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা" দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাবের ভয়ে 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' ব্যবস্থা গ্রহণে শরিয়তের সিদ্ধান্ত।

◈ ইসলামি জীবনধারার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও ইহার সীমারেখা বর্ণনা। প্রত্যেক মুসলমানের উপর স্বীয় সন্তান-সন্ততিদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের গুরুত্ব।

◈ আধুনিক প্রচারযন্ত্র, নাটক, বিচিত্রা ও কবিগানের মাধ্যমে বাদ্যযন্ত্র ও নাচ-গানের ব্যাপক প্রচারে নৈতিকতা বিধ্বংসী কুফলসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা।

◈ ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও কার্যক্ষেত্রে সফলতার প্রমাণ। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ।

◈ "ওহী" এর কাইফিয়ত , স্বরূপ বর্ণনা এবং হযরত রসুল মকবুল (স.) এর ইনকিলাবী জীবনধারা পর্যালোচনা।

◈ মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ও সভ্যতার পূর্ণতা বিধানে রিসালতের প্রয়োজনীয়তা।

◈ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী- "তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি উহা কবুল করব।" এবং রসুলুল্লাহ (স.) এর হাদিসের আলোকে দোয়া ও মোনাজাতের গুরুত্ব। দোয়া কবুল হওয়ার বিভিন্ন সময় ও শর্তাবলী।

◈ "এমন কতেক লোক রয়েছে যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর যিকর থেকে বিরত রাখেনা।" পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর যিকর এর ফজিলত বর্ণনা।

Pioneer in village based website

◈ ইসলাম বিরোধী প্রচারণা কার্যাবলীর ক্ষতিকর পরিণতি হতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য সীরত মাহফিল অনুষ্ঠানে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা।

◈ হুযুরে আকরম (স.) এর আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরামের (আ.) সুসংবাদ ও বিভিন্ন ঘটনাবলীর মাধ্যমে এর প্রচার।

◈ মহানবী (স.) এর ভবিষ্যৎবাণীসমূহ যেগুলি হযরতের জীবদ্দশায় ও ওফাতের পরে সত্যে পরিণত হয়েছে এবং যেগুলি এখনও প্রকাশ পায়নি সেগুলোর তথ্যপূর্ণ আলোচনা।

◈ শরিয়তের দৃষ্টিতে এবং বিবেকের আলোকে ঈমান বিল্লাহ, ঈমান বিররসূল ও ঈমান বিল আখেরাতের প্রয়োজনীয়তা ও বিস্তারিত বর্ণনা।

◈ হযরত হাসান ও হোসাইন (র.) এর মর্যাদা ও ফজিলত। ন্যায়-নীতিতে অটল থেকে কারবালার ময়দানে হযরত হোসাইন (র.) এর শাহাদত বরণের ঐতিহাসিক বর্ণনা।

◈ হুযুর (স.) এর পারিবারিক জীবনের আদর্শ। তাঁর সান্নিধ্যের বদৌলত তাঁদের উচ্চ মর্যাদা লাভ।

◈ আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে আঁ হযরত (স.) এর জীবনাদর্শ।

◈ ইসলামে শারীরিক ও মানসিক সতীত্বের গুরুত্ব। বিবাহবন্ধন নারী-পুরুষের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। এ সম্পর্কে শরিয়ত ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।

◈ এবাদতের অর্থ ও গুরুত্ব। সর্বোৎকৃষ্ট এবাদতকারী হিসেবে রসুলুল্লাহ (স.)।

◈ জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলী সম্পর্কে আঁ হযরত (স.) এর শিক্ষা ও আদর্শ (বৃক্ষরোপন, রাস্তাঘাট, পুল নির্মাণ ও অন্যান্য সেবামূলক কার্যাবলী, মেহমানদারী, দানশীলতা)।

◈ আঁ হযরত (স.) এর জেহাদ। সশস্ত্র জেহাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা। ইসলামি জেহাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী জেহাদের ইতিহাস আনুগত্য ও শৃঙ্খলার, ঈমান ও প্রেমের, ক্ষমা ও বীরত্বের মহিমায় পরিপূর্ণ।

◈ বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও ইসলাম প্রগতি বিরোধী নয়, বরং সহায়ক।

◈ সৈয়দুল মুরসালিন ও আশরাফুল আম্বিয়ারূপে হযরত (স.) এর আবির্ভাব

◈ "যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।" এ হাদিসের আলোকে নিয়্যত ও এখলাছের গুরুত্ব বর্ণনা।

◈ হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পয়দায়েশ ও এর অলৌকিকত্ব বর্ণনা।

◈ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা।

◈ ইসলামের প্রচারের প্রথম যুগের প্রতিকূল অবস্থা বর্ণনা। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের উপর পৌত্তলিকদের নির্যাতনের করুণ কাহিনী।

Chunati.com Pioneer village based website

◈ অনাড়ম্বর জীবন যাপনে আঁ হযরত (স.) এর জীবনাদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এর প্রতিফলন।
◈ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ইসলাম।
◈ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ইসলাম।
◈ আল কুরআনে ইসলামের মৌলিক ও দার্শনিক দিকসমূহ আলোচনা।
◈ ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য, এর প্রচলন ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্তব্য।
◈ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতের প্রমাণ।
◈ শরিয়তের দৃষ্টিতে গান-বাজনা, মদ্যপান, জুয়া, মদ, ঘুষের লেনদেন ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যাবলী সম্পর্কে হুযুরে আকরাম (স.) এর সতর্কবাণী এবং এ সমস্ত জিনিস ইসলামী ভ্রাতৃত্বের জন্য ক্ষতিকর।
◈ মুহাম্মদ (স.) সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ। হযরত আদম আ. হতে খাজা আবদুল্লাহ পর্যন্ত নুরপাকের হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা।
◈ কুফর, শিরক ও বেদআতের পরিচয় ও এসবের উচ্ছেদ সাধনে ইসলামের কঠোর নির্দেশাবলী। বুযুর্গানে দ্বীনের মাজারসমূহে প্রচলিত শিরক-বেদআতের বর্ণনা।
◈ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল কুরআনের বৈশিষ্ট্য। বাগ্মিতা ও রূহানী আকর্ষণ সৃষ্টিকারী রূপে এর মুজেযাসমূহের বর্ণনা।
◈ সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, আমানত, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্মীয় কাজে মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতায় আঁ হযরতের শিক্ষাদর্শ ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এর বাস্তবায়ন।
◈ উহুদ যুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমের, ঈমান ও আক্বিদার , ত্যাগ ও ধৈর্যের এবং শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের চিরন্তন শিক্ষা।
◈ খোদা ভীরুতা ও খোদা প্রেমের গুরুত্ব এবং তা অর্জনের উপায়। আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও এর প্রয়োজনীয়তা এবং এ ব্যাপারে বুজুর্গানে দ্বীনের অবদান।
◈ ঈমান সত্তর বিভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে কলেমায়ে তৈয়্যেবা সর্বোৎকৃষ্ট এবং রাস্তা থেকে কন্টক অপসারণ ঈমানের নিম্নতম অংশ। এ মহান উক্তির আলোকে ঈমানদারদের নৈতিক দায়িত্ব।
◈ সর্বকালের নবী, সর্বমানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)।
◈ অনৈসলামিক সংস্কৃতির অনুসরণ মুসলমানদের জাতীয় মৃত্যুরই নামান্তর। ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার তুলনামূলক বিচার।

◈ মহানবী হযরত (স.) এর মহব্বত, মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র ও সকল মানুষ হতে এবং নিজের জীবন হতে অধিক হওয়া ওয়াজিব। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এর যথার্থতা প্রমাণ।

◈ হালাল রিযক অর্জনের ব্যাপারে ইসলামে উৎসাহ প্রদান ও হালাল জীবিকা অর্জনের উপায়। ইসলামে ব্যবসা ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা ও তার উন্নতি সাধনের গুরুত্ব।

◈ মানব সৃষ্টির সূচনা ও ঈমান সম্পর্কিত অধ্যায়, মানব-সৃষ্টির রহস্য। এ বিশ্বের বুকে মানব জাতির এবং বিশেষ করে মুসলিম মিল্লাতের মহান দায়িত্ব।

◈ ঈমানের তাৎপর্য। মু'মিনের বাস্তব জীবনে ঈমানের বাহ্যিক নিদর্শনসমূহ প্রতিফলিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

◈ তাওহিদ রিসালত ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপনের গুরুত্ব। এ তিনটি ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

◈ মহানবী (স.) এর গর্ভধারণ ও ভূমিষ্ঠ হওয়াকালীন বিবি আমেনার কাছে প্রকাশিত আশ্চর্য ঘটনাবলী। দুগ্ধপান, বিবি হালিমা কর্তৃক পিতৃহীন শিশু মুহাম্মদ (স.) এর নির্বাচন এবং তাঁর কাছে অবস্থানকালীন ঘটনাবলী।

◈ মুহাম্মদ (স.) এর রসূলরূপে আগমন সম্পর্কে হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর দোয়া ও অন্যান্য নবী ও রসূলগণের ভবিষ্যৎ বাণী সমুহের বিবরণ।

◈ মহানবী (স.) এর নূর "এর সৃষ্টি দিয়ে সৃষ্টির সূচনা। খোদা যা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন সে আমার নূর" মহানবী (স.) এর এ উক্তির তাৎপর্য।

◈ আবু তালেবের সাথে মহানবী (স.) এর সিরিয়া গমন, কাবাগৃহ পুনঃনির্মাণে অংশগ্রহণ, বিবি খদিজা (র.) এর পক্ষে ব্যবসা পরিচালনা ও তাঁর সাথে শাদি।

◈ হযরত (স.) এর হেরায় নিভৃত গুহার ধ্যানে আত্মনিয়োগ। ওহীপ্রাপ্তির পূর্বাভাস, ওহীর সূচনা, তাৎপর্য ও ওহীলাভের বিভিন্ন প্রকৃতি

◈ রিসালতের প্রয়োজনীয়তা। মানব জাতির হেদায়তের জন্য যুগে যুগে নবী প্রেরণ।

◈ মুসলমানদের আবিসিনিয়া হিজরত। নাজ্জাশীর কাছে কোরাইশদের দূত প্রেরণ। নাজ্জাশীর সত্যনিষ্ঠা ও মুসলমানদের আশ্রয়দান।

◈ মক্কী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। নবুয়তের ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষের ঘটনাবলী। সত্যের বাণীর প্রকাশ্যে ঘোষণা এবং কাফিরদের বিরোধিতা।

◈ ওহীলাভের পর প্রথম তিন বৎসর গোপনে ইসলাম প্রচার। মক্কাবাসীর কাছে সত্যের বাণী পৌঁছানো এবং প্রত্যুত্তরে তাঁদের বিদ্রূপের কাহিনী।

◈ মক্কী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়। নবুয়তের ৭ম থেমে ৯ম বর্ষের ঘটনাবলী। মুসলমানদের উপর অত্যাচারের নির্মম কাহিনী। মহানবী (স.) ও মুসলমানদের নজীরবিহীন দৃঢ় মনোবল ও সহিষ্ণুতার পরিচয়।

◈ ইবাদতের তাৎপর্য। আবদ এর সংজ্ঞা ও তার প্রয়োজনীয় গুণাবলী।

◈ শিরক এর তাৎপর্য ও এর প্রকারসমূহ। বর্তমান যুগে জনসাধারণ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে সমসত্ শিরকে লিপ্ত রয়েছে তা হতে বাঁচার প্রয়োজনীয়তা।

◈ রব শব্দের তাৎপর্য। কলেমায়ে তাইয়্যেবার সংজ্ঞা। মানব ও জ্বিন জাতি সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য খোদার প্রতি দাসত্বের প্রতিষ্ঠা।।

◈ ত্বকওয়ার তাৎপর্য। ত্বকওয়ার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কেন? ত্বকওয়া সম্পর্কিত মহানবী (স.) এর এরশাদসমূহ।

◈ কোরআন ও হাদিসের আলোকে নিকাহের প্রয়োজনীয়তা। সমাজ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার ক্ষেত্রে প্রচলিত বদ রসমসমূহ ও যৌতুক প্রথার মারাত্মক পরিণতি।

◈ রোযার হাকিকত এবং ফজিলতসমূহের বিবরণ। মানুষের ব্যক্তি চরিত্র ও সামাজিক জীবনে রোযার প্রভাব।

◈ ইসলামের বৃহত্তম স্তম্ভ নামাজ রেওয়ায়েত ও যুক্তির মাধ্যমে ইহার গুরুত্ব বর্ণনা। মুসলমানদের জীবনে নামাজের কি প্রভাব পরিলক্ষিত হওয়া উচিত তার বিবরণ।

◈ যাকাতের হাকিকত। পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্বের উপর গঠিত একটি আদর্শ ও কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যাকাতের ভূমিকা।

◈ হজ্বের হাকিকত। কাবাগৃহের ইতিহাস ও হজ্বের গুরুত্ব। হজ্ব উপলক্ষ্যে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইসলামী সাম্যের একটি নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত।

◈ হজ্বের মৌসুমে বহিরাগত কাফেলাসমূহের প্রতি মহানবী (স.) এর দাওয়াত পেশ। মহানবী (স.) এর হাতে মদিনাবাসীদের বাইআত এবং হযরতকে মদিনা গমনের দাওয়াত।

◈ ইসলাম ও মহানবী (স.) এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রের আলোকে মহানবী (স.) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পর্যালোচনা।

◈ ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য- ভৌগোলিক সীমারেখা বিস্তৃত নয় বরং ত্রুটি - বিচ্যুতি দূরকরতঃ একটি কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। ইতিহাসের আলোকে এ উক্তির যথার্থতা প্রমাণ।

◈ আমি আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতের পূর্ণতা দান করেছি এবং ইসলামকেই তোমাদের একমাত্র দ্বীন হিসাকে ঘোষণাকরত: সন্তুষ্ট হয়েছি। এ উক্তির ব্যাখ্যা।

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

◈ মহানবী (স.) এর অন্তিম শয্যা রুগ্নাবস্থায় মহানবী (স.) এর বিভিন্ন উপদেশাবলীর বর্ণনা এবং তাঁর তিরোধানের পরে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিক্রিয়া। ইসলামে পয়গম্বরীর স্বরূপ।

◈ শরিয়ত কি? এর প্রয়োজনীয়তা কেন? যুগে যুগে ও ধাপে ধাপে শরিয়তের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস।

◈ ইসলাম প্রকৃতি ও মানবতার ধর্ম। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম। এ ধর্মে কেয়ামত পর্যন্ত কোন বিষয়ে কারো নিকট মুখাপেক্ষী হওয়ার দরকার নেই।

◈ মহানবী (স.) বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ । ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এর যথার্থতার প্রমাণ।

◈ আল কুরআনের উক্তি "আমি আপনার স্মৃতি চর্চাকে সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেছি। বাস্তবতার দৃষ্টিতে এর পর্যালোচনা।

◈ মাহে রবিউল আউয়ালের ফজিলত ও তাৎপর্য। মহানবী (স.) এর শুভাগমন মাস হিসেবে এর শিক্ষাণীয় বিষয়সমূহ।

◈ "আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলাম" মাওলানা আবুল হোসাইন ভট্টাচার্য

◈ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (র.) এর খেলাফত। শোচনীয় পরিস্থিতিতে তাঁর অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয়। ইসলামের ইতিহাসে হযরত আবু বকর (র.) এর শাসনকালের গুরুত্ব ও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ।

◈ ইসলামি রাষ্ট্রে সরকার ও জনসাধারণের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ।

◈ খোলাফায়ে রাশেদিনের রাষ্ট্রীয় ও আদর্শিক বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদের আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব।

◈ হযরত ওমর (র.) এর শাসনকাল ইসলামের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাঁর নীতি ও সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সমূহের পর্যালোচনা। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী।

◈ ইসলামের তরে হযরত খদিজাতুল কুবরা (র.) ও হযরত আয়েশা (র.) এর অসাধারণ আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত। তাদের চারিত্রিক গুণাবলীর বিবরণ।

◈ মহানবী (স.) এর অন্যান্য পত্নীদের বিবরণ এবং তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ।

◈ মহিলাদের জন্য ইসলামী শিক্ষার সুব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা। সমাজ ব্যবস্থাকে সৃষ্ট ইসলামি প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব।

◈ ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর স্থান এবং নারী জাতি সম্পর্কিত মহানবী (স.) এর এরশাদসমূহ।

◈ নারীর ন্যায্য মর্যাদা দানে ইসলামের ভূমিকা।

◈ নারী মুক্তি সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের অধিকারসমূহের পারস্পরিক পর্যালোচনা। সমাজ জীবনে পর্দাহীনতার অশুভ পরিণতির বিবরণ।

◈ মহানবী (স.) এর নির্দেশাবলীর আলোকে পারস্পরিক লেন-দেনে বিশেষ সতর্কতাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা। এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনের দরুন বর্তমান সমাজ-জীবনের শোচনীয় পরিণতি।

◈ খোদায়ী অভিশাপ এবং মহামারীর বিভিন্নরূপসমূহের বর্ণনা। মহানবীর (স.) এর এরশাদের আলোকে এর কারণসমূহের পর্যালোচনা।

◈ মহানবী (স.) এর ভবিষ্যৎ বাণীর আলোকে কিয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ। কবর আযাব ও আলমে বরযখের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

◈ মহানবী (স.) এর উক্তি "আমার উম্মতের আলেম সমাজ বনি ইসরাইলের নবীর ন্যায়।" এর আলোকে আলেম সমাজের মহান দায়িত্বাবলী। আলেম সমাজ কর্তৃক এ দায়িত্ব পালনে অলসতা প্রদর্শনের পরিণতি।

◈ হালাল উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা। ইসলামি পদ্ধতি মতে জীবনযাপন করার ক্ষেত্রে হালাল রোজগারের গুরুত্ব। অবৈধ উপার্জনের বিভিন্ন পন্থাসমূহের পর্যালোচনা যার মধ্যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বর্তমান সমাজ লিপ্ত।

◈ বিভিন্ন নেসাবের বিবরণ (ক) ভিক্ষা হারাম হওয়ার নেসাব। (খ) সদকা, ফিতরা ও কোরবানির (গ) যাকাতের নেসাব ও (ঘ) হজ্বের নেসাব।

◈ শরিয়তের বিধানসমূহের প্রচার ও প্রসারে যুগে যুগে আলেম সমাজের ভূমিকা এবং তাদের দায়িত্বসমূহ।

◈ আধুনিক বস্তুবাদের যুগে ইসলামি বিধানাবলীর প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। পাশ্চত্য জগতে বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণ।

◈ ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ।

◈ ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সাম্যবাদী ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ।

◈ ইসলাম ও খ্রিস্টবাদের পারস্পরিক তুলনামূলক পর্যালোচনা। খ্রিস্টবাদের অসারতা প্রমাণ। মুসলিম মিল্লাতের উপর বর্তমান খ্রিস্টান মিশনারী ষড়যন্ত্রের শোচনীয় প্রভাব ও এর প্রতিরোধে সরকার ও জনগণের দায়িত্ব।

◈ যুবক গোষ্ঠীকে সত্যিকার ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব। একটি সুষ্ঠু কল্যাণকর ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা।

◈ ব্যভিচার একটি জঘন্য সামাজিক ও ধর্মীয় অপরাধ। এ অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তিদানে শৈথিল্য প্রদর্শনে সমাজ জীবনে অশুভ পরিণতির প্রতিক্রিয়া। এ অপরাধ বিস্তারের কারণসমূহ এবং প্রতিরোধে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণে সামাজিক দায়িত্ব।

◈ সুদের অবৈধতা সম্পর্কিত দলিল প্রমাণাদি। সমাজ জীবনে সুদ ব্যবস্থার কুফলসমূহ। সুদী কারবার ও লেনদেন থেকে বাঁচার উপায়।

◈ হাদিস ও সুন্নাত কি? শরিয়তের বিধানসমূহে মহানবী (স.) এর হাদিস ও সুন্নতসমূহের গুরুত্ব ও এর স্থান।

◈ ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এবং ইত্তেফাক ও ইত্তেহাদের গুরুত্ব। মহানবী (স.) এর এরশাদসমূহের দৃষ্টিতে এর বিশ্লেষণ। মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার বর্তমান দ্বন্দ্ব ও দলাদলি সৃষ্টির অশুভ পরিণতি।

◈ মহানবী (স.) এর শিক্ষাসমূহের আলোকে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা।

◈ সমাজ জীবনে মহানবী (স.) এর মহান আদর্শ। মহানবী (স.) এর বাণীর আলোকে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য।

◈ আল কুরআনের বানী "বল তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।" এ আয়াতের আলোকে মহানবী (স.) এর আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব।

◈ মহানবী (স.) এর মহান পয়গাম।

◈ হুজুর (স.) এর পারিবারিক জীবনের আদর্শ। তাঁর সান্নিধ্যের বদৌলতে পরিবারবর্গের উচ্চ মর্যাদালাভ।

◈ ইসলামের দৃষ্টিতে আমানতের দায়িত্ব ও খেয়ানতের অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে নামাজের বৈশিষ্ট্য।

◈ মানব সৃষ্টির রহস্য ও এর উদ্দেশ্যাবলীর ব্যাখ্যা।

◈ দুরাশা, লোভ, লালসা, ক্রোধ এবং জুলুম-অত্যাচারের অপকারিতা বর্ণনা

◈ সুরায়ে "আদ্দোহা'র তাফসির এর 'দোয়াল্লান' শব্দের পূর্ণ ব্যাখ্যা।

◈ আঁ হযরত (স.) যেমন রূহানি চিকিৎসক ছিলেন তেমনি শারীরিক চিকিৎসকও ছিলেন তাঁর বিভিন্ন চিকিৎসাবলীর আলোচনা।

◈ মক্কা শরিফকে ইসলামের কেন্দ্রিয় মর্যাদা দানের হেকমত ও গুরুত্ব।

◈ মিলাদ শরিফ বা মিলাদুন্নবী (স.) এর গুরুত্ব এবং তা বৈধ হওয়ার পক্ষে যুক্তি ও প্রমাণাদি।

◈ প্রত্যেক দায়িত্ব এর যোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করাই ফরজ এবং অযোগ্য ব্যক্তির উপর অর্পনের ভয়াবহ কুফল বর্ণনা।

◈ বেদয়াত শব্দের অর্থ ও এর বিভিন্ন প্রকারের পর্যালোচনা। বর্তমানে প্রচলিত বেদায়াতসমূহ ও তার সম্পর্কে ইসলামি বিধানের বর্ণনা।

◈ প্রকৃত আলেম কারা? তাঁদের দায়িত্ব কি? আলেম-বিদ্বেষীদের ভয়াবহ পরিণতির পর্যালোচনা।

◈ ইসলাম ধর্ম ও ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে অমুসলিম চিন্তাবিদগণের মন্তব্য) প্রাচ্যবিদদের ভ্রান্ত প্রচারণাসমূহের পর্যালোচনা, খ) অমুসলিম চিন্তাবিদদের ভাষায় ইসলামের মাহাত্ম্যের প্রকৃতি।

◈ ইন্নাল্লাহা ওয়ামলায়িকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান্নবী এ আয়াতে কুরআনের আলোকে দরূদ ও সালামের ফজিলত বর্ণনা।

◈ কিয়ামতের পূর্বাভাস সম্পর্কে নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণী।

◈ সৃষ্টির মহান সেবক মুহাম্মদ (স.)।

◈ আল কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রমাণ।

◈ মুমিন ও মুনাফিকের পরিচিতি। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুনাফিকের ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। দুনিয়া ও আখেরাতে মুনাফিকের শোচনীয় পরিণতি।

◈ হেরমে মক্কার ফজিলত ও বিশিষ্ট জায়গাসমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনা।

◈ পরমুখাপেক্ষী একটি জাতীয় অভিশাপ। আত্মনির্ভরশীলতা হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শ।

◈ খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, চলাফেরা, নিদ্রা-জাগা, কথা-বার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার অর্থাৎ জীবনের সর্বস্তরে নবীজীর সুন্নতের একটি সুন্দরতম শিক্ষণীয় চিত্রাঙ্গন।

◈ কুরআনে আছে-'যা মানুষ বুঝেনা তা ইহা জ্ঞানের মহান ভাণ্ডার'। এ উক্তির আলোকে বিজ্ঞান ও ইসলাম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা।

◈ মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ন্যায্য দাবি সমূহের বর্ণনা। এ সম্পর্কে মহানবীর নির্দেশাবলীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা।

◈ মুনষের ধর্মীয় বিপর্যয়ের দিনে নবীজীর একটি সুন্নতের অনুসরণ তাঁর মহব্বতলাভের একমাত্র উপায়।

◈ মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদা। 'লা তুশাদ্দুর রেহাল ইল্লা ইলা ছালাছাতে মাসাজেদা' এ হাদিসের আলোকে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসার ঐতিহাসিক বর্ণনা।

◈ ইসলামি আইনসমূহ একমাত্র বিশ্বকে অপরাধমুক্ত করতে সক্ষম। কুরআন ও হাদিসে উল্লিখিত বিভিন্ন আইনের যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা।

◈ সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার অসন্তুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উম্মতগণের উপর আযাবের ধরণ বিশ্লেষণ। কুরআন ও হাদিসের আলোকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভ ও বিপদ মুক্তির উপায় নির্ধারণ।

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

◈ আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও সাধারণ মানুষের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে হযরত (স.) এর জীবনাদর্শ।

◈ সভ্যতার সার্বিক রূপ নির্ধারণে কুরআনের অবদান। বর্তমান কুরআন বিবর্জিত সমাজের বীভৎস রূপের বর্ণনা।

◈ সভ্যতার সার্বিক রূপ পার্থক্য বর্ণনা। সমগ্র বিশ্বের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনে কোনটির গুরুত্ব কত?

◈ পরোপকার নবী চরিত্রের একটি সুন্দরতম নিদর্শন। সৃষ্টি জগতের কল্যাণ সাধনে মহানবীর জীবনাদর্শের বর্ণনা।

◈ নারী ও গোলামদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবীর অবদান।

◈ 'রিজালুল লা তুলহিহিম তিজারাতুন ওয়ালা বাইয়ুন আন যিকরিল্লাহ' আয়াতের আলোকে একজন মুমিন বান্দাহর জীবন গঠন প্রণালীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদান।

◈ ইসলামি সংস্কৃতি ও বিজাতীয় সংস্কৃতির তুলনামূলক পর্যালোচনা।

◈ সীরতুন্নবী, মসজিদে বায়তুল্লাহ ও হযরত শাহ সাহেব কেবলা।

◈ ফিতনার যুগ সম্পর্কে নবীজীর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। তৎকালে মুমিনদের করণীয় কি? হাদিসের আলোকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা।

◈ "ন্যায়পরায়ন শাসক আল্লাহর ছায়া" এর আলোকে খোলাফায়ে রাশেদিনের স্বর্ণযুগের উপর বিশেষ আলোকপাত এবং অযোগ্য ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পনে ভায়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা।

◈ বিশ্বের দুর্নীতি দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র সহায়ক ইসলামি অনুশাসন।

◈ অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্যকথা বলাই উত্তম জিহাদ। রসূল (স.) এর এ উক্তির আলোকে ইসলামি জিহাদের উপর আলোকপাত।

◈ বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান।

◈ 'ওয়া মিনান্নাসে মাইঁ ইয়াশতারি লাহওয়াল হাদিস....' এ আয়াতের আলোকে রেডিও, টেলিভিশন, ভি.সি.আর আর ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামের বিধান। সমাজ জীবনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপর বিশদ আলোচনা।

◈ মুসলমান ও অন্যান্য আহলে কিতাবদের মধ্যে আক্বিদা বিশ্বাসের মৌলিক পার্থক্য।

◈ 'ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর' কুরআনের এ বাণীর তাৎপর্য বর্ণনা।

◈ সুরায়ে হুজরাতের সামাজিক শিক্ষা।

◈ ইসলামিক আইন আদালত।

◈ হাকিকতে রসূলে আরবি (স.) ও পারলৌকিক জীবনের বর্ণনা।

- হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ছুলতী
- 'ধনীদের ধন সম্পদে গরিবদের অধিকার রয়েছে' আল কুরআনের এ বাণীর আলোকে যাকাত ও দান-খয়রাতের আলোচনা।
- কুরআন ও হাদিসের আলোকে পারলৌকিক জীবনের উপর বিস্তারিত বর্ণনা।
- ইসলামি তাহজিব-তমাদ্দুন প্রচারে প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিকদের অবদান
- মাহে মহররমের মর্যাদা ও ফজিলত বর্ণনা। কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইন (র.) এর শাহাদাত বরণের ইতিহাস।
- ইসলামের সৌন্দর্যতা বর্ণনা
- তাযকিয়ায়ে নফসের গুরুত্ব ও এর পদ্ধতিসমূহ
- বিসমিল্লাহ শরিফের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা
- আল্লাহতা'আলার নিকট হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সর্বোচ্চ মর্যাদা
- কুরবানির ইতিহাস ও তাৎপর্য বর্ণনা
- কুরআন ও হাদিসের আলোকে মাতা-পিতার গুরুত্ব বিশ্লেষণ। মাতাপিতা ও সন্তানদের পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ।
- বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে আল কোরআনের অবদান।
- মসজিদে নববীর আদর্শই সব মসজিদের আদর্শ।
- হেরেমে মদিনা শহরের ফজিলত।
- ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে দারুল আরকম'র ভূমিকা।
- হযরত ওমর ও আবু যর গিফারী (র.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা।
- হজ্ব মৌসুমে হযরত মহানবী (স.) এর দাওয়াতি অভিযান ও আকাব শপথসমূহের আলোচনা। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে হযরত নবী করীম (স.) এর দাওয়াতি চিঠি প্রেরণের বিবরণ।
- ঈমান ও নিফাকের পরিচয়। কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা।
- যুক্তির আলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ। খ্রিস্টানদের ত্রি-ত্ববাদ, হিন্দুদের ঈশ্বরবাদ ও নাস্তিকতার অসারতা প্রমাণ।
- মিসওয়াকের গুরুত্ব ও ফজিলত, নবীদের অনুসৃত ১০টি সুন্নতে কাদিমা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা।
- রোজা ও এ'তেকাফের গুরুত্ব ও ফাজায়েল। সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় মসায়েল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা।
- হেরেমে নববীর ফজিলত ও মদিনা শরিফ জিয়ারতের গুরুত্ব এবং বিশুদ্ধ নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা।

- ◈ হজ্ব ও ওমরাহ'র ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং তা পালনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা।
- ◈ ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা আলোচনা, বর্গা, বন্ধক ও লাগিয়ত প্রভৃতি সম্পর্কে শরিয়তের নির্দেশনা।
- ◈ তালাকের তাৎপর্য বর্ণনা এবং এর প্রকারভেদ ও বিশুদ্ধ উপায়ে তালাক প্রদানের পদ্ধতি আলোচনা। অহেতুক তালাকদানের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ।
- ◈ আদর্শ নারী হিসেবে হযরত আয়েশা, খদিজা ও ফাতেমা (র.) এর করামতসমূহের বর্ণনা।
- ◈ মুজিযা ও করামতের পরিচয়, হযরত মহানবী (স.) এর মুজিযাসমূহের বর্ণনা।
- ◈ মূতার যুদ্ধের বিবরণ, এ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের বর্ণনা।
- ◈ মুমিনের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যসমুহ।
- ◈ ইসলামি আইনের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে মানব জাতির কল্যাণ সাধনে এর অনন্য ভূমিকা।
- ◈ মানুষের শেষ নিবাস জান্নাত বা জাহান্নাম এর বিস্তারিত বিবরণ।
- ◈ মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কবর আযাবের বিস্তারিত বিবরণ।
- ◈ জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ' এ হাদিসের আলোকে মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
- ◈ মুনাফিক ও মুরতাদের পরিচয়। এর লক্ষণসমূহ এবং তাদের পরিণতির বিবরণ।
- ◈ "নিশ্চয় মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই" এই আয়াতের আলোকে মুসলমানদের করণীয় ও ভূমিকা।
- ◈ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও মুসলিম অস্তিত্ব।
- ◈ ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা। শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়। হযরত মহানবী (স.) এর অনুপম আদর্শ।
- ◈ ইসলামের আক্বিদাসমূহের বিবরণ ও ভ্রান্ত আক্বিদার স্বরূপ উন্মোচন।
- ◈ 'যে ব্যক্তি নামাজ প্রতিষ্ঠা করল সে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করল" হাদিসের আলোকে ইক্বামতে দ্বীনের স্বরূপ উদঘাটন।
- ◈ আল-কুরআনই হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী মু'জেযা।

◈ "হাসিবু কবলা আনতুহাসাবু" এ হাদিসের আলোকে আত্মসমালোচনার শিক্ষা এবং আত্মগঠনের ভূমিকা।
◈ তরিক্বত কি ও কেন? ইহা যে শরিয়তের পরিপূরক আইম্মায়ে মুজতাহেদিনগণের উক্তির দ্বারা প্রমাণ।
◈ "ইন্না সালাতি ওয়ানুসুকি ওয়া মাহয়ায়া ওয়ামামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।" এ আয়াতের আলোকে ইসলামি বাইয়াতের হাকিকত আলোচনা।
◈ "আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম।" উক্ত আয়াতের বিশদ আলোচনা
◈ "আলমারউ মা'মান আহাব্বা।" মহানবী (স.) এর এ হাদিসের আলোকে মুসলমানদের প্রভাব।
◈ ইসলামের প্রতি দাওয়াতদানের ফজিলত। দাওয়াতদানকারীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী।
◈ ছগিরাহ ও কবিরাহ গুনাহর পরিচয়, কবিরা গুনাহসমূহ এবং এর বিস্তারিত আলোচনা।
◈ হযরত নবী করিম (স.) এর কীর্তিমান পূর্বপুরুষদের কথা।
◈ আধুনিক বিশ্বে আল কুরআনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।
◈ "ওয়াহাদাইনাহুন্নাজদাইন" কালামে হাকিমের এ আয়াতের আলোকে হক ও বাতিলের তুলনামূলক আলোচনা।
◈ কুরআন ও হাদিসের আলোকে আ' মালে সোয়ালেহা তথা সৎকাজের বিশদ বর্ণনা।
◈ কুরআনে করিমের হক আদায়ে সাহাবায়ে কেরামগণের ভূমিকা।
◈ ইসলামে পানাহারের নিয়মাবলী বর্ণনা।
◈ বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞানের উপর তুলনামূলক আলোচনা।
◈ আসহাবে রসুলুল্লাহ (স.) এর জীবন এবং আমাদের জীবন।
◈ বেলায়াত কত প্রকার । বিস্তারিত আলোচনা।
◈ হযরত মহানবী (স.) এর শিক্ষার মূল উৎস এবং ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা।
◈ সালাতুল জুমার গুরুত্ব। জুমা ও ঈদাইনের জরুরী মসায়েল বর্ণনা।
◈ সালাতুত তাহাজ্জুদসহ বিভিন্ন নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা।
◈ পর ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের স্বার্থ এবং সম্ভ্রম রক্ষা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা।

◈ দ্বীন প্রচারে অনুমোদিত পন্থা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা।
◈ দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপরিহার্যতা, এ বিষয়ের উপর সারগর্ভ আলোচনা।
◈ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইসলামের অন্তরায় নয় বরং সহায়ক।
◈ খেলাফত ও রাজতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা।
◈ আল্লাহতা'লার আধিপত্য, স্রষ্টার প্রকৃত পরিচিতি সৃষ্টির মাঝেই নিহিত রয়েছে।
◈ অমুসলিমদের প্রতি নবী করিম (স.) এর ইনসাফপূর্ণ আচরণ, উসামাসহ অনেকেরই বশ্যতা স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণ-নবী করিম (স.) এর সুন্দর আচরণের ফসল।
◈ আসহাবে সুফফা এর পরিচিতি। হাদিসে রাসূল (স.) এর সংরক্ষণে তাঁদের ভূমিকা।
◈ কুরআন ও হাদিসের পরিচিতি। সামাজিক কল্যাণে উভয়ের অপরিহার্যতা
◈ ইসলামে সমাজনীতি, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক নীতির বিবরণ।
◈ যুগে যুগে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আইম্মায়ে কেরামের ভূমিকা।
◈ সদকায়ে জারিয়ার পরিচিতি, প্রকারভেদ ও ভিক্ষাবৃত্তির কুফল বর্ণনা।
◈ আল কুরআন একটি বিস্ময়: একটি চিরন্তন মু'জিযা।
◈ যাকাত ও ওশর প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।
◈ 'আবগজুল মোবাহাতে ইলাল্লাহি আত-তালাকু' এ হাদিসের আলোকে অহেতুক তালাক প্রদানের পরিণতি ও তালাক সংক্রান্ত জরুরি মসায়েল বর্ণনা।
◈ 'আল-ঈমানু বায়নাল খওফে ওয়াররযা' এ হাদিসের বিশদ ব্যাখ্যা।
◈ প্রকৃত আওলিয়ায়ে কেরামের পরিচয়, বানিয়ে সীরাত হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর করামতপূর্ণ জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা।
◈ কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্ত্রাস জঘন্য অপরাধ।

Chhuriati.com Pioneer in village based website

পবিত্র মে'রাজুন্নবী (স.) ও অন্যান্য মাহফিল উদযাপন

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ হতে আশেকে রাসূল (স.) ফানা ফির রাসূল (স.) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রতি ২৬ রজব দিনগতরাত সাইয়্যেদুল কাউনাইন শফিউল মুজনেবিন রহমতুল্লিল্ আলামিন (স.) এর পবিত্র মে'রাজ রজনী অতীব সম্মানের সাথে পালন করতেন। তিনি বলতেন: মে'রাজের হরফ পাঁচটি, মীম+আইন+রা+আলিফ+জিম যা একত্র করলে মে'রাজ শব্দগঠিত হয়। মে'রাজের নামেই মে'রাজের প্রমাণ, যথা: মীম অর্থ মুহাম্মদ (স.) আইন অর্থ আরশ-মুয়াল্লা, রা-অর্থ রাত্রিতে, আলিফ অর্থ আল্লাহর নিকট, জিম অর্থ জাগ্রত অবস্থায় মে'রাজ।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মে'রাজের রাত্রিতে খ্যাতনামা ওয়ায়েজিনে কেরামগণকে দাওয়াত করে সারারাতব্যাপী ওয়াজের ব্যবস্থা করতেন। রাসূল (স.) এর যিয়াফতরূপে ৪/৫টি বড় বড় গরু জবেহ করে সর্বসাধরণের খাবারের ব্যবস্থা থাকত। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সারারাত নিজে বসে বসে অভিজ্ঞ ও উন্নত আমলের অধিকারী ওলামায়ে কেরামগণের গুরুত্বপূর্ণ তকরির শ্রবণ করতেন। প্রতি বৎসর এ মাহফিলে দারুল উলুম চট্টগ্রামের প্রধান মুহাদ্দিস মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) তশরিফ আনলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ওনাকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে বসাতেন যা স্বীয় ওস্তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওনার তিরোধানের পর তাঁর নিষ্ঠাবান ভক্তবৃন্দ সে মে'রাজুন্নবী (স.) এখনো জারি রেখেছেন। জ্ঞান-গুণী ওলামায়ে কেরামগণের ওয়াজ নসিহত এবং যিয়াফত প্রথা এখনো পর্যন্ত বহাল আছে। প্রথমদিকে পবিত্র মে'রাজুন্নবী (স.) মাহফিল চুনতী মাদরাসা ময়দানে উদযাপিত হতো। পরে সীরত ময়দানে সুন্দর ব্যবস্থাপনা পড়ে উঠায় বর্তমানে তথায় অনুষ্ঠিত হয়।

শবেবরাত:

সীরত ময়দানে প্রতি বৎসর শাবানের ১৫ তারিখ রজনীতে পবিত্র লায়লাতুল বরাতের তাৎপর্য ও ফজিলতের উপর স্বনামধন্য ওলামায়ে কেরামগণকে দাওয়াত দিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ওয়াজের ব্যবস্থা করতেন। সাথে সাথে তবরুকও বিতরণ করা হত। বর্তমানে এ মাহফিলও জারি রয়েছে।

শবেকদর :

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রতি বৎসর রমজানের ২৭ তারিখ পবিত্র লায়লাতুল কদর তথা মহিমান্বিত ভাগ্য রজনীর ফজিলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে মাহফিলের আয়োজন করতেন। বর্তমানেও তা জারি আছে সীরত ময়দানে।

আশুরা দিবস :

মুহাররম মাসের ১০ তারিখ শোহাদায়ে কারবালার স্মরণে প্রতি বৎসর সীরত ময়দানে মাহফিল উদযাপন করা হয়ে থাকে যা আজও জারি আছে।

ফাতেহায়ে এয়াজদাহম :

প্রতি বৎসর রবিউস্‌সানি মাসের ১১ তারিখ বড়পীর সাহেব হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর ওফাতবার্ষিকী উপলক্ষে সীরত ময়দানে ইছালে সাওয়াব মাহফিলের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ইছালে সওয়াব মাহফিল:

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর ১৪৪০ হিজরির ২৩ সফর সে বৎসরের মাহফিলে সীরতুন্নবী এর ১৯ দিন আগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ইন্তেকাল করেন বিধায় প্রতি বৎসর সফর মাসের ২৩ তারিখ মাহফিলে ইছালে সওয়াব ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মোবারক জীবনীর উপর আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। উক্ত দিবসে খতমে কুরআন মজিদ, খতমে বোখারী শরিফ ও খতমে তাহলিল ইত্যাদির পাশাপাশি গরু জবাই করে যিয়াফতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার উদ্যোগে প্রতি বছর মাদরাসার প্রতি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অবদানের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ শিক্ষক-ছাত্র সকলে মিলে খতমে বোখারী শরিফের ব্যবস্থা করে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর রূহের মাগফিরাত ও রফে দরজাত কামনা করা হয়।

সীরাত ময়দান ক্রয় ও ভরাট

গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে চুনতী গ্রামের শাহ মঞ্জিল সম্মুখস্থ চত্বরে পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর শুভ সূচনা হয়। তার পরবর্তী বছর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে শাহ মঞ্জিলের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় ২/৩ একর ধানী জমিতে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) উদযাপন শুরু হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মাহফিলে লোক সমাগম ধারণাতীত বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে এসে এ সমাগম এত বৃদ্ধি পায় যে, দূর-দুরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে আগত আশেক, নবী-প্রেমিকগণ মাহফিল স্থলের সন্নিকটে সমবেত হতে না পেরে দূরবর্তীতে অবস্থান করতেন, যেহেতু শাহ মঞ্জিলের দক্ষিণ পার্শ্বের এ জমির সংলগ্ন পূর্বপার্শ্বে সমতল ভূমিতে জনবসতি পশ্চিম সংলগ্ন পাহাড়, পাহাড়ের উপর মরহুম মলিহ খান এর ভ্রাতাগণের বাড়ি, দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তা, রাস্তার পরপর জনবসতি।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) পাশাপাশি তাঁর নিকটাত্মীয় ও ভক্তগণ সীরতুন্নবীর মাঠ সম্প্রসারণ ও মাঠের স্থায়িত্ব নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। যেহেতু এ ২/৩ একর তথা ৫/৭ কানি জমি জনসমাগম অনুপাতে খুবই অপ্রতুল।

এমনি অবস্থায় মাহফিলে সীরত চালাকালীন একদিন এশার নামাযের পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, এদিকে (পশ্চিম দিকে) সীরতের মাঠ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে এস্তেফাজুর রহমান খানের পুত্র মলিহ উদ্দিন খান, রফি উদ্দিন খান, সালাহ উদ্দিন খান এর সাথে যোগাযোগ হয় তাদেরকে উপযুক্ত বিনিময়ের মাধ্যমে স্থায়ী সীরত ময়দান করার উদ্দেশ্যে তাদের বৃহদাকারের পাহাড়টি ক্রয় করে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এ পাড়া সংলগ্ন মরহুম মুহাম্মদ আয়ুব খান এর ১ একর ৬০ শতক জমিও খরিদ করে নেয়ার আলোচনা হয়।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত দানবীর, ছালেহ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, হুলাইন ছালেহ নুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম ছালেহ আহমদ চৌধুরী অর্থ যোগান দিতে এগিয়ে আসেন। তিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম একজন। প্রথমে তিনি সে আমলের এক লক্ষ টাকা দেয়ার ঘোষণা দেন এবং চুনতী থেকে হাফেজ

হারুন সাহেবকে সাথে করে চট্টগ্রাম শহরস্থ তাঁর বাসভবনে নিয়ে আসেন সীরত ময়দান খরিদের টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য।

মরহুম ছালেহ আহমদ চৌধুরী উক্ত দিবাগত রাত্রে তাঁর পুণ্যবতী সহধর্মিণী মোছাম্মৎ জরিনা বেগমের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করেন। আলাপে তাঁর স্ত্রী এ রকম একটি মহৎ কাজে অন্যকে শরিক না করে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ টাকা এককভাবে দেয়ার জন্য পরামর্শ দেন। বিষয়টি তিনি তাঁর বড় জামাতা মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীকে অবহিত করেন। অতঃপর ছালেহ আহমদ চৌধুরী যথাযথ চাহিদা মুতাবেক সীরত ময়দান খরিদের সম্পূর্ণ টাকা এককভাবে প্রদান করেন।

ঐ এলাকায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কিছু মৌরসি সম্পত্তিও ছিল যা তাঁর পৈত্রিক অংশীদারগণ সানন্দচিত্তে দান করে দেন এবং এলাকার কিছু উদারপ্রাণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও কিছু কিছু জমি দান করেন।

অতঃপর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে চট্টগ্রাম শহর থেকে বুলডোজার নিয়ে পাহাড় কেটে সমতল করা হয়।

নবী-প্রেমিক বুলডোজার চালক আবদুর রশীদ রাত-দিন পরিশ্রম করে পাহাড় কেটে সমতল করে।

ফলে ক্রয় ও দান উভয় প্রকারের-জমি নিলে বর্তমান সীরত ময়দানের আয়তন হচ্ছে প্রায় ১২ একর ৮০ শতক। অর্থাৎ ৩২ কানি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি এ বিশাল সীরত ময়দানে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) ও অন্যান্য মাহফিল উদযাপিত হয়ে আসছে। সীরত ময়দানের পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদ-এ-বায়তুল্লাহ তার দক্ষিণ পার্শ্বে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মাযার অবস্থিত। এ সীরত ময়দানের উত্তর পার্শ্বে সীরত মাহফিল ব্যবস্থাপনার দালান ও মেহমানদারীর অবকাঠামো অবস্থিত।

১২ একর ৮০ শতক ও সীরত ময়দানের বৃহদাংশ খরিদ, কিয়দংশ দান পাওয়া মালিকগণের সাথে যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করা এবং পাহাড় কেটে সমতল করে ময়দানের উপযোগ্য করাকে এক বৃহত্তর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বলা যেতে পারে।

এ বিশাল ময়দান বাস্তব রূপ লাভ করা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অন্যতম করামত। সাথে সাথে তাঁরই নিকটাত্মীয় ও তাঁরই অন্যতম ঘনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ ভক্তগণ যে যেভাবে সম্ভব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মসজিদে বায়তুল্লাহ নির্মাণ

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল আরম্ভ হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রতি বছর দিনের সংখ্যা বাড়তে থাকলে একটি সীরত ময়দান ও একটি বড় মসজিদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সীরত ময়দানের ব্যবস্থা হওয়ার পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলতে লাগলেন (ইন্তেকালের কয়েক বৎসর পূর্বে) বড় করে মসজিদ নির্মাণ করব যেন এক কাতারে এক হাজার মুসল্লি নামায পড়তে পারে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে একদিন মসজিদের নামকরণ ও স্থাপনের জন্য একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেন যাতে দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, দানবীর, দ্বীনদরদী, সরকারি-বেসরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীসহ অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সভাপতিত্বে সাতকানিয়া থানার বারদোনার ফখরুল মোহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমীনুল্লাহ (রহ.) কে প্রধান অতিথি এবং হযরত মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা (রহ.) কে প্রধান বক্তা করে মাহফিল আরম্ভ করা হয় যাতে নগদ ৮লক্ষ টাকার মত অনুদানের ওয়াদা দেয়া হয়। মসজিদের ডিজাইনের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন মসজিদের মানচিত্র দেখানো হয়। বিশেষতঃ মালয়েশিয়ার অনেক মসজিদের মানচিত্র সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কোনটা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পছন্দ হলো না। অবশেষে আলহাজ্ব গোলাম কবির কন্ট্রাক্টরের ম্যাপ অনুযায়ী মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হলো। ওলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদ ও দানবীরগণের উপস্থিতিতে অনেক মতামত নামকরণের ব্যাপারে আসলেও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নাম রাখেন মসজিদে বায়তুল্লাহ সীরত ময়দান জামে মসজিদ।

চারিদিকে জুমা মসজিদ থাকায় উক্ত মসজিদে জুমা জায়েয হবে কিনা মতভেদ দেখা দিলে হযরত মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহিম (রহ.) অবশেষে জায়েয হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দেন।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাঁশের খুঁটি, ছনের ছাউনী, তলের বেড়া দিয়ে প্রথমে উদ্বোধন করা হয়। ইত্যবসরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলতে লাগলেন পাথর দিয়ে মসজিদ করব। এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে আবেদন জানালে তিনি সম্পূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করে দেয়ার আশ্বাস দেন। তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তিনি কিছুদিনের মধ্যে শাহাদত বরণ করায় ওনার প্রদত্ত ওয়াদার অংশ হিসেবে দুই লক্ষ টাকা কর্ণেল অলি আহমদ সাহেবের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

অতঃপর সন্দ্বীপ নিবাসী আলহাজ্ব এ.বি.এম আশরাফ উল্লাহ কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকরিয়ার ডুলাহাজারাতে তাঁর নামে ডাককৃত একটি গাছের লট মসজিদের জন্য দান করেন। কিন্তু ঐ লট কাটতে গেলে স্থানীয় মফজল চেয়াম্যান ও আরো কিছু লোকজন মিলে হাফেজ হারুন সাহেবকে এক নম্বর আসামী করে কক্সবাজার কোর্টে মামলা দায়ের করে। একমাস পর মামলাও মসজিদের পক্ষে চলে আসে। ইত্যবসরে উক্ত লট থেকে কিছু গাছ চুরি হয়ে গেলে দারোয়ান মুস্তাফিজ এসে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে জানালে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন আর চুরি হবে না। দেখা গেল সে রাত হতে ৩/৪টি হাতি গাছ পাহারা দিতে থাকে।

মামলা পেয়ে যাবার পর গাছগুলো কেটে বিক্রয় করে নেট তিন লক্ষ টাকা পাওয়া যায়। আর অবশিষ্ট ব্যয়ভার বহন করেন হালিশহর নিবাসী মরহুম আলহাজ্ব ইউসুফ সাহেব এবং মসজিদ নির্মাণের যাবতীয় কাজের দায়িত্ব পালন করেন নোয়াখালী নিবাসী আলহাজ্ব গোলাম কবির কন্ট্রাক্টর। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মনের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী মসজিদের জন্য সিলেট পাথর আনার কথা। কিন্তু পরবর্তীতে রাঙ্গামাটি এলাকার পাথর দিয়ে মসজিদে বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়। জনাব হাফেজ হারুন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অনুমতি নিয়ে চট্টগ্রামের এ.ডি.সি. মরহুম মালেক সাহেবের সহযোগিতায় রাঙ্গামাটির ডি.সি. জনাব আলী হায়দারের কাছে গিয়ে দুই লক্ষ সি এফ টি পাথর বিনা ট্যাক্সে সংগ্রহ করেন। প্রায় ৫৬ হাজার টাকার ট্যাক্স মওকুফ করে দেয়। পরে এ.ডি.সি. রেভিনিউ প্রয়োজনে আরো পাথর দেয়ার আশ্বাস দেন।

১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) আরম্ভ হওয়ার ২ মাস পূর্বে মহররম মাসের ১০ তারিখ দানবীর ছালেহ আহমদ চৌধুরীর আবদারের মুখে সীরত ময়দানের পশ্চিম পার্শ্বে বায়তুল্লাহর পাকা দালানের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.)। মসজিদের ফাউন্ডেশনের সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কন্নি দিয়ে সাতবার মসল্লা দিতে গিয়ে বারংবার উচ্চারণ করলেন 'ছাবআ সামাওয়াত' (সাত আসমান) বলে তিনি সাততলা মসজিদের আশা ব্যক্ত করেছিলেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবদ্দশায় কয়েকটি পিলারের কাজ সম্পন্ন হয়। ওনার ইন্তেকালের পর পুরো একতলা মসজিদ নির্মিত হয়। পরে ২য় তলারও কিছু পিলার এর কাজ হয়।

মসজিদের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ১৭২ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১১৩ফুট।

গাড়ি দুর্ঘটনা

মহান আল্লাহপাক যুগে যুগে তাঁর অতিপ্রিয় নবী-রাসূল (স.)গণকে নানাভাবে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। লক্ষাধিক নবী-রাসুল (স.) গণের মধ্যে কয়েকজন বাদে বাকি সকলেই কোন না কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।

গত সোয়া চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে অনেক গাউস কুতুব আওলিয়া আবদাল আল্লাহপাকের নানান পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহপাকের পরীক্ষাস্বরূপ নবী-রাসূল (স.) গণের অনুকরণে নানান দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে আওলিয়া আবদাল গাউস কুতুবগণকে।

তেমনিভাবে এ মহান ওলি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবনে পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে নানান দুঃখ কষ্টের পরেও সড়কপথে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হন। তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট সোমবার রজমান মাসে আরাকান মহাসড়কে মারাত্মকভাবে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন।

তিনি চট্টগ্রাম মহানগরীর হেমসেন লেইনস্থ ইউসুফ মিয়ার বাড়ি থেকে তাঁরই কার গাড়িযোগে সন্ধ্যায় চুনতি যাচ্ছিলেন। ইউসুফ মিয়ার ড্রাইভার খোরশেদ গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। সামনের সিটে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বসা। চোখে চশমা ছিল। গাড়িতে ঐ সময় কোন খাদেম বা ভক্ত ছিলনা। পথিমধ্যে ইফতার করে চুনতী যাওয়াকালীন সময়ে পটিয়া অতিক্রম করে ২/৩ কিলোমিটার যাওয়ার পর ভাইয়ার দীঘির উত্তর পার্শ্বে হঠাৎ গাড়ি জাম্প করে রাস্তা থেকে ছিটকে অনতিদূরে পতিত হয়।

তখন স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে। অন্ধকারের মধ্যেও চুনতী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) দুর্ঘটনায় আক্রান্ত দেখতে পেয়ে সাথে সাথে ১৫/১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে দোহাজারি উপজেলা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের ব্যবধানে লোহাগাড়া নিবাসী আহমদ কবির চৌধুরী (টিম্বার ব্যবসায়ী) চট্টগ্রাম শহর থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা স্থানে রাস্তার উপর জনসমাগম দেখে কৌতুহলী হয়ে জানতে চায়। ঐ মুহুর্তে স্থানীয় জনগণ থেকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) স্বয়ং দুর্ঘটনায় পতিত জানতে পেরে গাড়ি থেকে নেমে যান। তিনি দেখতে পান রাস্তা থেকে কিছুটা দূরত্বে গাড়ির সামনের দিক মাটিতে ঢুকে আছে। কবির সাহেব তথায় কালবিলম্ব না করে দোহাজারি হাসপাতালে চলে যান। এ সংবাদ দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায় তখন হাসপাতাল অঙ্গন স্থানীয় লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। কবির সাহেব হাসপাতালের ভিতর হযরত শাহ সাহেব

(রহ.) এর নিকটে গিয়ে তার চক্ষুদ্বয়ে ব্যান্ডেজ করা দেখতে পান। তখনো রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না।
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চোখে ব্যান্ডেজ থাকার পরও কবির সাহেবের উপস্থিতি উপলবদ্ধি করতে পারেন। ফলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কবির সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন তাঁকে যেন চুনতি নিয়ে যাওয়া হয় এবং এও বললেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. শরীফ সাহেবকে এ দুর্ঘটনার সংবাদ যাতে জানানো হয়। ঐ মুহূর্তে উপস্থিত কর্মরত ডাক্তার কবির সাহেবকে বললেন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে যেতে উন্নত চিকিৎসার জন্য এতে কবির সাহেব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই তিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে শহরে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন যেহেতু চুনতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল।
হাসপাতালে বর্তমান কালের মত এ্যাম্বুলেন্স দুস্প্রাপ্য বিধায় কবির সাহেব তাঁরই কার গাড়ির পিছনে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে শোয়ায়ে তাঁর কোলে মাথা মোবারক রেখে সহযাত্রী শফি মিস্ত্রিকে সামনের সিটে বসিয়ে চট্টগ্রাম শহরের দিকে রওয়ানা দিলেন। যদিওবা তিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মতের বিপরীতে উন্নত চিকিৎসার নিমিত্তে শহরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে বুঝতে দিলেন না। পথে একাধিকবার হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কতটুকু এসেছেন জানতে চাইলে তিনি নীরব থাকেন। যেহেতু কবির সাহেব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইচ্ছার বিপরীতে উন্নত চিকিৎসার কথা ভেবে শহরে নিয়ে যাচ্ছেন।
দোহাজারি থেকে কালুরঘাট ব্রিজ হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে সরাসরি চলে যান। তথাকার কর্তব্যরত ডাক্তর চিকিৎসা শুরু করলে কবির সাহেব টেলিফোনে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পরিবারবর্গ, নিকটাত্মীয় ও ভক্তগণের মধ্যে যাদের টেলিফোন নম্বর আছে তাদেরকে ফোনে সংবাদ জানিয়ে দেন। এতে অল্পক্ষণের মধ্যে নিকটাত্মীয় ও ভক্ত-অনুরক্তগণ দ্রুত মেডিকেলে ছুটে আসেন।
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১২দিন চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এরই মধ্যে প্রবাস থেকে দেশে আসা লোহাগাড়ার কলাউজানের শুক্কুর মিয়ার ছোট ভাই বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার জব্বার সাহেব চট্টগ্রাম মেডিকেলে দেখতে যান। তিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.)কে দেখে ক্ষুব্ধ হন চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা নিয়ে এবং তথাকার ডাক্তারগণকে সরাসরি কিছু না বলে নিকটাত্মীয় ভক্তগণকে পরামর্শ দিলেন আরো উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন বিধায় এখান থেকে ঢাকা নিয়ে যেতে। যেহেতু তিনি এখানকার চিকিৎসা যে যথাযথ হচ্ছেনা তা বুঝতে পারেন।
এরপর ঢাকা পিজি হাসপাতালে কর্মরত স্বনামধন্য চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার শরীফ সাহেব (শাকপুরা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম) ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে আসেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে দেখতে। তিনিও চট্টগ্রাম মেডিকেলে তাঁর চিকিৎসা

ব্যবস্থা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত তারই নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা পিজি হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন।

এতে নিকটাত্মীয় ও ভক্তগণ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে দ্রুত বিমানযোগে ঢাকা পিজি হাসপাতালে নিয়ে যান। ১২/১৩ দিন পর তথায় চক্ষুর ব্যান্ডেজ খুলে ডাক্তাররা হতবাক হয়ে যান যথাযথ চিকিৎসা না হওয়ার কারণে।

ডাক্তার শরীফ চোখের দুর্ঘটনার দ্বারাই শরীরে তথা মস্তিস্কে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তথা ইনফেকশন না হয় মত বিদেশ থেকে অতি মুল্যবান ও অত্যাবশ্যকীয় ইনজেকশন আনতে তাগাদা দেন। ঐ সময় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সুইজারল্যান্ড সফরকালীন তাঁর বিশেষ বিমানে করে দ্রুত তাঁর সাথে সুইজারল্যান্ড থেকে ইনজেকশন নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। ঐ ইনজেকশন দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ক্ষতি থেকে রাক্ষা পান।

এখানে উল্লেখ্য, মহান আল্লাহপাকের এ জিন্দা ওলি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন চট্টগ্রাম শহরে নিয়ে গেলে তাঁর ভুল চিকিৎসা হবে। তাই তিনি বারেবারে চুনতী নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

ঢাকা পিজি হাসপাতালে প্রায়- ১ মাস ছিলেন। ঢাকা ও পরবর্তীতে চট্টগ্রামের একাধিক চক্ষু চিকিৎসকগণের একটাই কথা- চট্টগ্রাম মেডিকেলে যথোপযুক্ত চিকিৎসা না হওয়ায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দুটি চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়।

উল্লেখ্য, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এতবড় মারাত্মক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়েও সম্পূর্ণ স্বজ্ঞান স্বাভাবিক সুস্থির ও দৃঢ় ছিলেন। কোন প্রকার বিচলিত, উদ্বিগ্ন, উহ্ শব্দ উচ্চারণ, হা-হুতাশ কিছুই করেননি।

ঢাকা পিজি হাসপাতালে ২য় বার অপারেশনের সময় কর্তব্যরত ডাক্তাররা ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে এনেসথেসিয়া (অজ্ঞান) করে অপারেশন শেষ হতে না হতেই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) জিজ্ঞেস করেছিলেন ডাক্তারগণের কাজ শেষ হয়েছে কিনা? এতে উপস্থিত কতর্ব্যরত ডাক্তার ও অপারেশন সংশ্লিষ্ট সকলে হতবাক হয়ে যান।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, হযরত শাহ সাহবে (রহ.) এর অসংখ্য করামতের মধ্যে অন্যতম একটি করামত হল বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি না থেকেও তিনি স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নদের অনুরূপ ছিলেন। দুর্ঘটনাজনিত কারণে এই দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্তির পর প্রায় ৩ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই সময় তাঁর উপলব্ধি, কথাবার্তা সবকিছুতেই তাঁর যে দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত তা বুঝে ওঠা কঠিন ছিল। এতে তাঁর নিকটাত্মীয়, ভক্ত-অনুরক্ত দোয়া প্রার্থীগণ তাঁর সান্নিধ্যে এসে হতবাক হয়ে যেতেন।

ইন্তেকাল

প্রত্যেক আত্মাই মরণশীল পবিত্র কুরআনের এই বাণীকে বাস্তবে রূপ দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় এ মহান আশেকে রাসূল (স.) হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)ও একদিন ভক্ত অনুরক্তদের রেখে চলে যাবেন এটাই চিরন্তন সত্য কথা। ইন্তেকালের বেশ কিছুদিন পূর্ব হতে বলতেন আমি পশ্চিম দিকে চলে যাব। এক সকালে ফজরের নামাযের পর হাফেজ হারুন সাহেব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কাছে গেলে বললেন, একটি রিক্সা আন, আমি পশ্চিম দিকে চলে যাব। রিক্সা আনার পর কিছুক্ষণ নীরব হয়ে গেলেন।

ইন্তেকালের দিন সকাল হতে তাঁর শরীর ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং শ্বাসকষ্টও বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সহধর্মিণীর ভাতিজা জসিম সাহেবকে বললেন ঠাণ্ডা প্রভাবিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সরিষার তৈল মালিশ করলে ভাল হবে। তখন জসিম সাহেব তৈল মালিশ করা আরম্ভ করলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিষেধ করলেন। যোহরের নামাযের পর তাঁর মধ্যে অশ্বস্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল, তিনি একবার শায়িত হন আরেকবার উঠেন। এভাবে আছর পর্যন্ত অতিবাহিত করলেন। আছর নামাযের পর হাফেজ হারুন সাহেব, ইলিশিয়া নিবাসী মকসুদ মিয়া, গোলাম কবির কন্ট্রাক্টর সাহেব, মোস্তাফিজ সাহেব ও জসিম সাহেব সকলে রুমে বসা অবস্থায় ছিলেন।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে দেখে জনাব হাফেজ হারুন বুকে, পিঠে ও হাতে-পায়ে তৈল মালিশ করা আরম্ভ করেন। হঠাৎ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন আজ কি বার? হাফেজ হারুন সাহেব বললেন সোমবার। তিনি বললেন আহ! সোমবার কি চলে যাচ্ছে? মাগরিবের পূর্বে হেলান দেয়ার চেয়ার সম্পর্কে আলোচনা করলে হুযুরের ভাগিনা হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) এর বাড়ি থেকে চেয়ার আনা হলো। তিনি নিজে তথায় উপস্থিত হয়ে বললেন, এই চেয়ারে আজমগড়ী (রহ.) ও বসেছিলেন। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন আজমগড়ী (রহ.)

এর উপবিষ্ট চেয়ারে আমি কি বসতে পারব? তখন হাফেজ হারুন সাহেব চেয়ারের বেড-বালিশ ঠিক করে দিলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চকি থেকে দাঁড়িয়ে লাঠিটি ওনার হাতে নিলেন এবং স্বীয় লুঙ্গিটি ভালমত পরিধান করলেন। আর বললেন চেয়ার কই? হাফেজ হারুন ধরে বসিয়ে দিলেন। তখন হাফেজ হারুন দেখলেন তাঁর চেহারা মোবারক নুরে সমুজ্জ্বল হয়ে গেল। দক্ষিণ দিকে একটু তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সুরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন।

সে সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভাতিজা জসিম সাহেব বলেন, "আমি যেহেতু ৩/৪দিন থেকে ঘুমাতে পারিনি সেজন্য পুরাতন বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুমাবার চিন্তা করে যাবার সময় একটু দেখতে গেলাম তখন আমাকে বললেন, পুতইন্না আইস্যনি, কোথাও যাবি না। এরপর ওনাকে ভাত খাওয়ার চেয়ারে বসায়ে দেয়া হয়। ইলিশিয়া থেকে আনা মাছের তরকারি তুলে দিই। অতঃপর হাত পরিস্কার করে দিই। এরপর সোজা করে শোয়ানোর ব্যবস্থা করি। তারপর বললেন- সাবধান, আমি চলে যাব... কাছে থাক। আধ ঘণ্টা পর রাত ১১ টার দিকে নিজে নিজে ওঠে যান। ক্রমান্বয়ে শ্বাস বেড়ে যায়। আস্তে করে লাইট দেয়া হয়। দেখলাম চেহারা হলুদ হয়ে যায়। ঘাম বের হয়ে টপটপ ঝরছে। তাড়াতাড়ি বের হয়ে বড় আম্মা, কবির সাহেব, মোস্তাফিজ সাহেব, মকসুদ মিয়া সকলকে ডাকলাম, সকলে উপস্থিত হলেন। শেষে বললেন, 'ও'ডা আঁইতো আর ন পারির'... অতঃপর কাত হয়ে পড়ে গেলেন। বড় আম্মা ঘাম মুছে নেন। পার্শ্বে থাকা জমজমের পানি থেকে দেয়া হলে সামান্য পান করেন। এরপর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর মোতাবেক ১৪০৪ হিজরির ২৩ সফর ১৩৯০ বাংলার ১২ অগ্রহায়ণ সোমবার রাত ১২টা ১৫ মিনিটে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলে লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ ও আত্মীয়স্বজনদের রেখে বেলায়াতের এ মহান সম্রাট ফানাফির রাসূল (স.) হাসিমুখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)

জানাযা ও দাফন

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের রাতের পরদিন ২৪ সফর ১৪০৪ হিজরি ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা রোজ মঙ্গলবার সকাল বেলা পুরো দেশে হরতাল ছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের খবর প্রচারিত হলে সারাদেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। লোহাগাড়া থানার ওয়ারলেস মারফত বিভিন্ন জায়গায় খবর প্রেরণ করা হলো। চতুর্দিক থেকে মানবস্রোতের ঢেউ তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে একনজর দেখার জন্য। সরবে-নীরবে ক্রন্দনরত অবস্থায় দলে দলে লোকসমাগম হতে হতে যোহরের সময় সীরত সময়দান জনসমুদ্রে রূপ নেয়। এর আগে, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরামগণের মধ্যে হযরত মাওলানা শফিক আহমদ সাহেব, হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব, হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে গোসলদান করেন।

উল্লেখ্য যে, সীনার উপরিভাগ জীবিত মানুষের ন্যায় তখনও উষ্ণ থাকায় সকলে একটু ভীত হলে হাফেজ হারুন সাহেবের মাধ্যমে দেহ মোবারকের উপরি অংশ গোসল দেয়া হয় বলে ওনার মাধ্যমে জানা যায়।

সর্বত্র লোকে লোকারণ্য। ওলামায়ে কেরাম, ছাত্রবৃন্দ ও মুসল্লিগণ সকলে খতমে কুরআনের ব্যবস্থা করলেন।

অতঃপর বিকেল ৪টার দিকে স্মরণকালের ঐতিহাসিক নামাযে জানাযা চুনতী সীরত ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার নামাযে ইমামতি করেন হযরত হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভাগিনা হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.)। সালাতুল জানাযার পর ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় বর্তমান সীরত ময়দানের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত মসজিদে বায়তুল্লাহর দক্ষিণ পার্শ্বে মুহাম্মদ আয়ুব খান হতে খরিদা জমির উপর বেলায়তের মহান সাধক আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) কে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

দাফনের দিন চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ওস্তাজুল আসাতিজা প্রসিদ্ধ শায়ের হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.) উর্দু ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করে জানাযার অবস্থা বর্ণনা করেন এভাবে-

জমিঁ রুতী জঁমা রুতা ফলক আছো বাহাতাহে
চুনতী কা সেতারা খাক মে মদফুন হোতাহে।
জানাযা কেয়া সমন্দর হে বনী আদম কী মওজী হে
ইয়ে মনজর দেখ লও কেইছে ওলী আল্লাহছে মিলতাহে।

মাযার নির্মাণ

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দাফনের পর তাঁর কবরকে ৫/৬মাস পর্যন্ত বাঁশের ঘেরাও এবং উপরে সামিয়ানা দিয়ে রাখা হয়। পরে দানবীর ও শিল্পপতি মরহুম ইউসুফ মিয়ার সহধর্মিনী মোছাম্মৎ আলহাজ্ব সুলতানা বেগমের (বর্তমানে মরহুমা) সম্পূর্ণ অর্থায়নে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মাজার নির্মাণ করা হয়। ঐ সময়ে মাজার নির্মাণ না করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার শিক্ষকগণের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসলেও পরে সাতকানিয়া থানার ফখরুল মোহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমীন উল্লাহ (রহ.) মাজার করার পক্ষে অভিমত প্রদান করেন।
উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ে মসজিদে বায়তুল্লাহর নির্মাণ কাজ চলছিল যার সিংহভাগ ব্যয়ভার আলহাজ্ব ইউসুফ মিয়া বহন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সুলতানা বেগম শর্তারোপ করেছিলেন যে, আমি মাজার পাকা করতে না পারলে বা করতে না দিলে তুমি মসজিদের টাকা দিতে পারবে না। অবশেষে মাজার নির্মিত হয়।
১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর মাজারের পাকা কাজ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.) একদিন যেয়ারত করতে আসেন। যেয়ারত শেষে চুনতী মাদসারায় বসে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন-

য়েহিহে রওজায়ে খাকী শাহীন শাহে চুনতীকা
ইহা মখফীহে মখজান লু'লু ওয়া মরজান মুতী কা।
ওলীয়ে ওয়াছেলে হক মৌজেদে সীরতকা মরকাদ্ হে
ছমকতাহে ইয়ে তুরবত ছে সেতারা নেকবখতীকা।

সীরত ময়দান নিয়ে দলিল সম্পাদন

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ২৯/১১/১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ দিবাগত গভীর রাতে ইন্তেকালের মাত্র ৩৬ দিন পর ৫/১/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সীরত ময়দান নিয়ে একটি ওয়াক্ফনামা দলিল সম্পাদন করা হয়। এ দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিচারপতি ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরী দূরদৃষ্টি তথা ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভূমিকা রেখেছিলেন বলে জানতে পারি। এ দলিল সম্পাদনে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত কম-বেশি সকলে সমর্থন ও সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন। ৫/১/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দতে লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে সম্পাদিত ওয়াকফনামা দলিল নং-৩৮, উক্ত দলিলের গ্রহীতা মোতাওয়াল্লী ও মোতাওয়াল্লী কমিটির সভাপতি হিসেবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর একমাত্র সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ জমাল আহমদ। অপরদিকে, দলিল দাতা হিসেবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ওয়ারিশ একমাত্র পুত্র হযরত শাহ জমাল আহমদ ও একমাত্র কন্যা মোছাম্মৎ আমেনা বেগম এবং ১ম স্ত্রী মাহমুদা খাতুন ও ২য় স্ত্রী মোছাম্মৎ জয়নাব বেগম।

উক্ত দলিলে সীরত ময়দানের উত্তর-দক্ষিণ দৈর্ঘ্য দেখানো হয়েছে ৮৫০ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিম এবং ৭৫০ফুট। উক্ত ওয়াকফকৃত জমির পরিমাণ ১১ একর ৯ শতক তথা ২৭ খানি ১৪ গণ্ডা ১/২ কড়া তার উপর মৌরসি সম্পত্তি। বর্তমান মসজিদে বায়তুল্লাহ ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র মাযার এবং উত্তর পার্শ্বে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) ব্যবস্থাপনার দালানাদিসহ এ বিশাল ময়দান অবস্থিত। উক্ত রেজিস্ট্রিযুক্ত ওয়াকফনামা দলিলে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি মোতাওয়াল্লী কমিটি লিপিবদ্ধ করা আছে। এ মোতাওয়াল্লী কমিটির মেয়াদ ৫ বছর হওয়ার কথাও উল্লেখ করা আছে। মেয়াদ শেষ হওয়ার ১ মাস পূর্বে পরবর্তী ৫ বছরের জন্য কমিটি গঠনের কথাও বলা আছে।

এ মোতাওয়াল্লী কমিটি দ্বারা মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) মসজিদে বায়তুল্লাহসহ মে'রাজুন্নবী (স.) লায়লাতুল বরাত, লায়লাতুল ক্বদর ইত্যাদি মোবারক মাহফিলাদি পরিচালনা তথা উদযাপনের কথাও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কমিটির মেয়াদকালীন কমিটিভুক্ত কোন সদস্য ইন্তেকাল করলে অপরাপর সদস্যগণ একমত হয়ে কো-অপ্টের মাধ্যমে অন্যকোন ব্যক্তি দ্বারা উক্ত শূণ্যপদ পূরণ করবেন বলে লিপিবদ্ধ করা আছে।

ওয়াক্‌ফনামা দলিলে উল্লিখিত মোতাওয়াল্লি কমিটি নিম্নরূপ: (হুবহু ভাষায়)

১. জনাব শাহজাদা জমাল আহমদ — সভাপতি
পীং- মরহুম হযরত আলহাজ্ব শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.)

২. জনাব মকছুদ আহমদ চৌধুরী — সহ-সভাপতি
পীং- মরহুম আলহাজ্ব মকবুল আহাং চৌং

৩. জনাব মকবুল আহমদ চৌং — সহ-সভাপতি
পীং- মরহুম মৌং এমদাদ আলী চৌং

৪. জনাব আলহাজ্ব মোহাং ইউসুফ — সম্পাদক
পীং- মরহুম আবদুল জলিল

৫. জনাব মৌং মুসলিম খান — সহ-সম্পাদক
পীং- মরহুম মৌং আবদুচ্ছোবহান খাঁ

৬. জনাব মৌং হাবীব আহমেদ — ক্যাশিয়ার
পীং- মরহুম মৌং নজির আহমদ

৭. জনাব মোহাং আশরাফ উল্লাহ
পীং- মরহুম আবদুল বাতেন সওঃ

৮. জনাব ছালেহ আহমদ চৌধুরী
প্রযত্নে: ছালেহ কার্পেট, চট্টগ্রাম।

৯. জনাব গোলাম কবীর
পীং- মরহুম মৌং ছাদত উল্লাহ

১০. জনাব এম. রমজু মিঞা সওঃ
পীং-মরহুম বিল্লাল মিঞা সওঃ

১১. জনাব আহমদ সাঈদ
পীং- মরহুম মৌং তফছির উদ্দিন আহমদ

১২. জনাব সাহেবুর রহমান চৌধুরী
পীং- মরহুম ছিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী

১৩. জনাব হারুনুর রশীদ (হাফেজ সাহেব)
পীং- মরহুম মৌং আহমুদর রহমান

১৪. জনাব মোহাম্মদ শাহ মুরাদ
পীং- মোহাম্মদ ইউসুফ

১৫. জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের
পীং- মরহুম আবদুস ছোবহান

১৬. জনাব ডা: গোলাম কিবরিয়া
পীং- মরহুম মৌং ছাদত উল্লাহ

১৭. জনাব রফিকুল কাদের চৌং
পীং- মরহুম হাজী আবদুল করীম।

Chunati.com Pioneer in village based website

সূরত মোবারক

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর গায়ের রং লাবলণ্যময় গুন্দুম গো-উজ্জ্বল ও ধারালো চেহারা যাতে র'উব এর চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। শরীরের উচ্চতা স্বাভাবিক লম্বা ও মোটা ছিল। দেখতে আরবি লোকের মত খুবই মায়া মহব্বত লাগত।
তাঁর দাড়ি মোবারক খুবই সাদা ঘন ও লম্বা ছিল। কোঁকড়ানো চুল মোবারক লতিছাঠা ছিল। তাঁর চোখ ছিল একটু কালো নীলাভ। নাকের অগ্রভাগ কিঞ্চিত বড়। চোখের ভ্রু ছিল পরিপূর্ণ।
চক্ষুদ্বয় একটু বড় আকৃতির ছিল। তাঁর বাহু ছিল দীর্ঘ শক্ত মজবুত। হাতের তালু একটু দীর্ঘ ও নরম ছিল। হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালি ছিল মোটা মোটা ভাব। আঙ্গুলগুলো দেখতে সাদা ও লম্বা। নখগুলি কলমী ছবির মত। বাম পায়ের তালুতে একটি জখমের দাগ ছিল। এটা নাকি আকর্ষণ করত। এক কথায় আপাদমস্তক তাঁর শারীরিক গঠন অতুলনীয় ছিল। কারো মতে চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদের খতিব আওলাদে রসূল সৈয়দ মাওলানা আবদুল করিম (রহ.) এর সাথে তাঁর দৈহিক আকৃতির কিছুটা মিল ছিল।
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর হাঁটাচলা ছিল দ্রুতগতিসম্পন্ন। পবিত্র হাদিসে এসেছে, রাসূল (স.) দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিলেন। চলার সময় বীরের মত উভয় বাহু নেড়ে হাঁটতেন। কথাবার্তাও ছিল বড় ও উচ্চস্বর বিশিষ্ট। এক এক শব্দ করে তিনি কথা বলতেন। ঘন কথা বলতেন না। আর আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণের অবস্থায় কথাবার্তা ভীষণ গর্জন ও উচ্চস্বরে হত। শ্রোতারা ভীত না হয়ে পারতেন না।

লেবাস (পোষাক পরিচ্ছদ)

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আধ্যাত্মিক জগতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ও কাপড় চোপড় পরিহিত থাকতেন। কোন সময় কাপড়বিহীন ছিলেন না। তিনি সবসময় সুন্নত মোতাবেক পোশাক পরিধান করতেন। লম্বা কোরতা, সাদা টুপি এবং মূল্যবান সুন্দর সাদা 'খতওয়ালা' লুঙ্গি ব্যবহার করতেন।

তিনি দুদিকে কাটা হাটু পর্যন্ত সুতার কোরতা পরতেন। ধবধবে সাদা কোরতা তাঁর শরীর মোবারকে খুব সুন্দর মানাত। পায়জামা খুব কম ব্যবহার করতেন। শুধু কয়েকবার ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়। দামী পামসু জুতা মোজাসহ ব্যবহার করতেন।
সাদা ফুল এর টুপি বেশি পছন্দ করতেন। তিনি তিন প্রকারের টুপি ব্যবহার করতেন। প্রথমে মজযুব হালতে কালো টুপি, তারপর সাদা লম্বা ফুলের টুপি, অতঃপর হজ্বের পর হতে গোল জালিটুপি ব্যবহার করেন। শীতের মৌসুমে উলের শাল ব্যবহার করতেন। তবে প্রচন্ড শীতের সময় লংকোটও ব্যবহার করতেন।
মাঝেমধ্যে হাজি রুমাল ব্যবহার করতেন। ভাঁজকৃত সাদা রুমাল ঘাড়ের উপর হতে দুই পার্শ্বে ঝুলিয়ে দিতেন। তখন বেশি সুন্দর মানাত।
আতর, খোশবু (সুগন্ধি) এবং দামী সুগন্ধিযুক্ত তৈল ব্যবহার করতেন। তৈল ব্যবহারের প্রায় সময় ইন্ডিয়ান জবা কুসুম তৈল ব্যবহার করতেন। তৈল ব্যবহারের কারণে টুপি সামান্য লাল-রঙ্গিন হয়ে যেত। কোরতার ভিতর হাতওয়ালা কোরা গেঞ্জি ব্যবহার করতেন। তিনি হাতঘড়ি ডান হাতে পরতেন এবং বলতেন ইহুদী নাসারা বাম হাতে পরে বিধায় বিরোধিতা করছি।

খাওয়া-দাওয়া

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর খাওয়া-দাওয়া ঠিক সুন্নত মোতাবেক হত। প্রায় সময় মেহমানসহ খাওয়া-দাওয়া করতেন। মাঝেমধ্যে একা একা খাওয়া দাওয়া করতনে। খাওয়া-দাওয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। যখন বেশি ইচ্ছা হত তখন খেতেন। তাও নিজে বলতেন না। খানাপিনার জন্য অনুরোধ করলে কিংবা সামনে আনলে খেতেন। যেহেতু সবসময় ধ্যান ও যিকরে তিনি মগ্ন থাকতেন।

গরু, ছাগল, মুরগির গোস্ত এবং মাছ বেশি পছন্দ করতেন। মহিষের গোস্ত তিনি খেতেন না, পছন্দও করতেন না।

তাঁর আব্বাজান দধি ছাড়া এক বেলাও আহার করতেন না বলে শুনতে পাই। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিজে দধি পছন্দ করতেন বিধায় তাঁর বাড়িতে প্রায় সময় দধি থাকত। তিনি ঝাল তরকারী বেশি পছন্দ করতেন। ঝাল কম হলে অপছন্দ করতেন। মধু ও ঘি বেশি খেতেন। এগুলো ওনার প্রধান খাদ্য হিসেবে গণ্য হত।

দেশীয় পিঠা, এমনকি শীত পিঠা বেশি পছন্দ করতেন ও শখ করে খেতেন মাঝে মধ্যে শীত পিঠার জন্য আদেশ করতেন।

কড়া দুধবিহীন চা বেশি খেতেন। অনেক সময় রং চা বড় কাপে নিয়ে নিজে পান করে অন্যদেরকেও তবরুক হিসেবে দিতেন। এতে আনন্দিত হয়ে নিজের জন্য খোশ নসিব মনে করে অনেকে খেয়ে ফেলতেন।

Chhunati.com Pioneer of village based website

মেহমানদারী

আশেকে রাসূল (স.) হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) মেহমানদারীতে ছিলেন অনন্য ও বেনজির। তিনি একজন উঁচু মাপের মেহমান নেওয়াজ ছিলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর বাড়িটি ছিল একটি লঙ্গরখানা বা মুসাফিরখানা।

সর্বসাধারণের জন্য মেহমানদারীর দরজা খোলা থাকত। পবিত্র মাহফিলে সীরাতুন্নবী (স.) চলাকালে ১৯ দিনব্যাপী সর্বসাধারণের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করতেন। মেরাজুন্নবী (স.) উপলক্ষেও রাতব্যাপী আ'ম মেহমানদারীর ব্যবস্থা থাকত। রাসূলে খোদার সুন্নত হিসেবে তিনি সবসময় আল্লাহর বান্দাহগণকে খাওয়াতেন। মেহমান ছাড়া তিনি খাওয়া পছন্দ করতেন না।

একদা সীরাত মাহফিল চলাকালে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে ভাত না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে ঐ খবর তিনি জানার পর সারারাত কান্না করেন এবং হালতে ছিলেন। সে-রাতে হযরত রাসূলে করিম (স.) তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য খোলাফায়ে রাশেদিনসহ তশরিফ এনেছেন এবং হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে জড়ায়ে ধরেছেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সীরতের প্রতিটি কাজের দেখাশুনা করেছেন। এ ঘটনা ফখরুল মোহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহ (রহ.) ঐ রাতে স্বপ্নে দেখেছেন বলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে জানান। তিনি প্রায় সময় বলতেন সীরাতুন্নবী (স.) মাহফিলে যারা আসেন, আসবেন সকলে রাসূল (স.) এর মেহমান। তাঁর নিজ বাড়িতে রন্ধন ঘরে সারাক্ষণ চুলা জ্বলতে থাকত। দেশী-বিদেশী অগণিত ভক্ত যেন না খেয়ে না যায় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর বাড়ির সেই মেহমানদারী এখনও জারি আছে। হুজুরের একমাত্র জীবিত ছেলে হযরত শাহ জমাল আহমদ এর সদ্য মরহুমা সহধর্মিণী নুরজাহান বেগম সীরতের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট মেহমান ও ওয়ায়েজিনে কেরামগণের জন্য নিজ হাতে পাকানো তরকারি ও নাস্তার মাধ্যমে মেহমানদারী করে গেছেন আমৃত্যু।

Chunati.com Pioneer in village based website

দৈনন্দিন কার্যাবলি

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথেষ্ট পরিমাণ খুশু-খুযু তথা অত্যন্ত বিনয় ও ধ্যানমগ্ন হয়ে আদায় করতেন। আর নফল নামাযসমূহের মধ্যে সালাতুল আওয়াবিন, এশরাক, দোহা ইত্যাদি খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। ব্যস্ততার কারণে কেউ সুন্নাত, নফল ছেড়ে দিলে বলতেন বাবারা সুন্নত নামাযও পড়ে দিও। রাসূল (স.) খুশি হবেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রায় সময় পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাসবীহ টিপে টিপে দরূদ শরিফ পড়তেন। নামাযের পর মসনুন দোয়াসমূহ রীতিমত আদায় করতেন। আর স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাজ্জুদ ও নিয়মিত আদায় করতেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দৈনন্দিন কার্যাবলীর মধ্যে পবিত্র কুরআন মজিদ তেলাওয়াত ও হাদিস শরীফ পাঠ অন্যতম কর্মসূচি ছিল।

তিনি প্রায় সময় উচ্চস্বরে সুন্দর লাহানে মুখস্থ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। মাঝেমধ্যে দেখেও তেলাওয়াত করতেন। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণকালীন পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত অংশ বেশি বেশি তেলাওয়াত করতেন তন্মধ্যে সূরা ফতাহ অন্যতম। তিনি উক্ত সূরার ২৮ ও ২৯ নম্বর আয়াত প্রায় সময় তেলাওয়াত করতেন। আবার কখনও কখনও এ আয়াতগুলো মিশায়ে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন।

তিনি যেহেতু প্রায় সময় মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন সেজন্য লোকজন ওনাকে হাফেজ মামা বলে ডাকতেন। ভক্তরা তাঁর কুরআন তেলাওয়াত লাহানকে লাহনে দাউদী বলত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুরআন তেলাওয়াত করলে শ্রোতারা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করত। যেখানে বলতেন সেখানে মানুষ জমে যেত।

অনুরূপভাবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একজন আশেকে রাসূল (স.) হিসেবে প্রায়সময় হাদিস শরিফ পড়তেন এবং লোকজনকে তা দ্বারা ওয়াজ করতেন। মাঝে মাঝে কুরআন মজিদের অশ্রুতপূর্ব তফসির করতেন যা শুনে বড় বড় আলেমগণও হয়রান হয়ে যেতেন। তাছাড়া প্রায় সময় যিকর-আযকার ও মোরাক্বাবা মোশাহাদায় মশগুল থাকতেন।

একাকী সময়ে বেশি বেশি মোরাক্বাবা করতেন। আর শোবার সময় বক্ষের উপর দু'হাত রেখে মোরাক্বাবা করতেন। কোন কোন সময় ঐ নিদ্রাবস্থায় এক/দেড়/দুদিনও থেকে যেতেন। কেউ ডাকলে বলতেন আমাকে ডেকে ভাল করনি। আমি এ জগতে থাকি না। তিনি শেষ রাতে আবার কোন কোন সময় মধ্যরাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে পাহাড়ঘেরা এলাকায় একাকী চলে যেতেন। আবার অনেক সময় সকাল বেলা চা-নাস্তা খাওয়ার পরে রিক্সা নিয়ে বের হতেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঠিক সময়ে বাড়ি চলে আসতেন।

পারিবারিক জীবনে আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তাঁর দৈনন্দিন যোগাযোগ সুন্দর ও সুমধুর ছিল।

সর্বস্তরের ভক্তবৃন্দের সাথে তিনি সদালাপী ছিলেন। অনেক সময় মেজাজ একদম ঠান্ডা তথা খোশ মেজাজি হয়ে যেতেন। তখন রসালো আলাপ করতেন। সকলকে প্রাণ খুলে দোয়া করতেন এবং বলতেন ছোট ছোট পিপীলিকাকেও দোয়া করতে হয় যেহেতু তারাও আল্লাহর সৃষ্টি।

Chunati.com Pioneer in village based website

আত্মীয়তার হক আদায় ও কৃতজ্ঞতাবোধ

নিকট-আত্মীয়স্বজনের হক আদায় ও তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে রাসূলে করিম (স.) এর অগণিত মূল্যবান হাদিসের বাণী রয়েছে। এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর প্রতি অনেক সতর্কবাণীও রয়েছে।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আল্লাহর রাসূলের (স.) নির্দেশনাবলীকে সামনে রেখে সর্বাবস্থায় আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ-খবর নিতে সচেষ্ট থাকতেন। প্রয়োজন সাপেক্ষে আত্মীয়দের বাড়িতে সশরীরে যেতেন। এমনকি মাঝেমধ্যে ফজরের নামাযের পরে এ দায়িত্ব পালন করতেন। সাধ্যানুযয়ী সাহায্য সহযোগিতা করতেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) স্বীয় ছোট ভাইকে নিয়মিত বাজারের টাকা দিতেন বলে জানা যায়। এমনকি ওনার জমির খাজনা পর্যন্ত আদায় করে দিতেন। নিয়মিত তাঁর সৎ মাকে দেখতে যেতেন বিভিন্ন মূল্যবান ফলমূল নিয়ে। মাহফিলে সীরাতুন্নবী (স.) এর যিয়াফতের তবরুক ইউসুফ মঞ্জিলে পৌছায়ে দিতেন ঐ বাড়ির অবদান এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।

একদা ওনার সহপাঠী ও আত্মীয় সুফি- মিয়াজীপাড়ার মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইন্তেকাল করলে অনবরত চারদিন পর্যন্ত তাদের বাড়িতে ভাত ও তরকারি পাঠান।

তেমনিভাবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর হালত অবস্থায় যারা ওনার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছিলেন ওনাদের প্রতিও তিনি আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। জামালি হালতে চলে আসার পর ওনাদের অবদানের কথা স্মরণ করে সব সময় সহযোগিতা ও দান খয়রাতের হাত প্রসারিত রাখতেন। এমনকি একদা এক মহিলা এসে শাহ মঞ্জিলের নিচ থেকে ডাক দিলে তিনি উপরের তলা থেকে ওনার ডাকে নিচে নেমে আসেন যেহেতু ঐ মহিলার পরিবারের সামান্য অবদান হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উপর ছিল।

Chunati.com pioneer in village based website

শিশুদের প্রতি মমতা

শিশুদের প্রতি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর প্রাণখোলা স্নেহ-মমতা প্রবাদাকারে সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি শিশুকে আদর-মায়া করতেন। তাদের খেলা দেখে আনন্দ পেতেন। তাঁর আদর-মমতার প্রত্যাশায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখলে তাঁর চারিদিকে আনন্দচিত্তে সমবেত হত। তাঁর পরিবারের সন্তান-সন্ততির প্রতিও তাঁর অপরিসীম ভালবাসা ছিল। তাদের হাতে মিষ্টি খাওয়ার জন্য টাকা পয়সা দিতেন। যাকে যে রকম ভাল মনে করতেন দোয়া করে দিতেন। স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার সরকারী পরীক্ষার সময় কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষার খবরাখবর নিতেন। হল সুপারকে ছেলে-মেয়েদের তথা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে বলতেন। তারা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কেন্দ্রে তাশরীফ আনলে খুশি হতো ও সাহস পেত। কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কথা রক্ষা করবেন বলতেন। মাহফিলে সীরাতুন্নবী (স.) চলাকালীন ১৯ দিনব্যাপী দৈনিক ৮/১০ হাজার ছোট ছোট শিশুদেরকে দুই বেলা খানা খাওয়াতেন। এতে তিনি বেশী আনন্দ অনুভব করতেন। ৮/৯ দিন শিশুদেরকে খানা খাওয়ানোর পর সীরাত মাহফিল এন্তেজামিয়া কমিটি অনর্থক ঝামেলা কমানোর নিয়তে ২ বেলা খাওয়ানোর পর একসময় ২ বেলা খানা বন্ধ করে দেয়ায় শিশুরা দ্রুত তাঁর দরবারে গিয়ে খানা বন্ধের অভিযোগ পেশ করে। তিনি খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন। আফসোস করে মনের দুঃখে দুইবেলা আহার করলেন না। এমনকি নাস্তাও করলেন না। পরে সকলে ক্ষমা চেয়ে তাঁর আদেশমত খানা আবার চালু করে দেন। আর কখনও বন্ধ করেনি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শিশুদের প্রতি তাঁর মায়া-মমতা কত অধিক ও গভীর ছিল।

উল্লেখ্য যে, হযরত রাসূল করিম (স.) এর অন্যতম সুন্নাত হলো শিশুদেরকে স্নেহ মমতা করা। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ও একজন আশেকে রাসূল (স.) হিসেবে এ সুন্নাত, সারাজীবন জারি রাখেন। মহানবী (স.) জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিশুকে আদর করতেন। দেখলে কোলে তুলে নিতেন। মুখে চুমু দিতেন এবং তার বাহনের অগ্র-পশ্চাতে তুলে দিতেন। তাদের খেলা দেখে আনন্দবোধ করতেন। তারাও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আদর মমতা পাওয়ার আশায় চারিদিকে ভিড় জমাত। হযরত রাসূলে করিম (স.) ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুকে নিস্পাপ বলে ঘোষণা করেছেন। ওনার পরিবারের শিশু সদস্যদের প্রতি অপরিসীম মোহাব্বত ছিল। তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমার (র.) শিশুপুত্র হযরত হাসান (র.) ও হযরত হোসাইন (র.) কে তিনি সীমাহীন ভালবাসতেন। এমনকি তিনি কখনও সোহাগভরে নিজে ঘোড়া সেজে তাদেরকে আপন পিঠ মোবারকে আরোহন করাতেন। তাঁর শিশুপুত্র হযরত ইব্রাহিম (র.) কেও তিনি প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসতেন। হযরত ইব্রাহিম (র.) এর অকাল মৃত্যুতে মহানবী (স.) অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। আশেকে রাসূল (স.) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ও পবিত্র সুন্নাতে নববীর অনুসরণ ও অনুকরণ করে চলেছেন। তাই ওনার জীবনেও ছোটদের প্রতি পরম দয়া মায়া ও স্নেহ-মমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একজন প্রকৃত আশেকে রাসূল (স.) হিসেবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী ছিলেন। তিনি মধ্যমপন্থী ছিলেন। শাখাগত বিষয়াবলীতে টানাটানি ও দলাদলি পছন্দ করতেন না। মাযহাব হিসেবে তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (রহ.) কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন। তিনি প্রাই বলতেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) কেমন লোক ছিলেন ৯৯ বারের মত আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেন।

তিনি আরো বলতেন- ইমাম আবু হানিফা (রহ.) শরিয়তের মাধ্যমে আল্লাহকে চিনিয়েছেন। তাই তিনি বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) থেকে অনেক বড়। আর বড়পীর সাহেব তো মা'আরিফাতের ইমাম।

তিনি তাসাউফের সিলসিলার মধ্যে মোজাদ্দেদিয়া তরিকাকে অত্যাধিক ভালবাসতেন এবং হযরত মাওলানা হাফেজ হামেদ হাসান আলভী প্রকাশ হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর ভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক বছর তাঁর জন্যে একভাগ কুরবানি দিতেন। হযরত আজমগড়ী (রহ.) চুনতী এলাকায় তশরিফ আনলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পুরাতন বাড়ি ইউসুফ মন্‌জিলে থাকতেন।

ফানা ফিল্লাহ ও ফানা ফির রাসুল (স.) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যুগের অদ্বিতীয় আল্লাহর ওলি ছিলেন। পবিত্র মক্কা মোকাররমায় বিদায়ী তাওয়াফ ও মদিনা মুনাওয়ারায় বিদায়ী সালাম সম্বন্ধে তিনি বলতেন, আল্লাহ ও রাসূল (স.) থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? যেখানে যাবে সেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) ছাড়া কে আছে? এবং বলতেন ছমায়াহে জবছে তু নজরৌ মে জিদর দেখতাহু উদর তুহি তুহে।'

তিনি পবিত্র সীরত, শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর ও ১০ মহররম ছাড়াও কোরবানির বেলায়ও ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি আল্লাহর নামে কুরবানি করতেন। কুরআন মজিদে উল্লেখ আছে- এমন নবীদের নামে ও আউলিয়া কেরামগণের নামে কুরবানি দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে ৩৫টি গরু কুরবানি করেছেন। ওনার ইবাদতের পরিধি ও সময় ভিন্ন ছিল। আল্লাহ ও রাসূলের (স.) প্রেমে সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক উর্ধ্ব মাপের ছিলেন। যে সময় যার ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন সেটাই অবশেষে ঘটেছে। তিনি খন্ড ভারত- এর সমর্থক মুসলিমলীগকে পছন্দ করতেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে দাঁড় করায়ে বিরোধী দল যখন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পক্ষে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সময় সময় বলতেন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আমার হাতে যার প্রমাণ বাংলাদেশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ বারেবারে তাঁর দরবারে এসে দোয়া নেয়ার চেষ্টা করতেন। বিশেষত: প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তিনিও ভক্তি সহকারে তাঁর দরবারে দোয়া নেয়ার জন্য বারবার আসতেন।

এখানে আরো উল্লেখ করা যায় যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ডানপন্থি ছিলেন কিন্তু দেশের প্রচলিত ডান ও বাম উভয়ধারার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ওনার কাছে যেতেন; দোয়ালাভে ধন্য হতেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ওনার কাছে আশ্রয় লাভ করেন। এমনকি তিনি মুসলমানগণের পাশাপাশি অমুসলিমদেরকেও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদারতা ও মহানুভবতার চোখে দেখতেন।

Chunati.com Pioneering village based website

চুনতী মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্টতা

দক্ষিণ চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা দেশের অন্যতম সুখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর গোড়াপত্তন বালাকোটের গাজী হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) কর্তৃক ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল বলে জানা আছে। কিন্তু চুনতীর প্রবীণ ও গুণীজনগণের মাধ্যমে যতটুকু জানা যায়, তা হলো ১৮৮৩/৮৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ওনার জ্যৈষ্ঠপুত্র চুনতীর প্রখ্যাত জমিদার ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব খান বাহাদুর ওয়াজিউল্লাহ খান (সামী) সর্বপ্রথম তৎকালীন ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) টাকার (যা বর্তমানে এক কোটি টাকার মত) একটি বিশাল ফান্ড করেছিলেন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য।

কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণে তদীয়পুত্র ফৌজুল কবির খাঁন স্বীয় পিতার এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে সিওম মানের একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে এর নামকরণ করেন পিতার স্মৃতি অনুসারে 'সামিয়া মাদরাসা।'

হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর প্রথম খলিফা হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) উক্ত সামিয়া মাদরাসার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ কার্তিক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রতিষ্ঠানটির অবয়ব বিনষ্টের সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে পরিচালনাগত কারণে ধারাবাহিকতায় বারংবার বাধাগ্রস্ত হয় এবং বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানান্তরিত ও পুনঃনির্মিত হয়।

উক্ত সামিয়া মাদরাসার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের এক শুভলগ্নে হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর অন্যতম খলিফা চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসার তৎকালীন হেড মাওলানা হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এলাকার কিছু শিক্ষানুরাগী মহান ব্যক্তিবর্গ নিয়ে বর্তমান চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম (রহ.) এর নামানুসারে মাদরাসার নাম রাখা হয় চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসা।

এ হাকিমিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তখন বড় অবদান রাখতে এগিয়ে আসেন মরহুম এস্তেফাজুর রহমান খান। তিনি তাঁর বন্দোবস্তিকৃত ৩.২০ শতক বা ৮ কানি পাহাড় এরিয়া মাদরাসার জন্য দান করেন। ফলে, এ মাদরাসা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। টিনের ছাউনীযুক্ত মাদরাসা গৃহ নির্মাণে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এগিয়ে আসেন।

chunati.com Pioneer village based website

মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকল্পে চুনতীর বিশিষ্ট গুণীজনদের নিয়ে ২৬/৫/৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার উপস্থিত সভ্যবৃন্দের নাম রেজুলেশন খাতায় নিম্নরূপ পাওয়া যায়। (ইংরেজি থেকে হুবহু বঙ্গানুবাদ ছাপানো হল)

১. খান বাহাদুর মৌলভী মুহাম্মদ হাসান
২. এম.ডি. ইউনুস খান, সাব-রেজিস্ট্রার
৩. মাওলানা ফজলুল হক
৪. মাওলানা ফৈইয়াজ আহমদ
৫. মাওলানা নজির আহমদ (হেড মাওলানা দারুল উলুম)
৬. মাওলানা বশির আহমদ (M.U.B.C)
৭. মাওলানা মুহাম্মদ হারুন
৮. মাওলানা ফৈইয়াজুর রহমান খান, এম.এ.আর
৯. মাওলানা মুফাজ্জালুর রহমান
১০. মাওলানা জিয়াউল হক
১১. মাওলানা সফদর আহমদ
১২. মাস্টার মুহাম্মদ মুহসিন, PRESS- M.U.B.C
১৩. মৌলভী মুনতাছারুল ইসলাম, বি.এ
১৪. মাওলানা মোজাফ্ফর আহমদ, M.M.
১৫. মাওলানা নুরুল হুসাইন, M.M.R.C
১৬. মৌলভী হাশমত উল্লাহ, M.U.B.C
১৭. মৌলভী আজম উল্লাহ, অব: দারোগা
১৮. শারাফত উল্লাহ খাঁন, ফাজিল
১৯. মলিহ উদ্দিন খাঁ
২০. আলী মুহাম্মদ সিকদার
২১. আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ চুনতীর কিছু সদস্যবৃন্দ
২২. চুনতী মাদরাসার কতেক শিক্ষক

এম. রহমান খাঁন
(মুস্তাফিজুর রহমান খাঁন ডেপুটি)
সভাপতি

উক্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম নির্বাচিত কমিটি নিম্নরূপ:

(ইংরেজি থেকে হুবহু বঙ্গানুবাদ দেয়া হলো। ২৮/০৫/১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ

অভিভাবক সদস্য ৫জন

১. আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল গণি

২. মাওলানা ফৈয়াজুর রহমান খাঁন — সেক্রেটারী

৩. মাঃ এম.ডি. মুহসিন, P.U.B.C

৪. মৌলভী বশির আহমদ, M.U.B

৫. মৌলভী এস্তেফাজুর রহমান, M.U.B

দাতা সদস্য

৬. আলহাজ্ব খান বাহাদুর মুহাম্মদ হাসান, অব: অধ্যাপক, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ।

৭. আলহাজ্ব মৌলভী মুস্তাফিজুর রহমান খাঁন, এম.এ. অব. সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

মেডিকেল অফিসার

৮. হাকিম মৌলভী মখছুছুর রহমান

শিক্ষানুরাগী

৯. আলহাজ্ব মাওলানা নজির আহমদ, হেড মাওলানা, দারুল উলুম — প্রেসিডেন্ট

শিক্ষক প্রতিনিধি

১০. মাওলানা মোনতাছারুল ইসলাম, বি.এ.

১১. পদাধিকার বলে সুপার মাওলানা নুরুল হোসাইন

১২. .... বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত।

মাদরাসা প্রদত্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায়, ১০/০৩/১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ১ম শ্রেণি থেকে ফাযিল পর্যন্ত সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে অত্র মাদরাসা। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত ছাত্ররা আলিম কেন্দ্রিয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তবে মাদরাসার ২৫/০৫/১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের একটি রেজুলেশনে দেখা যায়, সে তারিখের অধিবেশনে মূলত ফাযিল ফাইন্যাল ক্লাস খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘদিন মাদরাসা একাধারে ফাযিল পর্যন্ত চলে আসছে। অতঃপর আশেকে রাসূল (স.) ওলিকুল নক্ষত্র হযরত শাহ মাওলানা

chunati.com Pioneer in village based website

হাফেজ আহমদ প্রকাশ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কামিল হাদিস বিভাগের উদ্বোধন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত করা হয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর পুনরায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উদ্যোগে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কামিল বিভাগ চালু হয়। তবে সরকারিভাবে কামিল খোলার অনুমতি লাভ করে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই তারিখে। আর মঞ্জুরি লাভ করে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে।

"১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মাদরাসা কমিটির সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে কামিল ক্লাস চালু হবার পর এর পরিচালনা সাধ্যের বাইরে মনে হলে মুলতবী রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখন ওলিয়ে কামেল হযরত শাহ সাহেব (রহ.) স্বীয় রূহানী শক্তিবলে কমিটির সদস্যদের সাহস যুগিয়ে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকারি মঞ্জুরির ব্যবস্থা করেন। যেহেতু হাকিমিয়া মাদরাসার এ পরিপূর্ণতা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ওসিলায় হয়েছে সেজন্য কামিল শ্রেণি খোলার কৃতিত্ব বিশেষভাবে ওনারই স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে।"

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রায় বলতে লাগলেন আমি এখানে হাদিস পড়াব, কামিল খুলব। একদিন সকালে চা খেয়ে রিক্সা নিয়ে চুনতীর (ঢালায়) পর্বতের দিকে চলে গেলেন। রাত্রি ১১টার দিকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় গেইটে ঢুকে পশ্চিম দিকে দেখে উত্তর দিকে যাচ্ছিলেন এবং বারেবারে বলতে লাগলেন, আমি রাসূল (স.) এর এজাযত নিয়েছি, আমি এখানে হাদিস পড়াব।

অনুমতি সংক্রান্ত ব্যাপারে জানা যায়, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী মাদরাসায় বসে পশ্চিম দিকে মুখ করে দেখে দেখে প্রায় বলতেন, এই হতে মদিনা শরীফ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা উঠায়ে ফেলেছি। আমি রাসূলে পাক (স.) থেকে দু'টি জিনিসের অনুমতি নিয়েছি। তার মধ্যে একটি সীরাতুন্নবী (স.) মাহফিল। অপরটি চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসাকে হাদিস বিভাগে কামিল করা।

এর সপ্তাহখানেক পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নির্দেশনায় চুনতীসহ লোহাগাড়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উপস্থিতিতে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত সমাবেশকে যখন কামিল খোলার ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও নবীজীর অনুমতির কথা জানানো হয় তখন উপস্থিতি থেকে ২/১ জন আপত্তি করে বললেন ভালমতে ফাযিল চলছে না কামিল কিভাবে চলবে। তবুও প্রস্তাব গৃহীত হল; আপাতত কামিল খোলার জন্য ২ জন মুহাদ্দিস, ৪০ সেট কিতাব ও ২টি কামরা প্রয়োজন। যে যতটুকু পারেন সহযোগিতা করার প্রস্তাব হলো। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর স্বপ্ন বৃথা যাবে না। তখন উপস্থিত সভ্যগণ থেকে ১৩ সেট কিতাবের প্রতিশ্রুতি

পাওয়া গেলো। উল্লেখ্য, বৈঠকের শুরু থেকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কালো জামা পরিহিত (অবস্থায়) চুপচাপ ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন।
উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে সর্ব প্রথম অনুদান দিয়েছেন হারবাং নিবাসী মরহুম ডাক্তার আনোয়ার সাহেব। তিনি ঢাকায় থাকতেন। জনাব হাফেজ হারুনুর রশিদ ও জনাব মাওলানা কাজী নাসির উদ্দিন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অনুমতিক্রমে ঢাকায় ডাক্তার আনোয়ারের কাছে গিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর বাসনা প্রসঙ্গে জানালে তিনি তাঁদেরকে বাসায় মেহমান হিসেবে রাখলেন। রাত্রে তাঁরা এ ব্যাপারে ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন বলে ওনাকে জানালেন। সকালে নাস্তা শেষ করার পর তিনি পত্রিকা মোড়ানো'একটি বান্ডিল হাফেজ হারুন সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, এখানে ছাব্বিশ হাজার টাকা আছে বাকি টাকা দিয়ে দেব। হুজুরকে আমার সালাম জানাবেন ও দোয়া করতে বলবেন।
অতঃপর আল্লাহপাকের অশেষ মেহেরবানি ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দোয়ায় আরো বেশ কিছু কালেকশান হলে পশ্চিমের ভবনের ২য় তলায় কামিল আরম্ভ করা হল। দু'জন উপযুক্ত মুহাদ্দিসও ব্যবস্থা হয়ে গেল। বছরখানেক চলার পর মুহাদ্দিসের অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়। এক বছর পর আবার পুনরায় কামিল ক্লাস আরম্ভ হয়ে অদ্যাবধি চালু আছে। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১৫/২/৭৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ইন্তেকাল পর্যন্ত মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাদরাসার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বলতে গেলে হযরত সাহেব (রহ.) এর জীবনের শেষ দশক চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার উন্নয়নের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁরই জীবদ্দশায় যেভাবে উল্লেখযোগ্য আর্থিক অবদান রাখেন তেমনি ওনার ওফাতের পরে ও তার ধারাবাহিকতা চালু রাখেন। বলা বাহুল্য, মাদরাসার কালেকশানের জন্য সৌদি আরব বা অন্যান্য দেশে যাওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলতেন, যে আল্লাহ ওখানে দিবেন তিনি এখানেও দিতে পারেন।
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সে ইচ্ছা ও অনুভূতির ফলশ্রুতিতে দেশের টাকা দিয়েই চুনতী মাদরাসায় প্রায় উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, চুনতী মাদরাসার সার্বিক অভাব অনটন ও প্রয়োজনে তিনি যেমন অকাতরে (না গুনে) দান করতেন তেমনি বিভিন্ন মাদরাসায় ও দাওয়াত দিলে মুঠভরে টাকাকড়ি দান করতেন।
তাঁর আর এক অভ্যাস আলেম ওলামাগণকে সম্মান করা। তিনি বড় বড় আলেমগণকে যথাযথ সম্মান করতেন এবং প্রায় সময় আলেম পরিবেষ্টিত থাকতেন বলা যাবে।

যে তিনটি গভর্নিং বডিতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সভাপতি ছিলেন, সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো- (হুবহু ছাপানো হলো)

গভর্নিং বডি

সেশন ১৫/০২/৭৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০/০৩/৭৯ খ্রিস্টাব্দ

হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব	সভাপতি
হযরত শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব	সহ-সভাপতি
হযরত শাহ মাওলানা হাবিব আহমদ সাহেব	সম্পাদক
মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব	সদস্য
মাওলানা মোহাম্মদ আমীন সাহেব	সদস্য
মাওলানা আবদুল্লাহ মিয়া সাহেব	সদস্য
মাওলানা মুসলিম খান সাহেব	সদস্য
মাওলানা আজহার হোসাইন ছিদ্দিকী সাহেব	সদস্য
মাওলানা হোমাম্মদ ইয়াহিয়া	সদস্য
মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী	সদস্য
প্রফেসর মাওলানা আবু বকর রফিক	সদস্য
ডা. লোকমান মিয়া	সদস্য

গভর্নিং বডি

সেসন ৩১/০৩/৭৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ২৭/০৫/৮৩ খ্রিস্টাব্দ

হযত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব	সভাপতি
হযরত শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব	সহ-সভাপতি
হযরত শাহ মাওলানা ইয়াহিয়া সাহেব	সদস্য
হযরত শাহ মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব	সদস্য
জনাব মাওলানা আজহার হোসাইন	সদস্য
জনাব মাওলানা মুসলিম খাঁন	সদস্য
জনাব মাওলানা আবদুল্লাহ মিয়া	সদস্য
জনাব মাওলানা হাবিব আহমদ	সদস্য
জনাব মাওলানা মাহফুজর রহমান সিদ্দিকী	সদস্য
জনাব মাওলানা কামাল উদ্দিন মুসা খতিবী	সদস্য
জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আমিন সাহেব	সদস্য
জনাব ডা. মুহাম্মদ লোকমান সাহেব	সদস্য
জনাব মাওলানা আবু বকর রফিক আহমদ	সম্পাদক

Chunati.com
Pioneer in village based website

গভর্নিং বডি

সেশন ২৮/০৫/৮৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৩/০৬/৮৬ খ্রিস্টাব্দ

হযত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব	সভাপতি
হযরত শাহ মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব	সহ-সভাপতি
জনাব মাওলানা আবু বকর রফিক আহমদ	সম্পাদক
মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী	সদস্য
আলহাজ্ব মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব	সদস্য
আলহাজ্ব মাওলানা কামালুদ্দীন মুসা সাহেব	সদস্য
আলহাজ্ব মুফিজুর রহমান কোম্পানী	সদস্য
জনাব হাফেজ হারুনুর রশিদ	সদস্য
জনাব আহমদ সাঈদ	সদস্য
জনাব মাওলানা মুসলিম খাঁন	সদস্য
জনাব ডা. মোহাম্মদ লোকমান মিয়া	সদস্য
জনাব মাওলানা শফিক আহমদ	সদস্য
আলহাজ্ব মাওলানা শফিক আহমদ	অধ্যক্ষ

২০/০৫/৭৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে গঠিত এতিমখানা কমিটির একটি রেজুলেশন মর্মে দেখা যায় যে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এতিমখানার সভাপতি। রেজুলেশনের ভাষা হল: অদ্য ২০/০৫/৭৭ খ্রিস্টাব্দে জনাব শহীদ আহমদ খাঁ সহ-সম্পাদক, চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসা এতিমখানা-এর প্রস্তাবে ও জনাব মাওলানা সিরাজুল আরেফীন সিদ্দিকী এম.এ. প্রাক্তন অধ্যাপক, এম.ই.এস, কলেজ, চট্টগ্রামের সমর্থনে শিশুসম পবিত্র আত্মা মহাপুরুষ আল্লাহর ওলি জনাব আলহাজ্ব শাহ সাহেব মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেবকে সভাপতি পদে বরণ করা হয়।

বর্তমানে মাদরাসাটি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে যার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হয়। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ- ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হন অত্র মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দিসে আওয়াল ওস্তাযুল আসাতিযা হযরতুল আল্লামা আবদুল হাই নেজামী সাহেব (ম.জি.আ.)

অতঃপর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হন অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবু নছর আতিক আহমদ, উপাধ্যক্ষ, অত্র মাদরাসা।

Chunati.com Pioneer in village based website

চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসায় বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব পালনকারী সম্মানিত প্রধানগণের তালিকা

বর্তমানে দায়িত্ব পালনকারী সম্মানিত অধ্যক্ষ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। তবে মাদরাসার প্রাপ্ত রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিভিন্ন সময়ে যারা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন তাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল-

১.	হযরত মাওলানা আবদুস সোবহান (রহ.)	১৯৩৭-	১৯৪২
২.	হযরত মাওলানা নুরুল হোসাইন (রহ.)	১৯৪২-	১৯৪৩
৩.	হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ আরকানী (রহ.)	১৯৪৩-	১৯৪৪
৪.	হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.)	১৯৪৫-	১৯৪৮
৫.	হযরত মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের (রহ.)	১৯৪৮-	১৯৬৩
৬.	হযরত মাওলানা শফিক আহমদ (রহ.) (১ম বার)	১৯৬৪-	১৯৭১
৭.	হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ পীর সাহেব (রহ.) (১মবার)	১৯৭২-	২২/৪/১৯৭৬
৮.	হযরত মাওলানা ড. আবু বকর রফিক আহমদ	২৩/৪/১৯৭৬-	৩১/১/১৯৭৭
৯.	হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ পীর সাহেব (রহ.) (২য় বার)	১/২/১৯৭৭-	২১/৪/১৯৮২
১০.	হযরত মাওলানা শফিক আহমদ (রহ.) (২য় বার)	২২/৪/১৯৮২-	৯/৯/১৯৮৬
১১.	হযরত মাওলানা আজিজুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	১০/৯/১৯৮৬-	১৪/৪/১৯৮৭
১২.	হযরত মাওলানা ড.আ.ক.ম. আবদুল কাদের	১৫/৪/১৯৮৭-	৩১/৫/১৯৮৯
১৩.	হযরত মাওলানা আজিজুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	১/৬/১৯৮৯-	৩১/৫//১৯৯২
১৪.	হযরত মাওলানা নুর মুহাম্মদ ওসমানী	১/৬/১৯৯২-	৩০/৬/১৯৯২
১৫.	হযরত মাওলানা আজিজুল হক (ভারপ্রাপ্ত)	১/৭/১৯৯২-	১৪/১১/১৯৯২
১৬.	হযরত মাওলানা মাহমুদুল হক	১৫/১১/১৯৯২-	৩১/৫/২০০৬
১৭.	হযরত মাওলানা আ. ন. আতীক আহমদ (ভারপ্রাপ্ত)	১/৬/২০০৬-	১৫/১/২০০৭
১৮.	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ছাবের হেলালী (ভারপ্রাপ্ত)	১৬/১/২০০৭-	৩১/১২/২০০৭
১৯.	হযরত মাওলানা আ. ন. আতীক আহমদ (ভারপ্রাপ্ত)	১/১/২০০৮-	২৬/১০/২০১১
২০.	হযরত মাওলানা হাফিজুল হক নিজামী	২৭/১০/২০১১-	বর্তমান

মাদরাসার দীর্ঘ জীবন পরিক্রমায় যেসব মহান সাধকগণ শিক্ষকতার মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ওনাদের ক'জন

১.	হযরত মাওলানা আবদুল বারী	১৯৪০-১৯৫৫(মহেশখালী)
২.	জনাব মাস্টার হেলাল উদ্দিন	১৯৪০
৩.	হযত মাওলানা মুহাম্মদ আলী	১৯৪০
৪.	হযরত মাওলানা গোলাম কাদের	১৯৪২ ও তৎপরবর্তী
৫.	হযরত মাওলানা মোছলেহ উদ্দীন	১৯৪২ ও তৎপরবর্তী
৬.	হযরত মাওলানা জামালুদ্দীন ইউসুফ	১৯৪২
৭.	জনাব মাস্টার সুলতান আহমদ (১)	১৯৪২

৮.	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হারুন সিদ্দিকী	১৯৪২ ও তৎপরবর্তী
৯.	হযরত মাওলানা মীর গোলাম মোস্তফা	১৯৪৩-১৯৬৩
১০.	হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ	১৯৪৩-১৯৬২
১১.	হযরত মাওলানা হাশমত উল্লাহ	১৯৪৫-১৯৬৫
১২.	হযরত মাওলানা আবুল হাশেম (শেরে খোদা)	১৯৪৬
১৩.	হযরত মাওলানা ফজলুল্লাহ (নায়েবে আলা)	
১৪.	হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ	
১৫.	জনাব মাস্টার সুলতান আহমদ (২)	
১৬.	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন (খাকী)	১৯৪৮-১৯৬৫
১৭.	হযরত মাওলানা আবদুল হাকিম	১৯৫০ ও তৎপরবর্তী
১৮.	হযরত মাওলানা আবদুন নুর ছিদ্দিকী	১৯৫০-১৯৭৫
১৯.	হযরত মাওলানা জিয়াউল হক	১৯৫২-৬০
২০.	হযরত মাওলানা হাকিম মুনির আহমদ	১৯৫৫
২১.	হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম	১৯৫৫
২২.	হযরত মাওলানা মোজাফ্ফর আহমদ	হেড মাওলানা
২৩.	জনাব মাস্টার মুহাম্মদ আইয়ুব খান	
২৪.	মাওলানা নুরুল কবির নদভী	
২৫.	হযরত মাওলানা আবদুল লতিফ (বাঁশখালী)	
২৬.	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন আরাকানী	
২৭.	হযরত মাওলানা ক্বারী নুরুল হোছাইন	১৯৬১-২০০৫
২৮.	জনাব মাস্টার আবু জাফর	
২৯.	হযরত মাওলানা নেছারুল হক	
৩০.	হযরত মাওলানা আমিন খাঁন রেজভী	উপাধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস
৩১.	হযরত মাওলানা আবদুল হাই নেজামী	উপাধ্যক্ষও মুহাদ্দিস
৩২.	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমিন	মুহাদ্দিস
৩৩.	হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ	মুহাদ্দিস
৩৪.	হযরত মাওলানা কামাল উদ্দিন মুসা খতিবী	
৩৫.	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম	
৩৬.	হযরত মাওলানা আহমদ কবির	
৩৭.	হযরত মাওলানা আহমদ উল্লাহ	মুফতি
৩৮.	হযরত মাওলানা মোস্তফা কামাল	১৯৭৮
৩৯.	হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মোজতবা	১৯৮১
৪০.	হযরত মাওলানা মোজাফ্ফরুল ইসলাম	
৪১.	হযরত মাওলানা আহমদ আলী	উপাধ্যক্ষ ও মুহাদ্দিস
৪২.	হযরত মাওলানা ফৌজুল কবির	

Ghumati.com pioneer in village based website

চুনতীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দরদ

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অন্যতম এক আদর্শ ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দরদ রাখা। তিনি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতি দরদ রাখতেন, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাওয়াত দিলে তিনি তা গ্রহণ করে নিতেন। শুধু তাই নয়, তিনি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতেন ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে পকেট থেকে না গুনে টাকা দিয়ে আসতেন।

অনুরূপভাবে চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া ছাড়াও চুনতী হাকিমিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুনতী উচ্চ বিদ্যালয় এবং চুনতী মহিলা কলেজের প্রতি দরদ রাখতেন। তিনি সময় ও সুযোগ পেলেই এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিসে গিয়ে বসতেন, খোঁজ-খবর নিতেন। স্বীয় ইচ্ছায় যেতেন স্বীয় ইচ্ছায় আবার চলে আসতেন। কোন সময় অল্পক্ষণ বসতেন কোন সময় দীর্ঘক্ষণ বসতেন। মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) উপলক্ষে বা অন্য কোন সময় দেশের রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মোলাকাতে চুনতী গেলে অনেকে চুনতী মাদরাসার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পরিদর্শন করতেন।

পরিদর্শনকালে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাক বা না যাক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাবমূর্তির সহায়ক হত তা অস্বীকার করা যাবেনা।

অপরদিকে, চুনতী ফাতেমা বতুল মহিলা মাদরাসা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকাল পরবর্তী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপরেও এ প্রতিষ্ঠানটি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মত আর্থিক ভাবমূর্তিসহ কোন না কোনভাবে লাভবান হচ্ছে তা অস্বীকার করা যাবেনা।

এখানে উল্লেখ্য, চুনতী হাকিমিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে, চুনতী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, চুনতী মহিলা ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে, চুনতী ফাতেমাবতুল মহিলা সিনিয়র মাদরাসা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবদ্দশায়।

Chunati.com
Pioneer in village based website

Chunati.com
Pioneer in village based website

উস্তাযুল আসাতেযা হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ
সাবেক মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা

✪ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায় পরিচালনা কমিটির সদস্যদের হাজারো আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে কামেল স্তর খোলার পরে যখন এর ব্যয়ভারের কারণে ওনাদের সাহস হারিয়ে যায় তখন ওনারা সেটাকে মুলতবি করে দেন। অতঃপর ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওলিয়ে কামেল আশেকে রাসূল (স.) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) স্বীয় বিশেষ রূহানি তাওয়াজ্জুহ দ্বারা মাদরাসার পরিচালনা কমিটির সদস্যদেরকে সাহস যোগায়ে ঐ সিদ্ধান্তকে নিজের হাতে নিয়ে যথাযথ তদবিরের মাধ্যমে সরকারি মাদরাসা বোর্ডের কাছ থেকে মঞ্জুরির ব্যবস্থা করেন। যেহেতু হাকিমিয়া মাদরাসার এ পরিপূর্ণতা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ওসিলায় হয়েছে সুতরাং কামেল স্তরের সূচনা বিশেষভাবে ওনাকে স্মরণীয় করে রাখবে। বাকি মাদরাসার উন্নতি মাদরাসার সদস্যবৃন্দ ও তোলাবায়ে সাবেকীনের চেষ্টা সাধনার উপর নির্ভর করবে।

✪ করামত : একদা বাঁশখালী থেকে একজন লোক এসে বললেন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে আমি এখন বাঁশখালীতে দেখে এসেছি। কিন্তু এসে দেখছি তিনি খলিফার পাড়ায় আগেই এসে বসে বসে কিতাব দেখছেন।

প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান
প্রথম মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সাবেক উপাচার্য, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়

✪ ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর বিয়ের সময় আমার বয়স ৭/৮ বৎসর। আমার এখনো স্মরণে আছে যে, যেহেতু চাচাতো বোনের সাথে বিয়ে হচ্ছে, ঘর খুব কাছে সেহেতু ওনার থানজান সাজায়ে ওনাকে নিয়ে চুনতীর বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে আবার কনের বাড়িতে আসে।

✪ বিয়ের পর ওনার নানা শ্বশুর চকরিয়ার জমিদার খান সাহেব মকবুল আলী চৌধুরী ইলিশিয়ার মসজিদের ইমাম হিসেবে ওনাকে নিয়ে যান। তথায় ইমাম থাকা অবস্থায় আমি একবার বেড়াতে গিয়ে ২/৩ দিন ছিলাম।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মজযুব অবস্থায় মাঝে মাঝে চুনতী থাকতেন। প্রথম প্রথম ওনাকে যখন ঘরে আটকিয়ে রাখা হয় তখন শেষ রাত্রে হযরত রাসূলে করিম (স.) এর শানে বড় বড় আওয়াজে না'ত শরিফ পড়তেন যা আমাদের ঘর থেকে শুনা যেত।

হযরত মাওলানা কুতুব উদ্দীন
পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মা দরজাত ওলি ছিলেন। বংশগতভাবে উচ্চ পর্যায়ের সন্তান ছিলেন। আশেকে রাসূল (স.) ফানা ফির রাসুল (স.) ও ফানাফিল্লাহ ছিলেন। তাঁর অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে।

✪ চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর করামত ও দোয়ার ফসল। আরাকান সড়ক থেকে চুনতী গ্রামের দিকে যাওয়া রাস্তার সংস্কার ও পাকা ওনার ওসিলায় হয়েছে।

✪ আজ পর্যন্ত ১৯দিন ব্যাপী মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) সুচারুরূপে চলে আসা ওনারই করামত।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ছোট ছেলেমেয়ে ও মহিলাদের খানার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।

✪ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রথম হজব্রত পালন করেন। সে বছর আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় হযরত কেবলা শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতর (রহ.) মীনায় ইন্তেকাল করেন।

প্রফেসর ড. এ.এম.এম. আবদুল গফুর চৌধুরী
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

✪ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামিয়া ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ফাযিল পড়া অবস্থায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে প্রায় সময় দেখা হত। তখন ওখানে জঙ্গল ছিল বিধায় তিনি তথায় নিয়মিত যেতেন।

✪ একদা মিসকিন শাহ (রহ.) এর মাজারের ওরশ শেষে রাত্রে খাবারের ডেকসহ অন্যান্য আসবাবপত্র পাহারা দিচ্ছিলেন আবদুর রজ্জাক নামে এক ব্যক্তি। গভীর রাতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এসে আবদুর রাজ্জাককে বললেন, তুমি কতক্ষণ ঘুমাও আমি পাহারা দিব। সকালে আবার আবদুর রাজ্জাককে পাহারা দিতে বলে নিজে চলে গেলেন।

✪ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমরা দারুল উলুম মাদরাসায় পড়া অবস্থায় হঠাৎ ক্লাশে গিয়ে বসে যেতেন। আবার কিছুক্ষণ পর বকাঝকা করে নিজ থেকে চলে যেতেন।

✪ চট্টগ্রাম ওয়াজেদিয়া আলীয়া মাদরাসায়ও হযরত শাহ সাহেবকে অনেক সময় দেখা যেত।

প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

✪ আমি আমার আব্বাজান (চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার হেড মাওলানা) এর সাথে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পুরাতন বাড়ীতে ১০/১১ বৎসর ছিলাম ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে। সাথে আরো ৪/৫ জন শিক্ষক থাকতেন। ওনার ১০/১১ বৎসর বয়সে আম্মাজান ইন্তেকাল করেন। তিনি চুনতী এলাকায় কোন চায়ের দোকানে বসতেন না। বাইরে অন্য জায়গায় গেলে অবশ্য দোকানে বসতেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হঠাৎ করে মাসে ২/৩ বার চুনতী আসতেন। তখন সারা শরীরে, দাড়ি ও চুলে 'আডালি' দেখা যেত। ওনার চাচী ও শাশুড়ি সেগুলো আস্তে আস্তে নিয়ে ফেলতেন। ওনার সেবাযত্নের ব্যাপারে অত্যাধিক যত্নবান থাকতেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ব্যাপারে চুনতীর মানুষের ভালমন্দ কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। ওনার মজযুব অবস্থায়ও লোকেরা ওনাকে শাহ সাহেব বলে অভিহিত করতেন। তবে তিনি তখন মানুষের সাথে খুব কম কথা বলতেন।

✪ চট্টগ্রাম মহানগরের গাড়ির ড্রাইভাররা ওনাকে অত্যাধিক সম্মান করতেন। যেখানে দেখতেন সেখানে তুলে নিতেন।

✪ একদা মুষলধারে বৃষ্টি পড়া অবস্থায় একজন লোক ওনাকে ছাতার নিচে আসতে বললে শাহ সাহেব বললেন, তুমি ছাতার নিচে থাক। আমার ছাতা হচ্ছে আসমান।

প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ
উপ-উপাচার্য
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে একজন দেশখ্যাত ব্যক্তিত্বের ইন্তেকালের পর তাঁর স্মরণে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী তথা মরহুম মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) এর মৃত্যুর পরেও এমনটি আশা করা গিয়েছিল। আসলে এ বিষয়ে বর্তমানে পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের এবং শাহ সাহেবের পৌত্রদের যে কোন পরিকল্পনা ছিল না তা নয়। বরং হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র দুই জ্যেষ্ঠ পৌত্র তথা আযাদ-নাজাত ভ্রাতৃদ্বয় একাধিকবার তাদের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করে আমার কাছে এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করেছিল।

আমিও এ ব্যাপারে মোটামুটি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম যে শাহ্ সাহেব নানার উপর প্রকাশিতব্য স্মারকে যতটুকু সহযোগিতার দরকার তা দিয়ে যাব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে শাহ সাহেবের ইন্তেকালের পর দেখতে দেখতে ২৩ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল কিন্তু তাঁর উপর একটি স্মারক গ্রন্থ্ প্রকাশের সুযোগ হয়ে উঠলো না কারও।

বিগত জানুয়ারি মাসে বিশিষ্ট লেখক ও সমাজকর্মী জনাব আহমদুল ইসলাম সাহেব যোগাযোগ করে জানালেন যে তিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উপর একটি জীবনী গ্রন্থ রচনার কাজে বহদূর এগিয়ে গেছেন। এতে একটা লেখা প্রদানের অনুরোধ করে বললেন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

তিনি এমন সময় আমার কাছে অনুরোধটি করলেন যখন আমি অন্তত পক্ষে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অনেকটা দিশেহারা অবস্থায়। এদিকে জনাব আহমদুল ইসলাম সাহেবকে অপরাগতার কথাও বলা যাচ্ছে না। তাই বললাম, চেষ্টা করে দেখবো।

দেখতে দেখতে কবে যে দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেল আমি তা টেরও পাইনি। মনে করলাম এখন আর লেখার সুযোগ নেই। কিন্তু পুরো দু'মাস পেরিয়ে যাবার পর অগত্যা কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলাম। এবারের টার্গেট কিন্তু কোন গবেষণাধর্মী ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনা নয় বরং স্মৃতির জগতে বিচরণকারী হাজারো বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য হতে বাছাই করা কিছু ঘটনাকে শব্দের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার একটি প্রয়াস মাত্র।

✪ জনাব আহমদুল ইসলাম সাহেবকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। তিনি চুনতীর অধিবাসী না হয়েও চুনতীর এক কিংবদন্তীর নায়কের স্মরণে একটি গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে হাত দিলেন। তিনি বহু দেশের সফরের অভিজ্ঞতা সম্বলিত বর্ণনার গ্রন্থসহ যে কয়টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায় এ মহতী উদ্যোগটিও তার সফল কীর্তির তালিকায় একটি মূল্যবান সংযোজন।

✪ ছোটবেলা থেকে যাকে একজন নিকট আত্মীয় ও মুরব্বী হিসেবে দেখেছি, যার বিভিন্ন হাল আহওয়ালের সাক্ষী হওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করেছি তার স্মৃতিচারণ স্বাভাবিকভাবে অন্য দশজন ভক্ত অনুরক্তের অনুভূতি হতে ভিন্নতর হবে, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যাঁর স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে আজ কলম ধরলাম তিনি ছিলেন মহামহীরূহতুল্য বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর মধ্যে লুকিয়ে ছিল বহুমুখী প্রতিভার (Multi-dimentional talent) অনেক

নির্দশন। তাঁকে যিনি যেভাবে দেখেছেন সে দিকটাই তার নিকট মূখ্য মনে হয়েছে।

✪ অনেকে তাঁকে দেখেছেন একজন মজযুব হিসেবে, তাই তার কাছে শাহ সাহেব একজন মজযুব হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছেন। অনেকে দেখেছেন তাঁকে একজন খ্রীস্টান্দেক হিসেবে। তাঁর কাছে ইনার সুলুকের চরিত্রই মুখ্য হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে দেখেছেন তাঁকে দান ও দয়ার প্রতীক রূপে। তাঁর কাছে তিনি একজন দানবীর ও দয়ার বিরল উদাহরণ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন। পক্ষান্তরে, কোন কোন লোককে তাঁর প্রতি এত ভীতসন্ত্রস্ত থাকতে দেখা গিয়েছে যে সে তাঁর মুখোমুখি হতেই তিনি এক রুদ্র মূর্তি ধারণ করা ব্যক্তিতে পরিণত হতেন। কারো কাছে তিনি ধরা দিতেন এক বিনয়ী অনুগত হিসেবেও। আবার কারও কাছে তিনি বিবেচিত ছিলেন মনের গোপন কথার শরিকদার এক অন্তরঙ্গ রূপে।

হয়ত শুনে বিস্মিত হবেন যে তাঁকে এমনও দেখা গেছে যে, তাঁর নিকট থেকে দোয়া নেয়ার জন্য হাজির হয়েছেন দেশের শাসক নিজেই। কিন্তু তিনি সকলের চোখে ধুলা দিয়ে লুকিয়ে রয়েছেন কোনও এক অজানা স্থানে। কোন পরোয়া নেই, প্রেসিডেন্টকে তাঁর সাক্ষাত লাভে ব্যর্থ হয়ে নিরাশ মনে ফিরে যেতে হচ্ছে কিনা?

যাই হোক, আমি আমার এ প্রবন্ধে একজন ভক্ত ও অনুরক্তেরে দৃষ্টিতে শাহ সাহেবকে বিচার না করে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে শাহ সাহেবকে কিভাবে দেখেছি তাই উপস্থাপনের প্রয়াস পাব। এ দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আমার এ প্রবন্ধটি প্রচলিত ধারা হতে একটু ভিন্নধর্মী হতে বাধ্য। আশা করি পাঠকবৃন্দ এ প্রয়াসকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখবেন না। বরং প্রচলিত ধারায় রচিত।

বুযুর্গদের জীবনী গ্রন্থে স্থান পাওয়া অনেক করামতের বর্ণনা ও অলৌকিকত্বের ব্যাখ্যা সম্বলিত অনেক স্মৃতিলেখ্য রচনার পাশাপাশি এ লেখাটি কিছুটা ভিন্নতা দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

বাল্যকালে দেখা শাহ সাহেব

✪ পঞ্চাশের দশকের আগে শাহ সাহেবের কোন ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে না। আমার জীবনের সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে তা হলো- ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা। তখন আমার বয়স ছয় বছর মাত্র। এ সময় থেকেই শাহ সাহেবের কথাও আমার মনে আছে। তিনি ছিলেন আমার নানী সাহেবার জেঠাতো ভাই এবং বয়সে তার চাইতে চার বছরের কনিষ্ঠ।

আমার নানা ছিলেন মরহুম শাহ সাহেবের উস্তাদ এবং ফুফাত ভাই। শাহ সাহেবকে দেখেছি আমার নানীর প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করতে এবং নানার প্রতি বড় ভাই ও ওস্তাদ হিসেবে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করতে। নানাকে দেখার সৌভাগ্য না হলেও শাহ সাহেব কর্তৃক আমরা ভাই-বোনের নানাতুল্য স্নেহে সিক্ত ছিলাম সর্বদাই।

✪ শাহ সাহেব নানা আমার নানী মরহুমার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তা বুঝার জন্য একটি উদাহরণ এখানে পেশ করতে চাই। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত শাহ সাহেব ছিলেন চূড়ান্ত জযবের ভুবনে। দিবারাত্র ছিল তাঁর জন্য একাকার। আহার বিহার, নিদ্রা ও বিশ্রাম, কোন কিছুর প্রতি তাঁর তেয়াক্কা ছিল না। এমনকি এক নাগাড়ে কয়েকদিন ধরে গহীন বনেও কাটিয়ে দিতেন। হঠাৎ করে এসে হাজির হতেন আমার মাতুলালয়ে তথা মরিয়মের মা বুবুর বাড়িতে।
বুবুর সাথে দেখা হওয়া মাত্রই শাহ সাহেব যেন এক সুবোধ বালক। মায়ের প্রতি ছেলে যেরূপ অনুগত অনেকটা তাই। নানীকে আদরমিশ্রিত কণ্ঠে বলতে শুনতাম: "ভাই হাফেজ, তুমিতো কয়েকদিন ধরে খাওয়া দাওয়া করনি। একটু মুখ হাত ধুয়ে আস। কিছু খেয়ে নাও।" তখনই শাহ সাহেব নানাকে দেখতাম, বুবুর কথা মাথা পেতে নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসতে। আমার মামার বাড়িতে একটি ফিতার তৈরি বিশেষ ধরনের খাট ছিল, তা ছিল একেবারে শাহ সাহেবের জন্য সংরক্ষিত। আজমগড়ী (রহ.) তশরিফ আনলে এই খাটে আরাম করতেন। এ খাটে তিনি মাঝে মধ্যে এক নাগাড়ে দু'তিনদিন ধরে ঘুমিয়ে থাকতেন। যখন ধুমপান করতেন তখন এক নাগাড়ে ৫/৭টি সাবাড় করতেন। তার জন্য এক বিশেষ ধরনের চায়ের প্রয়োজন হতো। যা এত কড়া ছিল যে সাধারণ লোকের পক্ষে গলধকরণ করা সম্ভব ছিল না।
তদুপরি এ চা প্রায়ই দুধ চিনিবিহীন হতো। মাঝে মধ্যে কাপের তলায় কিছু অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমাদের দিকে কাপটি বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, নাতি ইহা খেয়ে নাও। ইহা ছিল আমাদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা। তেতো স্বাদের জন্য খাওয়া দুষ্কর আবার শাহ সাহেবের উচ্ছিষ্ট প্রাপ্তির জন্য নিজেকে মনে করতাম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

✪ আমার সর্বজ্যোষ্ঠা মামাত বোন নুরুন নাহার বেগম ছিলেন আমাদের জন্য ঈর্ষার পাত্র। তিনি সুযোগ পেলেই শাহ সাহেবের জামা কাপড় পরিস্কার করে দেয়ার চান্স না নিয়ে ক্ষান্ত হতেন না। আমরা ধুয়ে দিতে চাইলে তিনি বারণ করলেও নুরুন নাহার আপাকে কখনও বাধা দিতেন না। তিনি ছদাহা নিবাসী মরহুম মাওলানা আবুল খায়ের সাহেবের পৌত্রবধু।

✪ পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে (সম্ভবত ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে) হযরত শাহ সাহেবের পিতার ইন্তেকালের পর তিনি প্রায় সময়ই নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন। তখনও কদিন অন্তর আমার নানী তথা মরিয়মের মা বুবুর সাক্ষাতে হাজিরা দেয়ার দায়িত্বের কথা ভুলতেন না। সম্ভবতঃ বুবুর মুখ নিঃসৃত স্নেহভরা সম্বোধন তথা "ভাই হাফেজ, তুমি ক্ষুধার্ত দেখছি, কিছু খেয়ে নাও" তিনি কখনও ভুলতে পারতেন না। তিনি বলতেন বাল্যকালে আমার মা মারা গেলে আমার বুবু আমায় লালন পালন করেছেন।

✪ আমি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চুনতী মাদরাসার ছাত্র ছিলাম। এ সময় তিনি তাঁর বাড়িতে অথবা আমাদের মামার বাড়িতেই অবস্থান করতেন। তাই সুযোগ পেলেই আমি তাঁর কাছে হাজির থাকার চেষ্টা করতাম। বিশেষ করে আমার মামার বাড়িতে অবস্থান করলে আমার উপস্থিতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমার মামার তখন এমন কোন উপযুক্ত ছেলে সন্তান ছিল না যে আগত মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাবে অথবা তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। অবশ্য ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে নতুন বাড়িতে স্থানান্তরের পর তথায় এক জমজমাট দরবারের মত অবস্থা সৃষ্টি হয় আর এ সময়ে আমিও কামিল শ্রেণিতে অধ্যয়নের জন্য ঢাকা আলিয়াতে গিয়ে ভর্তি হই। আমি সুযোগ পেলে শাহ সাহেবকে পা টিপে দেয়ার চেষ্টা করতাম।
সাধারণ লোকেরা এসে তাদের নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, রোগমুক্তি, মামলা মোকদ্দমায় জয়ী হওয়া ইত্যাকার সমস্যার কথা জানিয়ে দোয়া চাইতেন। এতে তিনি মাঝে মধ্যে খুবই রেগে যেতেন এবং বলতেন, হায়রে মানুষ শুধু দুনিয়ার উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য দোয়া চাস। কাউকে দেখি না আখিরাতে মুক্তির পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য দোয়া চাইতে।

✪ একবার এক হিন্দু এসে তাঁর প্রতি ভক্তি সহকারে গদগদ কণ্ঠে বলল, ইনিতো একেবারে অবতার এবং এ বলে যখনই তাঁর পদযুগল চুম্বন করতে চাইল তখন তিনি তাঁর পা দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিলেন আর ঐ ব্যক্তিটি একেবারে চিৎপটাং। অতঃপর তাকে এ বলে গালিগালাজ করতে লাগলেন, তুই কি আমাকে খোদা বানাতে চাস। এখনই দুর হ এখান থেকে।" লোকটি চলে গেলে তিনি ক্ষান্ত হন।

✪ আলেমদের আগমনে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। কয়েকজন আলেম একত্রিত হলে তিনি কুরআনের কোন আয়াত অথবা কোন হাদিস পাঠ করে তার ব্যাখ্যা করতে বলতেন। এতে আলেমদের সাথে তিনি নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজে যে ব্যাখ্যাটি দিতেন তাতে আলেমরা অবাক হয়ে যেতেন তাঁর ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা দেখে। বলা বাহুল্য, শাহ সাহেব নিজেই

Chunati.com pioneer in village based website

এক উচুঁদরের আলেম ছিলেন এবং যৌবনকালে রেঙ্গুনের একটি মসজিদের খতিব (পেশ ইমাম) হিসেবে অনেকদিন দায়িত্ব পালন করেন।

সীরত সেমিনারের প্রবর্তন:

✪ শাহ সাহেবের অবদানের উপর আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করতে হয় সীরত মাহফিলের কথা। যারা সীরত মাহফিলকে প্রচলিত অর্থে মিলাদ মাহফিল কিংবা ওয়াজের আসর মনে করবেন তাদের জন্য এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। অবশ্য যারা এ মাহফিল অনুষ্ঠানের পটভূমি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত তারাই শুধু এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশে এমন এক অবস্থা বিরাজ করছিল যে, ইসলামের কথা বলাই যেন অপরাধ বলে বিবেচিত ছিল। আবহমান কাল ধরে এ দেশের প্রচলিত ইসলামি ওয়াজ মাহফিল একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় শাহ সাহেব ভাবলেন দেশের মানুষকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি ও দিশা দিতে পারে একমাত্র রাসূল (স.) এর জীবনী ও আদর্শ তথা সীরতের আলোচনা। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঘোষণা করলেন ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষে পুরোদিন ব্যাপী ও গভীর রাত অবধি সীরতের আলোচনা অনুষ্ঠানের কথা।

পরবর্তী বছর সিদ্ধান্ত দিলেন যে এ সীরত মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে তিনদিন ব্যাপী। তখন মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসার নাজেমে আ'লা। তিনি বললেন এ সীরত মাহফিলকে অর্থবহ করতে হলে একে মহানবী (স.) এর জীবনী ও আদর্শ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত করে একটি সেমিনারের আদলে রূপ দেয়া দরকার। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে সহযোগী নির্বাচিত করলেন।

আমরা দু'জনে বসে অন্ততঃ বিশটির মত আলোচ্য বিষয় ঠিক করলাম। এবার বক্তা নির্বাচনের পালা। চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়াও বাংলাদেশের স্বনামধন্য বক্তাদের দাওয়াত দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমি প্রস্তাব করলাম ঢাকায় গেল বছর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী নামক এক আলেমের বক্তব্য শুনে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। তাকে দাওয়াত দেয়া হলে শ্রোতাগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। আমার প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং তাকে দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয় আমারই উপর। আমি হাফেজ হারুনুর রশীদকে সাথে নিয়ে ঢাকায় গিয়ে তাকে মাহফিলে আসার জন্য রাজি করাই। এভাবে তিনি চুনতীর সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলে বক্তব্য রাখার পর জনপ্রিয়তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতি বছর শেষ দিবসে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে তিনি বক্তব্য দিতে থাকেন।

✪ প্রতি বছর সীরতুন্নবী মাহফিলের সময়কাল দু'দিন করে বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে ১৯ দিনের মাহফিল তথা রবিউল আউয়াল মাসের ১১শ দিবসের রাত্রি হতে শেষ দিবস পর্যন্ত এ মাহফিল চলতে থাকে। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। এখন চুনতীর শাহ সাহেব কর্তৃক প্রবর্তিত সীরতে আলোচনার এ ধারাও সারা দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং মহানবী (স.) এর শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে এ সীরত মাহফিলসমূহ যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

✪ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমার উচ্চ শিক্ষার্থে সুদান গমনের পূর্ব পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা ফজলুল্লাহ ছিলেন সীরত মাহফিলের নির্বাহী পরিচালক এবং আমি ছিলাম তার প্রধান সহকারী। সীরতের বিষয়বস্তুর তালিকা তৈরি করার মূল দায়িত্ব ছিল আমারই। মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব তা প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর চূড়ান্ত করে দিতেন। তা ছাড়া মাহফিলে কর্মসূচি ঘোষণার মূল দায়িত্বও ছিল আমারই উপর। এতে সহযোগিতা করতেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা উসমান গনি ও ঈসা শাহেদী প্রমুখ।

✪ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সুদান চলে যাওয়ার পর আমার সুদানে অবস্থান কালেই মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব ইন্তেকাল করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন ব্যস্ততা ও আমার কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের কারণে আমি আর সীরত মাহফিলের পরিচালনায় আগের ন্যায় সম্পৃক্ত থাকতে পারিনি।

চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসাকে কামেল স্তরে উন্নীতকরণ:

✪ চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসাটি ছিল দক্ষিণ চট্টগ্রামের একটি স্বনামধন্য ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চুনতী মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। সত্তরের দশক পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল বার্মা হতে আগত আরাকানি শিক্ষার্থী। তাই সকলেই আন্তরিকভাবে কামনা করত যে এ মাদরাসাটি কামিল স্তরে উন্নীত হোক, শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে। হযরত শাহ সাহেবেরও এ মাদরাসার প্রতি এক বিশেষ আগ্রহ। শাহ সাহেবের আগ্রহে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত উদ্যোগ নেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানে কামিল ক্লাস চালু করে একে আলিয়া মাদরাসায় উন্নীত করার। রীতিমত কামিল শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তিও করানো হয়। মুহাদ্দিস নিয়োগ দানেরও ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারি অনুমোদনের জন্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে যথারীতি আবেদনও করা হয়। কিন্তু ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পুরো মাদরাসা শিক্ষাই বন্ধ করে দেয়ার জন্য ধর্ম

নিরপেক্ষ জনগোষ্ঠীর পক্ষ হতে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাবি উঠার কারণে এ উদ্যোগ আর সাফল্যের মুখ দেখেনি। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় মাওলানা নজির আহমদ সাহেবের বিশেষ ভূমিকা ও পরবর্তীতে এ মাদরাসার উন্নয়নে তার বিশেষ অবদানের কারণে এ মাদরাসাটি হুযুরের মাদরাসা নামে পরিচিতি লাভ করে। হযরত শাহ সাহেব ছিলেন মাওলানা নজির আহমদের মামাত ভাই এবং প্রিয় ছাত্র। তাই এ প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপর বর্তায়।

✪ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আমি চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করি। এর পরপরই হযরত শাহ সাহেব নির্দেশ দিলেন চুনতী মাদরাসাকে কামিল স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে পূণরায় উদ্যোগ নেয়ার জন্য। এর জন্য যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এমন একজন প্রধান মুহাদ্দিস নিয়োগ দেয়া যিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে হাদিসের দরস দিতে সক্ষম।

তখন আমি প্রস্তাব দিলাম যে আমার এক বন্ধু ও এককালের সহপাঠী মাওলানা আবদুল হাই নিজামী কুমিল্লা আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে কর্মরত আছেন। তাঁকে কোনভাবে একবার চুনতীতে নিয়ে এসে শাহ সাহেবের সম্মুখে যদি হাজির করানো যায় এবং শাহ সাহেব তাকে অনুরোধ করেন তাহলে হয়ত তিনি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন না। সিদ্ধান্ত হয় তার সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাকেই। আমি আমার সাথে হাফেজ হারুনুর রশীদকে নিয়ে যাওয়া শ্রেয় মনে করলাম।

কুমিল্লায় গিয়ে তার কাছে প্রথমে চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস পদে যোগদানের প্রস্তাব দিলে তিনি তেমন আগ্রহ দেখালেন না। অবশেষে তাকে আমরা অন্তত এ বিষয়ে রাজি করাতে সক্ষম হলাম যে তিনি একবার চুনতীতে তশরিফ আনবেন এবং শাহ সাহেবের সাথে মোলাকাত করবেন। তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন এবং অবশেষে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এ মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস পদে যোগদানও করলেন।

দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এক নাগাড়ে প্রধান মুহাদ্দিস পদে নিয়োজিত থেকে তিনি শত সহস্র শিক্ষার্থীকে হাদিসের জ্ঞান দান করে যান। তাছাড়া চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসারই দু'জন সিনিয়র শিক্ষক যথাক্রমে মাওলানা মুহাম্মদ আমিন সাহেব ও মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেবকে ২য় ও ৩য় মুহাদ্দিস হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ঐ বছরই কামিল হাদিসের অনুমোদন লাভ করা হয়। এটা আমার জন্য এক পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমি চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত থাকা কালেই এ মাদরাসাটি আলীয়া স্তরে উন্নীত হয় এবং এর পেছনে যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও চালিকা ভূমিকা পালন করেন তিনি ছিলেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.)।

এর পরপরই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেলে শাহ সাহেব নানা আমাকে বাধা দেয়ার পরিবর্তে বরং উৎসাহিতই করেন। আমি তাঁর প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। তিনি সেদিন আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার পথে বাধা দিলে আজ আমার পক্ষে দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গুরুদায়িত্ব পালন করার এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কোন সুযোগ আসত না।

প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতিবী

বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মুহিব্বে রাসূল হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) এর ইন্তেকালের তেইশ বছর পর বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর জীবনী রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। লেখক আমাকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত দু'একটি ঘটনা লিখে পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করেছেন।

উল্লেখ্য, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) পরলোক গমনের অব্যবহিত পরেই 'চুনতীর শাহ সাহেব (রহ.)' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ আমি রচনা করেছিলাম, যা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের মাসিক 'দ্বীন-দুনিয়ার' কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত উক্ত মাসিকের একটি কপিও বর্তমানে আমার কাছে সংরক্ষিত নেই। প্রচুর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে আমি এ দীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। একজন মহান ব্যক্তিত্বের উপর একটি প্রবন্ধ রচনার তেইশ বছর পর তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণমূলক কিছু লেখা একই লেখকের পক্ষে কত দুরূহ কাজ তা শিক্ষিত ও বিদগ্ধজনেরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। লেখকের অনুরোধ রক্ষার্থে আমার স্মৃতি বিজড়িত দু'একটি ঘটনা প্রদত্ত হল:

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সম্পর্কের দিক দিয়ে আমার মামা (আম্মার মামাতো ভাই) হলেও চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে চিনতাম না। চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর একজন দীপ্তিমান চেহারাসম্পন্ন কোরতা পরিহিত প্রাণপুরুষকে এ মাদরাসায় আসা-যাওয়া করতে দেখতাম। অধিকাংশ সময়ই তাঁর মাথায় টুপি না থাকলেও কোন কোন সময় ফুলের টুপি থাকত। লোকজন তাঁকে হাফেজ মামা বলে ডাকত। আমিও হাফেজ মামা বলে শ্রদ্ধাভরে তাঁকে স্মরণ করতাম। আমি আমার খালুজান মাওলানা মুহাম্মদ দানেশ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করে চুনতী মাদরাসায় অধ্যয়ন

করতাম। সেখানে হাফেজ মামা প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। একদিন তিনি সেখানে উপস্থিত হলে আমার খালা তাঁর কপালে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই তোমার কপাল আগুনের মত গরম।" তিনি বললেন, "বুবু আমি কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছি।" আমার খালা থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, সত্যি সকলের হাফেজ মামা আসলেই আমার মামা। তাঁর সাথে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি জাযবের অবস্থায় ছিলেন। উল্লেখ্য, আল্লাহর প্রেমিকদের কেউ কেউ আল্লাহর আকর্ষণ ও মহব্বতে বিভোর থাকেন। তখন তাঁদের মাঝে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে। এ অবস্থাকে আরবি ভাষায় জাযব বলে। এ রকম অবস্থা যাঁর মাঝে বিরাজমান থাকে তাঁকে মজযুব বলা হয়।

✪ একদা চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসার উস্তাদগণ এবং ছাত্রবৃন্দ চুনতীর জামে মসজিদে যুহরের সালাত আদায় করার জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন। এ মাদরাসার তৎকালীন সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আবু তাহের মুহাম্মদ নাজের (রহ.) ইমামতির জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ মাওলানা হাফেজ আহমদ (যিনি তখনো শাহ সাহেব হিসেবে পরিচিত হননি) উচ্চস্বরে কুরআনে পাকের আয়াত তেলাওয়াত করতে করতে মসজিদে প্রবেশ করেন। সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব শাহ সাহেব কেবলার দিকে একনজর তাকিয়ে সালাতুয-যুহর শুরু করে দেন। যুহরের সালাত সম্পাদনের পর আমরা দেখতে পেলাম হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সূরা ত্বোয়াহার এ আয়াত দু'টি উচ্চস্বরে ক্রন্দনরত অবস্থায় তিলাওয়াত করছেন।

"وماتلك بيمنك يموسى قال هى عصاى ج

أتو كؤاعليها واهش بها على غنمى ولى فيها مارب اخرى"

"হে মুসা, তোমার ডান হাতে সেটা কি? তিনি বললেন, এটি আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দিই এবং এটি দিয়ে আমার মেষপালের জন্যে পাতা পাড়ি। এটি আমার আরো অনেক কাজে আসে।"

তখনও এ আয়াতের মর্ম অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। পরবর্তীতে অর্থ ও তাফসির সহকারে এ আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করার পর বুঝতে পারলাম যে, এর মধ্যে ছিল হযরত মুসার (আ.) সাথে আল্লাহর কথোপকথনের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা।

আরবি অলংকারশাস্ত্রের ছাত্রগণ অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, এ আয়াতদ্বয়ে কুরআনুল করীমের শৈল্পিক সৌন্দর্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এবং পুঞ্জিভূত হয়েছে রুহানিয়্যাতের খোরাক। এ জন্যেইতো শাহ সাহেব (রহ.) আয়াত দু'টি পুন: পুনঃ তিলাওয়াত করে আল্লাহর নৈকট্যের স্বাদ গ্রহণ করছিলেন।

✪ চুনতীর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত খান দিঘির পশ্চিম পাড়ে একটি মসজিদ রয়েছে। এ দিঘির মনোরম পরিবেশে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে চুনতী মাদরাসার কতক প্রাক্তন ছাত্র বনভোজনের আয়োজন করেন। এতে আমিও শরিক ছিলাম। সালাতুল-আসরের আযানের প্রাক্কালে হঠাৎ হযরত শাহ সাহেব কেবলা উপস্থিত হন এবং আমাদের সাথে সালাতুল আসর আদায় করেন। সালাত শেষে ইমাম সাহেব মুনাজাত শেষ করেন। এরপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মুনাজাত সহকারে চট্টগ্রামের ভাষায় দু'আ আরম্ভ করেন। আমরা উপস্থিত সবাই এ মুনাজাতে শরিক হই। মুনাজাতের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, "হে আল্লাহ তুমি এদেশকে পাকিস্তান বানিয়ে দাও।" মুনাজাত শেষে, আমরা সবাই বিস্মিত হই।
তাঁর এ দু'আর রহস্য প্রথমে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। কিন্তু এতটুকু অনুভূত হয়েছিল যে, এ দু'আ দেশে আমুল পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। অনুরূপভাবে এক বছরের মধ্যেই দেশের রাজনীতির পটপরিবর্তন হয়। আল্লামা ইকবাল কতইনা সুন্দর বলেছেন-

ز بروں در گزشتم ز دروں خانہ گفتم — سخنے نہ گفتہ را چہ قلندرانہ گفتم

"গৃহের দ্বারপ্রান্তে বিচরণ করেও অন্তঃপুরের সংবাদ পরিবেশন করতে পারি। কিন্তু কথা পূর্বে না হলে কি করে কালান্দার উপাধিতে ভূষিত করবো।"
শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে আমার আঁব্বা হাফিজুল হাদিস মাওলানা মাহমুদুল হক খতিবীর (ওফাত ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ) নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আমার আব্বা যখন কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় হাদিস অধ্যয়ন করছিলেন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তখন উক্ত মাদরাসায় হায়ার স্ট্যান্ডার্ড শ্রেণীর (বর্তমান ফাজিল) ছাত্র। আত্মীয়তা এবং আমার আব্বার সাথে রুহানি সম্পর্কের কারণে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) অনেকবার আমাদের বাড়িতে তশরিফ এনেছেন।
একবার হযরত শাহ সাহেব (রহ.) খতিবিয়া মাদরাসার সভা উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে আগমন করেন। সেদিন প্রসঙ্গক্রমে ঘরোয়া পরিবেশে আমার আব্বাজান হযরত হাফেজ হামেদ হাসান আলভী আজমগড়ীর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে হযরত শাহ সাহেব কেবলা আবেগ আপ্লুত হয়ে তাঁর নিজস্ব বাচনভঙ্গিতে হযরত আজমগড়ীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। হযরত আজমগড়ী (রহ.) এবং তাঁর অন্যতম খলীফা শাহ মাওলানা নজির আহমদের নাম শ্রবণ করা মাত্রই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাঁদের প্রতি আপন শ্রদ্ধা উজাড় করে দিতেন। শাহ নজির আহমদ ছিলেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উস্তাদ ও বড় ভাই। আমি অধম হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ছুহবত ও দু'আ লাভ করে ধন্য হয়েছি।

Ghunati.com pioneer in village based website

ড. মুহাম্মদ মুহিব উল্লাহ ছিদ্দিকী

প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

✪ আমার চাচা হযরত মাওলানা শিহাব উদ্দিন আহমদ ছিদ্দিকী, যিনি গারাংগিয়া মাদরাসার ফারেগ এবং গারাংগিয়ার বড় হুজুর শাহসুফি মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.) এর খলিফা তিনি আমাকে একদা বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি সুফি দরবেশ আছেন বাংলায়। বাংলায় সবচেয়ে বেশি সুফি দরবেশ আছেন চট্টগ্রামে, চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশি সুফি দরবেশ আছেন সাতকানিয়ায়, সাতকানিয়ায় সবচেয়ে বেশি দরবেশ আছেন চুনতীতে।" তাঁর এ বক্তব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করার মতো যোগ্যতা আমার নেই। তাছাড়া তাঁর মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের বক্তব্য চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস ও ক্ষমতা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের থাকার কথা নয়। শুধু তাই নয়, এ প্রসঙ্গে তিনি আর একবার বলেছিলেন, "চুনতী গ্রামের পূর্ব পার্শ্বে একটি পাহাড়ি কবরস্থান আছে। সে পাহাড়ে বহু উচ্চস্তরের আলিম, ফাযিল, কামিল, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, মুফতি, শহিদ, গাজী, ওলি দরবেশ, সুফি সাধক শায়িত আছেন। যার সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই।" এমন অনেক ইতিহাস সচেতন জ্ঞানী ভক্ত আছেন যাদের অনেকে আবেগভরে সে পাহাড়কে জান্নাতের অংশ মনে করেন।

✪ এমন ঐতিহ্যমণ্ডিত চুনতীর সাথে আমাদের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক রয়েছে এবং তা হলো আমার বংশের সবচেয়ে গৌরব-উজ্জ্বল সন্তান হায়দারাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে হাদিস শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রিতে গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল বারী (রহ.) চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায় প্রায় ৪০/৫০ বছর শিক্ষকতা করেছেন। ছাত্রদের নিকট তিনি মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি এতই স্বল্পভাষী ছিলেন যে আমরা তাঁর কাছে চুনতী সম্পর্কে ভালমন্দ কোন জ্ঞান লাভ করতে পারিনি। তারপরও খুব ছোটবেলা হতে চুনতী নামটি আমাদের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। কারণ আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় জেঠা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সৈয়দ আবদুল বারী (রহ.) এর কর্মস্থল ছিল চুনতী।

✪ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে দক্ষিণ চট্টগ্রামের তিনজন প্রখ্যাত আলিম কক্সবাজার জেলার প্রতিটি মানুষের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও সুপরিচিতি ছিলেন। তাঁরা হলেন, হযরত মাওলানা শাহ সুফি আবদুল মজিদ (রহ.) প্রকাশ গারাংগিয়ার বড় হুজুর; হযরত শাহ সুফি হাফেজ আহমদ (রহ.) প্রকাশ চুনতীর শাহ সাহেব হুজুর এবং বরইতলীর হযরত মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) প্রকাশ খতীবে আযম সাহেব। আজকে কেবলমাত্র চুনতীর শাহ সাহেব এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত চুনতীর সীরতুন্নবী (স.) সম্পর্কে দুটো কথা লিখার চেষ্টা করছি।

✪ খুব ছোটবেলা হতে উল্লেখিত মণীষীদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত চুনতীর শাহ সাহেবকে কখনও দেখিনি। ঐতিহাসিক নানাবিধ কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আলেম-ওলামাদের উপর ক্ষণিকের জন্য এক মহাবিপদ নেমে আসে। তাঁরা নানাভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। আলিমদের উপর শাসকগোষ্ঠীর জুলুম দিন দিন বেড়ে যায়। তার থেকে উত্তরণের কোন পথ তখন আপাততঃ দেখা যাচ্ছিল না। বহু আলিম বনে- জঙ্গলে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছে। আবার অনেকে শাহাদাত বরণ করেছে। আমার মনে হয় স্বাধীনতার পরে পলাতক আলিমদেরকে একত্রিত করে জনসম্মুখে প্রকাশ করার প্রথম কৌশলগত এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন চুনতীর শাহ সাহেব হুজুর (রহ.) মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর মাধ্যমে।

✪ ওলিয়ে কামেল শাহ সুফি হাফেজ আহমদ (রহ.) প্রকাশ চুনতীর শাহ সাহেব ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার প্রখ্যাত চুনতী গ্রামে সীরতুন্নবী (স.) এর নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নতুন অনুষ্ঠান প্রচলন করলেন- যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাব এবং মহানবীর সুন্নত অনুসারে বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (স.) এর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় ১৯ দিন ব্যাপী আলোচিত হয়ে আসছে। সীরতুন্নবী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাহ মঞ্জিল, সীরত ময়দান, মসজিদসহ বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা কালের সাক্ষী হিসেবে হয়তোবা শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম সমাজকে প্রেরণা যোগাবে।

Chunati.com Pioneer in village based website

মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

✪ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত চুনতীর শাহ সাহেব মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) একজন বুযর্গ লোক ছিলেন। তিনি বিশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চট্টগ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও সমগ্র বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআন পাকের একজন সমঝদার আলেম ছিলেন।

✪ একদিন চুনতী মাদরাসার মসজিদে সুরা ফাতেহার দরস হচ্ছিল। এমন সময় তিনি বাহির থেকে দরস মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন। দরস-এর পর তিনি আপনজনের মধ্যে কুরআনের দরসের প্রশংসা করে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর এই দোয়া আমার জীবনে প্রভাব বিস্তার করে।

✪ রাসূল (স.) এর বহুমুখী চরিত্র আলোচনার জন্য তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ১৯ দিনব্যাপী বিষয়ভিত্তিক সীরতুন্নবী মাহফিল এর সূচনা করেছিলেন। ইতোপূর্বে চট্টগ্রামে "মিলাদুন্নবী" নামে দ্বীনি আলোচনা হত। এতে রাসুলের বহুমুখী চরিত্র

প্রকাশ করা সম্ভব হত না। তিনি সর্বপ্রথম সীরতুন্নবী (স.) অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে বিষয়ভিত্তিক রাসূলের জীবনী আলোচনার সুব্যবস্থা করেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উক্ত সীরত মাহফিলে অংশগ্রহণ করায় মাহফিলের গুরুত্ব ও সুখ্যাতি অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়।

সুন্নতে রাসূলের আলোচনা তাঁর নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আলোচকদের আলোচনার প্রতি তাঁর খুবই নেকনজর ছিল।

✪ তিনি চট্টগ্রাম থেকে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। এই দুর্ঘটনায় তিনি চিরজীবনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। এতে সর্বস্তরের জনতা খুবই মর্মাহত হন। সে সময় কক্সবাজার সড়কের প্রশস্ততা খুব কম ছিল। দুটি গাড়ি ক্রসিং করতে গিয়ে কাদা ও বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছিল রাস্তার দুই পার্শ্বে। শাহ সাহেবের গাড়ি উক্ত গর্তের কারণে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। শাহ সাহেবের দুর্ঘটনা পত্র-পত্রিকায় বড় অক্ষরে ছাপানো হয় এবং নেতৃবৃন্দের বিবৃতি প্রকাশিত হয় দৈনিক খবরের কাগজে। এতে সড়ক ও জনপথ বিভাগ খুব দ্রুত কক্সবাজার সড়ক প্রশস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শাহ সাহেবের খ্যাতি ও পরিচিতির অলৌকিক প্রভাব পড়ায় অল্প সময়ের মধ্যে আরাকান সড়ক প্রশস্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

মাওলানা নেছার আহমদ

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ছোট ভাই

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবনের আগাগোড়াই করামত। হযরত মাওলানা আবদুস সালাম আরকানী (রহ.)-ই প্রথম মন্তব্য করেন, হাফেজ 'ফকীর' হবে। হযরত মাওলানা বদিউর রহমান আরকানী (রহ.) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ছেলে শাহ জমাল আহমদ (রহ.) এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন, এটা ফকিরের পুত্র।

✪ আল্লাহতায়ালা আউলিয়ায়ে কেরামগণের বেলায়াতের ক্ষমতা শুধু মানব জাতির উপর প্রদান করেন না বরং পশুপাখি ও জীবজন্তুর উপর ও ওনাদের বেলায়ত চলে। যার কারণে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হাতি ও বাঘের সাথে খেলা করতেন। পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় গভীর রাতে এসব ঘটনা বিভিন্ন সময়ে গাড়ির ড্রাইভাররা দেখেছেন।

✪ একবার ওয়াইদ্দা ঘোনার উচ্চ শিরে গিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বসেন। ঐ সময় একটি বিষাক্ত সাপ মাথার উপর এসে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে। থুথু শাহ সাহেবের মাথার উপর ফেলছে। এভাবে ৩/৪ ঘন্টা পরে সাপটি সরে যায়। সেখান থেকে এসে তিনি মন্তব্য করলেন, "আমি তখন মনে মনে চিন্তা করলাম আজকে বাঁচলে আরো বহুদিন বাঁচবো।"

✪ একদা এক রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে হারবাং এর ঢালায় যান। ওখানে রিক্সাওয়ালাকে এক জায়গায় রেখে তিনি গভীর জঙ্গলে চলে যান। অনেকক্ষণ হয়ে গেল ওনি ফিরে আসছেন না। ইতোমধ্যে একটি হাতি এসে রিক্সাওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তখন ভয়ে রিক্সাওয়ালা এক কিনারে চলে গেল। অনেকক্ষণ পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এসে বললেন, তুমি ভয় পেয়েছ নাকি, তোমাকে পাহারা দেয়ার জন্য হাতি পাঠিয়েছিলামতো। ওখান থেকে এসে রাত্রে ছমদরপাড়া চলে যান। ফজরের পর বাড়িতে চলে আসেন।

✪ একবার গাইনাঘাটায় আমাকে নিয়ে মাছ শিকারের জন্য যান। ওখানে আমরা ২ ভাই মিলে অনেক মাছ পাই।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে দেখলে সকলে ভয়ে বিভিন্ন দিকে পলায়ন করত। ওনি বলতেন, আমি বুঝেছি তোমরা সব আমার ভয়ে পলায়ন করছ। অথচ আমি কাউকে কিছু করব না।

✪ আমি বার্মা থাকা অবস্থায় ওখানকার পুলিশ আমার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করত ফকিরের মাহফিল আর কতদিন চলবে? এদিকে চুনতীতে মাহফিল চলাকালীন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে নাকি ওনারা ওখানে মাঝে মাঝে দেখতেন।

✪ একদা সকালে মুন্সেফ বাজারে মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) কে বললেন, মামা তোমার বাড়িতে কোন মেহমান এসেছেন? মেহমানের পার্শ্বে যিনি ছিলেন ওনি তোমার মামা। (অর্থাৎ শাহ সাহেব রহঃ নিজে)

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের দিন সাতকানিয়ার বড় মাওলানা সাহেব মন্তব্য করলেন, ইনি এশিয়া মহাদেশের দায়িত্বে ছিলেন। 'কুঞ্জে শাম' ওনাকে দেয়া হয়েছে।

✪ একবার চট্টগ্রাম শহরে বাকীবিল্লাহ সাহেবের বাসায় একাধারে ৩ দিন ঘুমান। পরে ওনার থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, খানা কোত্থেকে পান। উত্তর দিলেন, আল্লাহর কাজ করলে আল্লাহ খাওয়ান।

হাফেজ হারুনুর রশিদ

খাদেম, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও দুঃখের বিষয় তাঁর সম্পর্কে কোন স্মারক, স্মরণিকা, শোক গাথা বা জীবনালেখ্য প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘকাল পরে হলেও তার মহা মূল্যবান জীবনচরিত রচনা ও

প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন, চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী। তাঁর এ মহান প্রয়াসকে আমি মোবারকবাদ জানাই। কারণ তিনি জাতির এক বিশাল খেদমত আনজাম দিয়েছেন। অন্যথায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবনালেখ্য জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে কেবল একটি আবছা স্মৃতি হয়ে থাকত। তারপর হারিয়ে যেত স্মৃতির অতল গহ্বরে। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নগণ্য খাদেম হিসেবে লেখক আমার থেকে কিছু তথ্য চাইলে আমি চুনতী মাদরাসার বিশিষ্ট মোহাদ্দিস, স্নেহধন্য মাওলানা মুফতি আবদুল হক এর সহযোগিতায় পূর্ণ আমানতদারির সাথে দু'চার কথা লিখতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। দোয়া করি আল্লাহ পাক আমাদের সংশ্লিষ্ট সকলকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর রূহানি ফয়েজ দান করুক এবং তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ স্থান নসিব করুক-আমিন।

আমার বাল্যবয়সে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে যেমন দেখেছি:

১৯৪৯/৫০ খ্রিস্টাব্দের সময়ে ছোটবেলায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমার জেঠা আব্বা ফখরুল মুহাদ্দেসিন মাওলানা আমীন উল্লাহ (রহ.) এর বাড়ীতে মাঝে মধ্যে বেড়াতে আসতেন এবং আমার জেঠি আম্মাকে সাবিহা ফুফি বলে ডাকতেন। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রায়শঃ মজযুব হালতে থাকতেন।

চুনতী হেফজখানায় আমার নিযুক্তি ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সান্নিধ্যলাভ:

চট্টগ্রাম কোরবানীগঞ্জ, বলুয়ার দীঘি জামে মসজিদে আমি খতম তারাবী শুনাই। এক রাতে তারাবীর নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হলে দেখি দু'জন প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোক আমাকে খোঁজ করছেন। অতঃপর পরিচয় লাভে জানতে পারলাম তাদের একজন হচ্ছেন, আলহাজ্ব শামসুল হুদা খান ছিদ্দিকী, দ্বিতীয় জন হলেন তার বেয়াই মাওলানা আবদুস সুবহান খান। আবদুস সুবহান খান বললেন, আপনাকে আমার বেয়াই'র চুনতী মাদরাসার হেফজখানার পক্ষ থেকে নিতে এসেছি। তখন আমার মামার সাথে কক্সবাজারে আমি হোটেলের ব্যবসায় জড়িত থাকলেও কোরআনের খেদমতের আশায় ২৮ মে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার চুনতী মাদরাসার বার্ষিক সভায় উপস্থিত হই। তারপর দিন হতে চুনতী মাদরাসার দারুত তাহফিজ হেফজখানার খেদমতে নিযুক্ত হলে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সান্নিধ্যে আসা-যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়।

বান্দার উপর মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর গুরুদায়িত্ব অর্পণঃ

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে আমার এক জেঠাতো ভাই মুয়াল্লেম আজিজুর রহমানের ছেলে মুয়াল্লেম মুহাম্মদুর রহমান সাহেব আমাকে সস্ত্রীক মক্কা মোকাররমায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে নতুন আরবি পদ্ধতিতে লেখা একটি পত্র পাঠালে আমি তার পাঠ উদ্ধারে চুনতী মাদরাসার (সাবেক) মুহাদ্দিসে সোওম মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেবের সহযোগিতা লাভ করি। ইত্যবসরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তথায় হাজির হলে সোওম সাহেব হুজুর রসিকতা করে বললেন, আপনার আব্বাকে ভাইয়ে নিয়ে যেতে চায়।

তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, কোনখানে যেতে পারবে না, আমার অনেক কাজ আছে। অতঃপর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মাহফিলে সীরতুন্নবীর (স.) এর গুরুদায়িত্ব আমি গুনাহগারের উপর অর্পণ করেন।

পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্ননী (স.) এর সুচনাঃ

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে একদিনব্যাপী মিলাদ মাহফিল শাহ মঞ্জিলের সামনের উঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান ওয়ায়েজ ছিলেন বারদোনা, সাতকানিয়া নিবাসি ফখরুল মুহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমীনুল্লাহ সাহেব (রহ.) তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নির্দেশ অনুযায়ী আমি প্রথমে খতমে সবিনা শুনাই।

সবিনা শেষ করার পর আমন্ত্রিত মেহমান ওয়াজ আরম্ভ করেন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে হুকুম করলেন, দুটি ভাল খাসি ছাগল জোগাড় করে জবাই দিয়ে মাংস তৈরি করে রাখ। রান্না করার জন্যে অন্য লোক আসবে, তোমাকে রান্না করতে হবে না। আমি গোশত তৈরি করে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর মাগরিবের পূর্বক্ষণে জনাব এবিএম আশরাফুল্লাহ (সন্দ্বিপী) সপরিবারে পৌছ'লে হুজুর তার স্ত্রীকে রান্না করার জন্যে নির্দেশ দেন।

পবিত্র সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলের নামকরণঃ

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনদিন ব্যাপী মাহফিল অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হলে আমি একটি বৈঠকের আয়োজন করি। উক্ত বৈঠকে মুজাদ্দিদে সীরত মাহফিল আশেকে রাসূল হযতর শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) ফখরুল মুহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমিনুল্লাহ (রহ.) নাজেমে আলা (রহ.) আমি ও আরো অন্যান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মাহফিলের নাম মিলাদুন্নবী হবে না ইউমুন্নবী না সীরতুন্নবী হবে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তৎক্ষণাৎ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) অভিমত ব্যক্ত করলেন সীরতুন্নবীই (স.) হবে।

আমরা কেমন উম্মত! বার মাসের একটি মাসও রাসুলের জন্যে খাটতে পারি না:

১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দ হতে পবিত্র সীরত মাহফিল ১৯দিন ব্যাপী আরম্ভ হয়ে এ ক্রমধারা অদ্যাবধি চলে আসছে। শুরুতে বেশ কয়েক বছর ১৯ দিন ব্যাপী পবিত্র সীরত মাহফিল পরিচালিত হওয়ায় এলাকার দরিদ্র ও বিত্তবান ব্যস্ত সমাজ ১৯ দিনের পরিবর্তে এক সপ্তাহ বা আরো কম সময়ের আবেদন করলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, আমরা কি ধরনের উম্মত হলাম, বার মাসের একটি মাসও রাসূল (স.)'র জন্যে খাটতে পারি না। যারা মাহফিলে সীরতের বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব পালন করবে, পরিশ্রম করবে, আমি তাদের জন্যে ময়দানে হাশরে সুপারিশ করব।

সীরত মাহফিল শেষ হতে না হতে কর্জ শোধ:

সীরত মাহফিল সেই প্রাথমিক সময়ের ঘটনা : তখন হাতে কোন প্রকার টাকাপয়সা ছাড়া মাহফিলের কাজ আরম্ভ করা হতো। প্যান্ডেলের ছাউনি করা হত ছন দিয়ে। ফান্ডে কোন টাকা পয়সা ছিল না। ছনগুলো বাকিতে ক্রয় করতাম বান্দরবানের এমপি বীর বাহাদুর-এর পিতা লাল মোহন থেকে। তদ্রূপ বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন সামগ্রী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নাম দিয়ে বাকিতে ক্রয় করতাম।

বিশেষত: চাক্তাই নিবাসী হাজী আহমদ মিয়ার অবদান এ ব্যাপারে অনস্বীকার্য। কিন্তু আল্লাহপাকের মেহেরবানি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দোয়ার বরকতে মাহফিল শেষ হতে না হতেই প্রায় কর্জ পরিশোধ হয়ে যেত।

মাহফিলে সীরত শেষ জামানার গুনাহগারদের নাজাতের জন্যে করেছি:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে প্রায়শ: বলতেন, পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) আমি নিজের জন্যে করিনি বরং শেষ জামানায় গুনাহগার উম্মতের নাজাতের জন্যে করেছি।

নবীজীর যেয়াফত:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর হুকুম মোতাবেক আমি সীরত মাহফিলে গরু জবাই দিতাম। একদা গরু জবাই করার পর হুজুর আমাকে ডেকে পাঠালে আমি কাপড়-চোপড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় হাজির হলে তিনি বললেন, জন্তু জবাই করার সময় কি নিয়ত করেছ? জবাবে বললাম, আল্লাহ তোমার নামে জবাই দিলাম এবং রাসূল (স.) এর উপর সাওয়াব বখশিস করলাম। তখন বললেন, আমার রাসুল (স.) ইয়াতিম মাতা-পিতা ছিল না। আল্লাহর নামে তাঁরই যিয়াফত দিতেছি। তোমাকে দোয়া করব তুমি পারবে।

সীরত মাহফিলে মহানবী (স.) এর শুভাগমন:

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন সীরত মাহফিল তাঁর বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন এক রাত্রের ঘটনা: সারারাতব্যাপী মাহফিল চলছে। রাত আনুমানিক একটার সময় আমি শাহ সাহেব (রহ.) কে তালাশ করার ইচ্ছায় শাহ মঞ্জিল আসলে দেখতে পাই, তিনি উপরের তলায় অন্ধকারে চেয়ারে বসে গুণগুণ যিকির করছেন। আমি নীরবে কাছে আসলে তিনি অন্ধকারেই আমাকে চিনে ফেললেন, আর বললেন, আসছনি বাবা! আজ রাসূল (স.) তাশরিফ এনেছেন। সেই সময় আমি গোটা বাড়িতে একটি নুরানি ঝলক দেখতে পাই। অতঃপর তিনি আমাকে রং চা আনার জন্যে বললে আমি চায়ের ব্যবস্থা করি।

সীরত মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য শাহ সাহেব (রহ.)'র সুপারিশ:

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের সীরত মাহফিলের শেষে লোকজন চলে যাচ্ছেন দেখে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) স্বীয় বাড়িতে চেয়ারে বসে ক্রন্দন করছিলেন আর বলছিলেন, আমি রোজ হাশরে আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াব।

রাসূল (স.) এর সাহাবা ও আউলিয়া কেরামসহ সীরত মাহফিলের চতুর্দিক চক্কর দান:

আনুমানিক ১৯৭৬/৭৭ খ্রিস্টাব্দের সীরত মাহফিল চলাকালীন বারদোনা, সাতকানিয়া নিবাসী ফখরুল মুহাদ্দেসিন মাওলানা আমীনুল্লাহ বড় মাওলানা সাহেব একদিন সকালে শাহ সাহেবের দরবারে এসে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)- কে বললেন, আপনি আমার মাথায় হাত দিলে আমি একটি কথা বলব। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাঁর মাথায় হাত রাখলে বড় মাওলানা সাহেব বললেন, গতরাত আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, মহানবী (স.) আসহাবে কেরাম ও আউলিয়া কেরামের বিরাট জমাত সহকারে সীরত ময়দানের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে শাহ মঞ্জিলে তশরিফ আনয়ন করেন। তখন আপনি হরিণের চামড়ার চেয়ারটিতে উপবিষ্ট ছিলেন। তৎক্ষণাৎ উঠে রাসূল (স.) কে অভ্যর্থনা জানিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি এখানে তশরিফ রাখুন বললে নবীজী (স.) সেখানে তশরিফ রাখলেন। একথা বলার পর শাহ সাহেব (রহ.) বড় মাওলানা সাহেবকে বললেন, আপনি হুবহু দেখেছেন। আপনি হুবহু দেখেছেন। তখন তারা উভয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে চোখের পানি ভাসিয়েছিলেন।

Ghunati.com Pioneer in village based website

মৃত্যুর পরে আসলে কি হয়?

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের এক বছর আগে সীরত চলাকালীন সময়ে তিনি পুরাতন বাড়িতে বেশ কয়দিন থেকে গেলেন। তখন ভক্ত-অনুরক্তরা সে বাড়িতেই আসা-যাওয়া করছে। আমি কাজের ফাঁকে প্রায় দেখা করে আসি। তবে একদিন কাজের ভিড়ে ও ব্যস্ততায় যেতে পারিনি। পরদিন গিয়ে সীরত সম্পর্কে পূর্ণ রিপোর্ট দিলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তো আমাকে ভুলে গেছ-গতকাল আসনি। আমি বললাম, কাজের ব্যস্ততার দরুণ আসতে পারিনি বলে ওজর আপত্তি করছি। তিনি বললেন, মৃত্যুর পর সহস্র বার আসলেও কি হয়। এই বলে তিনি নিম্নোক্ত ছন্দটি আবৃত্তি করলেন-

مرنے کے بعد ہزار بار آئے تو کیا

শাহ মীর আখতার (রহ.) কর্তৃক হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মাথায় ফুঁক দানঃ

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে গারাংগিয়া মাদরাসার বার্ষিক সভা। তখন আমি জামাতে নাহুমে বা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। তথায় একটু পূর্বে মাথায় জটওয়ালা কালো টুপি ও সাদা কুরতা পরিহিত উজ্জ্বল নুরানি চেহারাবিশিষ্ট হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হাজির হলে মাদরাসার সুপার শাহ মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.) বড় হুজুর (রহ.) নিজেই চেয়ার টেনে তাঁকে মঞ্চে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর আমন্ত্রিত ছদরে মাহফিল হিসেবে চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের হযরত কেবলা শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) উপস্থিত হয়ে মঞ্চে উঠার সাথে সাথে চুনতীর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মাথার টুপিটি উঠিয়ে মাথায় একটি ফুঁক দিলেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র ইন্তেকালের তিন বছর পূর্বে একদিন হঠাৎ করে বললেন, গারাংগিয়া সভায় মীর আখতার সাহেব আমার মাথায় কেন ফুঁক দিয়েছিলেন। আমি বললাম, আমিও তা দেখেছিলাম, তখন হুযুর বললেন, তুমিতো দেখবা।

চুনতী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একটি রকেটঃ

আমার জেঠাআব্বা বড় মাওলানা সাহেবের ভাতিজা জনাব মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব একদা বড় মাওলানা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, চুনতী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কত বড় ওলি। তদুত্তরে বড় মাওলানা সাহেব বললেন, আকাশে বিমান চলাচলের জন্যে রোড আছে কিন্তু রকেট চলার জন্য কোন রোড নেই। জেনে রেখ চুনতি শাহ সাহেব হচ্ছেন বেলায়তের জগতে রকেট তুল্য।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ওলিগণের সর্বশ্রেষ্ঠ:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর ইন্তেকালের পরদিন সকালে বড় মাওলানা ফখরুল মুহাদ্দেসিন মরহুম আমিনুল্লাহ সাহেব (রহ.) শাহ মঞ্জিলে পৌঁছে আমাকে বললেন, তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? আমি বললাম, আমরাও বুঝতে পারিনি যে, হঠাৎ করে তিনি চলে যাবেন। কারণ তিনি কিছুদিন পূর্ব হতে বলে আসছেন, পশ্চিম দিকে চলে যাবেন। আমরা এটাকে স্বাভাবিক মনে করেছিলাম।

জানাযার পর শাহ মঞ্জিলের সামনে চেয়ারে বসালে তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, মানুষেরা আমাকে বলে যে, আপনি শাহ সাহেব থেকে ইলম ও বয়সে বড়, তবুও তাঁর সম্মুখে আপনি চুপচাপ বসে থাকেন কেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, শাহ সাহেবকে তোমরা চিননি। আমি আজ বলছি, তিনি হচ্ছেন সমসাময়িক ওলিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় সমাসীন।

বড় হস্তুর সাপ দ্বারা শাহ সাহেবের চুলের জট লেহন করা:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিজ জবানে আমাকে বলেছেন, একদা প্রচণ্ড শীত মৌসুমে রাতের বেলা পাহাড়ে গেলে ভীষণ ঠাণ্ডায় ভুগি। ফলে কিছু পাতা যোগাড় করে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তাপ লাভ করছিলাম। তখন একটি বড় হস্তুর সাপ (চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় অস্তুরাপ) এলে আমার মাথার (চুলের) জট লেহন করতে আরম্ভ করল। অতঃপর যখন আমি একটু তপ্ত হলাম তখন সাপটি জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

জনু মিয়ার মোকদ্দমায় কামিয়াবি, বৃষ্টির সময় ছাতা ও শুকনো কাপড়-চোপড়ও শুকনো:

একদা মাগরিবের পর হাই স্কুলের বি.এসসি স্যার আখতার আমাকে আনারসের দাওয়াত দিলে আমি তার রুমে পৌঁছি। তখন জনৈক বার্মার ছাত্র আলী আকবর আমাকে বললেন, আপনাকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ডাকছেন। যাওয়ার পর দেখলাম ওখানে জয়নুল আবেদীন ওরফে জনুমিয়া (হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভক্ত) ও জালাল আহমদ বসে আছে।

তখন জানতে পারলাম জনুমিয়া আগামীকাল পটিয়া কোর্টে অবজেকশন কেসে কামিয়াবির জন্যে দোয়ার আবেদন করলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চরম ক্রোধ ও রাগান্বিত অবস্থায় তাকে গালমন্দ করছেন ও মাথার উপর লাথি মারতে এবং লোহার বাটের ছাতা চোখে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কি অবজেকশন কেস? এভাবে গালাগালি করার পর আমাকে বললেন, লাল চা আন।

আমি লাল চা আনার পর তা পান করে একটু গরম (মজযুব) হালতে পূর্ব মসজিদের দিকে অন্ধকারে চলে গেলেন। আমি তাঁর পেছনে কত দুর চললে পেছনে তাকিয়ে বললেন, তুমি কোথায় যাও? আমি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলে তিনি বললেন, মাদরাসায় চলে যাও। আমি আসব। তখন বৃষ্টি নামছিল। রাত ২টায় ভীষণ বৃষ্টি ও অন্ধকারে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হেফজখানার দরজা নক করছেন। তখন আমি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.)।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তাঁর ছাতাও শুকনা এবং সর্ব শরীরও শুকনা রয়ে গেছে। কোথাও বৃষ্টির ভেজা চিহ্নও নেই। বললেন, লাল চা নিয়ে এস। তখন দোকানদার এর ঘুম ভাঙ্গিয়ে চা'র ব্যবস্থা করলাম। চা পান করার পর শাহ সাহেব শুয়ে পড়লেন। সেই জনু মিয়া এক জীপ ভর্তি আনারস, কাঁঠাল, আম ইত্যাদি ফল-ফলাদি ও নাস্তাপানিসহ নিয়ে আসলেন। ঘন্টাখানেক পর শাহ সাহেব আসলেন। জনু মিয়া বললেন, মামা আমি মোকদ্দমা পেয়ে গেছি। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, পাবিতো।

আল্লাহকে একদিন পেয়েছিলেন:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একদা বড় মাওলানা সাহেব ফখরুল মুহাদ্দেসিন জনাব মাওলানা আমীনুল্লাহ সাহেবকে বললেন, হে মাওলানা সাহেব! আল্লাহকে একদিন ভাল করে ভিড়িয়েছিলাম- সময় মতো পেয়েছিলাম। তখন বলেছি (১) আমার গোস্বা কমিয়ে দিতে হবে (২) ইলম দিতে হবে (৩) তোমাদেরকে বলব না (হতে পারে বেলায়াতের উচ্চ মর্তবা প্রসঙ্গ কথা) তখন বড় মাওলানা সাহেব নীরবতা পালন করলেন।

তিনটি বাঘের মাঝখানে শাহ সাহেব বসে আছেন:

পশ্চিম চুনতীর এক প্রৌঢ় বয়সী লোক বিভিন্ন মানুষের কাছে বর্ণনা করতেন যে, একদা ভীষণ বৃষ্টির পর তিনি সন্ধ্যাবেলায় পাহাড় থেকে চলে আসছেন। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) পাহাড়ের দিকে যাচ্ছেন। তিনি ভাবলেন সকলে পাহাড় থেকে চলে যাচ্ছে আর শাহ সাহেব মামা কোথায় যাচ্ছেন? পাহাড়ী ঢলে ছরা ভর্তি হয়ে গেছে। অথচ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হঠাৎ কেমনে পার হয়ে গেলেন বুঝে আসছে না। এ কৌতূহল বুঝার জন্যে লোকটি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পেছনে পেছনে চলল।

অল্প কিছুদুর অগ্রসর হওয়ার পর জঙ্গলের পাশে একটু অবনত মস্তক হতে দেখা গেল। অতঃপর তার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলেন। লোকটি শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান

করতে করতে হঠাৎ জঙ্গলের মাঝখানে একটি প্রশস্ত সমতল জায়গায় দেখল যে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যেন যিকির করছেন আর তাঁর সম্মুখে তিনটি বাঘ বসে রয়েছে। লোকটি এই দৃশ্য দেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে লোকজনকে এসব বলাবলি করতে লাগল। ফলে সর্বস্তরের জনতার মুখে এটি প্রবাদের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

আউলিয়াল্লাহ আছেন:

গারাংগিয়া থেকে আসার বেশ ক'দিন পর একদিন বাদ মাগরিব অন্ধকারে পূর্ব মসজিদের দিকে (চুনতী শাহী জামে মসজিদ) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একলা কোথাও চলছেন। আমিও পিছু পিছু কতটুকু যাওয়ার পর হঠাৎ তিনি আঁচ করতে পেরে পেছনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কোথায় যাবে? চলে যাও। তখন ইতস্তত অবস্থায় তিনি হঠাৎ বললেন, তোমাদের পুকুর পাড়ে (পাঁচ জন বড় মানুষ (আউলিয়াল্লাহ) আছেন। তোমরা ভাল মানুষের সন্তান।

হযরত ওমর (র.) কেমনে তরবারি নিয়েছিলেন:

এক রাতের ঘটনা, মাগরিবের পর হতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) শাহ মঞ্জিলের দোতলায় আমাকে নানান প্রকার ওয়াজ উপদেশ করছিলেন। অনেকক্ষণ পর আমি একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে তিনি উচ্চস্বরে বললেন, শুনছ, না? আমি বললাম, শুনছি। তিনি বিকট শব্দে বললেন, কি শুনছ তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ।

তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ভীষণ জযবার সাথে বলছিলেন, ওমর! তুমি কেমনে আমার নবীজীকে মারতে তরবারি নিয়ে আসছিলে? আবার বিকট শব্দে বললেন, তুমি কিছু বুঝছ? আমি বললাম, বুজছি। তখন প্রশ্ন করলেন, কি বুঝছ? আমি বললাম, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (স.) যখন কাফিরদের শর্তাবলী সব মেনে নিচ্ছেন তখনো হযরত ওমর আপত্তি করেছিলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, কিছু বুঝেছ? আরো বেশ কিছু সময় ওয়াজ করার পর মাদুরায় বসে আমিসহ খাবার খেলাম। অতঃপর তাঁকে শুইয়ে দিয়ে আমি মাদরাসায় চলে আসলাম।

চুনতী মাদরাসার মাঠে সবুজ রঙের নুর :

এক রাত্রে মাদরাসায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নগন্য খাদেম আমি ও মুহাদ্দিসে সোওম মাওলানা আবদুর রশিদ সাহেব হুযুর ছিলাম। কিন্তু রাত্রে তিনি তাঁর স্ত্রীর অসুখের কথা শুনে বাড়িতে চলে গেলেন। আমি রাত দশটা পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করে অবশেষে খানা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অমাবস্যার সেই ঘোর অন্ধকার রজনীতে হাল্কা পরিমাণ বৃষ্টি ঝরা কালো রাত দুইটার সময় প্রশ্রাবের হাজতে জাগ্রত হই। দরজা সামান্য ফাঁক করলে দেখতে পেলাম মাদরাসার প্রথম গেইটের ভেতরে সেই প্রকাণ্ড বট গাছটির উপর হতে

আসমান পর্যন্ত সবুজ রঙের এক উজ্জ্বল আলো। আমি অন্তত দু'ঘন্টা পর্যন্ত তা অবলোকন করি।

চুনতী মাদরাসায় কামিলের হাদীস খোলার জন্যে রাসূল (স.)'র অনুমতি লাভঃ

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রায় বলতে লাগলেন, আমি এখানে হাদিস পড়াব, কামিল খুলব। অতঃপর একদা সকালবেলা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন, একটু চা নিয়ে আস। আমি নিচতলা থেকে চা আনার পর বললেন, চা তোমার জন্যে আননি? এরপর আমার জন্যেও নিয়ে এসে উভয়ে চা পান করলাম।

অতঃপর আমাকে বললেন, একটি রিক্সা নিয়ে আস। আমি রিক্সা নিয়ে আসলে তিনি একলা রিক্সায় বসলেন। তখন সীরত মাঠের কাজ চলছিল বিধায়, সর্বত্র কাদামাটি হওয়ায় আমি রিক্সাটি ঠেলে কিছুদুর পশ্চিমে তুলে দিলে তিনি আমাকে বললেন, মাদরাসা দেখবা কোথাও যাবা না। একথা বলে তিনি চুনতীর (ঢালায়) পর্বতের দিকে চলে গেলেন। সারাদিন ফিরলেন না।

অতঃপর রাত এগারটার দিকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সাদা পোষাক পরিহিত অবস্থায় মাদরাসার গেইটে ঢুকে পশ্চিম দিকে দেখে দেখে উত্তর দিকে যাচ্ছিলেন। তখন আমি সালাম দিলে তিনি আমার দিকে চলে আসলেন। আমি হেফজখানার বাইরে বসার জন্য চেয়ার দিলাম। তিনি তথায় বসে পড়েন। তখন রাত আনুমানিক এগারটা। অতঃপর বললেন, একটু চা নিয়ে আস। আমি মাদরাসার পার্শ্ববর্তী দোকানে গিয়ে সওদাগরকে অনুরোধ করার পর তিনি একটি রং চা ও একটি দুধ চা'র ব্যবস্থা করলে আমি তা নিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)কে দিলে তিনি দুধ চা থেকে দু' এক ঢোক পান করার পর আমাকে দিয়ে বললেন, পান কর। আর রং চা-টি নিজে সম্পূর্ণ পান করলেন।

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, আমি রাসূল (স.) এর এজাযত নিয়েছি যে, আমি এখানে হাদিস পড়াব। তুমি মাদরাসা দেখাশুনা করবা। আমি ক্রন্দনরত অবস্থায় বললাম, আমি জাহেল লোক কিছুই জানিনা। আমি কি মাদরাসা দেখব? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাকে দোয়া করব। তারপর তিনি বললেন, তুমি কি এখানে একলা থাকতে ভয় পাবে? আমি বললাম, আপনি দোয়া করলে ভয় হবে না। এভাবে পরপর তিনবার বললেন। তারপর তিনি বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলে আমি কিছুদুর এগিয়ে দিলাম।

হাদিসের দরস খোলার ব্যাপারে প্রথম বৈঠক :

সপ্তাহখানেক পর চুনতী ও লোহাগাড়ার গণ্যমান্যদেরকে নিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উপস্থিতির্তে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা হয়। উপস্থিত সমাবেশকে যখন কামিল খোলার ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও নবীজীর অনুমতির কথা আলোচনান্তে বেশ ক'জন এই বলে অনীহা প্রকাশ করল যে, ভালমতে ফাযিল চলছে না আবার কামিল কিভাবে চলবে?

তবুও প্রস্তাব পাশ হলো এবং আপাতত কামিল খোলার জন্যে দু'জন মুহাদ্দিস, চল্লিশ সেট কিতাব ও দুটি কামরা প্রয়োজনের কথা ওঠে। যে যতটুকু পারে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত হয়। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর স্বপ্ন কিন্তু বৃথা যাবে না। তখন উপস্থিত সভ্যগণ থেকে ১৩ সেট কিতাবের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। উল্লেখ্য যে, বৈঠকের শুরু থেকে শাহ সাহেব হুজুর কালো চশমা পরিহিত চুপচাপ ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর আমি শাহ সাহেবের অনুমতিক্রমে বললাম, গত বৃহস্পতিবার রাত এগারটার সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে যেহেতু বলেছেন রাসূল (স.) এর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে তিনি এখানে হাদিসের দরসের ব্যবস্থা করবেন সেহেতু আমি মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হলেও কামিলের ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ। আমার এই কথা বলার সাথে সাথে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) উচ্চস্বরে বললেন, আমি দোয়া করব, তুমি পারবে।

উল্লেখ্য যে, এই ব্যাপারে সর্ব প্রথম বিশেষ অনুদানদাতা হচ্ছেন হারবাং নিবাসী মরহুম ডাক্তার আনোয়ার সাহেব, তিনি ঢাকায় থাকতেন। একদা আমি ও ভাগ্নে মাওলানা কাজী নাসিরুদ্দীন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর অনুমতিক্রমে ঢাকায় ডাক্তার আনোয়ারের কাছে গিয়ে তাকে শাহ সাহেব হুজুরের বাসনা প্রসঙ্গে বললে তিনি আমাদেরকে তার বাসায় মেহমান হিসেবে রাখলেন।

রাত্রে তাঁকে বললাম, এ ব্যাপারে আমাদের ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। সকালে নাস্তা পর্ব শেষ করার পর তিনি পত্রিকার একটি বান্ডিল আমার হাতে দিয়ে বললেন, এখানে ছাব্বিশ হাজার টাকা আছে, বাকি টাকা আমি দিয়ে দেব। হুজুরকে আমার সালাম জানাবেন এবং দোয়া করতে বলবেন। অতঃপর আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানি ও শাহ সাহেবের দোয়ায় আরো বেশ কিছু কালেকশন হলো। আমরা পশ্চিমের ভবনের ২য় তলায় কামিল আরম্ভ করলাম। দুইজন উপযুক্ত মুহাদ্দিসেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক বছর কামিল চলার পর মুহাদ্দিসের অভাবে তা বন্ধ হয়ে গেল। বছরখানেক পর আমরা পুনরায় কামিল ক্লাস আরম্ভ করতে সচেষ্ট হই। আল-হামদুলিল্লাহ, তখন হতে আজ পর্যন্ত সেই হাদিসের দরস যথাযথ বিদ্যমান রয়েছে।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পাঁচ লক্ষ টাকার অনুদানঃ

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-এর দরবারে আসেন। আমরা তাঁর বরাবরে কামিল ক্লাসের জন্য বিশ লক্ষ টাকার ভবনের আবেদন করলে তিনি প্রথমে পাঁচ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করলেন। তবে বাকি পনের লক্ষ টাকা তিনি শাহাদতবরণ করার দরুণ আর পাওয়া যায়নি। আমরা তাঁর প্রদত্ত অনুদান থেকে চারতলা ভবন নির্মাণ করি।

যতীনের মুখে কালেমা তাইয়্যিবা জারিঃ

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মজযুব অবস্থায় বেশকিছু দিন চন্দনপুরা ফায়ার সার্ভিসে ছিলেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিন্দু-মুসলিমগণ সকলে তাঁকে আন্তরিকভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। যতীন নামক হিন্দু কর্মকর্তাও সেখানে কর্মরত ছিলেন। অতঃপর আগ্রাবাদ আঞ্চলিক হেড কোয়ার্টারে উক্ত যতীন বদলি হন। যতীন তখনো বিজাতি হলেও শাহ সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্তদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। একদা রাত আটটার সময় শাহ সাহেব (রহ.) ও আমি ইউসুফ সাহেবের বাসা হতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে প্রথমে ধনিয়ালাপাড়া বায়তুশ শরফ পৌছলাম। তখন পীর সাহেব মরহুম মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব স্বীয় কক্ষে লোকজনসহ বসা ছিলেন। শাহ সাহেবের আগমন লক্ষ্য করে তিনি মুরিদগণসহ বেরিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বীয় চেয়ারে বসিয়ে দেন। হুজুর তাদেরকে সংক্ষিপ্ত উপদেশ বাণী শুনালেন। পীর সাহেব তাঁকে ডাবের পানি দিলে তিনি যৎসামান্য পান করে পীর সাহেবকে দিয়ে বললেন, খেয়ে নাও। দুই-তিন মিনিট পর ওখান থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে আগ্রাবাদ ফায়ার ব্রিগেড অফিসে গিয়ে তাঁর ভক্ত যতীনের বাসায় উঠলেন। যতীনের সন্তান-সন্ততি সকলে দাদু আসছে বলে আনন্দে মেতে উঠল। তিনি বললেন, যতীনের অবস্থা কেমন? তার মেয়ে বলল, অবস্থা ভাল নয়, শরীরে ফোলা এসেছে। অতঃপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাকে বললেন, যতীন! ওটা মনে আছে কি? তখন যতীন উত্তরে-বাবা মনে আছে, বাবা মনে আছে বলে উচ্চস্বরে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করতে লাগল। শাহ সাহেব বললেন, মনে রাখিস কাজে আসবে। জানা যায়, যতীন সেই রাত্রে তিনটার দিকে মৃত্যুবরণ করেন এবং কলিমা তাইয়্যিবাহ পাঠ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তৈলবিহীন (পানি দিয়ে) গাড়ি চালানোঃ

চন্দনপুরা ফায়ার ব্রিগেডের পরশ বাবু নামক জনৈক কর্মকর্তা শাহ সাহেব (রহ.) এর অন্যতম ভক্ত অনুরক্ত ছিলেন। একদা শাহ সাহেব হুজুর রাঙ্গামাটি যাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করলে উক্ত পরশ বাবু তার গাড়ি করে শাহ সাহেব (রহ.) কে নিয়ে রাঙ্গামাটি চললেন। আসার পথে কিছুদুর অগ্রসর হলে দেখা গেল গাড়িতে তৈল

নেই। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, পানি দাও। আরো কিছু সম্মুখে অগ্রসর হলে হঠাৎ তিনি বললেন, থাম। তখন তিনি জঙ্গলের দিকে ছুটলেন, ঘন্টা দু'এক পর ভিন্ন পথে তিনি গাড়ির ধারে আসলেন। বাবু বললেন, তৈল মোটেও নেই, গাড়ি কেমনে চালাব। হুজুর বললেন, আরো পানি দাও। পরশ বাবু আবারো পানি দিলে শেষ পর্যন্ত গাড়ি চট্টগ্রাম ফায়ার ব্রিগেডে পৌঁছে যায়।

হযরত শাহ সাহেবের দোয়ায় মৃগি রোগ নিরাময় :

আমার বন্ধু মরহুম হাফেজ বশির আহমদ (মালপুকুরিয়া নিবাসী) দীর্ঘদিন হতে মৃগি রোগে ভুগছিলেন। অনেক চিকিৎসার পরও কোন প্রকার প্রতিকার পাননি। একদা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কাছে দোয়ার জন্য আসলে আমি হুজুরের কাছে তাকে নিয়ে বললাম, মালপুকুরিয়া নিবাসী আমার এক বন্ধু হাফেজ সাহেব দীর্ঘকাল হতে মৃগি রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। আপনার কাছে দোয়ার জন্য এসেছেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, আমি দোয়া করব। ডা. সুলতান থেকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেতে বল। অতঃপর উক্ত হাফেজ সাহেব দু'তিন বার ঔষধ সেবন করার পর ভাল হয়ে গেলেন।

বোবার মুখে কথা :

জনৈক জাফর আহমদ কন্ট্রাক্টর হঠাৎ করে বোবা হয়ে গেলে কবির আহমদের সহযোগিতায় শাহ সাহেব হুজুরের দরবারে দোয়া চাইতে আসলে আমি হুজুরের কাছে গিয়ে বললাম, আমাদের মামা জনাব কবির আহমদ একজন বোবাকে দোয়ার জন্য নিয়ে এসেছেন। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কবির থেকে নাম জিজ্ঞেস করলেন, কবির বললেন, জাফর আহমদ। এবার হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বোবা লোকটির মাথায় হাত দিয়ে বললেন, কেমনে কথা বলতে পারবে না। জাফর, জাফর, দু'বার ডাকতে না ডাকতে সেই বোবা লোকটি জি হুজুর বলল। তিনি কবিরকে বললেন, তুমি কেন বলছ এ লোক কথা বলতে পারে না? এইতো দেখছি কথা বলছে!

ক্যান্সার রোগ নিরাময়:

চট্টগ্রাম নাছিরাবাদ নিবাসী হযরত শাহ সাহেবের অন্যতম ভক্ত জনাব আবদুল মন্নান সওদাগর শাহ সাহেব (রহ.) কে এসে বললেন, তার চাচী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারা সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তখন শাহ সাহেব বললেন, মাদরাসা থেকে হাকিমিয়া বাম নিয়ে মালিশ করো। তিনি কয়েকবার নিয়ে মালিশ করলে ক্যান্সার থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এ ধরনের অনেক লোককে বিভিন্ন রোগ-শোকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী মাদরাসার

হাকিমিয়া বাম মালিশ করার জন্যে বলতেন আর রোগীরা শাহ সাহেব হুজুরের দোয়ায় রোগ থেকে মুক্তি লাভ করত।

আল্লামা ফজলুল্লাহ-নাজেমে আ'লা (রহ.)এর ইন্তেকাল সম্পর্কে শাহ সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী:

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে নাজেমে আলা, চুনতী মাদরাসা হতে অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তা করলে আমি তা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে অবগত করি। তখন শাহ সাহেব হুজুর সাথে সাথে নাজেমে আলা সাহেবের কামরায় চলে আসলেন। বললেন, "মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেব আপনাকে এখানে থেকে যেতে হবে। কবি ফজলুল্লাহ আপনাকে এখানে থেকে যেতে হবে।"

বেশ কিছুদিন পর চন্দনাইশ জাফরাবাদ মাদরাসার বার্ষিক সভার শেষ অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে তাঁকে দাওয়াত করা হয়। উক্ত সভায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এবং সুফি দায়েমুল্লাহ (রহ.) ও বিশিষ্ট মেহমান হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

বাদ মাগরিব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর তকরীর শেষে সর্বশেষ অধিবেশনের সভাপতি হবেন নাজেমে আলা সাহেব। কিন্তু শাহ সাহেব তার সভাপতিত্ব শেষ করেই বলতে লাগলেন, নাজেমে আলাকে আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ নারাজ হলেও হযরত শাহ সাহেবের পীড়াপীড়ির কারণে অবশেষে নাজেমে আ'লা শাহ সাহেবের সঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হন। গাড়িতে উঠার পর নাজেমে আ'লা সাহেব একটু একটু কাশলে সুফি দায়েমুল্লাহ (রহ.) বললেন, বাসক পাতার রস মিছরি দিয়ে সেবন করলে ভাল হবে। শাহ সাহেব কেবলা বললেন, বাসকের রস নয় ভাল গাওয়া ঘি প্রয়োজন।

অতঃপর গাড়িতে করে মাদরাসার গেটে প্রবেশকালে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাঁকে বললেন, ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। নিদ্রা ভেঙ্গে সকালবেলা অন্য কক্ষে যাওয়ার সময় পড়ে গিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন।

অতঃপর সর্বত্র জানাজানি হলে শাহ সাহেব হুজুর আসলেন। আমার রুমে এসে বললেন, রাত্রে এক সাথে এসে বেশি বেশি ঘুমানোর কথা বলেছি। এভাবে কেমনে ইন্তেকাল করলেন। তারপর তাঁর ওয়ারিশগণ এসে তাঁর লাশ মোবারক) দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তা কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। আর বললেন, মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর উত্তর পার্শ্বেই তাঁকে সমাহিত করা হবে। অতঃপর নিজে গিয়ে কবরের জায়গা দেখিয়ে দিলেন। সীরত ময়দানে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাযার নামায শেষে তাঁকে নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করা হয়। সাড়ে তিনটায় জানাযার নামায শেষে তাঁকে কবরস্থ করার পর

লোকজন চলে গেলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ভীষণ গরম উপেক্ষা করে কালো চশমা পরিহিত অবস্থায় কবরের পূর্ব পার্শ্বে পশ্চিম মুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ ফাতেহা পাঠ করেন এবং তাকিয়ে থাকেন। এভাবে মাগরিবের আগ পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার সালাম ও দোয়া কামনা:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) পিজি হাসপাতালে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শরিফের তত্ত্বাবধানে 'চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহীদ জিয়া কর্ণেল অলি'র মারফত শাহ সাহেবকে সালাম জানান এবং খবর পাঠালেন, "মসজিদের জন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না। আমি নিজেই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মসজিদ নির্মাণ করে দেব।" তখন অলি সাহেব বললেন, প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রীয় সফরে সুইজারল্যান্ড যাচ্ছেন। তার জন্যে দোয়ার অনুরোধ করেছেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) 'র জন্যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে প্রদত্ত একটি চোখের ঔষধ বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা শহীদ জিয়াকে সেই ঔষধের জন্যে অনুরোধ জানালে জিয়াউর রহমান সাহেব সুইজারল্যান্ড থেকে ঔষধটি এনে দেন।

শহিদ জিয়া এখানে আসলেতো বেঁচে যেত:

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কর্তৃক আয়োজিত মি'রাজ রজনীর পূর্বদিনে অংশগ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত করা হয়েছিল। শাহ সাহেব প্রেসিডেন্টকে বার বার তাগাদা দিয়েছিলেন, সেইদিন এখানে চলে আসার জন্যে। জিয়াউর রহমান সাহেব চুনতী মি'রাজ অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষে চট্টগ্রামের বিভিন্ন কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করেছিলেন বটে কিন্তু পিএস মাহফুজ নানান ভুল তথ্য দিয়ে এখানে যোগদান করতে দেয়নি।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সেই রাতেই তাঁকে আততায়ীরা শহীদ করে ফেলল। পরদিন সকালে তাঁর শাহাদতের খবর এখানে পৌছালে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রতি আন্তরিক ভালবাসার কারণে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি। পরে তিনি বললেন, এখানে আসলে তো বেঁচে যেত।

শাহ সাহেব কেবলা কর্তৃক শহীদ জিয়ার যিয়াফত দান:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর শাহাদাত বরণ করার তিনদিন পর একটি বড় গরু ক্রয় করে জেয়াফতের এন্তেজাম করেন এবং তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে মোনাজাত করেন।

উনত্রিশ দিন পর জিয়ার মাজারে গমনঃ

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে বারবার বলতেন, তুমি দেরি করছ। অবশেষে তাঁর শাহাদাতের উনত্রিশ দিন পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমি কাজী মাওলানা নাসির উদ্দীন ও ইউসুফ সাহেবের ছেলে শাহ নেওয়াজ ঢাকায় তাঁর কবরে গিয়ে ফাতেহা পাঠ করলাম। কবরে অল্প কিছুক্ষণ মোরাকাবায় থাকার পর বলে উঠলেন, আহ! খুব ভাল আছে, খুব ভাল আছে।

হযরত ওমরের (র.) মত জিয়াউর রহমানেরও কিছু নেইঃ

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভকালে শহীদ জিয়ার আমন্ত্রিত মেহমান হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র সাথে আমি, শাহনেওয়াজ ও মরহুম রফিকুল কাদের চৌধুরী জিয়াউর রহমান সাহেবের ক্যান্টেনমেন্টের বাসায় পৌছালে শহীদ জিয়া গুরুত্বপূর্ণ মিটিং বন্ধ করে অযু করে গাড়ির পাশে আসেন।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে তিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন আর আমাদের জন্য কিছু মুড়ি ও পাউডার দুধের চার ব্যবস্থা করলেন।

আনুমানিক ঘন্টা দেড়েক পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.)কে জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও দুই পুত্র এসে গাড়িতে উঠিয়ে দিলেন। আমাদের সাথে বিদায়ী করমর্দন করলেন। উল্লেখ্য যে, শাহ সাহেব হুজুর মাদরাসার হাদিস ভবনের জন্যে একটি আবেদনপত্র সাথে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি লজ্জায় তা প্রেসিডেন্টের বরাবরে দেননি।

গাড়ি করে কিছুদুর অগ্রসর হলে শাহ সাহেব কেবলা আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদেরকে নাস্তা পানি কিছু দিয়েছে কিনা? আমরা বললাম, অল্প কিছু মুড়ি ও পাউডার দুধের চা ছাড়া আর কিছু নয়। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, আমাকে কিছু চনা-পেয়াজু দিয়েছে। দেখলাম বাসায় একটি ভাঙ্গা আলমিরা, একটি পুরাতন চৌকি এবং দুটি হাফশার্ট ছাড়া আর কিছু নেই। তোমরা যে বল হযরত ওমরের কথা, সেই হযরত ওমরের মত জিয়াউর রহমানেরও কিছু নেই। আমি তাঁর এই সততা ও দেশপ্রেম দেখেই তো তাঁর জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছি। আমি তাঁর বাসার শূন্যতা ও দৈন্যদশা দেখে লজ্জায় মাদরাসার আবেদনপত্রটি দিতে পারিনি। এটা নাও।

অতঃপর আমরা জাস্টিস ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্টের পি.এস. জনাব বদরুদ্দীনের মাধ্যমে দরখাস্তটি পাঠালে প্রেসিডেন্ট জিয়া তৎক্ষণাৎ বিশ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি দিলেন। সেইবার বাজেট থেকে আমরা মাদরাসার জন্যে পাঁচ লক্ষ টাকা অনুদান প্রাপ্ত হলেও তার শাহাদাত বরণের কারণে বাকি পনের লক্ষ টাকা পাওয়া যায়নি।

Chunati.com
Pioneer in village based website

আমি এখানেও থাকি ওখানেও থাকি:

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে হাটহাজারি হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেবের নাতি মরহুম শাহাব উদ্দিন চেয়ারম্যান বেশ কয়মাস পূর্বে যখন ওমরা পালন করতে গেলেন তখন রওজাতুন্নবী (স.) এর জিয়ারতের সময় (মিরাজ রজনীতে) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে নামায পড়তে দেখেন। নামাজান্তে মোলাকাত করবে আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় শাহ সাহেব নামায শেষ হওয়া মাত্র অদৃশ্য হয়ে যান। অথচ তিনি সে দিন মি'রাজুন্নবী (স.) রজনী পালনে সারা রাতব্যাপী এখানে সীরত ময়দানের মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। দেশে ফেরার পর চেয়ারম্যান মহোদয় হুজুরের সাক্ষাৎ করতে এলে আমি তাকে হুজুরের সান্নিধ্যে নিয়ে যাই। হুজুর তখন বিশাল সমাবেশে ওয়াজ করছিলেন। ওয়াজের পর আমি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, হাটহাজারীর বড় মুফতি সাহেব হুজুরের নাতি আপনার কাছে দোয়ার জন্য এসেছেন।

তখন চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, আমি আপনাকে মি'রাজ রজনীতে রওজাতুন্নবী (স.) এর কাছে দেখেছিলাম বটে, কিন্তু মুলাকাতের জন্য অনেকক্ষণ তালাশ করার পরও দেখতে পাইনি। তাই মুলাকাতের জন্য এসেছি। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, আমি এখানেও থাকি ওখানেও থাকি। অতঃপর হুজুর তাঁকে দোয়া করলেন।

চেয়ারম্যান মহোদয় হুজুরের প্রতি ভক্ত এবং আসক্ত হয়ে শাহ সাহেব হুজুরকে হজ্ব করানোর আগ্রহ প্রকাশ করলে হুজুর তাকে সম্মতি প্রকাশ করলেন। অতঃপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে আমি ও কাজী নাসির উদ্দীন, চেয়ারম্যান সাহেবের সম্পূর্ণ খরচে এবং মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইসলাম (হালিশহর নিবাসী) ও এডভোকেট লোকমান আহমদ (বাজালিয়া নিবাসী) নিজ খরচে সঙ্গে ছিলেন। আমরা শাহ সাহেব হুজুরসহ চিটাগাং বিমান বন্দর থেকে ঢাকায় নেমে জাস্টিস সিদ্দিক সাহেবের বাসায় দু'দিন থাকার পর চুনতী নিবাসী পাইলট জনাব খুররম সাহেব (প্রিন্সিপাল হাবিবুর রহমানের ছেলে) নানা শাহ সাহেবকে কলকাতা এয়ারপোর্টে পৌছানোর আগ্রহ প্রকাশ করায় তার বিমানে করে আমরা দমদম এয়ারপোর্টে অবতরণ করলে ভেতরে শাহ সাহেবকে বসার ব্যবস্থা করি। এখানে খুররম সাহেব, শাহ সাহেব থেকে দোয়া নিয়ে বিদায় নিলেন। মাওলানা ইসলাম ও কাজী নাসির উদ্দীন লাগিজ আনার জন্যে বেরিয়ে গেলেন। আমি হুজুরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শাহ সাহেব থেকে ইন্ডিয়ান সৈনিকের আশীর্বাদ লাভ:

ইত্যবসরে একজন ইন্ডিয়ান সৈনিক অফিসার আনুমানিক ১৫/২০ মিনিট হুজুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর অফিসার সাহেব হুজুরের সম্মুখে বসে পা ধরে

দোয়া চাইলেন। পরপর বাকি সৈন্যরাও এভাবে দোয়া চাইলেন। হুজুর দোয়া করার সময় নাম জিজ্ঞেস করলে কর্মকর্তা বলেন, তারাসিং। অতঃপর করিয়া রোডে অবস্থিত চুনতী নিবাসী ইসলাম সাহেবের বাসায় উঠলাম। ইসলাম খান সাহেব উত্তমভাবে হুজুরকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কলিকাতায় আট ঘন্টা পর্যন্ত অবস্থান করেন।

দিল্লীর নবনির্মিত হোটেলে অবস্থান:

মাগরিবের পর আমরা বিমান থেকে দিল্লী অবতরণ করলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলতে লাগলেন, দিল্লী জামে মসজিদের পাশে একটি হোটেল আছে সেখানে যাব। আমরা তথায় যাওয়ার পর হোটেল মালিক শাহ সাহেব কেবলাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন এবং ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর আমরা জানতে পারলাম হোটেলটি সেদিনই উদ্বোধন করা হয়েছে। মালিক বললেন, তিনি জানতেন, এ লোকটি আজ আমার হোটেলে আসবেন।

শাহ সাহেব থেকে দিল্লি জামে মসজিদের ইমামের দোয়া কামনা :

আমরা ওখানে তিনদিন অবস্থানকালে দিল্লি জামে মসজিদে নামায পড়তাম। প্রথমদিন হুজুরের নামায শেষে ইমাম সাহেব মহোদয় শাহ সাহেবের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, হুজরায় তাশরিফ রাখেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাঁকে নিতে চাইলেও শাহ সাহেব কেবলা গেলেন না। তখন ইমাম সাহেব দোয়া চাইলেন।

বিভিন্ন বুজুর্গানের কবর যেয়ারত:

তৃতীয় দিবসে আমরা বিভিন্ন আউলিয়া কেরামের যেয়ারতে বেরুলাম। প্রথমে নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) এর মাযারে ফাতিহা পাঠ করে শাহ সাহেব কেবলা আমাকে মোনাজাত পরিচালনা করার জন্য ইশারা করলেন। আমি মোনাজাত করলাম। মোনাজাতের পরে দেখলাম তিনি কবরের ডান পার্শ্বে গিলাফের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর আমরা সকলে বেরিয়ে এলাম। আসার পথে দেখলাম আলাউদ্দিন খিলজীর নির্মিত একটি মনোরম মসজিদ। মসজিদের ভেতরে কারুকার্য খচিত সম্পূর্ণ ত্রিশ পারা কুরআন মজিদ। অতঃপর কুতুব উদ্দিন বখতেয়ার (রহ.) হামিদুদ্দীন নাগুরী (রহ.) নাসির উদ্দীন চেরাগ দেহলভী (রহ.) সহ আরো অন্যান্য বুজুর্গানের কবর যেয়ারত করি। ওখান থেকে কুতুব মিনারের পাশে হযরত আবদুর রহমান জামি (রহ.) এর কবর যেয়ারত করি। কুতুব মিনারের ঐতিহ্যসমূহ দেখার পর আমরা হোটেলে চলে যাই।

বলা বাহুল্য, কুতুব মিনারের সম্মুখে একটি স্তম্ভ আছে। জনশ্রুতি মতে, এটি ভাগ্য পরীক্ষার স্তম্ভ। যারা এই স্তম্ভটি পেছনের হাত দিয়ে বেষ্টন করতে পারে তারা

ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হয়। এডভোকেট লোকমান সাহেব তাতে সক্ষম হলেন। আমরা কেউ পারলাম না। হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শাহ সাহেব কেবলা বললেন, আমার লোকমান মামা খুব ভাগ্যবান। সেখান থেকে এডভোকেট সাহেব বাড়িতে কিছু কাজকর্ম রয়ে গেছে এবং শেষ ফ্লাইটে হজ্বে হাজির হবেন বলে অনুমতি নিয়ে বাড়ি চলে আসলেন।

মদিনা শরিফের বড়টার কাছে যাবার পথে এ সকল ছোটদের কাছে কেন যাব:

হোটেলে বসে কাজী নাসির উদ্দিন ও লোকমান সাহেব, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে বললেন, আমাদের পাসপোর্টে তিনমাস সময় আছে বিধায় আমরা আজমীর, বাগদাদসহ আরো অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখে যেতে পারব। দু'একবার শুনার পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে রাগতস্বরে বললেন, সে কি বলছে, আমি বাড়ি থেকে মদিনা শরীফের বড়টার কাছে যাবার নিয়্যত করে বেরিয়েছি আর পথে সে এসব ছোটখাট কি দেখায়?

বিমানে শাহ সাহবে (রহ.) থেকে অচেনা লোকের তাবিজ প্রার্থনা:

দিল্লি হোটেলে আমরা তিনদিন অতিবাহিত করার পর মুম্বাইয়ের পথে রওয়ানা দিলে বিমান চলাকালীন জনৈক অচেনা লোক হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পা ধরে আকুতি মিনতি করে বলতে লাগলেন, বাবা তাব্বাজ (তাবিজ) দি জিয়ে।
তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে বললেন, সে তাবিজ চাচ্ছে। বলে দাও আমি তাবিজ দেই না। লোকটি অনেকক্ষণ অনুনয় বিনয় করার পর অবশেষে তার সিটে ফিরে গেল। মুম্বাই বিমান বন্দরে অবতরণ করার পর জনৈক হেলথ কর্মকর্তা আমাদেরকে বললেন, যেহেতু সৌদি আরবে বসন্ত রোগ চলছে তাই আপনাদের টেট্রাসাইক্লিন সার্টিফিকেট প্রয়োজন। অন্যথায় সৌদি আরব থেকে ফেরৎ পাঠাতে পারে।
তাই দু'এক দিন এখানে অপেক্ষা করে এখান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে গেলে ভাল হয়। আমরা রাত্রে একটি মালাবার হোটেলে উঠলাম। পরদিন সে উদ্দেশ্যে আমি ও মাওলানা ইসলাম সাহেব পাসপোর্ট চারটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসের খোঁজে বের হলাম। মুম্বায়ের সেই নয়নাভিরাম চোখ ঝলসানো শহরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দোআয়ে ইউনুস লেখা একটি সাইনবোর্ড দেখে সেখানে ঢুকে পড়লাম।
জানতে পারলাম ঠিকমত এসেছি। কর্মকর্তাকে আমাদের পাসপোর্ট দেখালে তিনি শাহ সাহেবের পাসপোর্টটি দেখে যেন অভিভূত হয়ে গেলেন। আর জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? আমি বললাম, তিনি একজন দরবেশ লোক। অতঃপর তিনি সরকারি ফিস হিসেবে ১২০০ রূপী থেকে ২০০ রুপী ফেরৎ দিলেন এবং আমার

থেকে হোটেলের পূর্ণ ঠিকানা সংগ্রহ করলে। আমরা কাজ সেরে হোটেলে চলে আসি।
কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা, উক্ত কর্মকর্তা বিকেল চারটায় আমাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দেয়ার কথা বললেও দুপুর আড়াইটায় সরাসরি হোটেলে চলে আসলেন, আর বললেন, হুযুরের মোলাকাত এবং দোয়া নেবার উদ্দেশ্যে নিজে চলে আসলাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাকে দোয়া দিলেন।

মুম্বাইতে সমুদ্রগর্ভে মাযার যেয়ারত, গেলাফ অভ্যন্তরে তাকানো:

পরদিন সকালে জনাব শাহাব উদ্দিন সাহেব আমাকে বললেন, শাহ সাহেব মামা বেড়াবেন কিনা? আমি তাঁকে এ ব্যাপারে বললে জবাবে তিনি বললেন, سيروا فى الارض। একটু বেড়াতে হয়। তখন আমি ও মাওলানা ইসলাম গিয়ে ২টি টেক্সি-ক্যাব ভাড়া করে নিয়ে আসলাম। এক গাড়িতে জনাব শাহাব উদ্দিন ও মাওলানা ইসলাম বসে পড়লেন। অনেকদুর অগ্রসর হওয়ার পর বিরাট ক্যান্টিন সামনে পড়লে শাহাব উদ্দীন সাহেব বললেন, মামা কি চা পান করবেন? শাহ সাহেব রং চা'র কথা বললে আমি গিয়ে চা এনে দিলাম।
অতঃপর ভূতপূর্ব হিন্দু মহারাজার গার্ডেন ও ঐতিহ্যাবলী পরিদর্শন করলেন। তারপর গাড়িতে চেপে শিখ ড্রাইভার কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করলে শাহ সাহেব নিজেই নির্দেশনা দিচ্ছেন আর গাড়ি তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চলতে লাগল। অথচ তিনি ইতিপূর্বে কখনো মুম্বাই শহরে আসেননি।
অনেক দূর এগিয়ে সামনে চৌরাস্তা পড়লে ড্রাইভার আবারও জিজ্ঞেস করলে শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, এদিকে যাও। এভাবে তাঁর নির্দেশনায় চলতে চলতে দেখি যে, সমুদ্রের একটি মাযারের গেইটে গাড়ি থামাতে নির্দেশ করলেন। তোরণে লেখা আছে- বাবা হাজী ইয়ানী আলী বাবার মাযার।
সেখান থেকে এক কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রগর্ভে মাযারটির সড়ক দিয়ে (ভাটার সাথে সাথে ভেসে উঠে আর জোয়ারের ছোঁয়ায় রাস্তা ডুবে যায়) হেঁটে হেঁটে মাযারে উপস্থিত হলাম তখন বিকেল আছরের সময়।
আমরা মাযার সংলগ্ন ছোট ইবাদতখানায় নামায সেরে যেয়ারতের জন্যে মাযারে ঢুকে পড়ি। যেয়ারত শেষে শাহ সাহেব কেবলা আমাকে ইঙ্গিত করলে আমি মোনাজাত পরিচালনা করি। হোটেলে ফেরার উদ্দেশ্যে তাঁর জুতো নিয়ে বেরুবার প্রাক্কালে তিনি পুনরায় মাযারে ঢুকে পড়েন। তাঁর পেছনে আমরাও ঢুকে গেলাম। তিনি গুণগুণ করে যিক্র করছেন আর মাযারের গেলাফ উঠিয়ে ভেতরে তাকাতে লাগলেন। তখন মুতাওয়াল্লি আশ্চর্যম্বিত হয়ে শাহ সাহেবের সাথে মোসাফাহা করে বসার জন্যে অনুরোধ জানালেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.)না বসে সাথে সাথে বেরিয়ে আসলেন এবং কুশল বিনিময় করলেন।

দাহরান হয়ে মদিনায় (মুনাওয়ারা) হাজিরা দান :

মুম্বাই তিনদিন অবস্থান করার পর দাহরান হয়ে সৌদিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে দাহরান এয়ারপোর্টে ফ্লাইট বিলম্ব করার দরুন প্রায় ১২/১৩ ঘন্টা দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তখন সাংঘাতিক বিরক্তি প্রকাশ করলেন। অতঃপর আমরা জেদ্দা এয়ারপোর্টে অবতরণ করে গাড়িযোগে মদিনা (মুনাওয়ারা) পৌছে যাই। ওখানে সৈয়দ আবদুল করিম মাদানী (রহ.)'র ভাগ্নে-জামাই সৈয়দ হুসাইনীর বাসায় হুযুরসহ অবস্থান নিলাম এবং নিয়মিত রওজা পাকে হাজিরা দিচ্ছিলাম। প্রথমোক্ত বাসাটি অসুবিধে হওয়ায় কষ্ট হলেও আমরা মদিনা শরিফের কাছে একটা ছোট বাসা ভাড়া নিলাম।

সারারাত শাহ্ সাহেবকে পাহারা দিতাম :

হযরত শাহ্ সাহেবের নিকট কেউ থাকতে চায় না বলে সফরসঙ্গী অন্যান্যরা এদিক সেদিক বিছানা করলেও আমি কিন্তু তাঁর পদযুগলের দিকে বিছানা করলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে শাহ্ সাহেবের একজন খাদেম হিসেবে বিশেষ করে তাঁর নিদ্রাকালীন সারারাত বিনিদ্র থেকে পাহারা দিতাম।

কারণ আশংকা হচ্ছিল যে, এই আশেকে রাসূল (স.) যদি নবীর দেশে চিরস্থায়ীভাবে থেকে যেতে চান তাহলে আমাদের কি উপায় হবে? তাই বড় চিন্তা ছিল বিশেষতঃ ঘুমের সময় দিবা-নৈশ পাহারাদারি করতাম বেশি।

শাহ সাহেব কেবলা কর্তৃক মীকাইল (আ.) কে দায়িত্বে তাগাদা প্রদান:

এক রাত্রে আমার নিদ্রা এসে গেলে তিনি চুপিসারে দরজার শিকল খুলে কোথাও বেরিয়ে গেলেন। আমি হঠাৎ জাগ্রত হলে দেখতে পাই তিনি নেই। চিন্তিত হলাম। ঘন্টা খানেক পর তিনি এসে চুপিসারে শুয়ে পড়লেন। আমি সংগোপনে তাঁর অবস্থা অবলোকন করে নীরবে আশ্বস্ত হলাম। মসজিদের জামাত শেষে চা পানের ব্যবস্থা করলাম। অতঃপর রাত্রের ঘটনাটি জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। ইত্যবসরে তিনি বলতে লাগলেন, আজ রাত বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তার সাথে দেখা হলে তাকে বললাম, জিম্মাদারি আদায় করতে না পারলে কেন নিয়েছেন?

উল্লেখ্য যে, মদিনা শরিফে অনেকদিন হতে অনাবৃষ্টি ও খরা চলছিল। আল্লাহর ওলির কি কেরামত, তখন হতে সারা মদিনায় ৪/৫ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি নামছিল।

প্রচণ্ড ভিড়ে গায়েবি সাহায্য :

জুমাবার হযরত শাহ্ সাহেবের গায়ে জ্বরজ্বর ভাব ছিল। অযু করার পর শাল গায়ে দিয়ে মোজা পরিয়ে তাঁকে ধরে ধরে মসজিদে নববীতে নিয়ে যাওয়া হল। বাবুচ্ছালামের বাইরে পাথরের উপর জায়নামাজ বিছিয়ে তাঁকে নামাযের ব্যবস্থা করিয়ে আমিও পার্শ্বে থাকলাম। নামাজের পর বাসায় ফেরার পথে প্রচণ্ড ভিড়ে পড়লে হঠাৎ এক লম্বাচৌড়া মোটা লোক এসে আমার হাত ধরে স্থান প্রশস্ত করে দিলেন এবং প্রধান সড়কে বাবুল মসজিদের সামনে এনে দিয়ে বিদায় নিলেন।

তুমি কেমনে তরবারি নিয়ে আসছিলে আমি তোমার যেয়ারত করছি না:

আরেকদিন হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.)'র রওজা যেয়ারত করতে গেলে বাবে জিব্রাইল ঢুকে সীসা ঢালার স্থানে হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) এর সাথে আমিও দাঁড়াই। দু'এক মিনিট পর হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) বলতে লাগলেন, আমি তোমার (হযরত ওমর (র.) যেয়ারত করছি না। আবু বকর ছিদ্দিকের (র.) যেয়ারত করছি। তুমি কেমনে তরবারি নিয়ে আসছিলে। যেয়ারত শেষে "রওজাতুম্‌মিন রিয়াজিল জান্নাতে" গিয়ে উস্তুয়ানে আয়েশা (র.)'র স্তম্ভের উপরের দিকে একবার তাকান আরেকবার আমার দিকে তাকান। পরপর তিনবার এরূপ করার পর বললেন আস, আসছনা কেন?

হাবশি কর্তৃক শাহ সাহেব (রহ.) কে অনুদান:

হেরম শরিফে যাওয়ার পূর্বে জুমাবার হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) ও আমি শেষবারের মতো মসজিদে নববীতে সুন্নাত নামায শেষে আমরা কাতারে বসে তাসবিহ তাহলিল আদায় করছি। হঠাৎ চার/পাঁচ কাতার পেছন হতে জনৈক শীর্ণকায় লম্বা হাবশি লাফিয়ে লাফিয়ে এসে হুজুরের হাতে পাঁচটি রিয়াল দিয়ে স্বস্থানে চলে গেল, কোন কথা বলল না।

রাসূল (স.) থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় যাবে:

আমরা রওজাতুন্নবী (স.)'র বিদায়ী যেয়ারত প্রসঙ্গে কয়েকবার বললে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, রাসূল (স.) থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় যাবে?
মদিনা শরিফে হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) চৌদ্দ দিন অতিবাহিত করার পর মক্কা মুয়াজ্জমা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। মক্কায় (মোকাররমা) আমরা মুয়াল্লিম হাছান মুরাদের মামা আবদুল হামীদ সায়তীর বাসায় উঠলাম। নিয়মিত হেরেম শরীফে নামায কালাম ও তাওয়াফ আদায় করি। অতঃপর হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মিনায়

গেলাম। ওখান থেকে মুজদালেফা ও আরফা হয়ে হজ্ব সম্পন্ন করলাম। হযরত শাহ সাহবে (রহ.) যেতে না পারায় তাঁর পক্ষ থেকে আমরা রমি করলাম।

মিনায় হঠাৎ তাজা টুকটুকে লাল গরু :

শাহ সাহেব হুযুরসহ আমরা কুরবানির মাঠে গেলাম। তিনি আগে থেকে মোটা তাজা ও লাল সুন্দর চোখ জুড়ানো গরু দ্বারা কোরবানি করার ইচ্ছে পোষণ করতেন। কিন্তু মাঠে তেমন কোন সুন্দর গরু দেখা যায়নি। ফলে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দুই বেদুইন একটি টুকটুকে লাল ও মোটা তাজা, চোখ জুড়ানো ষাঁড় নিয়ে মাঠে হাজির হলে আমি তাড়াতাড়ি রশি ধরে ফেললাম।

তারা পনেরশ রিয়াল দাম হাঁকলে আমি চৌদ্দশ রিয়াল দিয়ে তা খরিদ করি। অতঃপর কাজী নাসির উদ্দীনের হাতে জবাই দিলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, স্বল্প পরিমাণ রানের গোস্ত নাও। যেহেতু কুরবানির গোস্ত হতে নিজেরা কিছু খাওয়া ভাল। নাসির সাহেব আমাকে বলল, মামা আপনি শাহ সাহেবকে নিয়ে বাসার দিকে চলেন। আমি গোস্ত নিয়ে আসব।

প্রচণ্ড ভিড়ে জনৈক অচেনা লোক দ্বারা স্বস্তিলাভ:

আমরা ফেরার পথে দুই পার্শ্বে হাজী বহনের গাড়ি আর মাঝখানে সেই সরু রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে প্রচণ্ড ভিড়ে পড়ে যাই। এদিক-সেদিক নড়াচড়ার কোন উপায় নেই। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে বুকে জড়িয়ে ধরলাম আর তিনি আমাকে বাঁচানোর জন্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, মেরে ফেলবে, মেরে ফেলবে। ইত্যবসরে সম্মুখ থেকে জনৈক অচেনা লম্বাচৌড়া বিশালকার লোক এসে গাড়ির ছাদে উঠে এয়া আল্লাহ্ রুহ (আল্লাহর ওয়াস্তে চলে যাও) শব্দ বলে বাহু দ্বারা প্রতিরোধ করলে মুহূর্তে রাস্তা খোলাসা হয়ে যায়। শাহ সাহেব কেবলা বললেন, চল চল রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অল্প কিছুদূর আমরা অগ্রসর হলে নাসির উদ্দীনকে দেখলাম রক্তমাখা একটি আস্ত রান নিয়ে যাচ্ছে। পাক করে কোরবানির গোস্ত খাওয়ার পর আমরা তাওয়াফে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে হেরমের দিকে রওয়ানা করলাম।

আমার আল্লাহ আছেন:

তওয়াফ শেষে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে সায়ি করানোর জন্যে গাড়ি ঠিক করলাম। দু'এক চক্কর আমরা তাঁর সাথেই ছিলাম। অতঃপর হঠাৎ তিনি আমাদের চোখের অন্তরাল হয়ে গেলেন। আমরা বিভিন্ন স্থানে তাঁর খোঁজে ছুটাছুটি করছি।

না পেয়ে যেন চৈতন্যহারা হয়ে গেলাম। এক পর্যায়ে তাঁর খোঁজে মিনায় ছুটলাম। এখানে দেখি তিনি তাঁবুতে বসে যিকির করছেন।
আমরা দীর্ঘক্ষণ তালাশ ও খোঁজ করার পর তাঁকে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম। তিনি আমাদের সাথে রসিকতার সুরে বললেন, আমি তোমাদের মোহতাজ নই। আমার আল্লাহ আছেন। অতঃপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সহ মক্কায় চলে আসলাম।

শহীদ জিয়ার জন্য পূণ্যভূমির হাদিয়া :

হজ্বব্রত পালন শেষে আমরা দেশে ফেরার প্রস্তুতিমূলক কিছু কেনাকাটা করছিলাম। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, সাহেবের (জিয়াউর রহমানের) জন্যে কিছু হাদিয়া নিতে হবে। আমি বললাম, কি নেব। হুজুর বললেন, একটি বড় গালিচা নাও। আর দু'টি ভাল জায়নামায ও দু'টি তাসবিহ নাও।
অতঃপর ঢাকায় অবতরণ করে জাস্টিস ছিদ্দিক সাহেবের বাসায় উঠলাম। ক'দিন পর কর্ণেল অলি এসে বললেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, শাহ সাহেবকে সায় দাওয়াত করেছেন। তিনি দাওয়াত মঞ্জুর করলেন। আমরা পুণ্যভূমি মক্কার পবিত্র হাদিয়াগুলো নিয়ে তাঁর ক্যান্টনমেন্টের বাসায় গেলে তিনি হুযুরকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। ঘন্টাখানেক সেখানে অবস্থান করার পর তিনি পুনরায় জাস্টিস সাহেবের বাসায় ফিরে আসলেন। পরদিন বাই-রোডে চট্টগ্রাম হয়ে বাড়ি পৌঁছি।

আল্লাহর পথে কঠোর সাধনা:

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ের ঘটনা : হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে বলেন, (জনৈক ভক্ত) জনুমিয়া, চকরিয়া, ঢেমুশিয়া হতে সপরিবারের স্বীয় জিপ সহকারে রাত দশটার সময় আসার পথে হারবাংয়ের ঢালায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে দেখতে পেলে হুজুরকে তুলে নিল। অতঃপর তার বাড়িতে এনে গোসল করাল, খাবার দিল এবং তিনদিন পর্যন্ত তথায় রেখে দিল।

আল্লাহর ওলির বিভিন্ন সফর :

৭৩/৭৪ খ্রিস্টাব্দের একদিন হঠাৎ করে সকালে বললেন, রিক্সা আন। চা-নাস্তার পর রিক্সাযোগে পশ্চিম দিকে আরাকান রোডে পৌঁছে বললেন, চট্টগ্রাম শহরের গাড়ি ধরব। আমরা একটি লোকেল গাড়িতে ওঠে শহরে পৌঁছলে বললেন, আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিসে যাও। ড্রাইভার অন্যান্য যাত্রীদেরকে নামিয়ে দিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)কে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দিল।
ওখানকার সকলে চুনতীর শাহ সাহেব (রহ.) আসছেন বলে আনন্দ প্রকাশ করল। হেড কর্মকর্তা, হুজুরকে দোতলায় তার বাসায় নিয়ে গেলেন। চা-নাস্তা দিয়ে

আপ্যায়ন করালেন। দুপুরবেলা খাবার দাওয়াত করলেন। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলতে লাগলেন, ঢাকা যেতে হবে। হুযুর বিমানের টিকেটের টাকা দিতে চাইলে উক্ত কর্মকর্তা নিজেই বিমানের টিকেটের ব্যবস্থা করলেন।
ওখানে দুপুরে খাবার সেরে তিনটার ফ্লাইট ধরার পূর্বে জাস্টিস সাহেবকে সংবাদ দিতে বললে তার টেলিফোন নম্বরটি ভুলবশত: মাদরাসায় থেকে গেলে এলোমেলোভাবে নাম্বার রিং করতে করতে আল্লাহর মহিমা হঠাৎ জাস্টিস সাহেব ফোন ধরলেন।
বললাম, চট্টগ্রাম থেকে শাহ সাহেব মামা আসছেন। এয়ারপোর্টে গাড়ি ঠিক রাখলে ভাল হয়। ৩.২০ মিনিটের সময় আমরা ঢাকায় অবতরণ করে ভিআইপি গেটে জাস্টিস সাহেবের সাথে দেখা হয়। অতঃপর গাড়িযোগে তার বাসায় গিয়ে এক সপ্তাহ থাকার পর বাড়ি চলে আসলেন।

আর্মিদের ক্ষমা প্রার্থনা :
১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা: একদা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমি, মাওলানা শফিক ও এরশাদ মামা চট্টগ্রাম ঘাটফরহাদবেগ মকবুল সাহেবের বাসা থেকে চুনতী আসার পথে গাড়ি পদুয়া পর্যন্ত পৌঁছলে একটি আর্মি গাড়ি শাহ সাহেবের গাড়ি সাইড চাইলেও সাইড দেয় না। অতঃপর রাজঘাটা পর্যন্ত পৌঁছে তাদের গাড়ি বিকল হয়ে যায়। তারা নেমে অনেক চেষ্টা করার পরও স্টার্ড হয় না।
তখন হুযুরের গাড়ি পার্শ্ব দিয়ে চলে চুনতী শাহ মঞ্জিলে পৌঁছে যায়। ঘণ্টাখানেক পর দেখা গেল আর্মিরা এসে হুযুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। তখন শাহ সাহেব হুযুর তাদেরকে আপ্যায়ন করালেন এবং দোয়া দিলেন।

সীরত মাহফিলে গারাংগিয়ার বড় হুযুর (রহ.) এর শুভাগমন:
১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের সীরত মাহফিলে গারাংগিয়ার পীর সাহেব বড় হুজুর কেবলাকে দাওয়াত করা হলে তিনি শারীরিক অত্যন্ত দুর্বলতা ও বার্ধক্যের চাপ সত্ত্বেও পবিত্র সীরত মাহফিলে তাশরিফ আনয়ন করেন। এতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আন্ত রকিভাবে শোকরিয়া প্রকাশ করেন এবং বড় হুযুরকে বিদায় দানের সময় স্বীয় পকেট থেকে বেশি পরিমাণে টাকা প্রদান করলেন।

শাহ সাহেব (রহ.) বেলায়তের সম্রাট :
আনুমানিক ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সীরত মাহফিলে নৈশকালীন শেষ অধিবেশনে গারাংগিয়ার ছোট হুজুর (রহ.) কে সভাপতি করা হলে তিনি সে রাতে মেহমান হিসেবে মাদরাসায় থেকে যান। সকালের নাস্তা-পানি সেরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন- "দুনিয়াতে সবটুকু

আমার ভাইয়ের।" এতে তিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে সমসাময়িক বেলায়তের সম্রাট বলে ইঙ্গিত প্রদান করেন।

আরকানী সাহেব হুজুরের দোয়া কামনা:

আনুমানিক ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা: আরকানী সাহেব হুযুর (শাহ মাওলানা আবদুস সালাম আরকানী-রহ.) খানেকায়ে হামেদিয়া, সাতকানিয়াতে কিছুদিনের জন্য তাশরিফ আনলেন। ইতোমধ্যে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সংবাদ পেলেন যে, আরকানী সাহেব হুযুর সাংঘাতিক অসুস্থ। আমাকে বললেন, আরকানী সাহেব হুযুর গুরুতর অসুস্থ তাকে দেখতে যাব।

তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে আমি রিক্সাযোগে উক্ত খানকাহতে পৌছলে আরকানী সাহেব শাহ সাহেব হুযুরকে বললেন, মোরে (আমাকে) দোয়া করবেন। তদুত্তরে শাহ সাহেব হুযুর বললেন, আমাকেও আপনি দোয়া করবেন। অতঃপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ফল ফ্রুট খাওয়ার জন্য আরকানী সাহেব হুযুরকে যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিলেন।

শাহ সাহেব (রহ.) কে যাদু :

১৯৭৯/৮০' খ্রিস্টাব্দের ঘটনা : একরাত্রে আমি শাহ মঞ্জিলে গেলে হঠাৎ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, আমাকে এবং তোমাকে যাদু করেছে। যাদু করা তো গোনাহ'র কাজ। তখন হয়ত যাদুর প্রভাবে তার শারীরিক-মানসিক অবস্থা দুর্বল মনে হচ্ছিল। আমার জন্যে তিনি দোয়া করলেন। তবে আমিতো তাঁর জন্যে তেমন কিছুই করতে পারিনি। এমনিতে তিনি আমাকে বারংবার বলতেন, তোমার সাথে অন্যান্যরা শত্রুতা করবে। তুমি সর্বদা সূরায়ে ইউসুফ তেলাওয়াত করবে। আমি সেমতে আমল করলে আল্লাহ পাক তদ্বারা অনেক সুফল দান করেন।

শাহ সাহেবের মাথায় রাসূল (স.) এর হাত:

শাহ সাহেবের বর্ণনা : রাসূল (স.) আমার মাথার উপর হাত রেখে আমাকে বলেন, তুমি আমার তারিফ-প্রশংসা করতে থাক। তোমার প্রশংসা আমার খুব ভাল লাগে। তখন আমি আবেগতাড়িত ও ক্রন্দনরত ছিলাম। হুযুর (স.) বললেন, হাফেজ তোমার কোন ভয় নেই। তুমি সীমানা পেরিয়ে এসেছ। হে মাওলানা সাহেব! নবীজী আমার নাম যে হাফেজ আহমদ এটা কেমনে জানলেন।

সীরত মাহফিল সাধারণ মানুষের জন্য নবীজির সুপারিশ লাভ করার মাধ্যম:

একদা বাদ মাগরিব মাদরাসার মাঠে ওলামায়ে কেরামের একটি সমাবেশে ওয়াজ কালামের এক পর্যায়ে সাধারণ লোকজন কমে গেলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

মরহুম মাওলানা মোবারক সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এই সীরত মাহফিল সোর্স অব ইনকাম (টাকা কামাবার উপায়) হিসেবে করিনি বরং সাধারণ মুসলমান যেন রাসূল (স.) এর সুপারিশ লাভ করতে পারে সেই ওছিলা হিসেবেই এই সীরত মাহফিল।

এদেশ বড় হবে:

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি এক বৃহস্পতিবার রাত্রে আমি বাড়ি যাবার জন্যে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) থেকে ছুটি চাইলে তিনি বললেন, যথাশীঘ্র চলে আসিও। আমি শনিবারে আসব বলে বিদায় নিলাম। পরদিন বাদ জুমা বাড়িতে বিশ্রাম করলে আছরের পূর্বক্ষণে আমি স্বপ্ন দেখি, দুই লক্ষের মত লোক খোলা তরবারী ও রড বল্লম ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দক্ষিণ দিক হতে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আমার আত্মীয় স্বজন থেকে পাঁচজন লোক চৌরাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন আমার শরীরে কম্পন আরম্ভ হলে একটি গায়েবি আওয়াজ পেলাম। ধর এটি হযরত ওমরের (র.) তরবারি। আরবী লেখা ঝলমল তলোয়ারটি আমার দুই হাতে মজবুতভাবে ধরিয়ে দিলেন।
আমি সে সময় আল্লাহু আকবর শব্দ বলে তাদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং আল্লাহ আকবর শ্লোগান দিয়ে তলোয়ার চালালে অসংখ্য লোকের গর্দান দু'টুকরা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, পলায়ন করো, এর সাথে পারবি না। তারা পালিয়ে গেলে আমি উক্ত তরবারি নিয়ে রক্তরঞ্জিত অবস্থায় আমাদের বাড়ির পূর্বস্থ বড় বিলে চক্কর দিতে থাকি।
তখন জনৈক অচেনা লোক আমাকে ধরে ফেলতে চাইলে আমার ছোটভাই বলে উঠল সাবধান! তাকে ধরলে অসুবিধে আছে। বিল থেকে উক্ত চারজন ফিরে আসলে বলি যে, মোনাফেক তো এখানেও আছে। এই বলে তার মাথায় সজোরে আঘাত করলে লোকটির মাথার মগজ ছারখার হয়ে যায়।
আমি জাগ্রত হলে দীর্ঘক্ষণ প্রকম্পিত থেকে চৈতন্য লাভ করলাম। অতঃপর বাদ আছর বাড়ি থেকে সোজা চুনতী এসে বাদ মাগরিব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে বাড়িতে দেখা করলে তিনি তখন গুণগুণ যিকির করছেন। আমি সালাম দিলে বললেন, একটি রং চা নিয়ে আস।
অতঃপর আমি বললাম, আমি তাড়াতাড়ি আসার কারণ হচ্ছে, একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি, আপনার থেকে তার ব্যাখ্যা বর্ণনা শুনার জন্যে তাড়াহুড়া করে চলে আসলাম। আসবে এবং এদেশ বড় হবে। আর তোমার দ্বারা ইসলামের খেদমত হবে। সত্যিই আল্লাহর ওলির স্বপ্ন ব্যাখ্যা অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন মানুষ ধর্ম-কর্মে হতাশ ও উদাসীন হয়ে গেল ঠিক সেই মুহূর্তে মুজাদ্দেদে

সীরত মাহফিল আশেকে রাসূল শাহ্ সাহেব (রহ.) চুনতি গ্রামে প্রবর্তন করলেন বিশাল সীরত মাহফিল।

চোরাইকৃত টাকা দিয়ে ফেলব দিয়ে ফেলব:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কোন এক সময় তাঁর অন্যতম ভক্ত চট্টগ্রাম ঘাটফরহাদবেগ নিবাসী জনাব মকবুল আহমদ চৌধুরীর বাসায় অবস্থান করছিলেন। তখন দু'জন পার্টনারশিপ ব্যবসায়ীর মধ্যে একজনের পঁচিশ হাজার টাকা অন্যজন চুরি করলে অবশেষে তাদের একজন বলল, চুনতির শাহ সাহেবের সামনে বলতে পারলে আমি টাকা নেব না। অতঃপর তারা উভয়ে শাহ সাহেবের দরবারে এসে সালাম করার সঙ্গে সঙ্গে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, "যার টাকা তাকে দিয়ে ফেললে হয়ে যায়।" তখন প্রকৃত চোর "দিয়ে ফেলব হুযুর, দিয়ে ফেলব হুযুর" বলে দ্রুত চলে গেল।

টাকা নেব না :

একদা জনৈক লোক শাহ্ সাহেব হুযুরের দরবারে এসে হুযুরকে দশ টাকা এবং রাসূল (স.)'র জন্যে দশ টাকা অনুদান দিতে চাইলে শাহ্ সাহেব (রহ.) বললেন, তোমার টাকা নেব না, তুমি রাসূল (স.) কে আমার সমান করেছ।

শবে কদর লাভ:

শাহ সাহেব হুযুর আমাকে স্বীয় জবানিতে বর্ণনা করেন: বার্মায় ভামু অঞ্চলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সেখানকার জামে মসজিদের খতিব ও পেশ ইমামের দায়িত্বরত ছিলেন। প্রত্যেক্ষভাবে দেখতে পান যে, কদর রজনীর কোন এক মুহূর্তে গোটা দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয় এবং দুনিয়ার রং যেন হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। এরপর হতে শাহ সাহেব হুযুরের মজযুব অবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলে পথেঘাটে, জঙ্গলে অনেকে তাঁকে না চিনে হয়ত মারধর করতে পারে এই আশংকায় আমার শ্বশুর সাতগড় নিবাসী বুড়া মাওলানা সাহেবের নাতি মরহুম মাওলানা মোস্তফা খান সাহেব (তিনি তখন সেই মসজিদের দ্বিতীয় ইমাম) তাঁকে হিফাজত ও নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেও প্রহৃত হয়েছেন।

অতঃপর শাহ সাহেবের মজযুবি হালত বেড়ে গেল। উক্ত দ্বিতীয় ইমাম দেশে খবর পাঠালে হুযুরের ছোট ভাই মরহুম খ্রীস্টাব্দেহ মামা উক্ত দ্বিতীয় ইমামের সহযোগিতায় নিজের (খ্রীস্টাব্দেহ মামার) কোমরে এবং হুযুরের হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় স্টিমারে তুলে অনেক কষ্টের মাধ্যমে দেশের বাড়ি নিয়ে আসলেন।

শাহ সাহেব (রহ.) ব্রেইনের পাগল নন রাসূলের (স.) পাগল:

বার্মা থেকে দেশে ফেরার পর শাহ সাহেব (রহ.) পূর্ণ মজযুব অবস্থায় পথেঘাটে জঙ্গলে পাহাড় পর্বতে ঘুরাফেরা করছিলেন আর সদা-সর্বদা মুখে ছিল একটি ছন্দ-

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے-زندگی میں یہی کام کر جائینگے

অর্থ: আমি মুহাম্মদ (স.)'র মাযারে কুরবান হবো। জীবনে এ কাজটিই করে যাব।" আত্মীয়-স্বজন তাঁকে পাগল মনে করে শেষ পর্যন্ত চন্দনাইশ, জোয়ারা নিশি বৈদ্যের পাগলখানায় নিয়ে গেলে দুই-তিনদিন পর ওখানকার বৈদ্য সাহেব বললেন, আজ্ঞে ইনাকে নিয়ে যাও। ইনিতো ব্রেইনের পাগল নন।

ওখান থেকে নিয়ে আসার পর বাড়ির রুমে তালাবদ্ধ করে রাখলে কিছুক্ষণ পর দেখা যায় তালা ঠিকই আছে কিন্তু তিনি ওখানে নেই। এভাবে মজযুব হালতে প্রায় দুই যুগ কাল অতিবাহিত হয়ে গেল।

খবর দানের পূর্বে হাজী দেখতে যাওয়া:

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রারম্ভকালে আল্লাহর মেহেরবানিতে বাহ্যিক কোন উপায় ছাড়া বলুয়ার দীঘিতে আমার মুসল্লিগণের থেকে জনৈক মুম্বাইয়া লোক আমাকে স্বেচ্ছায় হজ্বের জন্যে টাকা প্রদান করলে দরখাস্ত করার পর লটারিতে নাম উঠে। তিন-চার দিন পর হঠাৎ একরাত বারটার সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বেশ ক'জন ভক্তসহ কারযোগে উক্ত বলুয়ার দীঘি মসজিদের হুজরায় আমাকে দেখতে যান। অথচ তখনো তাঁকে অবগত করানোর সময় আমার হয়নি। ভাবছিলাম রমযানের পর এসেই জানাব ও দোয়া নেব। তিনি মসজিদের আঙ্গিনা দিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে আমার হুজরায় যাওয়ার সময় জনৈক মুম্বাইয়া লোক (মুসল্লি) আলহাজ্ব আবদুল আজিজ مسجد میں جوتی لیکے کیوں جاتے "মসজিদে জুতো নিয়ে যাচ্ছেন কেন?" বলে ডাক দিলে আল্লাহর ওলি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হঠাৎ করে বললেন-

عرش پہ بھی جوتی لیکے جانا جائز ہے "আরশের উপরও জুতো নিয়ে যাওয়া যায়েয আছে" অতঃপর হুজরায় তাশরিফ রাখলে চা পান করাতে চাইলেও সুযোগ দিলেন না। তখন আমি বললাম, এক মুম্বাইয়া মুসল্লি আমাকে হজ্বের জন্যে টাকা দিয়েছেন। লটারির একদিন পূর্বে দরখাস্ত করলে পরদিন লটারিতে নাম আসে। সময়ের স্বল্পতার দরুন আমি আপনার এজাযতের জন্যে যেতে পারিনি। তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি জানিতো! তাইতো দেখতে এসেছি। তারপর আমাকে দোয়া করলেন এবং আশরাফুল্লাহ সাহেবের বাসায় চলে গেলেন।

মদিনাওয়ালাকে আমার সালাম দিও :

ঈদের পর হজ্বে যাওয়ার পূর্বে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) থেকে সালাম ও দোয়া নেয়ার জন্যে দরবারে হাজির হলে তিনি বললেন, মদিনাওয়ালাকে আমার সালাম দিও। চুনতীর হাফেজ নাম বললে রাসূল (দ.) আমাকে চিনবেন। অতঃপর আমি বিদায় নিয়ে ছফিনা আরব স্টিমারযোগে হিজাযের পূণ্যভূমিতে পৌঁছলে প্রথমে মদিনা শরিফে গমন করে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র সালামখানি সেভাবে পৌঁছালাম।

চুনতী মাদরাসায় স্বতন্ত্র হেফজখানা নির্মাণ:

চুনতী মাদরাসার সেই প্রথম অবস্থায় যখন ঘর-দোর সংকুলান ছিল না, তখন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুমে হিফজ ছাত্রদেরকে পড়াতাম। বারংবার স্থানান্তরিত হওয়ার দরুন অনেক সময় বিরক্তও হই। শেষ পর্যন্ত মাদরাসার পঞ্জেগানায় পড়াতাম। মক্কা শরিফের সেই মুলতাযিমে আল্লাহপাকের কাছে একটি স্বতন্ত্র হিফজখানার জন্যে দোয়া করলাম। পবিত্র হজ্ব সমাপনান্তে দেশে ফিরলে শাহ সাহেব হুযুরের সাথে যখন মোলাকাত করলাম তখন বললেন, পাকা হেফজখানা নির্মাণ করতে হবে। এই বলে তিনি স্বীয় পকেট থেকে পাঁচশ টাকা অনুদান দিলেন। আল্লাহপাকের অশেষ শুকরিয়া, শাহ সাহেব হুযুরের দোয়ায় এবং সেই পাঁচশ টাকায় এমন বরকত হলো যে, একতলা হেফজ কালামুল্লাহর ঘর নির্মিত হয়ে যায় এবং দুই-চার বছর পর দ্বিতল ও তৃতীয় তলার সহজভাবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। বর্তমানে আমিসহ ৫ জন অভিজ্ঞ হাফেজ মহোদয়গণের তত্ত্বাবধানে দেড়শ ছাত্র হেফজে কালামুল্লাহে রত আছে।

হেডমাস্টার যোগেশ এর হাঁপানী রোগ নিরাময়:

চুনতী হাই স্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টার যোগেশ বাবু দীর্ঘদিন হতে হাঁপানী রোগে ভুগছিলেন। তিনি প্রায় সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দরবারে আসতেন, অনেক সময় বসে থাকতেন। একদিন আমি শাহ সাহেব হুযুরের সাথে সেমাই খাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় যোগেশ বাবু উপস্থিত হলে হুযুর তাঁর খাওয়া অর্ধেক থেকে কিছু সেমাই বাবুকে খেতে দিলেন। জানা যায়, এরপর তিনি হাঁপানি রোগ হতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

যোগেশ মুসলমান হয়ে গেছেন:

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হজ্ব উপলক্ষে মদীনা শরিফ অবস্থানকালে আমাকে আর যোগেশ বাবুকে স্বপ্নে দেখেন। দেশে ফেরার পর হুজুর কেবলা আমাদেরকে উক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করে বললেন, যোগেশ মুসলমান হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, যোগেশ বাবু তখন কলকাতায় ছিলেন।

স্বপ্নে জুন শাহ'র কবর যেয়ারতের নির্দেশ দান:

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হজ্ব উপলক্ষে মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকালে একরাতে স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে বলেন, চট্টগ্রাম রেয়াজ উদ্দিন বাজার চৈতন্য গলি, জুন শাহ'র কবর যেয়ারত করো। অতঃপর স্বপ্নের নির্দেশ মোতাবেক জুন শাহ'র কবর যেয়ারত করলাম।

স্বপ্নে স্বীয় খাদেমকে পাহাড়ী ঢল থেকে নিরাপদ স্থানে নিক্ষেপ:

উপরোক্ত ঘটনার তিনদিন পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, ঠাকুরদীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় ব্রিজের নিকট থেকে ছরায় নামার পর প্রবল পাহাড়ী ঢল আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তখন হঠাৎ জটওয়ালা চুলবিশিষ্ট লংকোর্ট পরিহিত হযরত শাহ সাহবে (রহ.) আমার হাত ধরে আমাকে ছরার তীরে নিক্ষেপ করলেন। হজ্ব থেকে আসার পর আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমার কথা আমার মনে ছিল।

সারা শরীর ও গোটা কামরায় সর্বত্র আল্লাহ আল্লাহ:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র মৌখিক বর্ণনা : হুযুর চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় আলিম শ্রেণিতে পাঠরত অবস্থায় চট্টগ্রাম বাকলিয়া খাসিয়াপাড়া এলাকায় মরহুম আবদুল জব্বার এর বাড়িতে লজিং থাকার সময় মাদরাসায় যাওয়ার পুর্বে গোসল সেরে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে আতর সুঘ্রাণ মেখে কিছুক্ষণ মুরাকাবায় বসলে তখন সারা শরীর ও রুমের খাট পালং ইত্যাদি সব কিছু থেকে আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারিত হতো। তখন হতে আমি আর কোনদিন আল্লাহকে ভুলিনি।

শরাবি-মদদী ও বে-নামাযী শাহ সাহেবের সান্নিধ্যে হেদায়ত লাভ:

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাঁর মজযুব অবস্থায় শরাবি-মদদী, বেনামাজি ধর্ম-কর্মে উদাসীন লোকদের সাথে আসা-যাওয়ার কারণে কিছু কিছু লোক তাঁর সমালোচনায় মেতে উঠলে পক্ষান্তরে দেখা গেল অল্প কিছুদিন পরপর সে মদখোর, বেনামাজি, ধর্ম-কর্ম ও দ্বীনি কাজে অমনোযোগী লোক পাক্কা মুলসমান ও মুসল্লি হয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ সাতকানিয়া নিবাসী মরহুম আবদুল জব্বার, চুনতী নিবাসী হাজী রাস্তা এলাকার হোমিও ডাক্তার মরহুম আহমদ সহ আরো অনেক আছেন, তারা প্রথম সময়ে ধর্ম-কর্মে উদাসীন ও বেপরোয়া থাকলেও ওলিয়ে কামেল হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র সান্নিধ্যের বরকতে ধর্মভীরু হয়েছিলেন।

একই সময়ে কয়েকটি স্থানে বিচরণ:

আমি শুনেছি: মরহুম ফজলুল কাদের চৌধুরীর ইন্তেকালের দিন সকালে এক লোক হুযুরকে চট্টগ্রাম বদরপাটিতে দেখে। আবার তাঁকে চুনতী হাজী রাস্তার দোকানে চা পানরত অবস্থায় দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে মানুষকে বলাবলি করতে লাগল যে, এখন বদরপাটি দেখে এলাম আবার এখানেও দেখছি। আবার দুপুরবেলা ফজলুল কাদের চৌধুরীর জানাযায়ও বড় মাওলানাসহ হাজির হন। বস্তুত: মহান আল্লাহ তাঁকে সে রকম অলৌকিক শক্তিও দান করেছিলেন।

চোর ধরা পড়ল:

আধুনগর হরিণা নিবাসী মরহুম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের বাড়িতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ও বড় মাওলানা সাহেব বিশেষ উপলক্ষে উপস্থিত হন। অতঃপর তারা কাচারী থেকে বড় ঘরে খানা খেতে গেলে বড় মাওলানার পকেট থেকে ঘড়ি চুরি হয়ে যায়। অনেক তালাশ ও খোঁজাখুজির পরও পাওয়া যায়নি। তখন শাহ সাহবে (রহ.) বলতে লাগলেন, এই সামান্য উত্তর দিকে পাওয়া যাবে। বেশি দূরে যেতে হবে না। ইত্যবসরে এক লোক চোরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসলে তার থেকে ঘড়ি পাওয়া গেল। তাকে কোন প্রকার উত্তম-মধ্যম করা ব্যতিরেকে চুরি না করার ওয়াদা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হল।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সমসাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ ওলি:

একদা শাহ মঞ্জিলের উপরতলায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ভীষণ জযবার হালতে আমাকে নানান প্রকার ওয়াজ নসিহত করছেন, হঠাৎ তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আহাম্মক, আজও চিননি দুনিয়ার সব চেয়ে বড়টি (আমি।)

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ওফাত :

আশেকে রাসূল (স.) শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) ইন্তেকালের বেশ কিছুদিন পূর্ব হতে বলতেন, আমি পশ্চিম দিকে চলে যাব। ইন্তেকালের একমাস পূর্বে ভাতিজা জসীমকে বললেন, তোমার হাফেজ সাহেব দাদা কে দূরে কোন দিকে না যাওয়ার জন্য বলিও। এক সকালে নামাযের পর তাঁর দরবারে পৌঁছলে

Ghunati.com Pioneer in village based website

শাহ সাহেব বললেন, একটি রিক্সা আন, আমি পশ্চিম দিকে চলে যাব। রিক্সা আনার পর নীরব রইলেন। অতঃপর ২৩ সফর ১৪০৪ হিজরি ২৯ নভেম্বর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা, রোজ সোমবার সকাল হতে হতে তাঁর শরীর ভীষণ ঠাণ্ডাভাব এবং শ্বাসকষ্টও বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন তাঁর বড় স্ত্রী জসীমকে বললেন, ঠাণ্ডাজনিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সরিষার তৈল মালিশ করলে ভাল হবে। তখন জসীম তৈল মালিশ করতে আরম্ভ করলে শাহ সাহেব নিষেধ করলেন।

আমি, ইলিশিয়া নিবাসী মকছুদ মিয়া, গোলাম কবির কন্ট্রাক্টর, মুস্তাফিজ ও জসীম কামরায় বসা ছিলাম। যোহরের নামাযের পর তাঁর মধ্যে অস্বস্তি ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল, তিনি একবার শায়িত হন আরেকবার উঠেন। এভাবে আছর পর্যন্ত অতিবাহিত করলেন। আছর নামাযের পর আমরা সকলে তাঁর রুমে বসে পড়লাম। পায়ে হাত দিয়ে দেখি পা ও বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি তখন বুকে পিঠে ও হাতে পায়ে তৈল মালিশ করা আরম্ভ করলাম।

হঠাৎ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি বার? আমি বললাম, সোমবার! তিনি বললেন, আহ! সোমবার কি চলে যাচ্ছে? তখন আমাকে একটি ফারসি কবিতা শুনালেন-

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں - موج ہے دریا کے اندر بیروں دریا کچھ نہیں

তারপর বললেন, বুঝেছ? আমি একদম চুপচাপ। মাগরিবের পূর্বে আমরা হেলান দেয়ার চেয়ার সম্পর্কে কথা তুললে অবশেষে মাওলানা হাবিব সাহেবের বাড়ি থেকে চেয়ার আনা হলো।

তিনিও তথা উপস্থিত হয়ে বললেন, এই চেয়ারে আজমগড়ী সাহেব (রহ.) ও বসেছিলেন। তখন শাহ সাহেব হুজুর বললেন, আজমগড়ীর উপবিষ্ট চেয়ারে আমি কি বসতে পারব?

তখন আমি চেয়ারের বেড-বালিশ ঠিক করে দিলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চকি থেকে দাঁড়িয়ে লাঠিটি আমার হাতে দিলেন এবং স্বীয় লুঙ্গিটি ভাল করে পরিধান করলেন। আর বললেন, চেয়ার কই। আমি হাত ধরে বসিয়ে দিলাম। তখন আমি দেখলাম তাঁর চেহারা মোবারক নুরে আলোকময় হয়ে গেল এবং দক্ষিণ দিকে একটু তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সূরা ইয়াসিন পাঠ করা আরম্ভ করলেন। অতঃপর তিনি নীরবতা পালন করলেন। ইলিশিয়া থেকে তাঁর জন্যে রান্নাকৃত মাছ আনলে সকলের অনুরোধে তিনি সামান্য কিছু খেয়ে নীরব হয়ে গেলেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর গোসল :

আশেকে রাসূল, ওলি সম্রাট শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.)'র লাশ মোবারক গোসল দেয়ার জন্য চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসার মুহাদ্দেসিনে কেরাম, মাওলানা কাছেম সাহেব হুযুর, মাওলানা শফিক আহমদ ও মাওলানা রহমতুল্লাহ এগিয়ে আসলেন। শাহ সাহেব হুযুরের (সীনা) বক্ষের নিম্নাংশ পর্যন্ত গোসল

দেয়ার পর সীনার উপরিভাগ গোসল দিতে সকলে ভীতি প্রকাশ করলেন, যেহেতু তখনো হুযুরের বক্ষ মোবারকে জীবিত মানুষের ন্যায় উষ্ণতা বিদ্যমান ছিল। তখন সকলে, আমি নগণ্যকে তাঁর দেহ মোবারকের উপরি অংশ গোসল দেয়ার জন্যে বললে আল্লাহর মেহেরবানিতে আমি সেই খেদমত আঞ্জাম দিই।

ওয়াজ নসিহত :

শাহ মাওলানা হাফেজ (রহ.) এর ওয়াজ উপদেশের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর বড়ত্ব এবং মাহাত্ম্য বর্ণনার সাথে সাথে মহানবী (স.)'র মহব্বত ও তার সীরত বর্ণনা করা। আরো উল্লেখ থাকে যে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সীরতুন্নবী (স.)'র আলোচনা অতীব গুরুত্ব সহকারে শ্রবন করতেন। বলা বাহুল্য, মিরাজ রজনীর ওয়াজ, আলোচনা অনুষ্ঠান ও সীরত মাহফিল সমাপ্ত হলে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যেত। তিনি যেন আপনজন হারানোর কারণে শোকে মুহ্যমান হয়ে যেতেন।

তোমার প্রশংসা আমার খুব ভাল লাগে :

একদা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ফখরুল মুহাদ্দেসিন মাওলানা আমীনুল্লাহ (রহ.) কে বলেছিলেন- রাসূল (স.) আমাকে বলেন, হাফেজ আহমদ তুমি আমার তারিফ-প্রশংসা করো। তোমার প্রশংসা আমার খুব ভাল লাগে।

কাজী মাওলানা নাসির উদ্দীন

খাদেম, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)
আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথম পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। তখন পুটিবিলা ইউনিয়নের আজীবন চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন চৌধুরী প্রকাশ জনু মিয়া তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ঐ খ্রিস্টাব্দে বায়তুশ শরফ চট্টগ্রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা কুতবুল আলম হযরত শাহ মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতার (রহ.) পবিত্র হজ্ব পালন শেষে মিনায় ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালস্থলে তথা মিনায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সাল, মুয়াল্লেম হাছন মুরাদ ও মদিনা শরিফের বাঙ্গালী মুসাফিরখানার দায়িত্বে নিয়োজিত মাওলানা আবদুল কুদ্দুস ইন্তেকাল করেন। ঐ বৎসর হাটহাজারী থানার মেখল ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আলহাজ্ব শিহাব উদ্দীন চৌধুরীর ঘাড়ে কানের পাশে ক্যান্সার রোগ ধরা পড়লে সাতকানিয়া থানার বাজালিয়া নিবাসী আলহাজ্ব খ্রীস্টাব্দেহ আহমদ চৌধুরীর

মাধ্যমে শিহাব উদ্দীন চৌধুরী চুনতীতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নিকট দোয়ার জন্য আসেন।

পূর্ণ ঘটনা শাহ সাহেব হুজুরকে বললেন, তিনি তাঁর শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে শিহাব উদ্দীনের ঘাড়ে নির্দিষ্ট স্থানে তিনবার চাপ দিয়ে ফুঁক দেন এবং বলেন যে, তোমার ক্যান্সার ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে হিট দিতে হবে না। সত্যি সত্যিই ঢাকা গিয়ে পিজি হাসপাতালে পুনর্বার পরীক্ষা করে দেখলে ক্যান্সার ধরা পড়েনি। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

এই খুশিতে উক্ত শিহাব উদ্দীন চৌধুরী বিশ্ব ভ্রমণের জন্য টিকেট ক্রয় করে শাহ সাহেব হুজুরের নিকট পুনর্বার দোয়ার জন্য আসলে শাহ সাহেব হুজুর তাকে জেদ্দা যাবার পরামর্শ দেন। শিহাব উদ্দীন চৌধুরী প্রথমে লন্ডন যান। সেখান থেকে ওমরাহ করার জন্য সেদিন মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফ পৌছেন। মদিনা শরিফ পবিত্র রজব মাসের ২৬ তারিখ গত ২৭ তারিখ মেরাজের রজনী ছিল। শিহাব উদ্দীন চৌধুরী মাগরিবের নামাযের সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে নামাযরত অবস্থায় দেখতে পায়। নামায শেষে সাক্ষাতের জন্য চেষ্টা করলে আর সাক্ষাত মিলেনি। ঐ দিন চেয়ারম্যান শিহাব উদ্দীন চৌধুরী নিয়ত করেছিলেন যাকে আমি মদিনা শরিফে নামাজরত অবস্থায় দেখলাম আমার টাকা দিয়ে তাকে আমি হজ্বে পাঠাব।

এই নিয়ত কেউ জানতনা কিন্তু শাহ সাহেব হুজুর বারবার বলছিলেন বাদশাহ ফয়সলের জন্য মুয়াল্লেম হাসান মুরাদের জন্য বাঙ্গালি মুসাফেরখানার মাওলানা আবদুল কুদ্দুস সাহেবের জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে। ঐ সময়ে সৌদি আরবের কোন রাষ্ট্রদূত ঢাকায় আসেনি। যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবদ্দশায় সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। ঐ সময় রবিবারে সরকারি বন্ধ ছিল।

আমি বর্ণনাকারী তখন অলিকুল শিরমণি আশেকে রাসূল (স.) মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরত হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সঙ্গে থাকতাম। নিজ প্রয়োজনে চট্টগ্রাম শহরে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে বাদশাহ ফয়সাল এবং মুয়াল্লেম হাসন মুরাদ ও মাওলানা আবদুল কুদ্দুছ সাহেবের কথা বলতেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলতেন, টাকা জমা না দিলেও হজ্বে যাওয়া যাবে। ঐ বৎসর বাংলাদেশের নির্ধারিত হজ্ব ফ্লাইটে যাওয়ার পদক্ষেপের সময় শেষ। তাঁর নির্দেশে আমি চট্টগ্রামের সোনালী ব্যাংক ফিরিঙ্গী বাজার শাখার ম্যানেজার আলহাজ্ব খ্রীস্টাব্দেহ আহমদ চৌধুরীর নিকট টাকা জমা না দিয়ে হজ্বে যাওয়ার কোন পন্থা আছে কিনা জানতে গেলে তিনি কে বা কার নিকট ফোন করেন, ফোন করে আমাকে তাদের সাথে রোববার দিবাগত রাত্রে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেন।

পরে দেখলাম যাকে ফোন করেছেন তিনি শিহাব উদ্দিন চৌধুরী। আমরা যখন চুনতীতে পৌছি, ঐ দিন ইসলামিয়া লাইব্রেরী ও প্রেসের মালিক আলহাজ্ব শামশুল হুদা খাঁ ছিদ্দিকী ইন্তেকাল করেছেন। আমরা যখন শাহ মঞ্জিল পৌছি তখন শাহ সাহেব হুযুর ঘুমে ছিলেন। আমি কামরায় ঢুকার পর তিনি ঘুম থেকে উঠে আমাকে চা আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি নিচ থেকে চা এনে ফজরের নামাযের পুর্বে খ্রীস্টাব্দেহ আহমদ চৌধুরী ও শিহাব উদ্দিন চৌধুরীর আগমনের কথা বললে সাথে সাথে তিনি বললেন- মওতের কোন বিশ্বাস নাই, তুমি ব্যবস্থা কর।

শিহাব উদ্দিন চৌধুরী বললেন, "মামা এই বছর পবিত্র মেরাজ রজনীতে আমি আপনাকে পবিত্র মদিনা শরিফে মাগরিবের নামাযে দেখে মনে মনে নিয়ত করেছিলাম" তাই আপনাকে, মাওলানা নাসির উদ্দিন সাহেব ও হাফেজ হারুন সাহেবকে হজ্বে পাঠাব।" ভিসা কোথা হতে নেওয়া হবে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, দিল্লি থেকে নিলে ভাল হবে। ঐখানে আমার কাজ আছে। বাজালিয়ার নাতিন জামাই মাওলানা শফিক আহমদের দ্বারা তিনদিনের মধ্যে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট তৈরির কাজ সমাপ্ত হয়।

কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদে আসরের নামায আদায় করার পর আমরা চুনতীর ইসলাম খান সাহেবের বাসায় উঠেছিলাম। টিপু সুলতান মসজিদ হয়ে হযরত মাওলানা ছফি উল্লাহ (রহ.) এর কবর জেয়ারত, কলকাতা আলীয়া মাদরাসা পরিদর্শনসহ যাবতীয় কার্যাদি সমাপ্তির পর কলকাতার দমদম বিমান বন্দরে উপস্থিত হই। বিমান বন্দরে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত বাবু ধীরেন্দ্র মোহন সেন নামক একজন পুলিশ কর্মকর্তা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে বললেন, হুযুর মাই দু দিন পহলে খাব দেখতাহু কে আব কি তরেহ এক আদমী মোজে ফুঁকতাহে" তখন শাহ সাহেব হুযুর তাকে দীর্ঘক্ষণ ফুঁক দিলেন।

এই সময় আমাদের সাথে শাহাবউদ্দিন চৌধুরী, এডভোকেট লোকমান আহমদ চৌধুরী আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল ইসলাম (হালিশহর) সাথে আলহাজ্ব হাফেজ হারুনসহ অন্যান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা দিল্লির পথে বিমানে আরোহন করলে বিমানের দরজা বন্ধ করে বিমানের চালক পাইলট এসে শাহ সাহেবকে পায়ে ধরে সালাম দিয়ে বলেন যে, গতকাল আমি স্বপ্নে দেখছি আপনার মত একজন লোক আমাকে ফুঁক দিচ্ছে এবং একটি তাবিজ দিচ্ছে? তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাকে বেশ কিছুক্ষণ ফুঁক দিলেন। তাবিজ দেওয়া যাদুকরি আখ্যায়িত করে চুপ করে বসে থাকলে পাইলট তাঁকে বিমানের সামনে নিয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ পর আমরা দিল্লির চাঁদতারা কোট বিমান বন্দরে অবতরণ করি। ওখান থেকে মটরকার নিয়ে দিল্লি জামে মসজিদের পাশে হোটেল জোয়াহের নামে আবাসিক হোটেলে অবস্থান করি। পরদিন সকালে ফজরের নামায দিল্লি জামে

মসজিদে পড়ার সিদ্ধান্ত নিই। উল্লেখ্য যে, ৫৩টি সিঁড়ি পার হয়ে দিল্লি জামে মসজিদের উঠানে উঠতে হয়।

ফজরের নামাযের শেষে মসজিদের পূর্বদিকে হযরত শাহ ছরমসত (রহ.) এর মাযার জিয়ারত করেন। সকাল ১০টায় সৌদি আরবের হজ্বের ভিসার জন্য দিল্লি অফিসে গমনকালে কর্মকর্তাবৃন্দ শাহ সাহেব হুযুরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন।

ভিসার ফি গ্রহণ করেন নি এবং পরিবর্তে দোয়ার আবেদন করেন। ভিসা নিয়ে বের হয়ে শাহ সাহেব হুযুর জিজ্ঞেস করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোথায় থাকে। তখন ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের চারপাশে দুইবার ঘুরে বললেন, "ইন্ধিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুসলমানদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।" পরবর্তীতে ঐ মাসে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ওখান থেকে আমরা সোজা হযরত নেজাম উদ্দিন (রহ.) হযরত কুতুব উদ্দিন বখতেয়ার কাঁকী (রহ.) হযরত হামিদ উদ্দিন নাগোরী (রহ.) এর মাজার জিয়ারতে যাই। এ ছাড়া হযরত নাসির উদ্দিন ছেরাগে দেহলভী (রহ.) ও হুমায়ুনের মাজার জেয়ারত করি।

এখানে উল্লেখ থাকে যে, কুতুব মিনার পরিদর্শনকালে হযরত মোল্লা আবদুর রহমান জামী (রহ.) এর মাজার জেয়ারত করা হয়। আমাদের হেলথ সার্টিফিকেট ছিলনা। বাধ্য হয়ে মুম্বাই যেতে হয়। মুম্বাই তিনদিন অবস্থান করে হেলথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা হয়। এডভোকেট লোকমান সাহেব দিল্লি হতে এবং শাহাব উদ্দিন চৌধুরী মুম্বাই হতে শাহ সাহেব হুযুর এর নিকট থেকে বিদায় নেন।

মুম্বাইতে শাহ সাহেব হুযুর ভ্রমণের ইচ্ছা করলে ভারতের এ্যাম্বেসেডর নামে প্রাইভেট কারে করে বিভিন্ন পার্ক পরিদর্শন শেসে সমুদ্রের মাঝে হযরত শাহ হাজী বাবা আলী (রহ.) এর মাজারে নিয়ে যাওয়া হয়, যা সমুদ্রের মাঝে অবস্থিত। ঐখানে পৌছে আসরের নামায আদায়ান্তে মাজার জেয়ারত করি।

দীর্ঘক্ষণ মুনাজাত শেষে হযরত শাহ সাহেব হুযুর বের হওয়ার পর বললেন, এই লোকটি আমাদের দেশের, হজ্ব পালন করে আসার সময় ইন্তেকাল করেছিলেন। জিয়ারত শেষে মাগরিবের নামায হোটেলে এসে পড়ি।

তখন শাহ সাহেব হুযুর পূর্ণ হালতে ছিলেন। মাগরিবের ইমামতি আমি করি। নামায শেষে তখন শাহ সাহেব হুযুর বললেন, এমন এক শুভ দিনে আল্লাহপাক আমার কলবে এসে বসল ঐ দিন আমি আল্লাহর কাছে যা চেয়েছিলাম তা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন।

পরদিন সকালে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে মুম্বাই এর পালান বিমান বন্দর থেকে সৌদি আরবের বিমান বন্দর দাহরানে অবতরণ করি। সারাদিন ঐখানে অবস্থান করার পর জেদ্দা পৌছি। জেদ্দা হতে সোজা পবিত্র মদিনা মনোয়ারা রওয়ানা হই। মদিনা শরিফে হযরত সৈয়দ হোসনী এর মেহমান হিসাবে একদিন একরাত

অবস্থান করে পরবর্তীতে একটি ঘর ভাড়া নিই। আমরা সতের দিন মদিনা শরিফে ছিলাম।

পবিত্র রওজা শরিফে জেয়ারত, মদিনা শরিফের পবিত্র কবরস্থান জান্নাতুল বাকি উহুদ পাহাড়ের পাশে হযরত হামজা (র.) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কবর এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে হযরত শাহ সাহেব এর অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ পায়। মদিনা শরিফ হতে পবিত্র মক্কা মোকররমা এসে হজ্বের যাবতীয় আহকাম পালন করে আসার পথে জেদ্দায় ফন্দকে উন্দুলুজ নামে একটি আবাসিক হোটেলে অবস্থান করি। সেখানে মা হাওয়া (আ.) এর মাজার অবস্থিত। ঐ জায়গার নাম নজলা সরকিয়া।

জেদ্দা হতে সরাসরি দুবাই বিমানবন্দরে অবতরণ করি। বিমানে আরোহণের পর দুইজন ভদ্র পুরুষ ও মহিলা যাত্রী শাহ সাহেব হুজুরকে দেখে মন্তব্য করলেন এই লোকটি বড় উঁচু দরজার মানুষ হবেন। পরবর্তীতে তাদের পরিচয়ে জানা গেল তারা পাকিস্তানি ডাক্তার। তারা শাহ সাহেব হুযুরের দোয়া নিলেন এবং ৫০০ রিয়াল হাদিয়া দিলেন।

দুবাই বিমান বন্দরে অবতরণের পর শাহ সাহেব হুযুর, আমি, হাফেজ হারুন সাহেব, মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব দুবাই শহরে নিয়ে গেলেন যা দুবাই, আবুধাবি, আজমান, শারজাহ, রাস-আলখাইমাহ, আলফুজায়রা নিয়ে আমিরাত ইউনাইটেড আরব রাজ্য গঠিত। সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থানের পর আমরা বাংলাদেশে চলে আসি।

তখন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোছাইন ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন মন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) নুরুল হক ঢাকার ডিভিশনাল কমিশনার খানে আলম খানসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হযরত শাহ সাহেব (রহ.)কে তেজগাঁও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সংবর্ধনা জানান।

ঢাকা থেকে বাড়ি আসার পথে চট্টগ্রাম শহরে এসে জানতে পারলেন যে, আলহাজ্ব মাওলানা শফিক আহমদ সাহেব, অধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা ও মঈনুল ইসলাম চৌধুরী (হিরণ) চুনতী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তখন চট্টগ্রামে মকবুল আহমদ চৌধুরীর বাসায় অবস্থান নিলেন এবং চুনতীতে না আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। সপ্তাহখানেক পর চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাওলানা শফিক আহহমদ সাহেব বাড়িস্থ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে বহু কষ্টে শাহ সাহেবকে রাজি করিয়ে চুনতী নিজ বাড়িতে আনেন।

বাড়িতে আসার কয়েকদিন পরে শাহ সাহেব হুযুরের নতুন বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে চেয়ারম্যান প্রার্থী জনাব শফিক আহমদ ও মঈনুল ইসলাম হিরণের সমর্থকরা মিছিল করে যাওয়ার সময় উভয় পার্টিতে সংঘর্ষ লেগে যায়, যাতে জাফর সাদেক ও জহির নামে দুই ছেলে আহত হয়।

তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মঈনুল ইসলাম (হিরণ) কে সম্বোধন করে বললেন- "হিরণ তুমি চিন্তা করিও না, চেয়ারম্যান পার করে দিয়েছি।" উল্লেখ্য যে, সাতগড়ের অধিবাসী আলহাজ্ব মান্নান সাহেবও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ছিলেন।

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.):

সীরতুন্নবী (স.) এর জিয়াফত বিভাগের জন্য বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বর্তমান কক্সবাজার জেলার টেকনাফ থেকে গরু আনা হত। হারবাং কালা সিকদারপাড়ার জনাব ডাক্তার আনোয়ার যিনি গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ছিলেন, তার বুকে একটি দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার অফিসে বসে রং চা পান করছিলেন সাথে পেঁয়াজু ছিল। ঐ সময় ডাক্তার আনোয়ার শাহ সাহেব হুযুরকে সালাম করতে গেলে হুযুরের হাতের অর্ধেক পিয়াজু ডাক্তার আনোয়ারকে খেতে দেন। সাথে রং চা এর যে অংশ কাপে ছিল তা পান করতে বলেন। ডা. আনোয়ার পরে স্বীকার করেন যে, আমার বুকের ব্যথা কোন ঔষুধে সারে নাই, শাহ সাহেব হুযুরের দোয়ায় পেঁয়াজু ও রং চা খাওয়ার পর আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি।

কর্ণেল অলি আহমদ বীর বিক্রম (অব.) যিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পি.এস. ছিলেন তিনি ডাক্তার আনোয়ার সাহেবের বাসায় আসা-যাওয়া করত এবং ডাক্তার সাহেবকে নানা ডাকতেন। ডাক্তার আনোয়ারের পরামর্শে ও সহযোগিতায় কর্ণেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'এর কাছে আনার ব্যবস্থা করেন।

ঐ বছরে টেকনাফ থেকে গরু আনার জন্য চট্টগ্রাম জেলার এ.ডি.সি পরবর্তীতে বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবদুল মালেক সাহেবের অনুমতিপত্র নিয়ে চুনতী হেফজখানার হাফেজ আবদুছ ছমদ, হাফেজ মাওলানা নেছার আহমদকে গরু কেনার জন্য টাকা পয়সা দিয়ে টেকনাফ পাঠানো হয়।

৪৮টি গরু কেনা হয়। তৎকালীন বি.ডি.আর এর ওয়িং কমান্ডার চোরাচালানের অভিযোগে হাফেজ মাওলানা নেছার আহমদ, হাফেজ আবদুছ ছমাদসহ আরো দুইজন ট্রাকের হেলপারকে টেকনাফ থানায় আটক করে ঐ ৪৮টি গরু ও দুইটি ট্রাকসহ টেকনাফ থানার কাস্টম অফিসে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মামলা দায়ের করেন।

এ খবর চুনতীতে আসলে ঐ সময়ে যারা সীরত পরিচালনায় ছিলেন তারা সবাই হতাশ হয়ে গেলেন, কিন্তু শাহ সাহেব হুযুর মোটেই হতাশ হননি বরং বললেন এই কাজের জন্য আমার ছেলে নাসির উদ্দিনকে পাঠানো হবে।

শাহ সাহেব (রহ.)এর নির্দেশে আমি জনাব বদরুদ্দোজা আমিনকে সঙ্গে নিয়ে টেকনাফ চলে যাই। টেকনাফ থানা হেফাজতে থাকা চারজন কাস্টমে দায়েরকৃত

গরু ও গাড়িসহ মোট ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মামলা শাহ সাহেব (রহ.)'র দোয়া ও অলৌকিক শক্তির উসিলায় শেষ করি। উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ে কাস্টম এর ডেপুটি কালেক্টর জনাব আলী নেওয়াজ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন।

টেকনাফ থেকে গরু নিয়ে আসার পথে আমার প্রাইভেট কারের তেল উখিয়া থানা এলাকায় পৌছার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। আমার পকেটে কোন টাকা নেই। ড্রাইভারের হাতেও কোন টাকা নেই। উখিয়া থানার নিকটে পৌছলে থানার পুলিশ গাড়ি থামিয়ে আমাকে নামতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, আমাদের ওসি সাহেবের স্ত্রী পেটের ব্যাথা নিয়ে পাগল প্রায় অবস্থা একটু পানি পড়া দেওয়ার জন্য, ঐ গভীর রাতে গাড়ি থেকে নেমে এক গ্লাস পানি পড়া দিলে ওসি'র স্ত্রী আরোগ্য লাভ করেন।

উনি খুশি হয়ে আমাকে ১০০০ টাকা প্রদান করেন যা সম্পূর্ণ শাহ সাহেব হুযুরের করামত ছাড়া আমার ব্যক্তিগত কিছুই ছিলনা। এবার হাফেজ আবদুস ছমাদ, মাওলানা নেছার ট্রাকের ড্রাইভার গরুসহ মুক্তিলাভ করে ট্রাক চুনতী পৌছে যায়।

✪ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওলামা, ওলামা, পীর মাশায়েখ ও ইসলাম দরদী মানুষের দুর্গতি ও লুকিয়ে থাকা আলেম ওলামাদেরকে একত্রিত করার জন্য ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে আরবি রবিউল আউয়াল মাসের ১১ তারিখ গতে ১২ তারিখ সারারাতব্যাপী সীরাতুন্নবী (স.) এর গোড়াপত্তন হয় যা যথাক্রমে ১দিন, ৩দিন, ৫দিন, ৭দিন, ১০দিন, পরবর্তীতে ১৯দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করে শাহ সাহেব হুযুর সীরত মাহফিল শুরু হতে এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর ইন্তেকাল করেন।

✪ সীরাতুন্নবী (স.) শুরুর প্রথম দিন শাহ মঞ্জিলের সামনের আঙ্গিনায়, ২য় বৎসর বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে, ৩য় বৎসর একইস্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ৪র্থ ও ৫ম বৎসর একইস্থানে হতে থাকে। পরবর্তীতে সীরতের দিন ও সময় বেড়ে যাওয়ায় যুগ ও সময়ের চাহিদায় সীরত ময়দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে জনাব আলহাজ্ব ছালেহ আহমদ চৌধুরী, মকবুল আহমদ চৌধুরী, সাহেবুর রহমান চৌধুরী, রমজু মিয়া, গোলাম কবির, আলহাজ্ব ইউছুপ মিয়া ও ডাক্তার গোলাম কিবরিয়াসহ আরো অনেক ভক্তবৃন্দ শাহ সাহেব হুযুরকে সীরত ময়দানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বললে শাহ মঞ্জিলের পাশের জায়গায় মালিক মলিহ উদ্দীন খাঁ, রফি উদ্দীন খাঁ, সালাহ উদ্দিন খাঁ, পিতা- এস্তেফাজুর রহমান খাঁ এর মৌরসী পৈত্রিক জায়গা যার বর্তমান ও দাগ জনাব বদরুদ্দোজা আমিন ও মাওলানা নুরুল আবছার প্রকাশ (বানু মৌলভী) জোগাড় করে দেন।

জায়গার মুল্য আলহাজ্ব ছালেহ আহমদ চৌধুরী প্রদান করেন যা সীরাতুন্নবী (স.) এর পক্ষে আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ এর নামে ক্রয় করা হয়। পরবর্তীতে ঐ জায়গার পাশে ডেপুটি বাড়ীর জনাব আয়ুব খাঁন, প্রাক্তন প্রধান

শিক্ষক, কাজেম আলী হাই স্কুল চট্টগ্রাম হতে ৪ কানি জায়গা ক্রয় করেন। এছাড়া এই ময়দানে আলহাজ্ব শাহ কাজী মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের ওয়ারিশানের আলহাজ্ব তৈয়র উল্লাহ খান সাহেবের, মাওলানা মসউদ ও ইসহাক মিয়া গং এর কিছু জায়গা অন্তর্ভূক্ত আছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি খাসের দু'শতক জায়গা যা পরে বন্দোবস্তী করা হয়েছে।

আরো উল্লেখ করা যায়, জনাব আয়ুব খান থেকে ক্রয় করা জায়গার উপর বর্তমানে শাহ সাহেব (রহ.) এর মাজার অবস্থিত। ইহা একটি পাহাড়ী এলাকা ছিল যা সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে সীরত ময়দানে পরিণত হয়েছে। উল্লিখিত ব্যক্তি সকল হতে ক্রয় করার পর দখল স্বত্ব নিয়ে মাঠে পরিণত করার জন্য বুলডোজার দ্বারা মাটি কাটানো হয় যার ড্রাইভারের নাম ছিল আবদুর রশিদ। সীরত ময়দানে ৩২ কানি জায়গা বিদ্যমান আছে। ঐতিহ্যবাহী মসজিদে বায়তুল্লাহ ও সীরতের মেহমানখানা, রান্নারঘরসহ যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে সীরত ময়দানের কাজ সম্পন্ন হয়।

✪ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে, উপরে উল্লিখিত জনাব ডাক্তার আনোয়ার হোসেনের নির্দেশে জনাব আলহাজ্ব অলি আহমদ (অব.) বীর বিক্রম এর প্রচেষ্টায় জনাব জিয়াউর রহমান, উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে (ঐ সময়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি ছিলেন জনাব সায়েম) মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ তশরিফ আনেন।

✪ পরবর্তীতে শাহ সাহেব হুযুরের দোয়ায় জিয়াউর রহমান মহামান্য রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় সময় রাষ্ট্রীয় সংকটে শাহ সাহেব হুযুরের নিকট তাঁর ব্যক্তিগত দূত বা শাহ সাহেব হুযুরকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্থ বাসভবনে ও বঙ্গভবনে নিয়ে যেতেন। রাষ্ট্রীয় গোপনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এমনকি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংক্ষেপে বিএনপি গঠনের পুর্বে শাহ মঞ্জিলের ২য় তলায় পার্টি গঠনের অনুমতি নেন এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এর ১৯ হরফের এক এক হরফে এক এক দফা অর্থাৎ বিএনপির ১৯ দফার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শাহ সাহেব (রহ.) খুশি হয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে অন্তর খুলে দোয়া করলেন।

✪ বিএনপি গঠন হওয়ার পর প্রথম নির্বাচনে শাহ আজিজুর রহমান বিএনপি থেকে নির্বাচিত হয়ে সংসদ সদস্য হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছায় দোয়ার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট ডেলিগেট আবু সাঈদ (বরিশাল) তাহের সোবহান (চট্টগ্রাম) সহ আরো একজনকে পাঠান। ফজরের নামাযের পর শাহ আজিজুর রহমানের পক্ষ থেকে দোয়ার আবেদন জানালে শাহ সাহেব হুযুর ২০/২৫ বার শাহ আজিজুর রহমানের নাম বারবার উল্লেখ করেন এবং বলেন- তোমরা চলে যাও, প্রধানমন্ত্রী আল্লাহ করবেন।

একদিন পর দেখা গেল শাহ আজিজুর রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

✪ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের বর্তমান চকবাজার গুলজার টাওয়ারের পার্শ্বে কবির শেঠ সাহেব প্রকাশ হারুণের বাপ একটি জেনারেটর প্রদান করেন যা বর্তমানে আছে। লন্ডন থেকে শাহ সাহেব হুযুরের নামে পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবীর জন্য প্রদান করে। ঐ সময় বাংলাদেশে জেনারেটর আনা নিষিদ্ধ ছিল যার কাস্টম ডিউটি ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকার পরিমাণ এসেছিল।

রেভিনিউ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসাইন, বাড়ি সন্দ্বীপ, কাস্টম ডিউটি মওকুফ করেন। একই বছর ১লা রমজান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান জেনারেটর আনার অনুমতি প্রদান করেন যার বদৌলতে বিনা বাধায় জেনারেটর চুনতীতে আনা সম্ভব হয়েছে। ঐ দিন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান তশরিফ আনলেন। আমি বর্ণনাকারী জেনারেটরের অনুমতির জন্য যাই এবং তিনি আমাকে হজ্বে যাবার কথা বললেন। আমি হুবহু তার কথা শাহ সাহেব হুযুরকে এসে বললাম যা শাহ সাহেব এর জীবনের শেষ হজ্ব।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ব্যবস্থাপনায় পবিত্র হজ্বব্রত পালন:

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে অলিকুল শিরমণি আশেকে রাসূল (স.) ফানা ফিররাসূল (স.) মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরত হযরত শাহ আলহাজ্ব মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেবের ঘনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ যথা: অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন নুরুল হক (মাননীয় মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব ইউসুফ মিয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব মকবুল আহমদ চৌধুরী, সাহেবুর রহমান চৌধুরীসহ আরো অন্যান্য ব্যক্তি পবিত্র হজ্বব্রত পালনের জন্য শাহ সাহেব হুযুরকে প্রস্তাব দিলে তিনি রাজি হননি।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ঐ বৎসর রমজানের প্রথম দিন চট্টগ্রাম শহরের সার্কিট হাউসে জেনারেটরের অনুমতি প্রদানের সময় হজ্বব্রত পালনের প্রস্তাব আমার মাধ্যমে পৌছালে তিনি রাজি হন। একদিন জুমাবার দিবাগত রাত বারটার সময় শাহ সাহেব হুযুরের শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "নাসির উদ্দিন তুমি ঢাকায় যাও, মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে আমি হজ্বে যাওয়ার কথা বল।"

উত্তরে আমি বললাম, আব্বা আমি বঙ্গভবন পর্যন্ত কি করে পৌছব। তখন তিনি আমার মাথায় হাত রেখে ফুঁক দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে দোয়া করছি তুমি পারবে। ঐ সময় রোববার সরকারি বন্ধ ছিল।

শনিবার শহরে এসে হেমসেন লেইনে বসবাসকারী আলহাজ্ব আবু তাহের মামার নিকট শাহ সাহেব হুযুরের কাজে ঢাকা যাওয়ার কথা বললে ঐ সময়ে আমার

চাওয়া ছাড়া তিনি দুই হাজার টাকা আমার হাতে দেন এবং প্রয়োজনীয় খরচের পরামর্শ দেন। শাহ সাহেব হুযুরের হজ্জব্রত পালনের সিদ্ধান্তের কথা আমার পরে জনাব আবু তাহের ছাড়া আর কেউ জানতেন না।

সোমবার সকালে ঢাকায় পৌঁছে আমি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানকে শাহ সাহেব হুযুরের হজ্জব্রত পালনে সম্মতি দেয়ার কথা বললে তিনি হতাশ মনে বললেন এখন তো আমার হাতে কোন ক্ষমতা নেই। সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের। শাহ সাহেব হুযুর আমাকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর নিকট নয়। সোম, মঙ্গল ও বুধবার অতিবাহিত হবার পর বৃহস্পতিবার সকালে আলহাজ্ব অলি আহমদ (অব.) বীর বিক্রম এর সহযোগিতায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির রুমে সাক্ষাৎ করি এবং শাহ সাহেব হুযুরের হজ্বে যাওয়ার কথা বলি।

তিনি (মহামান্য রাষ্ট্রপতি) তখন বললেন টু ম্যান এলাউড। "Two-man allowed special delegate by the President of Bangladesh. Shah Saheb Kebla Chunati and Mowlana Nasir Uddin." ঐ সময় হুয়ায়ুন রশীদ চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রদূত হিসেবে সৌদি আরবে কর্মরত।

আমি বর্ণনাকারী মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন বঙ্গভবন থেকে সোজা সচিবালয়ে ক্যাপ্টেন নুরুল হক (অব.) মাননীয় মন্ত্রী এর নিকট খবর পৌছালে তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, শাহ সাহেব হুযুরকে আমি বলেছিলাম তিনি রাজি হননি। এখন কি জন্য রাজি হলেন? যা হউক, সময় প্রায় শেষ আর মাত্র তিনটি ফ্লাইট আছে, তিনদিনের মধ্যে চলে আসতে হবে।

আমি চুনতী এসে দেখতে পেলাম,শাহ সাহেব হুযুরের রুমে সাতকানিয়া থানার ফখরুল মুহাদ্দেসিন হযরত মাওলানা আমিন উল্লাহসহ বিশ-ত্রিশজনের মত ভক্ত শাহ সাহেব হুযুরের সামনে বসা অবস্থায় ছিলেন। ঐ দিন জুমার নামাযের সময় প্রায় হয়েছিল। আমাকে দেখে শাহ সাহেব হুযুর খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠেন "এই তো আমার ছেলে এসেছে"। আমি সকলের সামনে বললাম, আব্বা আপনি আমাকে গত জুমাবার দিবাগত রাত বারটার সময় ঢাকা যাওয়ার কথা বলে পাঠালেন। এ কথা কেউ জানতেন না।

আপনার দোয়ায় অলৌকিকভাবে আল্লাহর রহমতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আপনাকে আর আপনার খাদেম হিসেবে আমাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতির পক্ষে হজ্জব্রত পালন করার জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং আগামী তিন দিনের মধ্যে আমাদেরকে ঢাকা পৌছতে হবে। তারপর শাহ সাহেব হুযুর হঠাৎ আবেগে কাঁদলেন এবং বললেন, "সৌদি আরব পর্যন্ত আমার দায়িত্বে, ঐ দায়িত্ব আদায় করার জন্য আমার যেতে হচ্ছে।"

সোমবার দিন বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ছাড়া চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার সম্মানিত শিক্ষক, চট্টগ্রাম নোয়াখালী, ঢাকা টেকনাফ, কক্সবাজার এর অগণিত ভক্ত উপস্থিত হয়ে বিদায় জানাতে আসলে বিদায়কালে সকলে দোয়ার আবেদন করলে তিনি সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করেন।

বাড়ি থেকে আমরা সোজা হেমসেন লেইনস্থ বিশিষ্ট শিল্পপতি ও দানবীর আলহাজ্ব ইউসুপ মিয়ার বাড়িতে উঠি। পরদিন সকালে বিমানযোগে ঢাকা চলে যাই।

ক্যাপ্টেন নুরুল হক (অব.) মাননীয় মন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে তার বাসভবনে উঠি। ওখানে অবস্থানকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর মন্ত্রিপরিষদের কিছু কিছু সদস্যবৃন্দ ও সরকারি-বেসরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ শাহ সাহেব হুযুরের সাথে সাক্ষাত করেন ও দোয়া প্রার্থনা করেন।

নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ঢাকা বিমান বন্দর থেকে সোজা জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌছলে তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জেদ্দা বিমান বন্দরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে বরণ করেন এবং জেদ্দায় সরকারি মেহমানদেরকে যে ঘরে বসানো হয় ঐ ঘরে নিয়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ বিশ্রামের পর শাহ সাহেব হুযুরের নির্দেশে প্রাইভেট কার নিয়ে সোজা মদিনা শরিফ রওয়ানা হই। ঐ বৎসর মাওলানা শফিক আহমদ এবং গোলাম কবির বেসরকারিভাবে শাহ সাহেব হুযুরের সাথে ছিলেন।

মদিনা শরিফে ১১ দিন অবস্থানের পর মক্কা শরিফে আসি। শাহ সাহেব হুযুর যতদিন মদিনা শরিফে ছিলেন নিজে এবং অন্যান্য সকলকে আল্লাহর ঘরের জন্য দোয়া করতে বারবার বলতেন। মদিনা শরিফের যেসব জায়গায় দোয়া কবুল হয় প্রত্যেক জায়গায় আল্লাহর ঘরের জন্য দোয়া চাইতেন ও নিজে দোয়া করতেন।

মক্কা শরিফে তাওয়াফ শেষে আল্লাহর ঘরের জন্য বিশেষভাবে দোয়া ও মুনাজাত করেন। চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের প্রধান রূপকার মুজাহেদে আজম আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেবকে আল্লাহর ঘরের জন্য দোয়া করার কথা মিনা, মুজদালিফা, আরফাতের ময়দান প্রতিটি মকবুল স্থানে স্মরণ করায়ে দেন।

একদিন হঠাৎ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ শেষে শাহ সাহেব হুযুর বললেন মক্কা (মোকাররমা) মদিনা (মুনাওয়ারা) আমার হাতে বা অধীনে, এর হেফাজতের মহান দায়িত্ব নিয়ে আমি হজ্বে এসেছি। উল্লেখ থাকে যে, ঐ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় আল্লাহর ঘরের ভিতর যে রক্তপাত ও খুনাখুনি সে খ্রিস্টাব্দের মুহররম মাসের প্রথম তারিখে সংঘটিত হয়েছিল যা মক্কা (মুকাররমা) বিজয়ের পর ইসলামের ইতিহাসে নজির নেই। পবিত্র হজ্ব পালনের কাজ সম্পদান করে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর দাওয়াত বাদশাহ খালেদ ও ভাবী বাদশাহ ফাহাদ পর্যন্ত পৌছান। শাহ সাহেব

হুযুর বাংলাদেশে ফেরার এক সপ্তাহ পর ইরানিদের দ্বারা এই ঘটনার সূত্রপাত হয়।

এসব ঘটনাবলী দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শাহ সাহেব হুযুরের হাতে আধ্যাত্মিক ও অলৌকিকভাবে ন্যস্ত ছিল। বায়তুল্লাহর ভিতর রক্তপাতের ঘটনা সম্পর্কে অলৌকিকভাবে পূর্বেই তিনি জানতে পেরেছিলেন এবং এ জন্যই ঐ বৎসর হজ্বে গমন করেছিলেন।

চুনতী মাদরাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবদান

✪ ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসা উত্তরোত্তর ফোরকানিয়া, এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম ও ফাযিল স্তরে উন্নীত হয়ে এলাকায়, দেশে-বিদেশে দ্বীনি শিক্ষার আলো বিস্তার করে আসছিলেন। ঐ মাদরাসাকে কামেল তথা মাস্টার্স ডিগ্রি মানে পৌঁছাতে শাহ সাহেব হুযুরের আন্তরিকতা প্রচেষ্টা ও দোয়া অনন্য ভূমিকার অধিকারী। তিনি চুনতী মাদরসার অফিসে বসে পশ্চিম দিকে মুখ করে দেখে দেখে প্রায় বলতেন "এই হতে মদিনা শরিফ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পর্দা উঠিয়ে ফেলেছি, আমি রাসূল (স.) থেকে দুটি জিনিসের অনুমতি নিয়েছি তার মধ্যে একটি সীরতুন্নবী অপরটি চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসাকে হাদিস বিভাগে কামিল করা।

✪ একদা সীরত চলাকালীন সময় চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদরাসার বর্তমান মেহমানখানা সাবেক ফাযিল ক্লাসের রুমে সাতকানিয়ার জলিল শেঠ সাহেব থাকতেন। একদিন ফজরের নামাযের পর ঐ রুমে শাহ সাহেব হুযুর জলিল শেঠকে দেখার জন্য গিয়ে বসলে ওলামা কুল শিরমণি ওয়ায়েজে খোশ বয়ান বুলবুলে বাংলা হযরত মাওলানা মুবারক আহমদ সাহেব সহ অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ও ব্যক্তিবর্গ ঐ রুমে গিয়ে জড়ো হন।

শাহ সাহেব হুযুর আলহাজ্ব মাওলানা মুবারক আহমদ সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন- মুবারক আমি সীরত মাহফিল Source of Income অর্থাৎ আয়ের উৎসের জন্য করিনি। আমি একদিন মদিনার সবুজ গম্বুজের নিচে শায়িত অবস্থায় হায়াতুন্নবী (স.) কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি এসে সোজা আমার মাথার উপর হাত রাখলেন, তখন আমি ভয়ে কাঁপতে ছিলাম। আস্তে আস্তে আমি রাসূল (স.) কে বললাম হে আল্লাহর রাসূল, এখন আমি কি করব? উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, "তোমার গিরা পার হয়ে গেছে। তোমাকে কিছু করতে হবে না শুধু আমার প্রশংসা করবে।" ঐ দিন থেকে আমি চিন্তা করলাম আমি যদি একা প্রশংসা করি একাই লাভবান হব। আমার দেশের অসহায় গরিব-দুঃখী-মেহনতী ও পাপী উম্মতের কি অবস্থা হবে চিন্তা করে এই সীরত শুরু করেছি এবং চুনতী মাদরাসাকে হাদিস বিভাগে কামিল পর্যায়ে উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। উল্লেখ্য যে, ঐ সময়

Chunati.com Pioneer in village based website

তিনি চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র পরবর্তীতে কামিল মাদরাসার গভর্নিং বডির সভাপতি ছিলেন।

এছাড়া কুমিরাঘোনা আখতারাবাদ আখতারুল উলুম মাদরাসা, সাতকানিয়া কলেজ ও হাই স্কুলসহ বহু জাতীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি দান, দোয়া ও পরামর্শে জড়িত ছিলেন।

চিঠিপত্র :

✪ ব্যক্তিগতভাবে কোন চিঠি কারো নিকট প্রেরণ করেননি, কিন্তু মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর জন্য দাওয়াত হিসেবে সৌদি আরবের মহামান্য বাদশাহ খালেদ, বাদশাহ ফাহাদ, সৌদি রাষ্ট্রদূত ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল খতিব, শেখ মুজিবুর রহমান, সাবেক রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বিচারপতি আবদুল সত্তার সহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদেরকে চিঠি প্রেরণ করেন।

করামত :

✪ মুসলমানদের আক্বিদা বা বিশ্বাস হল করামাতুল আওলিয়ায়ে হক্কুন। সেই হিসাবে যুগে যুগে আউলিয়া কেরামদের ভিন্ন ভিন্ন করামত প্রকাশ পেয়েছে, যা আউলিয়া কেরামের জীবনী পাঠান্তে দৃষ্টিগোচর হয়। সেভাবে অলিকুল শিরমণি ফানাফিল্লাহ ও ফানা ফিররাসুল, আশেকে রাসূল মুজাদ্দেদে মাহফিলে সীরত শাহবাজে ত্বরিক্বত হযরত শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) ঐ সমস্ত আউলিয়ায়ে করামদের একজন ছিলেন তার জীবনে তিনি মাতৃগর্ভের ওলি ছিলেন। সেই হিসেবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সান্নিধ্য পাবার পর সর্বপ্রথম পাহাড় জঙ্গলে ঘোরাঘুরির সময় মোটর গাড়ির ড্রাইভারদের হাতে ধরা পড়েন।

যেমন: অরণ্য জঙ্গল থেকে বের হয়ে রাস্তার উপর কোন গাড়িকে হাত দেখালে গাড়ি থামিয়ে তাকে না নিলে গাড়ি বন্ধ হয়ে যেত। এমনকি দোহাজারী হতে চট্টগ্রামগামী রেলও তাকে নামিয়ে দেয়ার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিশেষ দূত হিসেবে সৌদি আরব গমন করলে মদিনা মুনাওয়ারাতে অবস্থানকালে ওখানে বেশি গরম পড়ছিল। শাহ সাহেব কেবলা মসজিদে নববী হতে বাবে জিব্রাইল দিয়ে বের হলেন এবং রওজায়ে আকদসের কার্নিশে যে চার ফেরেস্তার নাম লেখা ছিল, ঐ দিকে তাকিয়ে বললেন যে, এটা কার নাম? আমি বর্ণনাকারী বললাম যে, জিব্রাইল পাশেরটা মিকাঈল, তাঁর পাশে ইস্রাফিল, তাঁর পাশে আজরাঈল এর নাম লেখা, তখন শাহ সাহেব হুযুর ঐ দিকে তাকিয়ে বললেন এটা মিকাঈল! না সে যা পারে না সে দায়িত্ব নিয়েছে কেন?

অথচ ঝড়-বৃষ্টির দায়িত্ব তাঁর হাতে, মদিনা শরিফে এত গরম পড়তেছে বৃষ্টি দিতে না পারলে দায়িত্ব নিয়েছে কেন? তখন দেখা গেল গম্বুজে হদারার উপর দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে সাথে সাথে বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমরা বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় যাই।

✪ আমি বর্ণনাকারী ছেলেমেয়েসহ দশজনের জনক, একের পর এক ছয়টি মেয়ে সন্তান হলে আমি মনক্ষুন্ন করে শাহ সাহেব (রহ.)কে ৬নং মেয়ের খবর দিলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে তিনবার বললেন আমার ভাই হবে, ভাই হবে, ভাই হবে, আল্লাহর মেহেরবানি, এরপরে তিন ছেলে জন্ম নেয়, যা শাহ সাহেব হুযুরের দোয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

✪ আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরিফ ও মদিনায় সৈয়্যেদুল আম্বিয়ার রওজা মুবারক দেখার তাওফিক আমার ছিল না ও নাই। আল্লাহপাক দয়া করে বারবার আল্লাহর ঘর ও রওজাপাক দেখার সুযোগ করে দেয়া শাহ সাহেব হুযুরের দোয়ার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। আমার জীবনে আমি যখন আলিম পরীক্ষার্থী, সাতকানিয়া আলীয়া মাদরাসা কেন্দ্রে পরীক্ষা হচ্ছিল। চারদিন পর হঠাৎ একশ তিন ডিগ্রি জ্বর, পরীক্ষা দেয়ার কোন অবস্থাই ছিল না, হঠাৎ শাহ সাহেব কেবলা পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে আমাকে ফুঁক দিলেন, পরবর্তী বেলায় পরীক্ষা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল, তখন দুই বেলা পরীক্ষা ছিল।

অনুরূপভাবে ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় একই অবস্থা। ফাযিল পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর কামিল পড়ার জন্য চট্টগ্রামের চন্দপুরাস্থ দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার জন্য শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে ১৬০ টাকা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন- আমার উস্তাদ হযরত মাওলানা আমীন সাহেবকে ও আফাজ উল্লাহ সাহেবকে আমার সালাম বলবে।

আমি উস্তাজকুল শিরোমণি হযরত মাওলানা আমিন সাহেবকে শাহ সাহেব হুযুরের সালাম বললে আমিন সাহেব হুযুর সানন্দে সালাম গ্রহণ করে উত্তর দিলেন এবং বললেন, আমার দোয়া বলবে।

নাম লিখার পর আমি চুনতীতে শাহ সাহেব হুযুরকে সালাম করতে গেলে তিনি আমিন সাহেব হুযুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সালামের উত্তর ও দোয়ার কথা বললে শাহ সাহেব হুযুর কেঁদে দিয়ে বললেন- উস্তাদ বড় জিনিস, উস্তাদের দোয়া ছাড়া কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এক কথায়, আমার জীবনের সম্পূর্ণ শাহ সাহেব (রহ.) এর দোয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সবচাইতে শাহ সাহেব হুযুরের জীবনের বড় করামত ১৯ দিনব্যাপী সীরতুন্নবী (স.) মেরাজুন্নবী (স.) ও চুনতী মাদরাসাকে কামিল শ্রেণীতে উন্নীত করা যা তার বেলায়তের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা আমির আহমদ

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জেঠাত ভাই ও শ্যালক

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে অত্যাধিক স্নেহ করতেন। যদিও তিনি আমার আপন ভগ্নিপতি তবুও আমি ওনাকে বদ্দা বলে সম্বোধন করতাম।

✪ সম্ভবত ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে আমি যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তখন হঠাৎ করে শাহ সাহেব বদ্দা একদিন চুনতী আসেন। তখন রাতও গভীর। আমাদের ঘরের দরজাও বন্ধ। ১/২ টার দিকে শক্তভাবে দরজা লক থাকা অবস্থায় হঠাৎ খুলে গেল এবং শাহ সাহেব বদ্দা ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন আমি হতভম্ব হয়ে যাই।

✪ ১৯৭৫/৭৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে গভীর রাতে একবার আমি শাহ মঞ্জিলের উপরের তলায় এক কামরায় ঘুমাচ্ছিলাম। পার্শ্বে আমার আপার কক্ষ। এরপর শাহ সাহেব বদ্দার কক্ষ। কিছুক্ষণ পরে শাহ সাহেব বদ্দা বের হয়ে যান। রাত গভীর থেকে গভীরতম হতে থাকে। হঠাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে মনে হয়; কে যেন ঘোড়ায় চড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠছে। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার সাহস ছিল বিধায় প্রথমে দরজা ফাঁক করে দেখলাম। কিন্তু অন্ধকারের কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। শব্দ ঠিকই শুনা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। কিছুক্ষণ পর আমার আপার দরজা নক করলে ওনি দরজা খুলে বিরক্তির সাথে আমাকে ঘুমাবার নির্দেশ দিলেন। আর শাহ সাহেব বদ্দার কক্ষের দিকে দৃষ্টি না দেয়ার জন্য বলে দিলেন। তিনি আমাকে আরো বললেন, ব্যাপারটা কি তা আমি সকালে তোমাকে বলব।
যখন সকাল হলো তখন তিনি বললেন প্রায় সময় গভীর রাতের অন্ধকারে শাহ সাহেব এর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাথা হাত পা এক একটি অংশ পৃথক হয়ে আবার জোড়া লেগে স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর গভীর রাতে কতকিছুর আগমন হয়।

✪ আমার ভগ্নিপতি চকরিয়া দরবেশকাটার মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবকে সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলে দাওয়াত দিই। সম্ভবত: ১৯৭৭/৭৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে হবে। তিনি সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সূর্যখোলা বলে তুলনা করে তাচ্ছিল্য করে কথা বললেন। এ প্রসঙ্গে একদিন শাহ সাহেব বদ্দাকে বলায় তিনি জযবের হালতে চলে যান। রাগের স্বরে বললেন যার শরীরে সীরতের গোস্ত গেছে তার জন্য দোজখ হারাম হারাম।
এ ব্যাপারে আমি খতিবে আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের সাথে সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল নিয়ে আলাপ করি। তিনি মাহফিলের প্রশংসা করলেন এমনকি নিজে মাহফিলে অংশগ্রহণও করতেন। একদিন দরবেশকাটায় খতিবে

আজম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের সাথে আমার আলাপ হয়। খতিবে আজম সাহেব ভগ্নিপতির কাছে সীরত মাহফিলের প্রশংসা করায় ক্রমান্বয়ে ভগ্নিপতি পরিবর্তন হয়ে যায়। পরবর্তী বৎসর তিনিও সীরত মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।

মাওলানা আজিজ আহমদ (আনু)

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জেঠাত ভাই ও শ্যালক

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমার বোনের স্বামী ও জেঠাত ভাই হন। তিনি মজযুব অবস্থায় পাহাড় জঙ্গল থেকে হঠাৎ করে চুনতীতে আসতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর আগমনটা এমন সময় হত যখন চুনতীর কোন নারী পুরুষ অতি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকতেন।

✪ তাঁর প্রথম পুত্র ভাগিনা জমাল আহমদ জন্মের পর সর্বপ্রথম কিছুদিনের জন্য ...যুব হয়েছিলেন।

✪ মজযুব অবস্থায় পাহাড় জঙ্গল থেকে হঠাৎ লোকালয়ে আসলে তাঁর শরীর থেকে দুর্গন্ধতো নয়ই বরং খুশবু সুগন্ধ বের হত।

✪ আমি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে একসাথে হজ্ব করি।

মাওলানা মাহফুজুর রহমান সিদ্দিকী

চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

✪ একবার হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মামা এর নিজ মুখে শুনেছিলাম পাহাড়ের ভিতর বিশাল আকৃতির একটি অজগর সাপ আক্রমণের উদ্দেশ্যে দূর থেকে দ্রুত তাঁর অতি নিকটে চলে আসে। কিন্তু আক্রমণ না করে ইতস্তত: করে আবার ফিরে যায়।

(এখানে উল্লেখ্য, হযরত শাহ সাহেব (রহ) এর মজযুব অবস্থায় জীবনের একটি অংশ পাহাড়ে-জঙ্গলে দিনরাত অতিবাহিত হয়। ঐ সময় সাপ, বাঘ, হাতিসহ নানা রকম পাহাড়ি হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু কোন সময় কোন হিংস্র প্রাণী তার ক্ষতি করেনি। বরং উল্টো বহুবার হিংস্র প্রাণীরা তাঁকে সম্মান করেছে তা গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তথ্য তালাশে বারেবারে জানতে পারি।গ্রন্থকার)

✪ পাকিস্তান আমলে চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায় একটি মাহফিল হচ্ছিল। ঐ মাহফিলে বায়তুশ শরফের তখনকার পীর সাহেব হযরত মাওলানা আখতার (রহ.) উপস্থিত ছিলেন। মাহফিল চলাকালে হঠাৎ করে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মামা মাহফিলে উপস্থিত হয়ে হযরত আখতার সাহেব (রহ.) কে বকাঝকা করতে লাগলেন। অতঃপর অল্পক্ষণ পর তথা হতে চলে আসেন।

পরদিন চুনতীস্থ মাওলানা এজাহার হোসেন ছিদ্দিকী (মরহুম) হযরত শাহ সাহেব মামা থেকে এ বিষয়ে জানতে চাওয়ায় হযরত শাহ সাহেব মামা আবদারের সহিত বকার সুরে বললেন, "সব বিষয়ে জানতে চাওয়া উচিৎ নয়" অতঃপর বললেন আলিয়া মাদরাসার পূর্বদিকে ওলি বুযুর্গগণের কবরস্থান থেকে যে ফয়েজ আসতেছিল তা আখতার সাহেব একাই নিয়ে নিচ্ছিলেন। আমাকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল বিধায় উক্তরূপ আচরণ করছিলাম।

✪ মরহুম হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) এর আম্মাজান (হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর সহধর্মিনী) বলতেন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মামার মজযুব অবস্থায় মরহুম হযরত মাওলানা আবদুচ্ছালাম আরাকানী (রহ.) বলেছিলেন হযরত শাহ সাহেব মামাকে কদর করতে। যেহেতু তিনি কোন পাগল নন। একদিন স্বাভাবিক হয়ে প্রকাশ পেয়ে যাবে।

(এখানে উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর সহধর্মিণী হযরত শাহ সাহেব মামা মজযুব অবস্থায় হঠাৎ করে চুনতী আসলে অতি আন্তরিকতার সাথে তাঁর খোঁজখবর রাখতেন। অপরদিকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) স্বাভাবিক হালত ফিরে পেলে নিজস্ব নতুন বাড়িতে অবস্থানকালে হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর সহধর্মিণীকে জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁর নিজ বাড়ীতে এনে রেখে সেবা শুশ্রূষার ও চিকিৎসার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন এবং উক্ত অবস্থাতেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। (গ্রন্থকার)

✪ চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসায় কামিল খোলার ব্যাপারে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মামা রাসূলে করিম (স.) থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছিলেন বলে বারে বারে বলতেন।

✪ মাদরাসার কামিল জমাত খুলতে প্রধান মুহাদ্দিস হযরতুল আল্লামা আবদুল হাই নেজামী সাহেবের ক্ষেত্রে আমি ও মাওলানা ওসমান গণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। আমি চুনতী থেকে আলিম, ফাযিল পাশ করে দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় কামিল খোলার পর সেকেন্ড ব্যাচে পাশ করি।

✪ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার সেক্রেটারীসহ ১৩টার্ম কমিটিতে থেকে খেদমত করার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

মুহাম্মদ ইসলাম খান
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যখন চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা থেকে কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় চলে যান তখন ওনার ভাইরা মাওলানা আবদুস সোবহান সাহেব (আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান) এর ম্যাকলিউড স্ট্রিটের বাসায়

থাকতেন। পরে বার্মার ভামু মসজিদে একরাত্রে শবেকৃদর পাওয়ার পর মজযুব হয়ে গেলে ওনার ভাই গিয়ে ওনাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।

✪ গভীর রাতে অঝোর বৃষ্টির সময় খান দিঘীর ওখানে আমরা মাছ ধরতে গেলে দেখতাম তিনি বন থেকে বের হয়ে আসছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, মামা এখানে কী? তিনি কোন উত্তর দিতেন না বরং চুপ থাকতেন।

✪ আমি হরিণ শিকার করার জন্য জাইল্লার পাহাড়ে চুনতীর কাকাছাছি গেলে বেশ কয়েকবার ওনাকে পাহাড় থেকে বের হয়ে আসতে দেখি। হাতির রাস্তা দিয়ে উনি আসতেন।

✪ বৃটিশ আমলে শাহ সাহেব মামা প্রায় সময় হামিদ আলী সিকদারের কাছে থাকতেন। একবার দু'জন মানুষ শহর থেকে আসেন। একজন ফায়ার ব্রিগেডের অফিসার আর একজন ডাইরেক্টর। আমি ওনাদেরকে শাহ সাহেব মামার কাছে নিয়ে গেলাম। ওনারা ২জন কদমবুচি করলে লাথি মেরে বললেন, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছে চিঠি দিবে। পরে দেখা গেল ওনাদের হারানো চাকুরি ফিরে পেলেন।

✪ আমার শাশুড়ী ওনার জেঠাত বোন। তিনি আমাকে কোলে তুলে লালন পালন করেন। তিনি আমাকে বেশী স্নেহ করতেন। আমার শাশুড়ী ওনার ঘরে মারা যান।

✪ আমি কলকাতা থাকা অবস্থায় আমার বাসায় তিনি ২বার যান। গিয়ে বলতেন, ইসলাম কোথায়?

✪ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান সবসময় চুনতী থেকে হত। ৯ জন মেম্বার এর মধ্যে ৬ জন নির্বাচিত ৩ জন মনোনীত। ৬৩/৬৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে একবার জনাব এস্তেফা আলী মিয়া ও আবদুল্লাহ মিয়া চেয়ারম্যান প্রার্থী হন। মেম্বারদের ভোটে যেহেতু চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন সেখানে মেম্বার আমান উল্লাহ খানকে হিলট্র্যাক্টস পাঠিয়ে দেয়ায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। আমরা এ ব্যাপারে সাতগড় বুড়া মাওলানা সাহেবের বাড়িতে একত্রিত হয়ে শলাপরামর্শ করছিলাম। হঠাৎ রাত ১১/১২টার দিকে শাহ সাহেব মামা গিয়ে বলছেন তোরা মেম্বার পাবি না। আমি শেষ করে দিয়েছি। ছেলের দ্বারা হবেনা। অর্থাৎ আবদুল্লাহ মিয়া যেহেতু ছোট ছেলে সে চেয়ারম্যান হবে না। পরে এস.ডি. ও এর পক্ষে সার্কেল অফিসারের কাস্টিং ভোটে ইউনুছ মিয়া চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম খান
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

✪ মরহুম পিতা মাওলানা আবদুস সোবহান খান হতে শুনেছি আমার জন্ম ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে। মরহুম শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (রহ.) এর প্রথম সন্তান

মৌলভী জমাল আহমদ আমার সমবয়সী। ৪২/৪৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে একসাথে ফোরকানিয়ায় কায়েদা/ আমপারার পাঠ গ্রহণ করি। ওস্তাদ ছিলেন মাওলানা কাসেম সাহেবের চাচা মরহুম আজমুল্লাহ ক্বারী। সেই হিসেবে জনাব শাহ সাহেব হুযুর আমার প্রায় ২৫/৩০ বৎসরের বড়। যেহেতু তাঁর জন্ম ও লালন একই গ্রামে, তাঁর যৌবনকালের আংশিক ঘটনা হলেও আমার জানা থাকার কথা। স্মরণকাল হতে তাঁকে মজযুব দেখি। দেশবাসী হাফেজ পাগল বলত। আমরাও পাগল মনে করতাম।

তবে তিনি কাকেও মারধর করতেন না বলে সকলে একটু সমীহ করত। আবার কেউ কেউ মজযুবে খ্রীস্টাব্দেক মনে করতেন। সম্পর্কে আমার মামা হতেন। প্রায় সময় তেলাওয়াত ও বিভিন্ন রকম ইসলামি গান গাইতেন। নির্ভয়ে আমি ও অন্যান্য সকলে তাঁর ধারে কাছে বসে ঐগুলো শুনতাম। সে সময়ের কিছু অস্বাভাবিক দিক অবশ্য সকলের নজরে আসে। শীত-গরম, বৃষ্টি-বাদল এমনকি প্রতিকূল আবহাওয়ায়ও তাঁর বিচরণ একই রকম ছিল। তখনকার দিনে চুনতীর আশপাশের জঙ্গলে বন্যহাতি, বাঘ, ভাল্লুক ও বিষধর সাপের কমতি ছিল না। মাদরাসার পাহাড় এবং বর্তমান শাহ মঞ্জিলে ভিটার টিলায়ও প্রতিবৎসর বাঘ গরু-ছাগল আক্রমণ করত। কোন কোন সময় মানুষও আক্রান্ত হয়ে থাকত। এদের মধ্যে আমার জন্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম, মরহুম ক্বাজী ফারুক আহমদ (ক্বাজী বশিরের বাবা), মরহুম ইব্রাহীম শিকারী, মরহুম আসহাব উদ্দীন, মরহুম আব্দুস সত্তার, (চন্নু মাস্টারের বাবা) ও মরহুম ইসকান্দর। চনুতীর প্রায় তিনদিকে গভীর জঙ্গল ছিল নিশিরাত পর্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকি রাতভর ঐ সমস্ত জঙ্গলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হুযুর একা একা অবস্থান করতেন। লোকালয়ে যখন আসতেন সুরেলা আওয়াজে-

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے - زندگی میں یہی کام کر جائینگے

ইত্যাদি না'ত ও হামদ এবং আয়াতে কোরআনের তেলাওয়াত করতেন। রং চা পান ও ধূমপান এত বেশি বেশি করতেন যা সাধারণ লোকের বেলায় এক প্রকার অস্বাভাবিক মনে হত। মাঝে মাঝে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন, সপ্তাহ-দু'সপ্তাহ পর হঠাৎ তাঁর আবির্ভাব ঘটত।

১৯৪৮-১৯৫০ প্রায় তিন বৎসরকাল আমার বাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বিশেষ করে সুযোগ্য ওস্তাদদের নিকট হতে উন্নত শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার হাফতুম হতে পনজুম সময় পর্যন্ত মরহুম শাহ সাহেবের পুরান বাড়ির কাচারীতে (লম্বা প্রায় ২৫ হাত) বাবা আমাকে থাকার ব্যবস্থা করেন। সেখানে এক সাথে বেশ ক'জন ওস্তাদদের অবস্থান ছিল।

১. কক্সবাজারের মাওলানা মোহাব্বত আলী।
২. মহেশখালীর মাওলানা আবদুল বারি।

৩. রুপকানিয়ার মাওলানা গোলাম মোস্তফা।
৪. বারদোনার মাওলানা আবুল হাশেম (শেরে খোদা)।
৫. আনোয়ারার মাওলানা আবদুল হাফিজ।
৬. বাঁশখালীর মাওলানা আবদুল মজীদ ও
৭. মাওলানা আবদুল লতিফের নাম উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গে সেই বাড়ির পড়ুয়া ছেলেরা ও বিশেষ করে বার্মার আকিয়াব অঞ্চলের ছাত্ররাও (মাদরাসায় তখন ছাত্রাবাস ছিল না) থাকত। লেখাপড়ার সুন্দর পরিবেশ ছিল। ছাত্রদের মধ্যে "তকরারের" মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের অভ্যাস ছিল। সেই লম্বা কাচারীতে ১০/১২ টির মত চৌকি ছিল। খালি চৌকির মধ্যে তাঁকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখতাম। কবে এসেছেন আবার কখন চলে যান কেউ কোন রকম খবর রাখত না। দরজা খুলে দেয়া বা বন্ধ করার জন্য কাউকে ডাকতেন না। কিভাবে প্রবেশ করেছেন তা-ও রহস্যাবৃত।

✪ ৫০ ও ৬০ এর দশকে বেশিরভাগ সময় সাতকানিয়া সদর ও চন্দনপুরাস্থ ফায়ার ব্রিগেড অফিসে থাকতেন। ইতিমধ্যে দেশবাসীর নজরেও তাঁর কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ পায়। চুনতীর মরহুম ইস্তেফা আলী মিঞার মুখে তাঁর কন্ট্রাক্টরী আমলের একাধিক অস্বাভাবিক ঘটনার কথা আমি শুনেছি। এভাবে দিন গড়াতে ১৯৭১ এর অসহযোগ মুহূর্ত চলে আসে। একদা যারা দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত তারা বীর আবার যারা দেশপ্রেমিক বলে চিহ্নিত তারা দেশের শত্রুতে আখ্যায়িত হয়। উভয় শ্রেণীর লোকগণ একমাত্র বাঁচার তাগিদে শাহ সাহেব হুযুরের বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় পান। আল্লাহর মেহেরবানিতে তাঁর সহযোগিতায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও অনেকে রক্ষা পায়।

✪ ৭১ এর শেষভাগে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশের ধ্যান-ধারণা পাল্টে যায়। অহেতুক বাড়াবাড়ির কারণে ইসলামের অনুষ্ঠানাদি সম্প্রদায়িকতার লেবেলে কলঙ্কিত হয়। অন্যান্য ধর্মের বেলায় তাদের ধর্মীয় আচরণ বাঙ্গালি কৃষ্টির নামে প্রগতির প্রতীক হিসাবে মর্যাদা পেতে থাকে। ৪৭ এর বিভক্তির পূর্বেও মুসলমানদের অবস্থা, আল্লামা ইকবালের উপলব্ধি কবিতার মাধ্যমে তিনি যা প্রকাশ করেছিলেন তা পুনরায় দেখা দিল। আমি নিচে তাঁর দুটি চরণ উদ্ধৃত করলাম-

ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشہ - اسلام ہے محبوس مسلمان ہے ازاد
ملا کو جو ہے ہند میں سجدہ کی اجازت - ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ازاد

পরিস্থিতি জনাব শাহ সাহেব হুযুরের চোখ এড়ায় নি। সুতরাং ধর্মকে তিনি যে নজরে চিনেছেন- পৃথিবীর সমস্যাদির সমাধান যদি দিতে পারে তা একমাত্র

ইসলামই। অতএব সীরতুন্নবী (স.) এর অনুষ্ঠানের মাধ্যম (আম জনসাধারণ যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত) মাহফিলে সীরতের গোড়াপত্তন করেন। অভিজ্ঞ আলেম ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর বিষয়ভিত্তিক রচনার মাধ্যমে এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলেম (চকরিয়ার) খতিবে আজম মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) বড় মাওলানা হিসেবে পরিচিত বারদোনার মাওলানা আমিনুল্লাহ (রহ.) হ্নীলার মাওলানা বদিউর রহমান (রহ.) গারাংগিয়ার বড় হুজুর ও ছোট হুজুর নামে পরিচিত যথাক্রমে মাওলানা আবদুল মজিদ (রহ.) ও মাওলানা আবদুর রশীদ (রহ.) বায়তুশ শরফের মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) বাঁশখালীর মাওলানা শফিকুর রহমান (রহ.) কক্সবাজারের মাওলানা মোজাহের আহমদ (রহ.) রংগীখালীর মাওলানা কমরুল ইসলাম, ঢাকার মাওলানা ফরিদ উদ্দীন আত্তার, সুফি দায়েমুল্লাহ ও বাংলাদেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমৃদ্ধি লাভ করে এবং সর্বস্তরের জনগণের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা শিক্ষার সুযোগদানে ১দিন হতে ক্রমান্বয়ে ১৯দিন পর্যন্ত আপামর জনসাধারণের হেদায়তের প্রতীক হিসেবে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আল্লাহর মেহেরবানিতে আজও চালু আছে।

সীরতের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কাজ করার সুযোগ আমাকে দিয়েছেন বলে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই, সাথে সাথে বিগত সময়ের সংঘটিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করলাম:

✪ ১৯৭৫- পূর্ব কোন এক খ্রিস্টাব্দের ঘটনা:

আমার পেটে পূর্বে একবার অস্ত্রোপচার হয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় ১ মাস পেটে ভীষণ যন্ত্রণা। খাওয়া-দাওয়া এক প্রকার নাই, সামান্য কিছু তরল খাদ্যের আহারও বমি হয়ে যায়। ডাক্তারগণ প্রয়োজনীয় পরীক্ষার মাধ্যমে পুন: পেটের অপারেশনের পরামর্শ দেন। হঠাৎ শাহ সাহেব মামা হাফেজ হারুন ও আশরাফুল্লাহ সাহেবকেসহ একদম আমার রোগশয্যায় উপস্থিত; পেটের উপদ্রুত স্থানে হাত দিয়ে দীর্ঘক্ষণ চেপে ধরেন। কিছুক্ষণ পর বলে উঠলেন অপারেশনের প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তোমাকে শুধু আরোগ্য দান করবেন না বরং আসন্ন সীরতে (মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি) কাজ করার উপযুক্ততা দান করবেন।

পরদিন পুনরায় উপস্থিত এবং আমাকে কিছু রং চা খেতে দিলেন। পুরাটা পান করার পরও দেখি বমি হয়নি। আল্লাহ আমাকে পর্যায়ক্রমে আরোগ্য দান করলেন। সীরতে আল্লাহর দয়ায় পুরো দায়িত্ব পালন করেছি।

✪ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত ১৯৭৪/৭৫ জেয়াফত বিভাগের ছিলাম আমিসহ সর্বজনাব মঈনুল ইসলাম চৌধুরী (হিরণ), কাজী বশির, আহমদ সাঈদ, হাসান (মদনু) আবু বকর ও ইসমাঈল (মানিক)। সম্পাদক হিসেবে হাফেজ হারুন এবং পরিচালক

ছিলেন মকবুল আহমদ চৌধুরী ও ইউসুফ সাহেব। রং বে-রঙের টিকেটের মাধ্যমে দৈনিক দুই বেলা খাদ্য পরিবেশন করা হত। রাত পর্যন্ত জেগে কাজ করার পর শরীরের অলসতা দূর করার জন্য গোসল এর উদ্দেশ্যে বাড়ি আসি। হঠাৎ আমার অণ্ডকোষে যন্ত্রণা অনুভব করি। ক্রমান্বয়ে অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে লাগল। বাড়িতে কোন পুরুষ লোক ছিল না। বড় ছেলে হাবিব সেও পানি বিভাগের কর্মী ছিল বলে ইতোপুর্বে চলে গিয়েছে। সকল ৮টায় টিকেট দেয়া হত। আধুনগরের নুরু চেয়ারম্যান আমার সহযোগিতায় ছিলেন মেহমানদের দুর্ভোগ ও আমার অসুস্থতায় এক প্রকার অসহায়। হঠাৎ আল্লাহর বাণী-

وإذ غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين

স্মরণ করে তাঁর দরবারে আবেদন করলাম। অলৌকিকভাবে রোগমুক্তি লাভ করে কাজে যোগ দিলাম।

✪ প্রতি বেলার গোস্তের পরিমাণ, গরুর সংখ্যা ও বাছাই স্বয়ং শাহ সাহেব হুযুর নিজেই করতেন। চক্ষু নষ্ট হওয়ার পরও গরুর গায়ে হাত দিয়ে চিহ্নিত করে দিতেন। প্রয়োজনের ব্যতিক্রম তেমন হত না।

✪ টেকনাফের বার্মা সীমানা হতে লিখিত সরকারি অনুমতির মাধ্যমে গরু আনার নিয়ম ছিল। পারমিটের কপি সংশ্লিষ্ট কাস্টম দপ্তরে পৌছেনি অজুহাতে গরুসহ সংগ্রহকারীকে আটক করে। যোগাযোগের অসুবিধায় আমরা এ খবর তখন পর্যন্ত পাই নি। এরই মধ্যে শাহ সাহেব মামা আমার ভগ্নিপতি মরহুম মাওলানা নুরুল আবছারসহ খাঁন দীঘি হতে গোসল সেরে আসার পথে দুই ট্রাক গরু দেখতে পেয়ে নিয়ে আসার আদেশ দেন। ইউসুফ সাহেবকে গরুগুলো নেয়ার কথা বলতে তিনি আমাকে ডেকে মূল্য ধার্য করার কথা বলেন।

শাহ সাহেব মামা ঐগুলো নেয়ার পক্ষে ছিলেন তা আমার জানা ছিলনা, তাই আমি মনে করি আমার ভগ্নিপতির সরলতার সুযোগ গরু বিক্রেতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং তিনটি কারণে না নেওয়ার পরামর্শ দিই। (১) গরুগুলো কম মোটা তাজা ছিল (২) হাতে প্রয়োজনীয় গরু আছে। (৩) সেদিন সন্ধ্যার দিকে টেকনাফের গরুর চালান পৌছবার কথা।

ইউসুফ সাহেব বললেন, মামা নিতে বলেছেন তাই নিতে হবে। তবে তার হাতে টাকা মজুদ নেই। আমি যেন টাকার ব্যবস্থা করে দিই। দুই ট্রাক গরুর মূল্য ছিল ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা। সেই রাতেই আমরা টেকনাফে গরু আটকের খবর পেলে জরুরি ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিচারপতি সিদ্দিক ও ইউসুফ সাহেব, কক্সবাজারের এস.ডি.ও. জনাব এম. আর খান (পরে চট্টগ্রামের ডিসি) এর নিকট সুপরিশ এর বার্তা নিয়ে শাহনেওয়াজসহ আমাকে ভোরে কক্সবাজার পাঠান। ওনার সহযোগিতায় কয়েকদিনের মধ্যে গরুগুলো ফিরে পাই। জনাব শাহ সাহেব মামার নেয়া অতিরিক্ত গরুগুলোর কারণে কোন রকম অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

ব্যক্তিবিশেষ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কবি হাফেজ সিরাজীর কবিতার মর্ম উপলব্ধি করলাম। নিম্নে তা উদ্ধৃত করলাম :

بمی سجادہ رنگین کن گرت پیر مغا گوید - کہ سالک بے خبر نبود ز راہ رسم منزلہا

✪ চুনতী মাদরাসার হাদিসের কামেল বিভাগ খোলার ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করলে তিনি বলেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস পড়াবার অনুমতি পেয়েছেন।

✪ সীরত ময়দান (তখন পাহাড় ও জংগল ছিল) ও মসজিদে বাইতুল্লাহ তাঁর করামতের জীবন্ত প্রমাণ। সীরতে অংশগ্রহণকারীগণ (জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন।

✪ যুবরাজ বড়ুয়ার খাদ্যনালীতে ঘা জনিত কারণে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল, খাওয়া-দাওয়ার সময় উক্ত ব্যথা আরো বৃদ্ধি পেতো। যন্ত্রণার ভয়ে অনেক সময় তরল খাদ্য খেতে বাধ্য হতো। চট্টগ্রাম শহরের প্রসিদ্ধ অনেক ডাক্তারদের দেয়া চিকিৎসা কোন রকম গাফিলতি ছাড়াই চালিয়েছে। দীর্ঘ সময় চিকিৎসা করার পরও কোনরকম আরোগ্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ফলশ্রুতিতে সে ও তার পরিবার হতাশ ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। হঠাৎ তার স্ত্রী স্বামীর আরোগ্যের উদ্দেশ্যে চুনতী সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলে একটি গরু উৎসর্গ করার সংকল্প করে।

ইতোমধ্যে কিছুটা সামর্থ্যের অভাব কিছুটা খেয়ালীপনার কারণে সে বছর সীরত মাহফিল শেষ হয়ে গেছে কিন্তু গরু দেয়া হয়নি। এদিকে তার রোগের অবস্থাও অপরিবর্তিত রয়ে গেল। কয়েক মাস পর চাষের প্রয়োজনে সে একটি ষাঁড় ১০ হাজার টাকা দিয়ে খরিদ করে। প্রথম অবস্থায় চাষাবাদের কাজের জন্য উক্ত ষাঁড় যথাযথই ছিল, কিছুদিন যেতে না যেতেই গরুটির আচরণ অসংযত ও অস্বাভাবিক হতে লাগল। কেউ ধারেকাছে গেলেও লাফালাফি করত। উপায়ান্তর না দেখে তারা গরুটি বিক্রি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

এভাবে দিন যেতে যেতে পরবর্তী বছর গড়াল, যথারীতি নির্ধারিত সময়ে সীরত মাহফিলও আরম্ভ হয়ে কয়েকদিন অতিবাহিত হল। হঠাৎ একদিন যুবরাজের স্ত্রী স্বপ্নে দেখল- গরুটি নিজেই তাকে বলছে, "সীরতুন্নবী (স.) এ তাকে নিতে আসবে, তোমরা আমাকে কোথাও দিও না।" সকালে ঘুম ভাঙার পর স্বামী সেদিনই গরুটি সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলে দেয়ার প্রস্তুতি নিল। গরুটি দুষ্ট প্রকৃতির ছিল বিধায় মাহফিলে নিয়ে আসার জন্য তার ছেলে ও ভাতিজাদের সহযোগিতা নেয়, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে দুষ্ট প্রকৃতির গরুটি যার আশেপাশে পর্যন্ত কেউ যেতে পারতো না সে নিজেই মাহফিলের দিকে চলে আসে, যুবরাজ এসে আমাকে বলল, দাদা; আজকেই গরুটি জবাই করতে হবে। সে তার পরিবারবর্গসহ

তবরুক হিসাবে উক্ত গরুর গোস্ত খেয়ে বাড়ীর জন্যও অল্প কিছু নিয়ে গেল। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। আল্লাহর মেহেরবানিতে উক্ত রোগ আর দেখা যায়নি।

গত ২৭/০৭/০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে চুনতীতে হঠাৎ তার সাথে দেখা হয়, আমার সাথে জনাব আবদুল বাসেত (দুলাল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারিও ছিলেন। যুবরাজ আমাদের সামনে উক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল, জনাব শাহ সাহেব হুযুরের জীবনীতে আমার জানা ঘটনাবলীর মধ্যে এই ঘটনাটিও সংযোজন করলাম।

অধ্যাপক আমিন আহমদ খান

প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ, চুনতী মহিলা ডিগ্রি কলেজ

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর বাবা ছিলেন হাজী সৈয়দ আহমদ সাহেব। আমরা ছোটকালে তাঁকে হাজী সাহেব জ্যাঠা ডাকতাম। উনি ছিলেন আব্বার শিকারের ওস্তাদ। চুনতীতে শিকারের একটা ঐতিহ্য ছিল। প্রায় সব নামীদামী লোকেরাই শিকার করতেন। চুনতীর আশপাশ এলাকার পাহাড়ে বড় ও ছোট জাতের পাখি পাওয়া যেত। দল বেঁধে সবাই শিকারে যেতেন। প্রয়োজনে গভীর জঙ্গলে কয়েকদিন পিকনিক ও শিকার দুই-ই চলতো। যা পাওয়া যেত সবাই ভাগ করে নিতেন। এসব ব্যাপারে নিজস্ব নিয়মকানুন ছিল যা সবাই মেনে চলতো। স্তরভেদে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধেরও কোন কমতি ছিল না।

✪ আমরা ছিলাম আব্বার বুড়ো বয়সের সন্তান। পরে শুনেছিলাম আব্বা চাকুরিতে থাকাকালীন মাঝেমধ্যে ছুটি নিয়ে চুনতী আসলেই সঙ্গী পরিচিতজনেরা তাঁকে ধরে বসতেন শিকারে যাওয়ার জন্য। হাজী সাহেব জেঠা বয়সে আব্বার একটু বড় ছিলেন। আপন ভাই না হলেও আব্বা তাঁকে বড় ভাইয়ের মতই শ্রদ্ধা করতেন। তাই চুনতীতে প্রত্যেক শিকার পার্টিতে জেঠাকে আব্বা অগ্রাধিকার দিতেন। আব্বা রিটায়ার করে চুনতীতে স্থায়ীভাবে চলে আসার পর জেঠার সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। তখন আব্বার বয়স আনুমানিক ৬০ (ষাট) ও জেঠার বয়স তদূর্ধ্ব। আমি তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।

বাড়িতে আব্বা বসার জন্য একটি গোলঘর ছিল। এটা আব্বা নিজেই ছিমছামভাবে সাজিয়ে রাখতেন। আব্বা বসতেন একপাশে একটা ইজি চেয়ারে। তার পাশে লেখাপড়ার কাজে ব্যবহার বা বিশিষ্ট মেহমান বসার জন্য ছিল একটি সাজানো টেবিল ও হাতওয়ালা চেয়ার। সামনে উভয় পাশে ছিল আর কয়েকটা চেয়ার ও পরের লাইনে ছোটখাট শিকারিদের বসার জন্য কয়েকটা টুল।

হাজী সাহেব জেঠা থাকতেন তাঁর পুরনো বাড়িতে। প্রায় প্রত্যেকদিন সকালেই তিনি আব্বার সঙ্গে গল্প করার জন্য চলে আসতেন। আব্বা তাঁকে সালাম দিয়ে পাশের চেয়ারে বসাতেন। সঙ্গে তাদের আর এক বুড়া শিকারি বন্ধু পুতুন মিয়াজীও আসতেন। ঐ বৃদ্ধ বয়সেও আমরা ওনাদেরকে মাঝেমধ্যে শিকারে যেতে দেখেছি। শিকারের প্রোগ্রাম না থাকলে ১২টা পর্যন্ত বুড়ারা গল্প করতেন। পরে নামায ও খাওয়া- দাওয়ার জন্য ওঠে যেতেন। জেঠার বাড়িতে কতগুলি সাদা হ্যাজা মুরগি পুষতেন। এই মুরগি আমাদের অত্যন্ত পছন্দের ছিল। তাই আমরা সবসময় জেঠাকে এই মুরগির জন্য বিরক্ত করতাম।

✪ এ সমস্ত ঘটনা ১৯৬০ এর দশক এর দিকের। এ সময় আমরা হযরত শাহ সাহেব (রহ.)কে তেমন চিনতাম না। আমরাও ছোট ছিলাম। অস্বাভাবিক কিছু দেখলে ভয় পেতাম। এর পরবর্তীতে তাঁর সম্বন্ধে একটু একটু জানতে আরম্ভ করি। প্রথমে তাঁকে পাগল বলেই জানতাম। তিনি যখন গ্রামের ভিতর এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতেন তখন আমরা তাঁকে দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে লুকিয়ে থাকতাম।

✪ এই সময় প্রায়ই শুনতাম- হাফেজ বদ্দা মানুষ ধরে ধরে ভীষণ মার দেন ও মানুষের কাঁচা ঘর জ্বালিয়ে দেন। কেন ঘর জ্বালিয়ে দেন জিজ্ঞেস করলে বলেন, ভীষণ শীত লাগছিল তাই একটু গা গরম করছিলেন। পরবর্তীতে তিনি গভীর পাহাড়-পর্বতে যাতায়াত আরম্ভ করেন ও অনেক রাত পর্যন্ত গভীর জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতেন। খান দীঘি ও দরগাহ মুড়া নামক চুনতী থেকে ২/৩ মাইল দূরবর্তী নির্জন স্থানে তিনি একা রাত কাটাতেন। খান দীঘিতে একটি মোঘল আমলের মসজিদ ও কবরস্থান ও দরগাহ মুড়ায় একটি গাছপালা ঘেরা ছোট টিলা পাহাড় ছিল। এক সময় চুনতীর একজন কৃষক হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কাছে একটি সোনার আংটি দরগাহ মুড়ায় পড়ে থাকতে দেখে নিয়ে আসে ও পরে মালিকের কাছে ফেরৎ দেয়। এতে ঐ জায়গায় ওনার যাতায়াতের ব্যাপারটা সকলের স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রকাশ পায়।

✪ চুনতীর নামজাদা বুজুর্গদের কবরেও তিনি রাতের বেলা প্রায় সময় যাতায়াত করতেন। হযরত বড় মৌলনা আবদুল হাকিম (র.) এর মাজারকে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। সেখানে প্রায় রাতে ওনাকে দেখা যেত।

আস্তে আস্তে তাঁর মজযুবি হালত কমতে থাকে ও অনেকটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে থাকেন। কিছু কিছু যোগ্য ব্যক্তিত্ব তাঁর অনুসারী হয়ে ওঠেন ও তাদের প্রচেষ্টায় শাহ মঞ্জিল তৈরি হয়। ক্রমে ভক্তের দল বাড়তে থাকে ও ভক্তরা তাঁকে

বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যান। কিছুদিন পর আবার বাড়িতে ফিরে আসেন। এখন থেকে তিনি বাড়িতেও বেশ সময় কাটাতেন ভক্ত ও পরিবারের সঙ্গে। মেজায ভাল থাকলে সুললিত কণ্ঠে কোরান তেলাওয়াত ও তর্জমা করতেন আবার অনেকের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাও করতেন। মেজায খারাপ হলে তিনি উগ্র মূর্তি ধারণ করতেন ও উচ্চস্বরে গালাগালি করতেন।

এসব ৭০/৮০ 'র দশকের কথা। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র, এক সময় রোজার ছুটিতে বাড়ি এসেছি। সেহেরি খাওয়ার জন্য আম্মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে বসেছি আমাদের পুরনো বাড়িতে বারান্দায়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় আমাদেরকে রক্ষার জন্য আম্মা খাওয়ার জায়গায়ই আগুনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আগুনের পাশে বসেই আমরা সেহেরি খাচ্ছিলাম। পাশে পুরনো বাড়ির একটা ছোট পুরনো দরজা ছিল ঠেলা দিলেই খুলে যেত। হঠাৎ দেখলাম দরজা খুলে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই আগুনের পাশে বসে গেলেন, আম্মা খাওয়া দিলেন যদিও তত উন্নতমানের খাবার তৈরি ছিল না তবুও আমাদের সাথে উনি তৃপ্তিভরে খাবার খেলেন। ততদিনে তাঁর প্রতি আমাদের ভীতি কমে গিয়েছিল ও তাঁকে আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা করতাম, আম্মাও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। খাওয়া শেষ করে তিনি আর দেরি না করে উঠে গেলেন ও বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। এতক্ষণ কোন কথাবার্তাও বলেননি। বাইরে তখন প্রচণ্ড কুয়াশা ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আমি তাড়াতাড়ি হাতে টর্চলাইট নিয়ে ওনার পিছনে বের হলাম। ইচ্ছা ছিল বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি আমাকে নিষেধ করলেন।

তবুও আমি বাড়ির সামনের পুকুর পাড় পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। তিনি এক রকম জোর করে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমার মনে হলো তাঁর গন্তব্য সম্বন্ধে আমি যাতে জানতে না পারি এ জন্যই তিনি এটা করলেন।

✪ আমাদের বাড়ির পাশেই আমাদের আর এক ভাই মরহুম ইউনুছ খান সাহেব-এর বাড়ি। বাড়ির সামনে ছিল পুরনো একটি কাচারী বাড়ি। অনেকটা জরাজীর্ণ অবস্থা। ঐ কাচারী বাড়িতে কয়েকজন ছাত্র থাকত স্কুল-মাদরাসায় লেখাপড়া করত। একদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিক থেকে হঠাৎ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আসলেন ঐ কাচারী বাড়ির সামনে ভিতর থেকে একজন ছাত্র বের হয়ে অতি উৎসাহে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে একটা চেয়ারে বসায়। এতক্ষণ মেজায ভাল ছিল। বসার সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন- ও অমুকের ছেলে-

তুই কোন সাহসে রাসূলুল্লাহর কাঁধে হাত দিলি? আমরা ভয়ে যে- যেদিকে পারি পালালাম।

✪ বর্তমান বাইতুল্লাহ প্রথমে বেড়ার ঘর ছিল। এক জুমায় খুৎবা পড়ছিলেন চুনতী মাদরাসার তখনকার উপাধ্যক্ষ। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সামনে বসা ছিলেন। হঠাৎ রেগে গেলেন। ইমাম সাহেব খুব বেশি ভীত না হওয়ায় কাজ চালিয়ে গেলেন, উনি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে গেলেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সবসময় গাড়ির সামনের সিটে ড্রাইভার-এর পাশে বসতেন। আল্লাহর ইচ্ছা কি ছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভাল জানেন। গাড়ির পিছনের সিটে বসা থাকলে হয়তো তাঁর গাড়ি দুর্ঘটনার আঘাত এত মারাত্মক নাও হতে পারতো। তিনি শারীরিক গঠনে অনেকটা তাঁর বাবার মতই সুদর্শন সুপুরুষ ছিলেন। বেশ লম্বা, ফর্সা ও মাথায় বাবরি কাটা ঝাঁকড়া চুল, মুখে সাদা দাঁড়ি ছিল। অতিরিক্ত চা-সিগারেট ও পান খাওয়ার কারণে দাঁত কাল দেখতে খুব সুন্দর ও মানানসই লাগতো।
সুন্দর পোষাক পরতেন। চকচকে পাম্প সু পরতেন। দেখলেই সৌম্য পবিত্র মনে হতো ও শ্রদ্ধাবোধ জাগতো। সুগন্ধি দ্রব্য পছন্দ করতেন। তিনি যেখানেই থাকতেন বা চলতেন সর্বত্রই একটা মনোরম সুগন্ধ বিরাজ করতো।

✪ আমার আব্বা ওনার আব্বার বিশেষ স্নেহের পাত্র হওয়ার কারণে সম্ভবত আব্বাকে উনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। আব্বার পাশে উনার আব্বা যে চেয়ারটায় বসতেন উনিও ঐ চেয়ারটায় এসে বসতেন। কথাবার্তা তেমন বলতেন না। কিছুক্ষণ পর উঠে চলে যেতেন। চুনতী হাই স্কুলের হেড মাস্টার যোগেশ বাবুকে গিয়ে বলতেন যোগেশ, মানুষ ভাল।

✪ আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও কেমন জানি তাঁর প্রতি আমার একটা ভীতিও থেকে গিয়েছিল। হয়তো তিনি বুঝতেন। আমাকে একদিন ডেকে একটি হরিণ শিকার করতে বললেন। আমি দলবল নিয়ে শিকারে গেলাম। সব সময় দলের কেউ না কেউ হরিণ মারে- এটাই নিয়ম, আমি নিজে সুযোগ পাবো বলে কথা নেই। আশ্চর্য! ঐদিন পাহাড়ে ঢোকার একটু পরেই আমার সামনে দিয়ে শিংওয়ালা বেশ বড় ধরনের একটা হরিণ দৌড়ছিল মারতে পারলাম না। যে পাহাড়ে ঢুকল ওটা আবার ঘেরাও দিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি ঐ হরিণটাই ওপর থেকে নিচে দ্রুত নেমে আসছে।
মাথা লক্ষ্য করে অনেকদূর থেকে গুলি করলাম। ঠিক মাথায়ই লাগলো- আর কোন নড়াচড়া নেই। একটু পর আর একজন আর একটা মারল। দু'টা নিয়ে

দুপুরের খাবারের আগেই ফিরে আসলাম। আদেশ হলো সবাইকে দুপুরে খেতে হবে ও রাত্রে হরিণের মাংস দিয়ে খেতে হবে। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কেন যেন ইচ্ছা হলো শাহ মঞ্জিলে গেলাম।
হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একটা চেয়ারে বসা ছিলেন। একদম শান্ত, কোন রাগ নেই-হৈচৈ নেই। মাঝে মাঝে শুধু আহ শব্দ করেন। সালাম দিলাম। অনেকক্ষণ একপাশে মেঝেতে বসে তাঁর দিকে চেয়ে থাকলাম। ফিরে আসার জন্য আবার সালাম দিলাম। আমাকে বললেন, আমার জন্য দোয়া করো আমি পাথর হয়ে জমে গেলাম-এ নালায়েক কি দোয়া করবো! মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে শ্রেষ্ঠতম বেহেশতে স্থান দিন। আমিন

মাওলানা শফিক আহমদ

সাবেক চেয়ারম্যান, আধুনগর ইউ.পি.লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

সফরে হজ্ব

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাথা-বেদনার বৎসর ছিল ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। মা-বাবা জীবিত আছেন। চারিদিকে অফুরন্ত খুশি। হঠাৎ ৭৬ খ্রিস্টাব্দের শাওয়াল মাসে বাবার ওফাৎ। ঐ বৎসরেই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হজ্বে যাচ্ছেন সদলবলে। চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ মসজিদ প্রাঙ্গনে বাবার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হল মরহুম হুযুর আবদুল জব্বার শাহেবের ইমামতিতে। আমার খালু মরহুম আমীন উল্লাহ (বড় মাওলানা) মামা মরহুম মাওলানা মুবারক আহমদ এবং আমার শ্বশুর মরহুম মাওলানা মাহমুদুল হকসহ সম্মানিত গুণীজন সবাই উপস্থিত ছিলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নামাজান্তে আমাকে বুকে জড়ায়ে ধরলেন। সান্ত্বনা দিলেন, আজীবন তুমি আমাকে বাবা বলে ডাকবে। শান্ত হলাম, আজীবন ঐ নুরানি চেহারাই দেখে দেখে পিতৃহারা বেদনা ঘুচালাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চলে গেলেন। লোহাগাড়া সাতকানিয়ার বহু গুণীজন ঐ বৎসর হজ্বে যান। এলাকাবাসী চিন্তিত। কেন এতবেশী বুযুর্গানেদ্বীন এলাকা ছেড়ে যাচ্ছেন? আল্লাহর মেহেরবানিতে সবাই হজ্ব শেষে দেশে ফিরলেন।
দেখতে দেখতে পরবর্তী ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হজ্বে যাচ্ছেন আবার। মন আর মানলো না। আমার মরহুম বাবার হজ্বে বদল করার মানসে রওয়ানা হলাম। জীবনের প্রথম হজ্ব, অজানা অচেনা ঈমানের আস্তানা পবিত্র ভূমি মক্কায়ে মুয়াজ্জমা ও মদিনায়ে মুনাওয়ারার পথে রওয়ানা দিলাম। আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে হজ্ব পালন শেষে বাড়ি ফিরলাম।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমার এক ফ্লাইট আগে চলে আসলেন। পরবর্তী ফ্লাইটে আমি ফিরলাম। ঢাকায় তাঁর সাথে দেখা হল। বাড়ি ফেরার পথে জেদ্দায় যে গাড়িতে চড়ে আমি আসছিলাম ঐ গাড়িটির পেছনে আমার একটি মালামাল ভর্তি ব্যাগ ভুলে রয়ে গেল। মনে করলাম তা আর পাওয়ার নয়।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ঐ ব্যাগটি শাহ মঞ্জিলের বারান্দায় পড়ে আছে দেখে আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেলাম। কোথেকে এ ব্যাগ কোথায় কে বা কারা নিয়ে আসল? এটা ছিল হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর একটি ক্ষুদ্র করামত।

এবারের সফরে কিন্তু আল্লাহপাক এক বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেছেন। জেদ্দা এয়ারপোর্ট হতে অনতিদূরে চলন্তাবস্থায় বিমানে গোলযোগ দেখা দিল। মাত্র ১০মিনিট ফ্লাই করলে জেদ্দা এয়ারপোর্টে অবতরণ করা যাবে। এমতাবস্থায়, ঘোষণা দেওয়া হল অনিবার্য কারণবশত আমরা দুবাই রওয়ানা হচ্ছি। জেদ্দায় বাংলাদেশ বিমান মেরামতের সুব্যবস্থা নেই বলে এত বড় একটি ঝুঁকি নিয়ে বিমান উল্টো ২ ঘন্টার দূরবর্তী পথ ফ্লাই করতে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে যখন দুবাইর আকাশে প্রবেশ করল ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে শুরু করল। এলাকার গাছপালা দেখতে লাগলাম। বৈমানিক আকাশে আর বিমান ধরে রাখতে পারছেন না। জরুরী অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কান্নাকাটি আরম্ভ হয়ে গেছে। সরবে সবাই আল্লাহকে ডাকতে আরম্ভ করল। যেন আর রেহাই নেই।

তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) গায়ে একটি চাদর জড়ায়ে ঘুমাচ্ছেন। আমি ওনার দিকে বারংবার তাকাচ্ছি কিন্তু কোন নড়চড় নেই। জাগাবার সাহস তো আমাদের কারো নেই বরং মনে মনে একটি মাত্র ভরসা আল্লাহ চাহেন তো উনার ওছিলায় আমরা রক্ষা পেতে পারি। বাস্তবে তাই হল, বিমান মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থা। হঠাৎ আকাশ পানে ছুটল আর নিরাপদে দুবাই এয়ারপোর্টে অবতরণ করল।

বিমান বন্দরে অনেক্ষণ ধরে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হল। খবর পেয়ে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব কবির শেঠ বিমান বন্দরে এসে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে দেখা করতে গেলেন। এবার আমাদেরকে অন্য একটি বিমান চার্টার্ড করে জেদ্দা পাঠানো হল। এতবড় বিপদের মুহূর্তে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর চেহারায় কোন ধরনের অশান্তির ছাপ দেখলাম না।

অধম ওনার জীবিতকালীন সময়ে মসজিদে বায়তুল্লাহর দীর্ঘ ২৫ বৎসর খতিবের দায়িত্বে ছিলাম। ফাযিল পর্যন্ত চুনতী মাদরাসায় লেখাপড়া করেছি। বাইরের লোকেরা আমাকে চুনতীরই সন্তান মনে করত। ঐ পরিসরে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর যে অলৌকিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেছি তা লিখে শেষ করার মত

নয়। বাবার হজ্বে-বদল করতে গিয়ে আল্লাহর ঘর দেখতে আমার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেল।

আল্লাহর অপার কৃপায় পরবর্তী খ্রিস্টাব্দ ৭৯ তে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দোয়ায় আবার হজ্ব করার সুযোগ হল। পবিত্র মক্কা নগরীতে সুরাইকা নামক স্থানে আধুনগর নিবাসী ডা. ইসলামের বাসায় স্থান নিলাম।

পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌছলাম। ঠিক সময়ে মক্কা শরিফ হতে আরাফাত ময়দানে উপস্থিতি। সন্ধ্যায় মোজদালিফায় ফিরার পথে বাংলাদেশ দূতাবাসের গাড়িতে করে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে উঠায়ে নিয়ে গেল। আমরা পিছনে অন্য গাড়িতে ছিলাম। মোজদালিফায় গিয়ে তাঁকে আর খুঁজে পেলাম না।

সকালে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর তাবু খুঁজে পেলাম। পা ছুঁয়ে সালাম করলাম কিন্তু আমার পানে একটুও তাকালেন না। এমনকি মক্কা শরিফে পৌছেও না। বড় চিন্তায় পড়ে গেলাম। কি হল? কি বেআদবি করে ফেললাম? হজ্বে আসাটাই যেন নিষ্ফল। এমনিভাবে কয়দিন কেটে গেল।

উপায়ন্তর না দেখে কাউকে কিছু না বলে সোজা চলে গেলাম হাতিমে কাবাতে। মুনাজাত করলাম। আল্লাহ তুমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে আমার উপর সদয় করে দিন। আমি যেন বাসায় গিয়ে তাঁকে হাসিমুখে পাই।

সত্যিই তো আমি যেন আল্লাহর হস্তক্ষেপে তাঁর একজন ওলিকে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছি। আমাকে দেখামাত্র উনি হেসে উঠলেন। পরম স্নেহের সহিত কুশলাদী জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। সেদিনের মকবুল মুনাজাতের জন্য এখনো চিন্তিত হই। কেন আমি আরো বেশি কিছু আল্লাহর কাছে চাইলাম না যা নিশ্চিত পেয়ে যেতাম।

হজ্বের আগে মদিনা মুনাওয়ারা রওয়ানা দিলাম। তথায় একদিন সকালে এদেশের একজন খ্যাতনামা বক্তা শাহ সাহেব কেবলার সাথে দেখা করতে আসলেন। কথায় কথায় জান্নাতুল বক্বীর মহান শায়িত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে মন্তব্য করলেন উনারা তো মাটি হয়ে গেছে। তখন আমি তার সাথে পরিচিত নই। উত্তরে বললাম, আপনি কাদের সম্পর্কে এ মন্তব্য করলেন? দলায়েলুল খয়রাত নামক দরূদের কিতাবটিও কি আপনার চোখে পড়েনি? ঐ কিতাবের সম্পাদক মরক্কো নিবাসী আল্লামা সুলাইমান থজুলীকে ৭০ বৎসর পর কবর হতে উঠানো হয়েছিল।

তখনও তাঁর শরীরের অবস্থা ছিল- যেখানেই টিপ দেওয়া হয় সে স্থল হতে তাজা রক্ত সরে যেত। আর আপনি জন্নাতুল বক্বীর ১০ হাজার জিন্দা সাহাবা কেরাম সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করছেন? মদিনা শরিফে অবস্থানকালে একদিন প্রত্যুষে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাদের অগোচরে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী
একটি খুবই সুন্দর কালো রং এর ঝকঝকে রুমী টুপি হাতে হাসতে হাসতে বাসায় ঢুকলেন। আমরা সবাই অবাক। কিভাবে তিনি একাকী বাজার করে আসলেন? এমন একটি সুন্দর টুপি কোত্থেকে কিনলেন? কোনদিন কারো নজরে পড়েই নি। চোখ জুড়ানো মনমাতানো এই তাজে শাহিন শাহি।

পরবর্তীতে আমার মনে একটি কথা বারংবার উঁকি মারতে লাগল, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ঐ দিনই কুতবে আলমের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঐ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর গোড়াপত্তন করলেন যা তড়িৎবেগে বিশ্বজুড়ে প্রসারতা লাভ করল।

মদিনা শরিফে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি জান্নাতুল বক্বীতে যেতে চাইতেন না। একদিন আমরা অনেক অনুনয় বিনয় করে নিয়ে গেলাম। তিনি ভিতরে প্রবেশ না করে ছাদ দেওয়ালের বাইরে একটি অস্বাভাবিক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন যেখানে একটি খেজুর গাছ ছিল।

জেয়ারত শেষে বাসায় ফিরলাম। ফেরার পথে বাবে জিবরিলে এসে থেমে গেলেন। দেওয়ালে অংকিত চার ফেরেস্তার নাম ধরে পড়তে লাগলেন। তখন অনাবৃষ্টিতে বেজায় গরম পড়ছিল। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মীকাঈল এর নাম ধরে বলে উঠলেন, দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে নেওয়াটা অবাঞ্ছনীয়।

সাথে সাথে অল্পক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি নেমে আসল। আমরা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাসায় গেলাম। পরবর্তী বছর আমি একাই হজ্বে গিয়ে কি দেখলাম? ঐদিন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে জেয়ারত করছিলেন ঐটাই এখন বক্বীর একমাত্র প্রবেশপথ।

এমনিভাবে ওনার জীবনের অনেক ঘটনাবলী ভক্তগণের স্মৃতির আয়নায় উদ্ভাসিত যা ধীরে ধীরে ম্লান হবার পথে। অনেক ভক্ত এ ধরা হতে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে ফয়জে ছোহবত নসিব করুন। আমিন

মকবুল আহমদ চৌধুরী
বাজালিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

✪ একদিন জনাব জলিল শেঠ ও মাস্টার টি. আলীর নিকট জানতে পারলাম যে, তারা উভয়ে প্রতি রবিবার চুনতী যান। জিজ্ঞাসায় জানতে পারলাম যে, তারা সেখানে শাহ সাহেব মামার নিকটই যান। আমিও তাঁদের সাথে যেতে পারব কিনা জিজ্ঞাসা করলে জনাব জলিল শেঠ আমাকে রবিবার সকাল ৮ টায় চুনতী যাবার জন্য আসতে বলেন এবং আমিও সে অনুসারে এসে তাদের সঙ্গে সর্বপ্রথম চুনতী গিয়ে শাহ সাহেব মামুর সাথে দেখা করি। সালটি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ ছিল।

✪ এ ঘটনার ১০/১৫ বৎসর পূর্বে আমি শাহ আমির আলী (রহ.) এর নিকট গেলে সেখানে দেখলাম একজন সুন্দর বৃদ্ধ লোক ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতে করে সেখানে গিয়েছেন। তখন শাহ আমির আলী (র.) তাঁকে দেখে বললেন, "রাজার পোয়া কিল্লাই আইস্যো" এবং ক্ষণিক পরেই তিনি গাড়ি ফিরায়ে সেখান হতে চলে গেলেন। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম তিনি হয়তো ফায়ার ব্রিগেডের কোন বড় অফিসারের আত্মীয় হবেন। চুনতী গিয়ে শাহ সাহেব মামুকে দেখে বুঝলাম তিনিই ঐ ব্যক্তি যাকে আমি ১০/১৫ বৎসর পূর্বে শাহ আমির আলী (রহ.) এর নিকট দেখতে পেয়েছিলাম।

✪ তখন মনে সাধ জাগল আমি প্রতি সপ্তাহে শাহ সাহেব মামার নিকট যাব, কিন্তু গাড়ি কোথায় পাই? ইতিমধ্যে জনাব আবুল খায়ের সিদ্দিকী আমাকে নিজ থেকেই ১টি গাড়ির পারমিট দেন এবং আমি গাড়ি ক্রয় করি ও কয়েকদিনের মধ্যে নিজে ড্রাইভিং শিখে নিই। তখন শাহ সাহেব মামু চট্টগ্রাম শহরে আসলে ফিরিঙ্গী বাজারে কবির বিল্ডিং এ আবদুল মতিন চৌধুরীর বাসায় থাকতেন। আমিও মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে তার সাথে দেখা সাক্ষাত করতাম। একদিন মতিন চৌধুরীকে বললাম যে, যদি শাহ সাহেব মামু বাড়ি যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে আমাকে জানাবেন। আমি এখন গাড়ি কিনেছি আমি তাঁকে পৌছিয়ে দিতে পারব।

✪ পরে একদিন শাহ সাহেব মামা বাড়ি যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে গাড়ি নিয়ে কবিরাজ বিল্ডিং এ উপস্থিত হলাম। কিন্তু আমি পরিপূর্ণভাবে গাড়ি চালনায় পারদর্শী হইনি। ড্রাইভারও তখন ছুটিতে ছিল। শাহ সাহেব মামুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি গাড়ি চালিয়ে চুনতী যেতে পারব?" তিনি বলেন, পারবে। তখন আমি নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে উনাকে চুনতী পৌছালাম। সে সময় হতে আমি প্রতি সপ্তাহে ২/৩ বার করে তাঁর নিকট যেতাম এবং উনাকে জিজ্ঞাসা করে এবং এজাযত নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করতাম।

✪ এরপর একদিন তিনি মতিন চৌধুরীর বাসায় আসলে আমি উনাকে আমার বাসায় যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমার পাথরঘাটা বাসায় আসতে সম্মতি দিলেন এবং আমার পাথরঘাটার বাসায় আসলেন। তারপর হতে আমি নিজেই গাড়ি করে উনাকে শহরে আনতাম এবং আমার বাসায়ই তিনি থাকতেন এবং বাড়ি যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি নিজে উনাকে পৌছিয়ে দিতাম।

✪ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে উনি হজ্বে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি আমার বড় ভাই ডা. মনির আহমদ চৌধুরীকেসহ উনাকে হজ্বে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। হজ্ব হতে ফিরতি পথে তাঁরা করাচি এসে অবতরণ করলেন এবং তৎকালীন পূর্ব

পাকিস্তানে আসবার জন্য পি আই এ টিকিট কাউন্টারে গেলে তাঁরা মাত্র ২টি টিকিটই পেলেন। সে দুটি টিকিট নিয়ে তাঁরা চলে আসলেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র গণ আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

✪ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র গণ আন্দোলন এবং লিবারেশন মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেলে এবং পাক মিলিটারি কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে আমি শাহ সাহেব মামুর আদেশে সপরিবারে চুনতীতে উনার বাড়িতেই অবস্থান করি এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া অবধি উনার বাড়িতেই বসবাস করি।

✪ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আমি পাথরঘাটার বাসা পরিবর্তন করে ঘাটকফরহাদবেগ বাসায় চলে আসি। তিনিও শহরে আসলে আমার ঘাটফরহাদবেগ এর বাসায় থাকতেন।

✪ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আমার বড় ভাই ডা. মনির আহমদ চৌধুরী আবার হজ্বে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে চুনতীতে শাহ সাহেব মামুর নিকট যাই। আমার বড় ভাই ডা. মনির আহমদ চৌধুরী শাহ সাহেব মামুর কাছাকাছি বসলেন, আমি উনার কিছুদূর সামনে বসলাম, অন্যান্য লোকজনও ছিল। শাহ সাহেব মামু নিজেই আমার বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আবার হজ্বে যাবার ইচ্ছা করেছেন? ডা. সাহেব তখন হ্যাঁ সুচক উত্তর দিলেন এবং বললেন যে আপনি যদি যান তবে আমার ভাই মকবুল আহমদ টাকা দিবে এবং আমিও সঙ্গে যেতে পারব। সেই বৎসর আমি উনাদেরকে আবার হজ্বে পাঠালাম। সেবার হজ্ব করে এসে গায়েবি নির্দেশে তিনি সীরত মাহফিল এর সূচনা করেন ১দিন। পরবর্তীতে ৩দিন, ৫দিন, ৭দিন, ১৭দিন এবং ১৯ দিন প্রচলন করেন যা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

কিছু অলৌকিক ঘটনা যা প্রত্যক্ষ করেছি তা নিম্নরূপ :

✪ বক্সিরহাটের বদর আউলিয়া মাজারের খাদেমের ভগ্নিপতি ছিল জনৈক মুহাম্মদ আলী। বাড়ি আনোয়ারা। তার নামে ১টি বেবীটেক্সির ইম্পোর্ট লাইসেন্স আমার নিজ খরচে বানিয়ে দিয়েছিলাম। লাইসেন্সটি পাওয়ার পর সে আমাকে ব্যবহার করতে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে মাল ইম্পোর্ট করে। কিন্তু লাইসেন্সটির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আমার নিকটই ছিল। কোন একসময় গভর্ণমেন্ট ফ্রি লিস্ট ইম্পোর্ট ডিক্লার করে। তখন আমি খাতুনগঞ্জে জনৈক নলিনী দাসকে দিয়ে সে মোহাম্মদ আলীর ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে ফ্রি লিস্টে এক লক্ষ টাকার সোডা এ্যাশ ইম্পোর্ট করাই। মুহাম্মদ আলী খবর পেয়ে আমার ও নলিনী

দাসের বিরুদ্ধে ফজল দারোগার নিকট এক দরখাস্ত করে। এরপর একদিন ফজল দারোগা ও মুহাম্মদ আলী নলিনী দাসের ঘরে আসলে নলিনী দাস আমাকে টেলিফোনে তার ঘরে ডেকে নেয়। তখন আমি ফজল দারোগাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, বাজারে এ রকম অনেক কিছু হয়েই থাকে যা এমন কোন গুরুতর অপরাধ নয় এবং নলিনী দাসকে হয়রানী না করে যা কিছু করবার আমার সঙ্গে করবার জন্য অনুরোধ করলাম।

পরে একদিন আমি বদর আউলিয়া মাজারে গিয়ে মাজারের খাদেম মুহাম্মদ আলীকে মামলাটি তুলে নেবার জন্য অনুরোধ করলে মুহাম্মদ আলী আমাকে বলে যে, "আমি বদর আউলিয়ার অনুমতি নিয়ে বা নির্দেশে মামলা করেছি এবং বদর আউলিয়া নির্দেশ দিলে মামলা তুলে নিবে।" আমি চুনতী গিয়ে শাহ সাহেব মামুর নিকট ঘটনার বৃত্তান্ত হুবহু বর্ণনা করি।

তিনি আমাকে বললেন, "বদর আউলিয়া কি তাকে এ নির্দেশ দেয়ার জন্য বসে আছে? আমি তার লাশ বের করব। কয়েকদিন পর মুহাম্মদ আলী একদিন গরমের দিন সত্ত্বেও গরম কাপড় চোপড় পরে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু এ সময় তার জবান পুরাপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এ রকম জবান বন্ধ অবস্থা তার ৬/৭ বৎসর পর্যন্ত ছিল। ৬/৭ বৎসর পর একদিন সন্ধ্যা বেলা মুহাম্মদ আলী আমার অফিসে আসে। আমি তাকে আমার উপর কোন দাবি-দাওয়া আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে, আমার উপর তার কোন দাবি নেই। সে নাকি শুধু আমাকে দেখতে এসেছে। ইতিমধ্যে ফজল দারোগা এন্টি-করাপশান মামলায় জড়ায়ে চাকুরী হারিয়েছে।

✪ আমার ছোট ভাই আবু আহমদের ক্যান্সার রোগ হয়ে তার শরীরের সমস্ত গ্ল্যান্ড ফুলে গিয়েছিল। সে ডা. জি. এম চৌধুরীর চিকিৎসাধীন চিল। ডাক্তার অনেক গবেষণা করার পর একদিন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেডিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টে ফরওয়ার্ড করে। আমি জানতে পেরে তাকে শাহ সাহেব মামুর নিকট নিয়ে গেলাম এবং উনাকে আবু আহমদের রোগের বিবরণ জানালাম এবং ডাক্তারের নির্দেশের কথাও জানালাম।

✪ আমার স্ত্রীর এক সময় হার্টের পালপিটিশন শুরু হয়েছে। ডা. রোগ নির্ণয় করতে পারছিল না। আমি চুনতী গিয়ে শাহ সাহেব মামুকে আমার স্ত্রীর রোগের কথা জানালে আমার সঙ্গে আমার বাসায় চলে আসলেন।

আমরা বাসায় পৌছতে কিছুটা রাত হল। বাসায় পৌছে তিনি রং চা চাইলেন। রং চা করে তাঁকে দিলে তিনি কিছুটা খেয়ে বাকিটা আমার স্ত্রীকে খাওয়ায়ে দিতে দিলেন এবং বললেন যে রোগ ভাল হয়ে যাবে। পরেরদিন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে দেখল যে, আমার স্ত্রীর হার্ট পালপিটিশন আর নেই।

✪ কোন এক সময় আমার ঘাড়ে ভীষণ ব্যথা শুরু হল। ডাক্তারকে দেখিয়ে ঔষধ খেলাম এবং ডাক্তারের নির্দেশে গরম পানি ব্যবহার করলাম। কিন্তু কিছুতেই রোগ সারে না। শাহ্ সাহেব মামুকে যখন আমার গর্দানের ব্যথার কথা জানালাম, তিনি আমাকে গরমপানি ব্যবহার করতে নিষেধ করলেন এবং ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করতে বললেন এবং রোগ ভাল হয়ে যাবে বললেন।

পরের দিন ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলে দেখলাম আমার অর্ধেক রোগ সেদিনই ভাল হয়ে গিয়েছে। ২/৩ দিন পরে আমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেলাম। তখন হতে অদ্যাবধি আমি ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করছি। কিন্তু সে রোগ আর কোনদিন হয়নি।

✪ আমি সব সময় ব্যবসা-বাণিজ্য করবার সময় শাহ্ সাহেব মামুর এজাযত নিয়ে করতাম। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আমি আছাদগঞ্জের হাজি সোনা মিয়া সওদাগরের ছেলে আবুল কাসেমকে নাইলন টায়ার কর্ডের ডকুমেন্ট কিনবার জন্য অর্ধেক শেয়ারের মৌখিক চুক্তিতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিলাম। হাজি সোনা মিয়া সওদাগর মালগুলি খরিদ করে।

লভ্যাংশসহ ৪,১০,০০০/- টাকা আমাকে পরিশোধ করে। বাকি ২,৬০,০০০/- টাকা অদ্যাবধি অনেক দেন দরবার করেও উসুল করতে পারিনি। এ ব্যবসাটি আমি মামুর এজাযত না নিয়ে করেছিলাম বিধায় এ পরিণতি হয়েছে।

✪ আমি চিটাগাং চেম্বারের মেম্বার ছিলাম। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে চেম্বারের নির্বাচন। আমি শাহ্ সাহেব মামুকে জিজ্ঞাস করলাম, আমি ভোট কাকে দিব। উত্তরে শাহ্ সাহেব মামু আমাকে বললেন, ভোট দিবার কথা বলিও না ভোট নিবার কথা বল। নির্বাচন হল আর আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলাম।

✪ এক সময় এক ব্যক্তির একটি বড় ও শক্তিশালী গরু বনালা হয়ে গিয়েছিল। গরুটি কোন রকমে ধরতে পারছিল না। এ অবস্থায়ই গরুটি কয়েক বেচা হয়ে গেছে। কিন্তু কেউ গরুটি ধরতে সমর্থ হয়নি। শেষ পর্যায়ে যে লোক গরুটি খরিদ করে সে অনেক চেষ্টা করেও গরুটি যখন ধরতে পারল না তখন শাহ্ সাহেব মামুকে এসে দোয়া চেয়ে বলল যে, গরুটি ধরতে পারলে সে গরুটি সীরত মাহফিলে দিয়ে দিবে। তখন শাহ্ সাহেব মামু রশি পড়ে ফুঁক দিয়ে তাদের হাতে রশিটি দিয়ে বললেন যে, এ রশি নিয়ে গেলে গরুটি ধরতে পারবি। রশিটি নিয়ে গিয়ে লোকটি ঠিক ঠিক গরুটি ধরতে পেরেছে এবং গরুটি এনে সীরত মাহফিলে দান করে দিয়েছে।

✪ একদিন এক বয়স্ক লোক এক অন্ধ লোককে সঙ্গে নিয়ে শাহ্ সাহেব মামুর নিকট আসল। লোকটি কোমরের বাত রোগে কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। সোজা হয়ে

দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারছিল না। শাহ সাহেবমামুকে বলল, মামু আমি কোমরের ব্যথার জন্য নামায পড়তে পারছি না আমাকে দোয়া করুন। শাহ সাহেব মামু বললেন, তুই নামাযের কথা কেন বললি এ বলে অন্ধ লোকটির লাঠিটি নিয়ে লোকটিকে মারতে শুরু করলেন। মারতে মারতে লোকটিকে উঠানে ফেলে দিলেন। লোকটি সেখান হতে উঠলে তিনি আরও মারতে লাগলেন। মার খেতে খেতে লোকটি পাহাড়ের সিঁড়ির নিচে গড়িয়ে পড়ে গেল। লোকটি ভয়ে সেখান হতে তাড়াতাড়ি উঠে সোজা হয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সে হতে লোকটি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়।

✪ আমার ছোট ছেলে মুহাম্মদ মুছা জন্মের পর কথা বলার মত বয়স হলেও কথা বলতে পারছিল না। সে শাহ সাহেব মামুর কামরায় গিয়ে বসে থাকত। শাহ সাহেব মামু রং চা খেয়ে কিছুটা তাকে খাওয়ায়ে দিতেন। আমার স্ত্রী শাহ সাহেব মামুকে বারবার বলত যে, মুহাম্মদ মূছা এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও কথা বলছে না। আপনি তাকে দোয়া করুন। শাহ সাহেব মামু বলেন যে সে বড় হলে কথা বলতে পারবে এবং সে একদিন আমার থেকেও বড় হবে।

পরে দেখা গেল যে সে আস্তে আস্তে কথা বলা শুরু করেছে এবং বর্তমানে সে কিছু অলৌকিক কথাবার্তাও বলছে। আমার বড় মেয়ে শাহ নুর ও জামাতা মোহাম্মদ আলী তাদের বড় মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে।

বর ব্যারিস্টারি পাশ করে ওকালতি করে। মুহাম্মদ মুছা এ কথা শুনে তার আপাকে বলে, যদি তোমরা এ বরের সাথে মেয়ে বিয়ে দাও পরে কাঁদবে। বিয়ের ঠিকফর্দও হয়ে গেল। মুহাম্মদ মূছা ঠিকফর্দের অনুষ্ঠানে গেল কিন্তু খাওয়া দাওয়া করল না। পরে জানা গেল যে, বর অসুস্থ তার উভয় কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। এ খবর পেয়ে তারা মেয়েকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দিয়েছে।

✪ আমার ভাগিনা বাজালিয়ার ছালেহ আহমদ চৌধুরীর পূর্ব হতে এক প্রকার জটিল ক্ষয়রোগ ছিল। এক সময়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে পাহাড়ি বৈদ্যের কাছে চিকিৎসার জন্য গেলে পাহাড়ি বৈদ্য তার রোগ ভাল হবার নয় বললে সে বাড়িতে চলে আসে।

কিছুদিন পর তার রাত্রিতে নিদ্রা মোটেই হচ্ছিল না। একদিন আমাকে টেলিফোনে বলে, আমি ডাক্তার দেখাব, আপনি এসে আমাকে সাহায্য করবেন। আমি গিয়ে তাকে বললাম যে, আপনাকে আমি চুনতী শাহ সাহেব মামুর নিকট নিয়ে যাব। তখন পর্যন্ত শাহ সাহেব মামুর সম্বন্ধে ছালেহ আহমদ চৌধুরীর কোন ধারণাই ছিল না। আমি সেইদনিই তাকে চুনতী নিয়ে গেলাম। সে সময় শীত পড়ছিল।

আমরা মাগরিব নামাযের পর শাহ সাহেব মামুর নিকট পৌছলাম। তখন শাহ সাহেব মামু বারান্দায় বসা ছিলেন। আমি ছালেহ আহমদ চৌধুরীর রোগের কথা তাঁকে বললে উনি পরপর কয়েক গ্লাস খুব ঠাণ্ডা পানি প্রত্যেক গ্লাস হতে কিছু কিছু নিজে খেয়ে বাকি পানি ছালেহ আহমদ চৌধুরীকে খাওয়ায়ে দিলেন। তখন রাত বেশি হচ্ছিল বিধায় আমরা চলে আসবার অনুমতি চাইলে শাহ সাহেব মামু আমাদেরকে ভাত খেয়ে আসতে বললেন। আমরা উনাকে জোর করে রাজি করিয়ে চলে আসছিলাম। গাড়ির নিকট পৌছে দেখলাম ছালেহ আহমদ চৌধুরী থরথর করে কেঁপে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে।

তখন আমরা তাকে ধরাধরি করে শাহ সাহেব মামুর নিকট নিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে কিছুটা সুস্থ বোধ করল। ইতোমধ্যে ভাতের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমরা শাহ সাহেব মামুর সাথে বসে গরুর গোস্ত দিয়ে ভাত খেয়ে মামুর অনুমতি নিয়ে চলে আসলাম।

সেদিন হতে ছালেহ আহমদ চৌধুরীর যত রোগ ছিল সব ভাল হয়ে গেছে এবং অদ্যাবধি তার কোন জটিল রোগ হয়নি।

এ রকম অলৌকিক ঘটনা শত শত আমি প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু জায়গার সংকুলান হবে না বিধায় এবং বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে বিধায় এ পর্যন্ত লিখে সমাপ্ত করলাম।

মুহাম্মদ আলমগীর আলম

৩৯/এ, কাতালগঞ্জ, আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

✪ ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে আমার এক বন্ধুসহ চুনতী যাই। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সঙ্গে দুপুরের খানা খাই। ঐ সময় একজন লোককে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বকাঝকা করছিলেন। পরক্ষণে জানতে পারি এক ব্যক্তি আগ্রহ করে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জন্য একটি কাঁঠাল, তরমুজ আনছিল। পথিমধ্যে উক্ত লোকটি হুজুরের জন্য উক্তরূপ হাদিয়া আনতে নিরুৎসাহিত করছিল।

✪ সম্ভবত : ১৯৭৯/৮০ খ্রিস্টাব্দে আমার এক অসুস্থ ভাতিজীকে নিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নিকট যাই দোয়ার জন্য। তখন অত্যাধিক গরম পড়ছিল। মোলাকাতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, হাজী রাস্তার মাথায় আরাকান রোডে এক ডাক্তার আছে উক্ত ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে।

আমরা তথায় পৌছার সাথে সাথে দেখলাম উক্ত ডাক্তারের চেম্বার বন্ধ, কিন্তু ঐ মুহূর্তে ডাক্তার আসছেন। তখন অসময় তথা বেলা ৩ ঘটিকা প্রায়। ডাক্তার তাঁর

চেম্বার খুলে আমাদের সাথে কোন কথা না বলে আমার ভাতিজীকে একফোঁটা ঔষধ খাওয়ায়ে দিয়ে চলে যেতে বললেন। অর্থাৎ সাথে আরো ঔষধ দেওয়া বা পুনঃ সাক্ষাৎ করার কথা কিছুই বললেন না।

আমরা হতচকিত হয়ে শহরে চলে আসি। উক্ত একফোঁটা ঔষধের উসিলায় তথা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জবান মোবারকের বরকতে আল্লাহ পাক আমার ভাতিজীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন। তাতে আর কোন ঔষধের প্রয়োজন পড়েনি।

এ.ডি.এম আবদুল বাসেত দুলাল (চুনতী)

যুগ্ন-সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) অত্যন্ত রসিক ছিলেন। তাঁর রসিকতা ছিল নির্দেশ যা Wit বা Hunour এর সমতুল্য। এর মধ্যে কোন ধরনের ব্যঙ্গ বা খোঁচা দৃশ্যমান ছিল না। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর প্রবল রসিকতার কারণে এরূপ একজন রসিক ব্যক্তি কি করে গুরুগম্ভীর আধ্যাত্ম চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি বা শাহ সাহেব হলেন এ ব্যাপারে বাবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। বাবার কাছে শুনেছি তাদের আরেক সহপাঠী মাওলানা মোজাফ্ফর সাহেব কোনদিন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কারণে নতুন গেঞ্জি পরতে পারতেন না। তিনি সব সময় অধ্যয়নরত.থাকতেন এটা শাহ সাহেবের খুব অপছন্দ ছিল।

হযরত, শাহ সাহেব (রহ.) এর জ্বালাতনে তিনি দরজা বন্ধ করে পড়তেন। এ সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমার পিতার সম্মুখে বলতেন, মাওলানা মুজাফ্ফর বই এর মধ্যে ঢুকে গেছে। একটি কুড়াল দিয়ে কেটে তাকে বের কর। মাঝে মাঝে তিনি দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতেন। মাওলানা মুজাফ্ফর সাহেব একটু রাগী ছিলেন বিধায় শাহ সাহেবকে আক্রমণ করার জন্য দরজা খুলে আসলে তিনি তার গেঞ্জি টান দিয়ে ছিড়ে পালিয়ে যেতেন।

বাবা আরও বলতেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) খুব ঘামতেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মুন্সেফ বাজার দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে মৌলানা মুজাফ্ফর সাহেবকে দেখে গাড়ি থামালেন। তাঁরা উভয়েই তখন যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন, তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস। মাওলানা মুজাফ্ফর সাহেব বললেন, কি করব, আমি তো তোর মত খাওয়া-দাওয়া করতে পারছি না। ভাল খাওয়া দাওার জন্য তোর সাথে যাব কিনা বল। এ কথার জবাবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মুচকি হেসে বলছিলেন, আমার সাথে যাওয়ার দরকার নেই। তুই রোজা রাখ, বেশি সওয়াব হবে।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অলৌকিক ক্ষমতার আস্বাদন লাভের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে মাত্র একবার হয়েছে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আই.এসসি পরীক্ষার ফিজিক্স প্রশ্ন অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় আমি ও চুনতীর মাওলানা সাহেবানের ছেলে বন্ধু জহির একসাথে পরীক্ষার হল থেকে নির্ধারিত সময়ের আগে বেরিয়ে যাই। ওখান থেকে তিনি ও আমি আমার নানাকে দেখে বাড়ি ফিরছিলাম। তিনি আমার ডাকনাম ধরে জিজ্ঞেস করলেন, দুলাল পরীক্ষার হল থেকে আগে বেরিয়ে এসেছে কেন? আমি এই ঘটনায় দারুণভাবে বিস্ময়াভিভূত হলাম। কারণ হল থেকে বের হবার বিষয়টি আমি আমার বাবাকেও জানাইনি।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মনোরম নিসর্গ পরিবেষ্টিত নক্ষত্র চুনতীর আকাশের অন্যতম উজ্জ্বল দেদীপ্যমান নক্ষত্র। তিনি দীর্ঘদিন পূর্বে এই ইহধাম ত্যাগ করলেও এই যুগোত্তীর্ণ কালজয়ী মনীষী তাঁর বর্তমান দিয়ে চুনতীর ভবিষ্যতের ভিত রচনা করেছিলেন। চুনতীর জনবসতির সুত্রপাতের বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যন্ত সময়ের বিশাল ক্যানভাসের কীর্তিমান ও আধ্যাত্মিক জগতের খ্যাতিমান দিকপালদের অন্যতম হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বহির্বিশ্বের কাছে চুনতীর যে ভাবমূর্তি তুলে ধরেছিলেন তা অনন্য নৈপুণ্যে ভাস্বর।

হামিদ উল্লাহ খান
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

✪ হযরত শাহ সাহেব মামুকে ছোটবেলা থেকে মামু বলে ডাকতাম। যেহেতু সম্পর্কেও মামা হন। উনার অনেক স্মৃতি মানসপটে ভাসে। উনি আমাকে খুব ভালভাবে চিনতেন। আমাকে দেখলেই উনি হামিদ হামিদ এভাবে বারবার বলতেন এবং বলতেন আমেনার ছেলে। অর্থাৎ আমার মায়ের নাম ছিল আমেনা।

✪ এরপর উনি আমার নানীর নামও বলতেন এবং অনেক সময় আমার মামুর নামও বলতেন। উনি প্রায় সময় আমার নানার বাড়িতে যেতেন। আমিও ছোট বেলায় প্রায় সময় আমার নানার বাড়িতে যেতাম।

✪ হযরত শাহ সাহেব মামুর কামেলিয়াত বা ঐশী শক্তি সম্পর্কে যখন সাধারণ মানুষ কিছু ধারণা লাভ করলো তখন অনেকে অনেক শ্রদ্ধা করতে লাগলেন এবং কারও বাড়িতে গেলে মেহমানদারি করতেন। উনি কারও বাড়িতে গেলে ঐ বাড়িতে আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন আসতেন এবং উনাকে সালাম জানাতেন এবং দোয়া চাইতেন। ঐ সময় উনি কাউকে দোয়া করতেন আবার কাউকে বকাঝকা করতেন।

Chunati.com Pioneer in village based website

তবে উনার দোয়া করা এবং বকা দেয়ার ব্যাপার নিয়ে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতেন না। পরে দেখা যেত যে, যাকে গালি দেয়া হয়েছে তিনিই বেশী উপকৃত হয়েছেন। অনেকে উনাকে শ্রদ্ধাভরে টাকা পয়সা ইত্যাদি দিতেন।

✪ আমি স্কুলের ছাত্র। ঐ সময় আমি একদিন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মামুকে স্বপ্নে দেখলাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মামুকে স্বপ্নে কিছু পয়সা দিচ্ছি ঐ রকম দেখলাম। ব্যাপারটা আমার মনের গহীনে স্পর্শ করলো। আমি কিছু পয়সা যোগাড় করলাম। আমার মনে পড়ছে আমি দশ আনার মতো পয়সা যোগাড় করতে পেরেছিলাম। আমার মনে হতো উনি আমার নানীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। আমার নানী ছিলেন বড় মিয়াজীপাড়া বা ছুফী মিয়াজী বাড়ির মেয়ে। বর্তমানে বায়তুশ শরফের পীর শাহ মাওলানা কুতুব উদ্দীন সাহেব আমার নানীর ভাতিজা। হয়তো হযরত শাহ সাহেব মামুর সঙ্গে ঐ বাড়ির আত্মার সম্পর্ক ছিল।
সেই তথাকথিত স্বপ্নের কারণে আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মামুর সন্ধানে বের হওয়ার পর এক পর্যায়ে শুনলাম উনি আমার নানা বাড়িতে মেহমান হয়েছেন। আমি তখনই নানার বাড়িতে গেলাম এবং উনার সাক্ষাৎ পেলাম। ওখানে অনেক লোক মামুকে ঘিরে আছেন। তখন আমি গিয়ে মামুকে স্বপ্নের কথা বলে তাঁকে পয়সাগুলো দিলাম।
উনি প্রথমে নিতে চাইলেন না। পরে হয়তো আমার মনোভাব বুঝে পয়সাগুলো নিলেন পরে উনি হো হো করে হেসে বলতে লাগলেন- আমেনার ছেলে আমাকে পয়সা দিচ্ছে সেই দিনের স্মৃতি এখনও অম্লান।

✪ আর একদিনের কথা। উনি আমাদের বাড়ির বড় পুকুরের পশ্চিম পাড় দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে আসছিলেন। তখন ছিল চৈত্র মাসের দুপুর বেলা। প্রখর রোদে প্রচণ্ড গরম অনুভব হচ্ছিল। উনাকে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখেই উনি বলতে লাগলেন সূর্য মিয়া বড় হট এবং বারবার বলতে লাগলেন সূর্য মামা হট। তখন আমি বুঝতে পারলাম উনি হয়তো দূরে কোন জায়গা থেকে আসছেন তাই গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত।
আমি আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলতেই উনি রাজি হলেন। ঐ সময়ের কয়েক বৎসর আগেই আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছিলেন। আমি মামুকে সরাসরি আব্বা (মুহাম্মদ ইউনুচ খান) যে রুমে থাকতেন সেই রুমে নিয়ে গেলাম। উনি ঐখানে গিয়ে আমার আব্বার কথা বারবার স্মরণ করতে লাগলেন। তারপর উনার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। উনি প্রায় সময় কোন জিনিস পুরা খেয়ে শেষ করতেন না। কিছু খাওয়ার পর অন্যকে দিয়ে দিতেন। কিন্তু ঐদিন উনি তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিলেন এবং সব সময়ের মত পাতে কিছু রেখে দেন নি।

তারপর আমি উনাকে বিছানায় শোয়ার কথা বলাতে উনি বললেন, ইউনুস বন্দার বিছানায় আমি শুইতাম। একথা বলে উনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।
ঘন্টাখানেক ঘুমানোর পর উনি উঠে পড়লেন এবং বললেন নামায পড়ব, ওযু করতে হবে। তখন আমি উনাকে বড় পুকুরে ওজু করার জন্য নিয়ে যেতে উদ্যত হলে, উনি আবার বললেন পানি হট গরম। তখন আমি উনার মনোভাব বুঝতে পেরে আমাদের ভিতরের পুকুরের নিয়ে গেলাম। ঐ পুকুরে ওযু সেরে উনি ঘরে এসে নামায আদায় করলেন।
বলাবাহুল্য, আমাদের ছোট পুকুরের পানি যে ঠাণ্ডা উনি আগে থেকেই জানতেন। পরে মামুকে চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে উনি হেসে দিলেন। অর্থাৎ চায়ে আপত্তি নেই। বিকেলের দিকে উনি বের হয়ে পড়লেন এবং রাস্তা ধরে বর্তমান সীরতুন্নবীর মাঠ পর্যন্ত গিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেলেন।

✪ অনেকদিন আগের (স্বাধীনতার পূর্ব) কথা তখন পাকিস্তান সরকারের ইয়াহিয়া খান ছিলেন প্রেসিডেন্ট। দেশে একটা নির্বাচন হলো। তারপরই হলো একটি ঘূর্ণিঝড়। সমস্ত দেশ লণ্ডভণ্ড হলো। ঘূর্ণিঝড়ে বিশেষ করে চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক লোক প্রাণ হারান। আমাদের বাড়ি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও আমাদের বাড়ির প্রবেশদ্বারে যে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল সেটা গোড়াশুদ্ধ পড়ে গেল। আমার আব্বা ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর ইন্তেকালের পর শাহ সাহেব মামু প্রায় সময় আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং খোঁজ খবর নিতেন।
আমরা কাঁঠাল গাছটি কেটে, আসা-যাওয়ার পথ পরিষ্কার করেছিলাম। কিছুদিন পর মামু আসলেন। মামু আসার সময় কাঁঠাল গাছটি কাটা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন গাছটা কাটা হলো কেন? আমরা বললাম তুফানে গাছটা পড়ে গিয়েছিল তাই কেটে ফেলা হয়েছে। মামু গাছটার জন্য খুব আফসোস করলেন এবং জানতে চাইলেন ঝড়ের সময় আমরা কোথায় কিভাবে ছিলাম। বাড়িটা খুব বেশি কাঁপছিল কিনা। আমরা তুফানের সময়কার কথা উনাকে বর্ণনা করলে উনি উহ্ আহ্ বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। পরে যে কাঁঠাল গাছটি কেটে ফেলা হয়েছিল সেটার গোড়া থেকে আর একটি গাছ উঠেছিল এবং ওটাতে কাঁঠাল ধরেছিল।

✪ আর একদিন আমি আমার ভাইঝি রুহিলাকে মামুর কাছে নিয়ে গেলাম এবং সেজ দাদার নাম ধরে (নেজাবত উল্লাহ খান) উনার মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে দোয়া করতে বললাম। মামু রুহিকে জিজ্ঞাসা করল কোন ক্লাসে পড়? রুহি বলল কেজি টু-তে। কোন স্কুলে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রুহি বলল "গ্রেন্ট মেরিস স্কুলে

তখন মামু ABC....XYZ পর্যন্ত পড়ে একটা ফুঁক দিলেন এবং বললেন, নাতিনকে ইংরেজিতে দোয়া করে দিলাম।

✪ মাঝে মাঝে অনেক হিন্দু/বড়ুয়া মামুর কাছে দোয়া চাইতে আসতেন। তখন মামু নাম জিজ্ঞাসা করতেন এবং হিন্দু হলে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" ইত্যাদি বলে ফুঁক দিতেন। আসলে মামু প্রকাশ যা করুক না কেন আসল দোয়া তিনি অন্তর থেকে আধ্যাত্মিকভাবে করতেন।

✪ একবার এক রোগী আসলেন মামুর কাছে দোয়া চাইতে। মামুকে সে নিজ অসুখের কথা বললেন। তখন মামু বললেন তুমি কবিরাজের কাছে যাও চিকিৎসা করলে ভাল হয়ে যাবে। অনেকে বলতো মাথা ব্যথা করে বা মাথা ঘুরায় তাই দোয়া করতে, মামু তাদেরকে ঠাণ্ডা তেল মাথায় দেওয়ার পরামর্শ দিতেন।

অনেকে মামুর কাছে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসতেন দোয়ার জন্য এবং মামুকে অনুরোধ করতেন, মামু কোনদিন বিরক্ত হতেন না। দোয়া চাইতে আসা অনেককে আধা কাপ চা নিজে পান করে বাকি আধা কাপ তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য দিতেন। এতেই তারা খুব খুশি হতেন। আবার অনেকে মামার পানকরা আধা কাপ চা পান করার জন্য অনেক্ষণ বসে থাকতেন। এমনও দেখেছি মামুর পান করার পর অবশিষ্ট চা ভাগাভাগি করে পান করতেন মামু এইসব দেখে খুটখুট করে হাসতেন।

জীবনে মামুর সান্নিধ্যে অনেকবার যেতে পেরেছি এবং মামুকে অনেকরূপে দেখেছি। মামুর বাইরে যা ছিলেন না কেন উনার অন্তরে ছিল একটা কোমল মন যা অনুভব করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হতো না।

উনার স্মৃতিধন্য অনেকে আমার চেয়ে আরও ভালভাবে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ

চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মামার সাথে আমার বাবা এবং মা উভয়ের তরফ থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তবে মা-র তরফের সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে আমরা তাঁকে মামা ডাকতাম। তিনি আমার মাকে বড়বোন হিসাবে বুবু বলে ডাকতেন। মাও তাঁকে ছোটভাই হিসেবে স্নেহ করতেন। আবার বাবাকেও বড়ভাই হিসেবে সম্বোধন করতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বাবাও তাকে অত্যন্ত আদর করে মক্কুল্যা ভাই বলে ডাকতেন।

✪ তাঁর অসাধারণ ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের জন্য যখন তিনি সবার কাছে শাহ সাহেব হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন তখন আমরা অত্যন্ত ছোট ছিলাম। তাঁকে দেখার সাথে সাথে আমরা যারা সমবয়সী ছিলাম সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতাম। অতি ভক্তি সহকারে তাঁর কাছে তাঁর স্নেহ ও দোয়া নেবার প্রয়াস পেতাম। তখন তিনি সবার মাথায় হাত রেখে দোয়া করতেন।

✪ আমার বাবা চুনতী পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার ছিলেন। শাহ সাহেব মামা চুনতী বাজার দিয়ে কোথাও গেলে মাঝে মধ্যে বাবার অফিসে গিয়ে হাজির হতেন এবং বলতেন, 'বদ্দা, আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। বাবা তাঁকে দেখলে অত্যন্ত খুশি হতেন এবং অতীব স্নেহসহকারে তাঁকে বসাতেন এবং নজির আহমদের চা'র দোকান (তখন চুনতী বাজারের প্রসিদ্ধ চা'র দোকান) থেকে মামার পছন্দের রং চা ও অন্যান্য কিছু নাস্তা এনে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতেন।

✪ আর একটি ঘটনা। খুব সম্ভব ১৯৫৪ বা ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমি বাবার সাথে বাজারে গিয়েছিলাম। বর্ষাকাল ছিল। হঠাৎ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে আমরা একটা দোকানে ঢুকে পড়লাম। তখন দেখা গেল এইবৃষ্টির মধ্যে ছাতা ছাড়া শাহ সাহেব মামা দক্ষিণ দিক থেকে এসে বাজারের মাঝখানে দিয়ে পুর্বদিকে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে বাবা ডাক দিলেন, হে আমার মক্কুল্যা ভাই, বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাচ্ছ? এখানে এসে বস। বৃষ্টি থামলে যেও। ঐ ডাক শুনে শাহ সাহেব মামা বাবার কাছে আসলেন। তখন দোকানের মালিক দৌড়ে এসে একটা পরিষ্কার চেয়ারে খ্রিস্টাব্দের। তিনি যখন দোকানে এসে বসলেন দেখা গেল তাঁর পবিত্র শরীরে বৃষ্টির কোন ছোঁয়া লাগেনি। সব কাপড়-চোপড় শুকনা।

✪ শাহ সাহেব মামা আমার বড় জেঠার বাড়িটা (আজমউল্লাহ দারোগা সাহেবের বাড়ি) খুবই পছন্দ করতেন। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি মাঝেমধ্যে শাহ সাহেব মামা বড় জেঠার বাড়িতে এসে কয়েকদিন অবস্থান করতেন। জেঠাইমার কাছে শুনেছি, ঐ বাড়িতে অবস্থানকালে প্রায় প্রতিদিন গভীররাতে তিনি বাড়ির প্রধান দরজা খোলা রেখে কেউ টের না পায় মত নীরবে বেরিয়ে যেতেন এবং ভোর হবার আগেআগে নিঃশব্দে ফিরে আসতেন।

✪ একবার নাকি জেঠাইমা উনাকে বলেছিলেন, ভাই সাহবে, আপনি তো রাত্রে দরজা খোলা রেখে চলে যান। আমরা তো সবাই ঘুমিয়ে থাকি। এই অবস্থায় সুযাগ সন্ধানী চোরেরা চুরি করার সুযোগ পাবে। তখন নাকি মামা বলেছিলেন, আপনারা ভয় করবেন না। দরজা খোলা থাকলেও ভয় করার কোন কারণ নাই।

মামার পায়ের ধূলার বরকতে আজ পর্যন্ত ঐ বাড়িতে কোন রকম চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হয়নি।

✪ ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই দুপুর ৩টার দিকে বাবা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করেন (ইন্নালিল্লাহে...... রাজেউন)। এদিন সন্ধ্যার আগে আমরা মরদেহ নিয়ে চট্টগ্রাম শহর থেকে গ্রামের বাড়ির দিকে রওয়ানা হই। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময়। আমরা যখন দোহাজারী পৌঁছাই তখন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। রাত আনুমানিক ১০টার দিকে আমরা যখন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাই তখনও আষাঢ়ি বৃষ্টির তুমুল ধারা অব্যাহত ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে শাহ্ সাহেব মামা বড় জেঠাদের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন।

বাবার মরদেহ বাড়িতে আনা হয়েছে শুনে তিনি তখনই একজোড়া খড়ম পরে একটা ছাতা নিয়ে আমাদের বাড়িতে চলে আসেন এবং অত্যন্ত শোকাহত অবস্থায় মরদেহের কাছে বসে পড়েন। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে বড় জেঠাদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ২০০ গজ কাদাযুক্ত পথ হেঁটে আসলেও তাঁর খড়মও ভেজে নি এবং কাপড়ের কোথাও পানি লাগে নি।

শাহ্ সাহেবমামা আমাকে এতই স্নেহ করতেন যে, কোন সময় আমাকে নাম ধরে ডাকতেন না। সব সময় আদর করে মামু বলে সম্বোধন করতেন। দু-একটি ঘটনা বর্ণনায় আমার প্রতি তার স্নেহের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

✪ ১৯৭৫ কিংবা ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের কথা। শাহ্ সাহেব মামা জনৈক শাহাবুদ্দিন সাহেবের সাথে হজ্বে যাওয়ার পথে ঢাকায় বেইলি রোডে অবস্থিত বিচারপতি জনাব সিদ্দিক আহমদ সাহেবের বাসায় অবস্থান করছিলেন। হজ্বে রওয়ানা হওয়ার আগেরদিন আছরের পর বড় দুলাভাই ডা. আলতাফ উদ্দিন সাহেব, তাঁর বড় জামাতা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. এম.এ শরীফ ও মেঝ জামাতা ক্যাপ্টেন নুরুল হককে নিয়ে মামার সাথে দেখা করতে যাই।

✪ মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেলে উপস্থিত সবার জন্য নামাযের ব্যবস্থা করা হয়। আলেম ওলামাসহ অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সবাই নামাযের জন্য দণ্ডায়মান। এমন সময় মামা বলে দিলেন, আজ আমার ওবেদু মামা নামায পড়াবেন। তাঁর নির্দেশে আমি ঐদিন মগরিবের নামাযে ইমামতি করেছিলাম।

✪ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ সাহেব মামা হজ্বে যাবার পথে যখন ঢাকাতে ভাগ্নী হাসনার বাসায় অবস্থান করছিলেন তখন একদিন হাসনা মামাকে বলেছিল, নানা, আমরা ওবেদু মামার বিয়ের কথা ভাবছি। দোয়া করবেন যেন তার জন্য একটা

ভাল মেয়ে পাই।' এ কথা শুনার পর মামা দ্বিধাহীন কণ্ঠে অবলীলায় হাসতে হাসতে বললেন যে, ওয়ালী খান মসজিদের উত্তর পাশে একটা মেয়ে আছে। ঐ মেয়েটা ভাল হবে।

আশ্চার্যের বিষয়, আমার যখন বিয়ে হয় আমার শ্বশুর মহোদয় সপরিবারে ঠিকই ওয়ালী খান মসজিদের উত্তর পাশে কাতালগঞ্জে আবাসিক এলাকাতে থাকতেন।

আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে দোয়া করার জন্যে শাহ সাহেব মামা চুনতী থেকে চট্টগ্রাম শহরে তশরিফ এনে জনাব ইউছুফ সাহেবের বাসায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ইউছুফ সাহেবসহ বিয়ের অনুষ্ঠানে মামার তশরিফ নেবার কথা ছিল। কিন্তু বের হবার আগ মুহূর্তে ইউছুফ সাহেবের নাতি মিনহাজ চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হলে তা আর সম্ভব হয়নি।

মিনহাজ যখন সংকটমুক্ত হলো ততক্ষণে সম্ভবতঃ বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। তখন নাকি মামা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গেলেন এবং চুনতীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে সরাসরি আমাদের বাড়িতে তশরিফ নিয়ে গেলেন। রাস্তায় নাকি বারবার বলছিলেন, মামুকে বলেছিলাম আমি যাব। যেতে পারলাম না। ছেলেটার মন ছোট হয়ে গেল।

উল্লেখ্য মাগরিবের আগে আগে আমরা নতুন বউ নিয়ে আমাদের বাড়িতে পৌঁছাই। আমাদের পিছু পিছু দেখি মামা গিয়ে উপস্থিত। মনে হচ্ছিল মামাই যেন নতুন বউ এনে বাড়িতে উঠালেন। মা মামাকে আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে পাঠানো খাবার খেয়ে যেতে অনুরোধ করলে তিনি সব খাবারের উপর নিজের হাত বুলিয়ে ফুঁক দিলেন। তাঁর সেই দোয়ার বদৌলতে বিয়ে উপলক্ষে আগত সব মেহমানবৃন্দ তৃপ্তিসহকারে খাওয়ার পরও অনেক খাবার বেঁচে গিয়েছিল।

মামা যাকে স্নেহ করতেন তার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং তার মঙ্গলার্থে সবকিছু করতেন। বর্ণিত কতেক ঘটনা তার জ্বলন্ত উদাহরণঃ

✪ চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. এম.এ. শরীফ আমার বড় জেঠার বড় নাতনিজামাই। সেই সুবাদে শাহ সাহেব মামারও নাতনিজামাই। একজন উচ্চ বুজর্গ নানাশ্বশুর হিসেবে মামাকে ডা. শরীফ সাহেব আন্তরিকভাবে ভক্তি ও গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ঠিক তদ্রূপভাবে মামাও তাঁকে একজন খোদাভীরু ধর্মপরায়ণ নাতনিজামাই হিসেবে অত্যন্ত আদর করতেন। শাহ সাহেব মামা যখন ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কার দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তখন ডা. শরীফ সাহেব পিজি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান ছিলেন। রাত্রে মামার দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ফ্লাইটে তিনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম চলে এসে সরাসরি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

chunati.com

হাসপাতালে মামাকে দেখতে যান। মামার আঘাতপ্রাপ্ত চক্ষুদ্বয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি বুঝতে পালেন যে মামার চোখের আঘাত গুরুতর। তাঁর চিকিৎসা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সম্ভব নয়। তখন তিনি মামার অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে পরামর্শ করে মামাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে পিজিতে চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডা. শরীফ সাহেব ঢাকা গিয়ে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করে মামাকে ঢাকার পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। দীর্ঘদিন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর মামা যখন চট্টগ্রাম ফিরছিলেন ডা. শরীফ সাহেব মামাকে বিদায় দেবার জন্য ঢাকা বিমান বন্দরে যান। ঢাকা বিমান বন্দরে বিদায় দেবার প্রাক্কালে ডা. শরীফ সাহেব যখন মামাকে সালাম করলেন তখন মামা তাঁকে বললেন, শরীফ আমাকে পৌছে দেয়ার জন্য তোমাকে চট্টগ্রাম যেতে হবে। তুমি না গেলে আমি যেতে পারব না। মামার মানসিক অবস্থা দেখে ডা. শরীফ সাহেব বিমান বন্দরে নিয়ে আসা তাঁর নিজের গাড়িখানা (গাড়ির কোন চালক ছিল না) বিমান বন্দরে রেখে মামার সাথে চট্টগ্রাম আসার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মামার একজন সফরসাথীকে অফলোড করে ডা. শরীফ সাহেব মামার সাথে চট্টগ্রাম আসলেন। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যেদিন মামা চিকিৎসা শেষে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসছিলেন, একটা আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য, ঐদিন রাত্রে ডা. শরীফ সাহেবের দিল্লি যাবার কথা। ভিসা, টিকেট, হোটেল বুকিং, সরকারি আদেশ, সবকিছু তৈরি। মামাকে বিমান বন্দরে বিদায় দিয়ে বাসায় গিয়ে ঐ ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের কথা ছিল। যখন মামা তাঁকে জোর করে চট্টগ্রাম বিমান বন্দর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে পরবর্তী ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে গিয়ে দিল্লি সফরের প্রস্তুতি নেবার পরিকল্পনা ছিল তাঁর মনে মনে।

কিন্তু চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে পৌছে তাঁর সেই পরিকল্পনাও ভেস্তে গেল। মামা ডা. শরীফ সাহেবকে ছাড়লেন না। মামাকে চুনতী পর্যন্ত পৌছে দেওয়ার আবদার জানালেন ডা. শরীফ সাহেবের কাছে। মামার আবদারে ডা. শরীফ সাহেব দ্বিধাহীনচিত্তে চুনতী পর্যন্ত মামাকে পৌছে দিতে সম্মত হলেন। চুনতী রওয়ানা দেবার সময় আমাকে বলে গেলেন, আপনি আপনার ভাগনিকে ফোন করে জানিয়ে দিবেন যে, আমি নানার সাথে চট্টগ্রাম এসেছি এবং নানার সাথে চুনতী পর্যন্ত যেতে হবে। নানার অনুমতি পেলে রাত্রের মধ্যে ঢাকায় ফিরে দিল্লি রওয়ানা দেবার আশা আছে। ঢাকা বিমান বন্দরে গাড়ি রেখে এসেছি। ডুপলিকেট চাবি নিয়ে কোন একজন চালককে দিয়ে গাড়িটা যেন বাসায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে।

আমি সেইভাবে ঢাকায় ফোন করে বেটীকে (শরীফ সাহেবের স্ত্রীকে) বিষয়টি জানিয়ে দিই।

ঐদিকে চুনতী পৌঁছার পর মামা ডা. শরীফ সাহেবকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত রেখে দিলেন। সন্ধ্যার পর চুনতী থেকে রওয়ানা দিয়ে যখন তিনি চট্টগ্রাম এসে পৌঁছেন ততক্ষণে ঢাকাগামী শেষ ফ্লাইট চলে গেছে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে রাত্রের মেইল ট্রেনযোগে ঢাকা রওয়ানা হন। ফলে ডা. শরীফ সাহেবের আর দিল্লি যাওয়া হলো না। পরদিন যথানিয়মে তিনি অফিসে গমন করেন।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় চক্ষু ইনিস্টিটিউটের পরিচালক পদে নিয়োগ প্রদান করে সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। দিল্লি থেকে ফেরার পর তাঁর নতুন পদে যোগদান করার কথা। এদিকে ভিতরে ভিতরে তাঁর বিরুদ্ধে এক বড় ধরনের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হচ্ছিল। তিনি দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারে গেলে তাঁর জুনিয়ার একজনকে জাতীয় চক্ষু ইনিস্টিটিউটের পরিচালক পদে পোস্টিং দেয়া হবে এবং যাকে ইতিমধ্যে পিজি হাসপাতালে পোস্টিং দেয়া হয়েছে, তিনি এসে ঐ পদে যোগদান করবেন। ফলে ডা. শরীফ সাহেব দিল্লি থেকে ফিরে আসলে কোথাও পোস্টিং পাবেন না। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত সঙ্গে ছিল। শাহ সাহেব মামা ডা. শরীফ সাহেবকে চুনতী নিয়ে যাওয়ার ফলে দিল্লী সফর বাতিল হওয়াটা তাঁর জন্য আর্শীবাদে পরিণত হল। ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনা বিফলে গেল। সরকারি আদেশের মর্মানুযায়ী ডা. শরীফ সাহেব জাতীয় চক্ষু ইনিস্টিটিউটের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হলেন। যে পদে তিনি অবসরে যাওয়া পর্যন্ত দীর্ঘদিন সসম্মানে কর্মরত ছিলেন।

✪ শাহ সাহেব মামা চিকিৎসা শেষে চুনতী ফিরে আসার পর ডা. শরীফ সাহেব কিছুদিন পরপর চুনতী গিয়ে মামাকে দেখে আসতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসলেন। এসেই আমার অফিসে গিয়ে বসলেন যে, তিনি শাহ্ সাহেব মামাকে দেখতে চুনতী যেতে চান এবং ফিরে এসে রাত্রের ট্রেনে ঢাকা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। চুনতী যাতায়াতের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। আমি সাথে সাথে হাসান ভাই (মদনু ভাইকে) ফোন করে ব্যাপারটা জানালাম। কিছুক্ষণ পর হাসান ভাই জানালেন যে বিকাল ৩টার দিকে তিনি কমরুল হুদা খান ছিদ্দিকীর গাড়ি নিয়ে আমার বাসা থেকে আমাদেরকে তুলে নিবেন। দুপুর দু'টার সময় অফিস ছুটির পর বাসায় এসে দুপুরের খাবার সেরে অপেক্ষারত ছিলাম। বেলা ৩টার সময় হাসান ভাই কমরুকে নিয়ে ঠিকই আসলেন। কিন্তু বের হবার মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল।

বৃষ্টি থামার আশায় আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম। বুঝা গেল বৃষ্টি থামার নয়।

তখন আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে ঐ তুমুল বৃষ্টির মধ্যে চুনতীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। বৃষ্টির প্রকোপ এতই বেশী ছিল যে, সামনে যে সহজে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কমরু গাড়ি চালানোর ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। সেই অভিজ্ঞতার উপর ভর করে তিনি আস্তে আস্তে অতি সাবধানে গাড়ি চালিয়ে ঠিক মাগরিবের আগে আগে আমরা শাহ সাহেব মামার বাড়িতে পৌছলাম। আমরা যখন মামার বাড়িতে পৌছি তখন তিনি দ্বিতীয়তলার বারান্দায় বসে ইউছুফ সাহেব, কবির কন্ট্রাক্টর ও আরো কয়েকজন ভক্তবৃন্দের সাথে গল্প করছিলেন। শরীফ সাহেবের আগমনের কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মাগরিবের নামায শেষে চা নাস্তার পর্ব সমাপনান্তে ডা. শরীফ সাহেব চলে যেতে চাইলে ইউসুফ সাহেব মামার কাছে অনুমতি চাইলেন। তখন শাহ সাহেব মামা উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, না না ডা. শরীফ সাহেব এখন যেতে পারবে না। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর শরীফ সাহেবের অনুরোধে ইউছুফ সাহেব শরীফ সাহেবকে যাবার অনুমতি দেওয়ার জন্য মামাকে আবার অনুরোধ জানালে মামা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন, হে শরীফ সাহেব, এরা কিছুই বুঝে না। এরা মনে করে আমি অন্ধ হয়ে গেছি। আমি চোখে কিছু দেখি না। আমার চোখ নষ্ট হলে কি হবে? আমি সব দেখি। শরীফ, তুমি এখন যেতে পারবে না। রাতের খাবার খেয়ে যাবে।

একথা শুনে সবাই ভয়ে চুপ হয়ে গেলেন। রাত ১০ টার দিকে এশার নামায শেষ করে রাতের খাবার পরিবেশনের নির্দেশ হল। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মামা ডা. শরীফ সাহেবকে যাওয়ার অনুমতি দেন। আমরা যখন মামার বাড়ি থেকে রওয়ানা হই তখন গভীর রাত। আমরা দোহাজারী অতিক্রম করে হাশিমপুর গিয়ে দেখি রাস্তার উপর হাঁটু উর্ধ্ব পানি। কমরু অনেক সাবধানে সে ডুবন্ত রাস্তা অতিক্রম করেছিল। উপস্থিত এক লোকের কাছে জানতে পারলাম সন্ধ্যার পর বৃষ্টির পানির ঢল নেমে ঐ জায়গায় রাস্তার উপর প্রায় ৪-৫ ফুট পানি জমে গিয়েছিল। তখন ঐ রাস্তার উপর দিয়ে কোন যানবাহন চলাচল করতে পারেনি। পানি ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার পর রাত ১টার দিকে দুইদিকের গাড়ি এই রাস্তা অতিক্রম করেছে। তখন আমরা অনুভব করলাম যে, মামা এই জন্য আমাদেরকে মাগরিবের পর আসতে দেন নি। মামার কথা না শুনে আমরা তখন রওয়ানা দিলে হাশিমপুর এসে রাত ১টা পর্যন্ত বসে থাকতে হতো। সেই দিকেই ইঙ্গিত করে মামা হয়তো বলেছিলেন, আমার চোখ না থাকলেও আমি সবকিছু দেখি।

মাওলানা মুহাম্মদ নিজামুদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চুনতীর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) উচুঁ স্তরের আশেকে রাসূল (স.) ও অসংখ্য করামতসম্পন্ন একজন আল্লাহর ওলী। দুনিয়া ত্যাগী ও প্রশস্তচিত্তের অধিকারী একজন মুহাক্কিক আলিমেদ্বীন তিনি। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ হতে আমি চুনতী সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল-এ নিয়মিত অংশগ্রহণকারী হিসেবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর ইন্তেকালের পর চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায় কামিল স্তরের একজন ছাত্র ও পরবর্তীতে প্রায় তিন বছরকাল নগণ্য শিক্ষক হিসেবে অবস্থানের সুবাদে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক বিষয় জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরলাম:

✪ **অনাড়ম্বর জীবনযাপন :** হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ছিলেন সত্যিকার অর্থে নিরহংকারী। চাল-চলনে কৃত্রিম শান-শওকত তাঁর ছিল না। স্বাভাবিক গোল টুপি ও হাঁটু পর্যন্ত দু'দিক কাটা পাঞ্জাবি পরিহিত দেখেছি। সীরত মাহফিলের আশ-পাশ ও খাদ্য বিভাগ ঘুরে ঘুরে তদারক করতে দেখেছি। কেবল বাসগৃহ কিংবা মাহফিল মঞ্চে বসে থাকতেন না। সবাই তাঁকে দেখার ও সালাম করার সুযোগ পেত। কাউকে কদমবুচি করতে দিতেন না। মনে হল তিনি বিদআত, কুসংস্কার ও কৃত্রিমতার ব্যাপারে কঠোর। শুনেছি, কদমবুচি করার কারণে তিনি অনেককে পিটিয়েছেন।

✪ **ইলমে দ্বীনের পৃষ্ঠপোষকতা:** হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ইলমে দ্বীনের অনন্য খাদেম। হযরত রাসূলে পাক (স.) এর হাদীসের শিক্ষাদানে তাঁর অবদান ও ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

সহজ কথায়, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায় হাদিস বিভাগ নিয়ে টাইটেল তথা কামিল খোলার মূল উদ্যোক্তা তিনি। তাঁর ভূমিকাতেই যাবতীয় উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরতুল আল্লামা আবদুল হাই নেজামী (ম.জি.আ.) কে নিয়োগদানও তাঁর ভূমিকার ফসল। মূলত: ইহা তাঁর হুব্বে রাসূলের (স.) উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি মুখলিস আলিমগণকে খুবই সম্মান করতেন। মজযুব প্রকৃতির আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে তাঁর মত ইলমি প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টান্ত বিরল। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রতিকূল পরিবেশে জনসমক্ষে ইসলামী জীবনাদর্শের পূর্ণাঙ্গ রূপ পেশ করার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.)।

✪ **হৃদয়ের প্রশস্ততা :** মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যিনি দুনিয়ার মোহমুক্ত হতে পারেন তিনি সংকীর্ণতার রোগে আক্রান্ত হতে পারেন না। তাইতো, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রবর্তিত সীরাত মাহফিলে আলীয়া ও কওমী উভয় ধারার শীর্ষস্থানীয় ওলামা ও মশায়েখ উপস্থিত হন। দ্বীনের স্বার্থে ওলামা মশায়েখ এর ঐক্যের জন্য তাঁকে আমি বাংলাদেশে প্রথম ভূমিকা পালনকারী মনে করি। দ্বীনের সকল খেদমতগারকে তিনি মূল্যায়ন করতেন।

✪ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অবদান অনন্য।

✪ চুনতীর শাহ সাহেব (রহ.) এর ভূমিকা বহুমুখী। তাঁর পরশেই অনেক কৃপণ ধনীর হাতের মুষ্টি খুলেছে। অনেক অভাবীর অন্নের ব্যবস্থা হয়েছে। হযরত রাসূলে পাক (স.) এর অনুপম আদর্শের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে তাঁর নিষ্ঠা ও ত্যাগে। আল্লাহপাক তাঁর দরজাকে দিনদিন বুলন্দ করুক আমিন।

আহমদ হোসেন

সাবেক ডাইরেক্টর, অর্থ (বিসিআইসি)

পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

✪ মাঝে মধ্যে সুযোগ বুঝে চুনতী মাহফিলে সীরতুন্নবীতে যেতাম। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করা হয়নি। চাকরি জীবনে ব্যস্ত থাকতে হয়। হাতে ছুটি থাকে কম। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেখা হয়নি।

✪ ১৯৭৬/৭৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম শহর থেকে গ্রামের বাড়ি গিয়ে রাত্রে ছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম সকালে চুনতী গিয়ে শাহ সাহেব হুজুরের সাথে মোলাকাত করে সপরিবারে শহরে যাব। কিন্তু অফিসের তাড়াকে প্রাধান্য দিয়ে চুনতী না গিয়ে চট্টগ্রাম শহরের দিকে রওয়ানা দিই। মাত্র মাইলখানেক যেতে না যেতেই গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। এমনভাবে খারাপ হয় সহসা ঠিক করা যাচ্ছিল না।
ফলে স্ত্রী ও শাশুড়িকে নিকটে করইয়ানগর পাঠিয়ে দিয়ে আমি পদুয়ায় বাড়ি চলে যাই। বিকেলের দিকে গাড়ি ঠিক হলে পরদিন সকালে চুনতী চলে যাই। চুনতী গিয়ে হযরত শাহ সাহেব হুযুরের মোলাকাত ও নুরানি চেহারা মোবারক দর্শন করে তৃপ্তি লাভ করে শহরে চলে আসি।

✪ ১৯৫৭/৫৮ খ্রিস্টাব্দে আমি সাতকানিয়া হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। ঐ এলাকায় মজযুব প্রকৃতির একটি লোক ছিলেন। তার নাম হাফেজ ইউনুস। লোকটি বলতেন চুনতী শাহ সাহেব হুযুর হেঁটে হেঁটে নদী পার হয়ে যান। ঐ মজযুব বারেবারে এ কথাটি বলতেন। তখন প্রকাশ্য জনসমক্ষে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর এত ব্যাপক পরিচিত ছিল বলে মনে হয় না।

এ.বি.এম. আশরাফ উল্লাহ

সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে। তবে কোন তারিখ সেটা মনে নেই। সাহেবুর রহমান চৌধুরীর (সাহেব মিয়া) বড়হাতিয়া, লোহাগাড়ার মাধ্যমে চট্টগ্রামেই দেখা হয়। এরপর থেকে চুনতী আসা-যাওয়ায় এখনো আছি।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে হজ্বে যাওয়ার ঘটনা

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাদের সন্দ্বীপের বাড়িতে তশরিফ আনেন। আমার ছোট দুই ভাই (জাহাঙ্গীর ও জামাল) এর বিয়েতে। তখন আমার কেন জানি হজ্বে যাওয়ার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রকটভাবে হচ্ছিল। ঐ বছর বাবা শাহ সাহেব কেবলা হজ্বে যাচ্ছেন। একথা বাবাকে (হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললাম। তখন শাহ সাহেব হুযুর আমাকে বললেন- চৈ নাওবা চেষ্টা করে দেখ। তখন বাংলাদেশের সাথে সৌদিয়ার যোগাযোগ এমন সহজ ছিল না এবং আমার পাসপোর্টও প্রস্তুত ছিলনা।

খুবই তাড়াহুড়ার মাধ্যমে পাসপোর্ট তৈরির ব্যবস্থা করালাম। এরই মধ্যে সন্দ্বীপের সোহরাব হুসেনকে লন্ডন থেকে আমার জন্য টিকেট পাঠানোর ব্যবস্থা করতে ডলারও পাঠালাম কিন্তু সে তা ব্যবস্থা করতে পারল না।

তখন চুনতীর হাবিব উল্লাহ সিদ্দিকী বলল, বাংলাদেশ ব্যাংকের কন্ট্রোলার জনাব হাফিজুর রহমান সাহেব আত্মীয়, তার বাড়ি মীর্জাখিল। তিনি হাজিদেরকে খুবই সহযোগিতা করেন। হাবিবের মাধ্যমে হাফিজুর রহমান সাহেবের সাথে আমার এমন সম্পর্ক হয়ে গেল যে, তিনি উনার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে আমার জন্য সকল ব্যবস্থা করেছিলেন যা উনার মাধ্যমে করা সম্ভব হল।

তাই হাবিবকে আমি ঢাকায় পাঠালাম এবং সে হাফিজুর রহমান সাহেবের সাথে দেখা করবে, আমাকে ঢাকায় যেতে বলল, হাবিবকে আমি আমার পাসপোর্ট দিতে পারিনি তখনও আমার পাসপোর্ট প্রস্তুত না হওয়াতে।

আমিও সাথে সাথে শুক্রবারের লাষ্ট ফ্লাইটে ঢাকায় চলে গেলাম। শনিবারে হাফিজুর রহমানের সাথে দেখা করার জন্য হাবিবকে বললাম, তোমাকে খুঁজে বের করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না তাই তুমি শনিবারে ব্যাংকের সামনে উপস্থিত থাকবে, আমি ওখানে যাব।

যথারীতি শনিবারে উপস্থিত হলাম সকাল ৯ টার দিকে। তখনও হাফিজুর রহমান সাহেব অফিসে পৌছেননি। কারণ উনার ছেলে এক্সিডেন্ট করে পা ভেঙ্গে

ফেলেছেন, তাকে নিয়ে হাসপাতালে গেছেন এবং অফিসে আসবেন না এমন সংবাদও দেননি। তাই উনার পি.এ. আমাদেরকে বসালেন এবং খুবই আপ্যায়ন করালেন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর উনি আসলেন এবং আমার কাজ খুবই তাড়াতাড়ি শেষ করে দিলেন।

এরপর আমি চট্টগ্রাম চলে আসলাম। এর পরেরদিন সন্দ্বীপ যাওয়ার সময় মাঝ রাস্তা হারিয়ে ফেলল এবং সারারাত সমুদ্রের মধ্যে অপেক্ষা করে সকাল বেলায় সন্দ্বীপ পৌছলাম। ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের এক বিমান টিকেটের এজেন্টকে টিকেটের ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়ে গেলাম। সম্ভবত ক্যাফকো আজিজের শুক্কুর সাহেব হবেন। উনি আমার জন্য (ঢাকা-কলকাতা-দুবাই) কনফার্ম টিকেট করেছিলেন এবং দুবাই-জেদ্দায় ওয়েটিং টিকেট করে দিলেন। বুধবার দিন ফ্লাইটে ঢাকা থেকে দুবাই পর্যন্ত পৌছে গেলাম এবং দুবাইতে গিয়ে ঘটল মহা ঝামেলা।

ফ্লাইট থেকে নামার পর এক অফিসার আমাকে দোতলায় নিয়ে একটা রুমে ঢুকিয়ে রাখলেন আর ওখান থেকে আমাকে বের হতে দিচ্ছেন না। নজরবন্দির মতই ঘন্টার পর ঘন্টা পার হতে লাগল। আমিও রাগে উত্তেজিত হচ্ছি আস্তে আস্তে, তবে রাগ ঝাড়ব কার উপর।

মনে মনে আল্লাহকে বলছি, "আল্লাহ আমি তো শুধুই তোমার দরবারে হাজিরা দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি এবং তোমার হাবিবের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য নয়।"

মনে মনে আরো বলছি (শাহ সাহেব কেবলার উদ্দেশ্যে) বাবা আপনি যদি আমাকে ছাড়া আরাফাতের ময়দানে যান তাহলে কিয়ামতের মাঠে আপনার সাথে আমার বুঝাপড়া হবে। এই বলে আমি এহরামের প্রস্তুতির জন্য বাথরুমে ঢুকে হাজত, ওজু ও গোসল সারলাম। এরই মধ্যে বিমানের একটা লোক এসে আমাকে ডাকতে লাগল এবং আমিও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। যে অফিসার আমাকে নজরবন্দির মত করে রেখেছিল সে তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বুঝাচ্ছিল আমার বিরুদ্ধে। যখন সে অফিসার আমার কাছে জিজ্ঞেস করল তখন আমি বললাম "হজ্ব হজ্ব"। তখন উর্ধ্বতন অফিসার আমাকে একটা চার্টার্ড করা হজ্ব প্লেইনে করে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। তখন পূর্বের অফিসারকে সে বকাবকি করতে লাগল এবং আমাকে বোর্ডি পাসের একটা অংশ দিয়ে বলল, "যায়ে যায়ে আপ ইসি প্লেইন সে চলে যায়ে।" এবং আমি জেদ্দায় পৌছে গেলাম। ওখান থেকে মক্কা শরিফ।

ওখানে গিয়ে শাহ সাহেব হুযুরকে তালাশ করতে করতে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। অতঃপর পেরেশান হয়ে বসে পড়লাম। মক্কায় কাবা শরিফে আমি পৌছে যাই আসরের পর। তখন থেকে মাগরিব পর্যন্ত তালাশ করি, বাবাকে না পেয়ে হতাশ হয়ে মনে মনে বলছি- আল্লাহ, গত দেড় মাস থেকে আমার চোখে ঘুম নেই শুধুই তোমার হজ্ব করার জন্য, এখন কোথায় বাবাকে খুঁজব আমি আর পারছি না।

এশার পূর্বেই মকবুল আহমদ চৌধুরীর সাথে বিচারপতি সিদ্দিক আহমদসহ পেয়ে গেলাম। তখন তাঁরা আমাকে বাবার কাছে নিয়ে গেলেন। পথেই আমাকে মকবুল সাহেব বলছেন আমাকে দেখেই, মামা এই জন্যেই তো আমাকে বারবার বলছিলেন চারজনের জন্য রুম নিতে এবং এভাবে হজ্ব সম্পাদন করলাম শুধুমাত্র বাবার উসিলায়। না হলে আমার পক্ষে হজ্ব করা হয়ত সম্ভব হত না।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

লেখক, গবেষক

২৫৪/২, পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

✪ মাঠের পশ্চিম পাশে বিশাল আয়তনের মসজিদে বায়তুল্লাহ তখনও হয়নি। মাত্র দু'বছর আগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর বাড়ির দক্ষিণের জমি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) অনুষ্ঠিত হচ্ছে পশ্চিমের বিরাট সীরত ময়দানে। চুনতী মাদরাসায় আমাদের ছাত্র জীবনের শুরুতে শাহ মঞ্জিলের পশ্চিমের অনুচ্ছ পাহাড়াটি লিচু বাগান হিসেবে পরিচিতি ছিল। পাহাড় কেটে আশপাশের জমি ভরাট করে এখন বিশাল সীরত ময়দান। তারিখটি এখন সঠিক স্মরণ নেই।

যদ্দুর মনে পড়ে '৭৭ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। জোহরের জামাত শুরু হবার অপেক্ষায় আছি। বর্তমানে যেখানে মসজিদ সেখানেই মাটি ভরাট করে বিরাট আকারে স্টেজ তৈরি। মঞ্চের তিনদিকে বেড়া আর কাপড়ের ঘেরা। উত্তর দিকে মঞ্চে প্রবেশের সদর দরজা। আলোচক মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য আলাদা রুম তৈরি আছে মঞ্চের সাথে। মেহমানরা আর মঞ্চের কর্মীরা সাধারণত: মঞ্চেই নামায পড়েন। বাকিরা একটু নিচুতে, প্যান্ডেলেই জামাতে শরিক হন। দুপুর দেড়টায় জামাতের সময় নির্দিষ্ট। কিন্তু জামাত শুরু করা যাচ্ছে না হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আগমনের অপেক্ষায়। তিনি শাহ মঞ্জিলে। বারবার মাহফিল থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হচ্ছে। জনাব আসছে না। আগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর খাদেমের উপর দায়িত্ব ছিল তাকে জামাতে নিয়ে আসার অথবা না আসলে জানিয়ে দেবার। কোনটাই হচ্ছে না। অস্থিরতায় মন ছটফট করছে। বারবার

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে শাহ সাহেব বাড়ির দিকে তাকাচ্ছি। মাহফিলের সুষ্ঠু এন্তেজামের দায়িত্ব অনেকটা আমাদের উপর অর্পিত পরিচালকের সহকারী ঘোষক হিসেবে ঠিক সময়ে অনুষ্ঠান শুরু করতে না পারলে শেষ সময়ের সংকুলান হবে না।

বারবার মাহফিল পরিচালক নাজেমে আ-লা মাওলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের দিকে তাকাচ্ছি। তিনি ইশারা করলেই নামায কায়েমের ঘোষণা দেব। কিন্তু তিনিও জায়নামাযে মাথা নিচু করে বসে আছেন। পেটের ক্ষিধেও কম না। জোহরের নামায শেষে তেলাওয়াতে কুরআন। তারপরে না'তে রাসূল (স.)। এরপর নির্দিষ্ট বক্তার নাম ও বিষয় ঘোষণা করে তাকে মাইকে তুলে দিয়ে খেতে যাব চুনতী মাদরাসার দু'তলায়।

দেখতে দেখতে ঘড়িতে দু'টা বাজে, তবুও আসছেন না হযরত শাহ সাহেব (রহ.)। আসবেন না একথাও জানাচ্ছে না কেউ। মনে খটকা বিধল, নামায কি আদৌ হবে? নামায পড়ব কার জন্যে? শাহ সাহেবের জন্য এভাবে অপেক্ষায় বসে থাকব?: শরিয়তের বিধান কি বলে? চেয়ে রইলাম- নাযেমে আলা সাহেব হুযুর এক পলক আমার দিকে তাকান কিনা? তার কাছে গিয়ে কিছু বলার সাহস ও নেই।

শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে ৪৫ মিনিট বিলম্বের মাথায় শাহ সাহেব (রহ.) পায়ে হেঁটে আসলেন মঞ্চে। নামায কায়েম হলো, অনুষ্ঠান শুরু হলো কেরাত ও না'তে রাসূলের পর, নির্দিষ্ট বক্তাকে মাইকের সামনে দিয়ে খেতে যাচ্ছি মাদরাসার দিকে।

মঞ্চ থেকে বের হতেই এক লোক পথ আগলে দাঁড়ালো। মাজুর মানুষ পা একটি খোঁড়া, চুনতী বাড়ি। আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করে বলল, আপনাকে একটা কথা বলবো, প্রকাশ করতে পারবেন না। ওয়াদা করলাম। এরপর বলতে লাগল: আপনারা যখন নামাযের জামাতের জন্য আগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আগমনের অপেক্ষা করেছিলেন। তখন আমি মোসল্লায় আনমনা হয়ে ঝিমুচ্ছিলাম। ও সময় স্বপ্নে দেখি, আপনাদের মঞ্চের পশ্চিমে পেছন দিক হতে তিনজন আরবি লোক ঘোড়ায় চড়ে এসে উত্তরে মঞ্চের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে। তারাও নামায পড়বে। কিন্তু ঘোড়া থেকে নামছে না। প্রত্যেকের হাতের আস্তিনে সুন্দর আরবি লেখা। আমি উম্মি মানুষ পড়তে পারিনি। গেইটে দাঁড়িয়ে তারা তাকিয়ে আছেন পূর্বদিকে। আগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.)'র জন্য অপেক্ষা করছেন। একটু পরে আমার তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

এই সহজ সরল মানুষটির মুখে এরূপ স্বপ্নের কথা শুনে গাঁ শিউরে উঠল। এক অজানা ভয়ে ভাবতে লাগলাম একটু আগে আমার মনের নানান কল্পনার কথা। মনে মনে বললাম, ভাগ্যিস ওসব কথা মুখ দিয়ে বের করিনি। লোকটি আরো বলল, এরূপ স্বপ্ন আমি আরেকবার দেখেছিলাম। যখন শাহ মঞ্জিলের দক্ষিণে মাহফিল হতো তখনও এরূপ এক স্বপ্ন দেখি, শাহ মঞ্জিলের পশ্চিমে এক বিশাল ময়দানে মাটি থেকে ১২ হাত উঁচুতে শূন্যে সীরত মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তখনও সীরত ময়দানের কোন জল্পনা-কল্পনা ছিল না এবং সেখানে ছিল লিচু বাগানের পাহাড়। এক বছর পর দেখি ট্রাকটর দিয়ে পাহাড় সমান করে মাঠ তৈরি হচ্ছে। আমার স্বপ্নকে যেন বাস্তবে দেখতে পেলাম, বলল, আমি গরিব মানুষ। মাহফিলের জন্য কিছুই করতে পারি না। তাই প্রতি বছর প্যান্ডেল তৈরির সময় দৈহিক শ্রম দিই। কাজ করি এবং বেতন নিই না। দিনমজুর হিসেবে কাজ করার লোক না হলেও পবিত্র সীরতের জন্য নিজেকে এভাবে খেদমতে নিয়োজিত করেন তিনি।

জানিনা, মুন্সেফ বাজারের সেই আলী আহমদ সওদাগর বেঁচে আছেন কিনা। তার স্বপ্নের কথা গোপন রাখার ওয়াদা এতদিন রক্ষা করেছি। এবার আর পারা গেল না। সুচনালগ্ন থেকে চুনতীর পবিত্র সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলের কর্মী হিসেবে উল্লিখিত ঘটনাটি আমার স্মৃতিতে এখনো অম্লান।

✪ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের আরো একটি স্মৃতিচারণ করছি, যাতে দীর্ঘ ১৯ দিনব্যাপী সীরত মাহফিল অনুষ্ঠানের আগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উদ্দেশ্য ও অন্ত র্নিহিত হেকমত আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে পড়বে। সীরত মাহফিল চলছে, একদিন সকালে আগে থেকেই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী মাদরাসার কুতুবখানায় বসে আছেন তাঁর সাথে মাহফিলে আলোচক হিসেবে আগত মেহমান চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমিন সাহেব এবং দ্বিতীয় মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেব। মাওলানা আমীন সাহেব হুযুর শাহ সাহেবের ছাত্র জীবনের উস্তাদ। মাদরাসার নিচতলায় মরহুম মাওলানা কামাল উদ্দিন খতিবি সাহেবের কামরাটিই ছিল কুতুবখানা।

নানা ধর্মীয় প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম তাদের কথাগুলো। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রশ্নের সূরে বললেন- ওবা শবেক্বদর বড় না? শব ক্বদরের মর্যাদা অনেক বড় তাই-না? শবে ক্বদরের বর্ণনা করে কোরান মজিদে, পৃথক একটি সূরা নাজিল হয়েছে। বলা হয়েছে, ঐ একটি রাত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। কাজেই এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য অন্য কিছু।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আবার বললেন, আমার মন কি বলে জানেন? আমার হুযুর (পাক (স.) যে-রাতে এসেছেন, সে-রাতের মর্যাদা শবে ক্বদরের চাইতে অনেক বেশি। এবার জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেব হুযুর জবাব দিলেন হ্যাঁ, কিতাবেও তো তাই লিখা আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ... শাহ সাহেব (রহ.) যেন আনন্দে ফেটে পড়বেন।

তিনি অনর্গল বলতে লাগলেন- আমি হুযুর (স.) কে দেখেছিলাম। তিনি আমার সাথে কথা বলছেন: আমাকে তিনটি কথা বলেছেন (১) অ-হাফেজ তুই নডরাইছ (২) হাফেজ তুইপার অই যাবি (৩) অ-হাফেজ তুই আর তারিফ গর। (১) হাফেজ! তুমি ভয় পাবেনা। (২) হাফেজ! তুমি পার হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। (৩) হাফেজ তুমি আমার প্রশংসা ও তারিফ করতে থাক। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আনন্দের আতিশয্যে জোর গলায় বলতে লাগলেন আমি মোটেও ভয় পাইনা, একেবারেই ডরাইনা। আমার হুযুরের তারিফ সব সময় করতে হবে। কি উনিশ দিন। সারা বছর সীরত মাহফিল হওয়া দরকার। আমার হুযুরের প্রশংসা সব সময় হওয়া দরকার। এরপরে তাঁর কথাগুলো সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের জগতে চলে গেল।

✪ হযরত নবী করিম (স.) এর জন্ম থেকে ওফাত এবং বর্তমান যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও গবেষণামূলক আলোচনার যে ব্যবস্থায় ১৯ দিনব্যাপী সীরত মাহফিল প্রবর্তন হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। কিন্তু তখন থেকেই দীর্ঘ ১৯দিন একটানা মাহফিল অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল অনেকের।

তবে বারবার মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছি যে, একজন আশেকে রাসূল, ফানাফির রাসূল রাসূলে পাক (স.) এর তারিফের জন্য যে আয়োজন চালু করে গেছেন তা নিয়ে আমাদের মত লোকদের যুক্তি খাটিয়ে মাথা খারাপ করা উচিত নয়। যারা পারবে সহযোগিতা করবে, কারো উপর জোর জবরদস্তি বা ফরজ ওয়াজিবের এলজাম তো নেই।

হয়ত প্রশ্ন আসবে দীর্ঘ উনিশ দিনের এ মাহফিল কি একজন মজযুব ওলির নিছক ভক্তির বিলাস এবং তাঁর অনুসারীদের অন্ধ অনুকরণ। আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার বাইরে এর সামাজিক কোন প্রয়োজন কি নেই? এ প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সীরত মাহফিলের সূচনা পর্বের দিকে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ চিন্তা করে দেখলে চুনতীর সীরত মাহফিল ছিল এদেশে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের নতুন দিগন্ত। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার যো নেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশের

ইসলামি ও মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলোর অপরিনামদর্শী ভূমিকার কারণে ইসলাম ও মুসলমানরা চরম অবহেলা ও নিগ্রহের পাত্র হয়েছিল। টুপি, দাড়ি দিয়ে রাস্তায় হাঁটা ছিল চরম লজ্জার বিষয়। দেশের কোথাও ইসলামের কথা বলার এতটুকু সাহস কারো ছিল না। এহেন চরম দুর্দিনে আধ্যাত্মিক দূরদৃষ্টিতে আহুত সীরত মাহফিল যেন ঈমানদারদের জন্য ছিল পুনর্জন্মের ঈদ। সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলের সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে মাহফিলের অনুষ্ঠান- সূচির বিজ্ঞ রূপকার ও স্থায়ী পরিচালক মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) এর প্রবন্ধে এ পরিস্থিতির বর্ণনা এভাবে দিয়েছিলেন- (আইয়ামে জাহেলিয়াতের ন্যায়) একটি অবস্থা বিরাজ করেছিল আমাদে এই বাংলাদেশে স্বাধীনতার পুর্বাপর সময়ে। মুসলমান মুসলমানের প্রতি ছিল খড়গহস্ত। ইসলাম হয়েছিল দেশের অধিকাংশ জনতার কাছে একটি অত্যন্ত অপ্রিয় বস্তু, সত্য ও ন্যায়ের মাথাটি ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত তিক্ত। ইসলামের কোন কথা বলার সাহসটুকু যেন কারো ছিলনা। প্রাক-ইসলামি যুগের তথা আইয়ামে জাহেলিয়াতের নমুনা যেন এখানে বাস্তবরূপে দেখা দিয়েছিল। এ জাতি যে আবার কখনো ধর্মীয় অনুভূতি ফিরে পাবে তা ছিল অকল্পনীয় বস্তু।

জাতীয় ঐক্যের প্রবক্তা যারা ছিল, তারা ধর্মের দিকে দেশবাসীকে আহ্বান করেছিল, এ কল্পিত অপরাধে অনেকের জীবন দিতে হয়েছে আর অনেককে হতে হয়েছে দেশত্যাগী। এহেন জাতীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে এ অধঃপতিত জাতিকে ধর্মীয় ও নৈতিক অবনতির অতল গহ্বর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত করার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়োছিলেন যিনি, তিনি হলেন হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (চুনতীর শাহ সাহেব রহ.)।

তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন ও সুতীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়ে দেখতে পেলেন, এ জাতির পরিত্রাণের ব্যবস্থা একমাত্র সীরত আন্দোলনের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। বিশ্ব মানবতার ত্রাণকর্তা রাহমতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আদর্শ জীবনের সঠিক চিত্রটুকু জনতার সম্মুখে তুলে ধরাই এর একমাত্র পন্থা

✪ সীরত মাহফিলের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলের নামে রাসূলে পাকের শান, মহব্বত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর মুখরোচক বর্ণনা দিয়ে দায়সারা গোছের ওয়াজ শুনে বাজার গরম করার যে প্রবণতা আলেম সমাজ ও ওয়ায়েজিনদের মধ্যে দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল তার আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়।

প্রত্যেক ওয়ায়েজিনকে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করতে হত এবং তার জন্য অনেক আগে থেকে পড়াশুনা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হত। কোন কোন প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজিন বলেছেন যে, সীরত মাহফিল বিষয় ঠিক করে দেয়ার আগে বছরের

পর বছর আমরা ওয়াজ করেছি অথচ কিতাব দেখতে হয়নি। এমনকি এর দেখাদেখি অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা করার জন্য ওয়ায়েজিনদের উপর সমাজের পক্ষ হতে চাপ আরোপিত হয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে ওয়াজ ও গণ মানুষকে হেদায়তের পদ্ধতিগত বিপ্লব এনেছিল চুনতীর সীরত মাহফিল।

আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, মাহফিলে ২/৩ মাস আগে থেকে নায়েমে আলা সাহেব হুযুর হাদিস শরিফের ফেহরেস্ত বা সূচি দেখে দেখে বিষয় ঠিক করতেন এবং নির্দিষ্ট বক্তাকে তা জানিয়ে দেয়া হত। দেশের সচেতন শিক্ষিত মহলে চুনতীর সীরত মাহফিলে অনুষ্ঠান-সূচির বিরাট কদর ছিল। কারণ তাতে তারা একনজরে ইসলাম ও প্রিয় নবীর (স.) জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে পেত।

স্বীকার করতেই হবে যে, মাহফিলের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সেই গুরুত্ব এখন দেয়া হয় না এবং তার আবেদনও অনেকাংশে কমে গেছে। বর্তমানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স.) উপলক্ষে রাসূলেপাকের শান ও মান বর্ণনার নামে রাসুল (স.) নূর, রাসূলের মহব্বত ও কিছু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা কিংবা একটি মিছিল বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান উদযাপনের মধ্যে মিলাদুন্নবী পালনকে সীমাবদ্ধ করার কথা চিন্তা করলে বারবার মনে জাগে চুনতীর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রবর্তিত পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর গুরুত্বের কথা।

✪ তখন আমি চুনতী মাদরাসার ছাত্রাবাসের আবাসিক ছাত্র। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমে শুনতে পাই শাহ মঞ্জিলে মিলার্দ মাহফিল হবে সাতকানিয়ার ২ জন সেরা আলেম ও বক্তাকে নিয়ে। একজন বড় মাওলানা হিসেবে প্রসিদ্ধ মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব (রহ.) অপরজন জনাব মাওলানা মুবারক আহমদ সাহেব।

ছোট হিসেবে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম-২ জনকেই শাহ সাহেব নাকি ১০০ টাকা করে হাদিয়া দিয়েছেন। পর বছর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ সেই মাহফিল দিনব্যাপী দীর্ঘায়িত হয়। শাহ মঞ্জিলের দক্ষিণের ধানের জমিতে স্টেইজ ছিল পূর্বমুখী হয়ে পশ্চিম দিকে। জোহরের পর চুনতী মাদরাসার ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণী এবং রাত্রে ওয়াজ মাহফিল। চারদিক থেকে এতদিন লুকিয়ে থাকা বা অবহেলিত ঈমানদার লোকদের ঢল নেমেছিল রবিউল আউয়ালের দ্বাদশী চাঁদের জ্যোৎস্নার প্লাবনে। এরপর প্রতি বছর ৩দিন, ৫দিন ৭দিন, ১০ দিন, ১৫দিন ও ১৯দিনব্যাপী মাহফিল- শেষ পর্যন্ত ১১ই রবিউল আউয়াল শুরু হয়ে ১৯ দিনের মাথায় শেষ তারিখ রাতে মাহফিল সমাপ্ত হয়। চিন্তা করার বিষয় হলো:

হঠাৎ করে ১৯দিনের ঘোষণা আসেনি। ক্রমান্বয়ে সুচিন্তিতভাবেই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরো কথা হলো, তিনি তো এই মাহফিল

আয়োজন কারো উপর ফরজ ওয়াজিব করে দিয়ে যাননি। তার মুরিদও কেউ নেই খেলাফত তো দুরের কথা। যাদের সময় আছে, সময় দিবেন। সময় না থাকলে জোর জবরদস্তি বা আপত্তি নেই। বরং এই মাহফিলকে কেন্দ্র করে বিশাল সীরত ময়দানের চৌহদ্দিকে স্থায়ীভাবে ইসলামের ও দ্বীনি এলমের খেদমতে কিভাবে নিয়োজিত করা যায়। এখন একটি বিরাট পরিসরে দ্বীনি মাদরাসা বা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করা যায় কিনা সেটাই খতিয়ে দেখা উচিত, রাসূলে (স.) ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আশেক হবার দাবিদার সামর্থবান লোকদের।

সীরত মাহফিলের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা আমার সাধ্যের অতীত। কারণ ছাত্র জীবন থেকে মাহফিলে চট্ বিছানো থেকে শুরু করে ঘোষক হিসেবে, মঞ্চ পরিচালনার সুবাদে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ আলেম ও বুযুর্গদের ছোহবতের যে অমূল্য সম্পদ আমার জীবনকে ধন্য করেছে তার ঋণ শোধ করা কখনো সম্ভব নয়।

তাই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সীরত মাহফিল সম্পর্কে আমার আরেকটি স্মৃতি কথার উদ্ধৃতি টেনে এ লেখা শেষ করতে চাই "যা ভাবের সৈকতের শান্তির সন্ধান" নামক আমার একটি বইয়ে বিধৃত হয়েছে। মুজিব আমলের ধর্মনিরপেক্ষতার আতঙ্কে যখন ধর্মপ্রাণ লোকদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা, তখনই ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডাক দেন সীরত মাহফিলের। সেই ডাকে প্রাণের স্পন্দন চতুর্দিকে।

মাহফিলকে তাৎপর্যময় করে তোলার জন্য নিপুণ শিল্পীর মত অনুষ্ঠান-সূচি ও বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করেন চুনতী মাদরাসার নাজেমে আলা প্রখ্যাত আলেম ও কবি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.) বর্তমানে ১৯ দিনব্যাপী এ সীরত মাহফিল চট্টগ্রাম এলাকার আশেকানে রাসূলের মিলন কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান। মাহফিলের আলোচ্য বিষয়গুলোকে মরহুম নাজেমে আলা এমনভাবে বিন্যস্ত করতেন যাতে ইসলামের সামগ্রিক পরিচয় এবং রাসূলেপাকের গোটা জীবনের উপর তথ্যপূর্ণ আলোচনা হয়।

সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন মহলের পীর মশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা রাখতেন এই মাহফিলে। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে কোনদিন মাহফিলে বক্তব্য রাখতে, নামাযে ইমামতি করতে বা দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করতেও দেখিনি। তবুও তাঁর নুরানী চেহারা দেখে মানুষ পাগল হয়ে যেত।

চুনতী মাদরাসার ছাত্র জীবন থেকেই আমি জড়িয়ে পড়ি এই মাহফিলের সাথে। নাজেমে আলা সাহেব ছিলেন স্থায়ী অনুষ্ঠান পরিচালক। আর শাহ মাওলানা

শফিক আহমদ (রহ.) ছিলেন সহকারী পরিচালক। তাঁদের ছাত্র হিসেবে আমি আর প্রফেসর আবু বকর রফিক ছিলাম ঘোষক। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবাস জীবনে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেছি। চুনতীতে ৭ বছর ছাত্র জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি ছাড়াও চুনতীর সীরত মাহফিল ছিল আমার জীবনের প্রাণস্পন্দন। রাসূলেপাকের (স.) ভালবাসার দীক্ষা, পীর মশায়েখ, ওলামা, চিন্তাবিদদের সাহচর্য ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শৈশব থেকে আমার জীবনকে আলোকিত করেছে সর্বতোভাবে। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ও আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদগণের দোয়া ও স্নেহের পরশ এখনো যেন অনুভব করছি গোটা জীবন দিয়ে। তাই একান্ত ইচ্ছা ছিল শেষদিনে হলেও হাজির হবো চুনতীর সীরত মাহফিলে। দেশে থেকেও সীরত মাহফিলের নবী প্রেমের রূহানি পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হব- তা ভাবতেও যেন কষ্ট হয়।

মাওলানা আবু নছর আতীক আহমদ
উপাধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে আমার একেবারে নাড়ির সম্পর্ক না থাকলেও নানা কারণে তা নাড়ির সম্পর্কের চাইতে কোনক্রমে কম ছিল না। তিনি ছিলেন আমার মাতামহ আজমগড়ী (রহ.) এর অন্যতম খলিফা, উস্তাযুল আসাতিযা শাহ মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর শ্বশুরাল ও নানহাল উভয় সূত্রে আত্মীয়। আমার মরহুমা নানী মুহতরমা খাইরুন্নিছা ছিলেন তাঁর পিতৃব্যবোন। শৈশবকালেই তাঁর আম্মাজান ইন্তেকাল করলে বড় বোন খাইরুন্নিছার প্রতিপালনে তিনি বড় হন। তাই তিনি নানীকে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

✪ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নানী যেদিন শাহ সাহেব নানার বাড়িতে ইন্তেকাল করেন, সেদিন উনার জযব এমন গালেব হয়ে যায় তিনি স্বয়ং আল্লাহকে গালি দিয়ে বলছিলেন, "তুই কি আমার বোনকে দেখেছিলি এভাবে নিয়ে যেতে... তখন তাঁর চোখ মুখ দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছিল। বারবার আক্ষেপ করে বলছিলেন হায়! আজ একজন রাবেয়া বসরীর তিরোধান হল।

সত্যিই নানী ছিলেন হযরত রাবেয়া বসরীর মূর্ত প্রতিক, তাহাজ্জুদ গুজার সদা এবাদতে মশগুল পরম দানশীলা অনন্যসাধারণ মহিলা। তুরিকতের সর্বোচ্চ সোপানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আজমগড়ী (রহ.) ও আরাকানী (রহ.) এর মত মহান পীরদ্বয়ের বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে তিনি প্রতি দশ দিনে নিয়মিত একবার কুরআন মজিদ খতম করতেন।

✪ **হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সম্ভবতঃ** আজমগড়ী (রহ.) এর হাতে বায়আতপ্রাপ্ত ছিলেন। কারণ অনেকবার তাঁকে বলতে শুনেছি- আমার পীর আজমগড়ী পীরের মত। এত বড় পীর আমি কোথাও দেখিনি। ওহ! ওহ! কত বড় পীর। তাঁর সম্পর্কে আরো অনেক সুন্দর সুন্দর মন্তব্য করতেন। তবে তাঁর শাহ সাহেব হিসেবে পরিচিত হওয়ার পিছনে যে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তা তাঁর যবানীতে তুলে ধরছি।

✪ প্রায় সময় তিনি বলতেন ওবা শবেকদরের রাত্রিতে আমি যখন বুঝতে পারলাম আজ শবে কদর ঠিক তখনি সিজদায় পড়ে আল্লাহকে ডাক দিলাম। আল্লাহ আমাকে বললেন- হাফেজ কি চাও? বললাম তোমাকে চাই এবং তখনি আল্লাহকে টান দিলাম। আর যায় কোথায়?

যেহেতু তিনি কোন পীরের তত্ত্বাবধানে খেলাফতপ্রাপ্ত ছিলেন না বরং আল্লাহ প্রদত্ত খাস বেলায়তপ্রাপ্ত ছিলেন তাই তাঁর পরবর্তী জেনারেশনে তাঁর কোন প্রতিনিধিত্বকারী বা সাজ্জাদানশীন নেই। বরং আছে শুধু ভক্ত-অনুরক্ত তথা মুহিব্বীন-মু'তাকেদিন। কবির ভাষায়-

احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا

আমি সালেহীনদের ভক্ত, যদিও তাদের অন্তর্ভুক্ত নই; আশা করি যেন আল্লাহপাক আমাকে তাদের ওসিলায় পরিশুদ্ধতা দান করেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর যবানীতে প্রায় সময় বর্ণিত সে ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে যখন তিনি বার্মার এক মসজিদে ইমাম নিযুক্ত ছিলেন এবং সেখানে তাঁদের জমিদারিও ছিল। এ ঘটনার পর তিনি অনেকটা পাগলের মত আচরণ করতে শুরু করলে তাঁর ছোট ভাই মাওলানা খ্রীস্টাব্দেহ আহমদ খুব কষ্ট করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

বাড়িতে আসার পর তিনি সম্পূর্ণ সংসার ত্যাগী হয়ে অহোরাত্রি পাহাড় জঙ্গলে কাটাতেন। খানাপিনার কোন খেয়ালই ছিল না। মাঝে মধ্যে বড় বোন খাইরুন্নিছার কাছে আসলে তিনি যথাসাধ্য আদর যত্ন করে খাওয়াতে চেষ্টা করতেন। সেখানে অনেক সময় একাধারে দু'তিন দিন শুধু কাটিয়ে দিতেন। খানাপিনা ছিল শুধু খালি লাল চা ও সিগারেট। তাও আবার একাধারে কয়েক কাপ।

✪ একবার আজমগড়ী (রহ.) এর অন্যতম খলিফা বার্মার হযরত শাহ মাওলানা আবদুস সালাম আরাকানী (রহ.) আমার নানার বাড়িতে তশরিফ আনলে আমার নানী, মামা শাহ মাওলানা হাবিব আহমদকে ডেকে নির্দেশ দিলেন- তোমার মামা

হাফেজ কোথায় আছে তালাশ করে আরাকানী হুযুরের কাছে নিয়ে আস এবং আমার পক্ষ থেকে হুযুরকে বল তিনি যেন তাঁকে একটু ঝাড়ফুঁক দিয়ে দোয়া করে দেন। নির্দেশমত শাহ সাহেবকে আরাকানী সাহেব হুযুরের সামনে উপস্থিত করতেই তিনি ছোট্ট শিশুর মত তাঁর সামনে বসে পড়লেন। আরাকানী সাহেব হুযুর একটুখানি চক্ষু মুদিত করলেন, পরক্ষণেই চোখ খুলে বললেন, তোমরা হাফেজদের কেউ পাগল বলবে না, তিনি তো একজন মস্তবড় আল্লাহর ওলি এবং নবীর প্রেমিক একজন মজযুব দরবেশ। যেদিন তাঁর জযব মগলুব হবে তিনি আসনে বসবেন এবং সারা পৃথিবীতে তাঁর বওটা উড়বে। পঞ্চাশ দশকের আরাকানী সাহেবের দেয়া সে ভবিষ্যৎবাণী ষাটের দশকে এসে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল।

✪ তিনি পবিত্র হজ্ব পালন করে আসলেন। চতুর্দিক থেকে দলে দলে চাতক পাখির ন্যায় তৃষ্ণার্ত, হাজতমন্দ লোকদের আনাগোনা শুরু হল। দেখতে দেখতে বর্তমান শাহ মঞ্জিল গড়ে উঠল। তিনি সাজ্জাদানশীন হলেন। সত্তরের দশকে এসে তাঁর ইশকে রাসূলের চূড়ান্ত বহিঃ প্রকাশ মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর গোড়াপত্তনের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে তাঁর বওটা উড়তে লাগল। আল্লাহর এক মহান ওলির ভাষায়-

قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید

খোদপ্রেমিকরা আল্লাহ প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি বলে কথা বলেন।

পবিত্র হাদিসের ভাষায়- اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

✪ মু'মিনের দিব্যদৃষ্টি সম্পর্কে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর। কারণ মু'মিন খোদাপ্রদত্ত নূরের সাহায্যে তাকান।

* আমার মরহুমা আম্মাজান বর্ণনা করেছিলেন ষাটের দশকের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা। আমরা ভাইবোন সকলেই ছোট। একরাত্রে আম্মাজান খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আব্বাও বাড়িতে নেই। আমার মনে হল এক্ষুণি জীবনলীলা সাঙ্গ হবে। এই মুহূর্তে কর্ণকুহরে বেজে উঠল একটি আওয়াজ, "জয়নব, জয়নব" দরজা খোল।

কেমন করে আম্মা দরজা খুলে দিলেন নিজেও বুঝে উঠতে পারলেন না। হঠাৎ স্বপ্নের মত দেখতে পেলেন শাহ সাহেব এই বলে একছড়া কাল জাম তার দিকে ছুঁড়ে মারছেন, ধর এগুলো খা ভাল হয়ে যাবি। তোর জন্য তিরওলা থেকে ঔষধ নিয়ে এসেছি। দু'একটি মুখে দিতেই মৃতসঞ্জিবনী সুরার মত ক্রিয়া আরম্ভ হল। নিমিষেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করলেন এবং তাড়াতাড়ি তাঁর জন্য প্রিয় লাল

Ghumati.com Pioneer in village based website

চা প্রস্তুত করে হাজির করলেন। চা পান করে তিনি সে গভীর রাত্রিতে বের হয়ে গেলেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) উপকারীর উপকার স্বীকার ও তার মূল্যায়ন ও স্মরণে নবী করিম (স.) এর বাস্তব আদর্শ ছিলেন। নবী করিম (স.) সম্পর্কে বুখারী শরিফে উদ্ধৃত একটি ঘটনা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত জুবাইর বিন মুতআম (তিনি তখনো ইসলামে দীক্ষিত হননি) আলোচনার জন্য মক্কা (মুকাররমা) থেকে মদিনায় (মুনাওয়ারা) আসলেন।
নবীজী এক পর্যায়ে তাকে বললেন- আজ তোমার পিতা মুতআম বিন আদী যদি জীবতি থাকতেন এবং এসব বন্দীদের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন আমি তাঁর সম্মানার্থে সব বন্দী মুক্ত করে দিতাম।
উল্লেখ্য যে, হযরত (স.) এর উপর মুতআমের কিছু ইহসান ছিল। শেআবে আবিতালিবে তিন বছর যাবত নবীজী ও তাঁর গোত্র অবরুদ্ধ থাকাবস্থায় একদিন মুতআম কাবাগৃহে সংরক্ষিত এ ব্যাপারে মক্কার (মুকাররমা) কাফির গোত্রদের সম্মিলিত চুক্তিনামা নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলে অবরোধ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কারো মতে, তায়েফবাসীরা পাথর মেরে নবীজীকে লহু লহান করলে মুতআ'ম তাঁকে বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় ও সান্ত্বনা প্রদান করেন। তাই মুতআ'মের ঐ উপকারের কথা স্মরণ করে তিনি তদীয় পুত্রকে একথা বলেছিলেন। তার প্রতি নবীজীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছিলেন। একজন প্রকৃত আশেকে রসূল হিসাবে তাঁর জীবনে সে রকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমি এখানে এরকম দুইটি উদাহরণ পেশ করছি:

✪ তিনি যখন প্রথম প্রথম মজযুব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এক রাত্রে চুনতী মুন্সেফবাজারের এক দোকানী থেকে গভীর রাতে বিড়ি চেয়ে না পেয়ে রাগ দেখান। এই অপরাধে দোকানদার তাঁকে বেদম প্রহার করেন। পরদিন তাঁর শরীরের আঘাত দেখতে পেয়ে চুনতী হাজির রাস্তার পার্শ্বে এক হোমিও ডাক্তার তাঁকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবাযত্ন ও চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলেন।
জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি সে কথা ভুলেননি। অনেক বড় বড় লোক কোন রোগের জন্য দোয়া চাইলে তিনি বলতেন, সুলতান ডাক্তারের কাছে যাও। এমনকি ঐ ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে মাঝে মধ্যে গিয়ে দু'এক দিন অবস্থান করতেন। আর্থিক ও আত্মিক সব দিক দিয়ে ঐ ডাক্তার সাহেব প্রভূত উন্নতি করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি সুরম্য অট্টালিকার মালিক বনে যান।

✪ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে শাহ সাহেব নানার একটি পুকুরের প্রয়োজন হলে তাঁর বাড়ির উত্তর পার্শ্বে আম্মাজানের জায়গায় তিনি বর্তমান পুকুরটি খনন করেন। আম্মাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে জায়গায় মূল্য বাবদ পাঁচশত টাকা দিলেন। কয়েকবছর পর আম্মাজান ঐ টাকা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, মামা আমার অভাব না থাকলে কখনো টাকা নিতাম না। এখন আল্লাহর রহমত ও আপনার দোয়ায় আমি সচ্ছল। তাই ঐ টাকা আপনাকে দিতে এসেছি। তিনি কিছুতেই টাকা গ্রহণ না করলে আম্মাজান তা শাহ সাহেব নানীর হাতে দিয়ে চলে আসেন।

✪ ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ জরীপে দেখা গেল নানাকে দেয়া রেজিস্ট্রি দলিলমূলে ঐ জায়গা পুকুরের মাঝে এসে শেষ হয়ে গেছে। বড় ভাই একথা আম্মাকে এসে জানালে আম্মা বললেন- তুমি এক্ষুণি গিয়ে সম্পূর্ণ পুকুর মামুর নামে জরিপভুক্ত করে দাও।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, শাহ সাহেব নানা ইহা আজীবন স্মরণ রেখেছিলেন। এমনকি যে কোন সময় আম্মা তাঁকে দাওয়াত দিতে গেলে তিনি বলতেন, ওবা আমি তো তোমার ভাত খাই।" শাহ সাহেব নানী এবং মামা শাহ জমাল আহমদ সাহেবের মরহুমা স্ত্রীও সীরতুন্নবী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তবরুক ইত্যাদি পাঠিয়ে এ সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন।

✪ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। আমার যমজ ভাই ফারুক মদিনা মুনাওয়ারা ইউনিভার্সিটিতে সরকারি বৃত্তি নিয়ে চলে যাবার সময় বাড়িতে নানাসহ অনেক মেহমান তশরিফ আনলেন। আম্মাজান নানাকে আরজ করলেন, মামু আমার ছেলেদের জন্য দোয়া করুন। শাহ সাহেব নানা বলে উঠলেন- ওবা এক ক্ষেতে তোলে; এক পুতে তোলে। সত্যিই তাঁর সেই দোয়ার বদৌলতে আমরা ছয়ভাই তিন বোন সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত সর্বমহলে সমাদৃত।

✪ নবী করীম (স.) এর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ও অগাধ ভালবাসার জ্বলন্ত প্রমাণ হল তাঁর মজযুবিয়্যতের সূচনায় সব সময় মুখ দিয়ে ধ্বনিত কোন এক প্রখ্যাত আশেকে রাসূল উর্দু কবির এই কবিতাচরণ:

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے-زندگی میں یہی کام کر جائینگے

আমি নবীজীর রওজাপাকের চৌকাঠে জীবন উৎসর্গ করব। জিন্দেগীতে শুধুমাত্র এই কাজটিই করে যাব। অনুরূপভাবে মজযুবিয়্যত থেকে সুলুকে উত্তরণের পর তাঁর প্রবর্তিত পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর প্রতিষ্ঠা। সাহাবাদের প্রতিও তিনি খুবই সতর্ক সযত্ন ভালবাসা পোষণ করতেন। সে বিষয়ে একটি ঘটনা তুলে ধরতে প্রয়াস পাচ্ছি।

Chunati.com Pioneer village based website

✪ মাহফিলে সীরতুন্নবী সন্নিকটে। মাদরাসা ছুটির পর আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি, শাহ মঞ্জিলের পূর্বদিকে কাচারীর মত একটি বেড়ার ঘর ছিল সেখানে শাহ সাহেব নানা ও বড় মাওলানা (হযরত মাওলানা আমীনুল্লাহ রহ.) কে দেখে আমি সালাম দিয়ে ঢুকে পড়লাম। মাহফিল প্রসঙ্গে কথা উঠল, এবার মাহফিলে ঢাকা আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা (বর্তমান জাতীয় মসজিদের খতিব) ওবাইদুল হকসাহেব আসছেন। তখন আমি বললাম, নানা আজ ফাযিল ক্লাসে নুরুল আনোয়ার পড়াতে গিয়ে মাওলানা ওবাইদুল হক সাহেব লিখিত উর্দু শরাহ কমরুল আকমারে দেখতে পেলাম তিনি আরবি ইবারত- مانصغ بقول اعرابى بوال على عقبيه
এর অর্থ করেছেন-

ہم ایسے شخص کی بات پر کان نہ دہرینگے جواپنے ایڑیوں کے بل موتتا ہے

অর্থাৎ আমি এমন ব্যক্তির হাদিস গ্রহণ করব না যে নিজের গোড়ালী শুদ্ধ মুতে (পেশাব করে) অর্থাৎ নিরেট মুর্খের খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য নয়। আমার কথা শুনামাত্রই শাহ সাহেব নানা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন- এর মর্ম হচ্ছে এই একজন সাহাবার শানে মুততাহে শব্দের ব্যবহার শোভনীয় নয়।

✪ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে আমি তখন গারাংগিয়া আলীয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসাবে কর্মরত। একদিন রিকশাযোগে আমিরাবাদ থেকে মাদরাসায় যাচ্ছিলাম। রিকশা বিদায় করার সময় রিকশাওয়ালা আমার বাড়ি চুনতী এবং শাহ সাহেব এর আত্মীয় বলে জানতে পারলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে বলল, একটু দাঁড়ান। শাহ সাহেব সম্পর্কে আপনাকে আজ আমার দীর্ঘদিনের চাপা এক গোপন ও বিস্ময়কর ঘটনা বলি।

সে বলতে লাগল: একদিন রিকশা নিয়ে চুনতী থেকে ফেরার প্রাক্কালে হাজির রাস্তার মাথার এক চায়ের দোকান থেকে শাহ সাহেব হুযুর বের হলেন এবং সরাসরি আমার রিক্সায় উঠে ইশারায় পশ্চিম দিকে চলতে নির্দেশ দিলেন। আজিজনগরের একটু আগে গিয়ে সূর্য ডুবোডুবো অবস্থায় আমাকে দাঁড়াতে বলে তিনি পশ্চিমদিকের গহীন জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।

আনুমানিক রাত ১০টার দিকে তিনি বের হয়ে রিকশায় চড়ে উত্তর দিকে চালাতে বললেন। আসতে আসতে খাঁন দীঘির মসজিদ বরাবর আসলে একটি বটগাছের নিচে রিক্সা থেকে নেমে পড়ে কি যেন বলতে বলতে আবার পশ্চিম দিকে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল কিছুক্ষণ পর ভয়ে আমি বটগাছের উপর উঠতেই পশ্চিম দিকে দিনের মত ঝিলমিলি আলোকময় বিশাল এক প্রান্তরে বিরাট

একটি চেয়ারে বসে হুযুর ওয়াজ করছেন দেখতে পেলাম। সামনে বাঘ, ভল্লুক, নানা ধরণের জীবজন্তু, পশুপক্ষী, জ্বীন-পরী, কীট-পতঙ্গ, আমার জানা অজানা সব ধরনের প্রাণী অধীর আগ্রহভরে খুবই আদরের সাথে তাঁর সে ওয়াজ শুনছে। প্রথমে একটু ভয় অনুভব করলেও মুহূর্তের মধ্যে তা কেটে গেল।

ফজরের আযানের সাথে সাথে মাহফিল শেষ। সে আলোও মিলিয়ে গেল। আমি গাছ থেকে নামতে নামতে শাহ সাহেব হুযুর হাজির। তিনি বললেন, "তুই যা দেখেছিস খবরদার কাউকে বলবিনা।" আমাকে জেব (পকেট) থেকে প্রচুর টাকা দিয়ে তিনি মসজিদের দিকে চলে গেলেন।

এই ঘটনা আমি আজ আপনাকে বললাম। এখনো পর্যন্ত অন্য কাউকে বলিনি। দেখুন আমার লোমগুলো এখনো শিউরে উঠছে। আমি বললাম, ভাই তুমি তো বড়ই ভাগ্যবান। সত্যিই উনি আল্লাহর একজন উঁচুদরের ওলি ছিলেন। আর আল্লাহর ওলিগণ আল্লাহর কুদরতি শক্তিতে বলীয়ান মহীয়ান-

اولیاراہست قدرت ازالہ

যার তরে আল্লাহ রাজি সবকিছু তার পদতলে- من له المولى فله الكل

যার জন্য রব তার জন্য সব।

চুনতী মাদরাসা ও হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

✪ চুনতী হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসার প্রতি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভালবাসা ও সম্পর্ক ছিল অত্যাধিক প্রবল। তিনি বিভিন্ন সময় বলতেন, এদেশের মানুষের আখেরাতের নাজাতের জন্য এ মাদরাসায় আল্লাহর রাসূলের হাদিসের দরসের ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। মাদরাসার অফিসে বসে পশ্চিম দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে বলতেন, এই থেকে মদিনা শরিফ পর্যন্ত কোন পর্দা না থাকে মত ব্যবস্থা নিতে হবে। অবশেষে চুনতী মাদরাসাকে কামিল স্তরে উন্নীত করে রাসূলে পাক (স.) এর হাদিসের দরসের ব্যবস্থা এবং এর পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে তিনি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে গেছেন।

✪ কালক্রমে উপমহাদেশের সেরা সেরা মুহাদ্দিসগণের দরসদানের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে এই মাদরাসার খ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে এই মাদরাসা জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণপদক লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাই নিজামী ও ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক (মুহাদ্দিস) হিসাবে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। এই মাদরাসার দ্বিতীয় মুহাদ্দিস মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আমিন সাহেবের রচিত

বুখারী শরিফের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় কিতাবুল মাগাজী ও কিতাবুত তাফসীর" অংশের উর্দু ভাষায় খুব উচুমানের শরাহ ইনআমুল বারি শরহে বুখারী ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ হাদিস চর্চা কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ হতে প্রকাশিত হয়, যা বাংলাদেশের মুহাদ্দেসিনে কেরামের জন্য একটি দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছে।

উল্লেখ্য যে, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুহাদ্দিস আল্লামা আমিন সাহেব আমাকে নিজের পুত্রসম স্নেহ করতেন। তিনি আমাকে একবার শাহ সাহেব (রহ.) সম্পর্কে বলেন- মাদরাসা কমিটির সাথে কোন এক কারণে তাঁর মনে খুবই দুঃখ আসে। তিনি রাত্রে সিদ্ধান্ত নেন আমি আগামীকাল এ মাদরাসা থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে একদম চলে যাব। যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তিনি নিদ্রা গেলেন। সকালে মসজিদ থেকে এসে রুমে ঢুকতে না ঢুকতেই দেখেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তার কামরায় এসে হাজির। আর আসা মাত্রই হুযুরকে বললেন, আমিন তুমি চলে যেতে পারবে না। তোমাকে থাকতে হবে। এই বলে শাহ সাহেব নানা প্রস্থান করলেন। অগত্যা হুযুর সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলেন।

✪ ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর থেকে আমি চুনতী মাদরাসায় একজন নগণ্য খাদেম হিসাবে যোগদান করি। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে দেখতাম প্রায়শঃ মাদরাসার অফিসে তশরিফ আনতেন এবং দু'পকেট থেকে বের করে করে মাদরাসায় টাকা দিতেন।

মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ শাহে আলম

মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা

মহান আল্লাহ পাকের হামদ ও হায়াতুন্নবী (স.) এর দরবারে সশ্রদ্ধ অসংখ্য দরুদ প্রেরণের পর বেলায়তের দেদীপ্যমান উল্কাপিণ্ড, অকৃত্রিম আশেকে রাসূল (স.) ওলি সম্রাট হযরত শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.) সম্পর্কে কিছু বলার মত আমার যোগ্যতা না থাকলেও দুটো কথা বলছি-

* তাঁর জীবদ্দশায় আমি চুনতী হেফজখানার ছাত্র এবং নিচের ক্লাশের ছাত্র। তাঁকে বুঝার মত জ্ঞান, বিবেক আমাদের তখনও হয়নি যেখানে বড় বড় আল্লামা, মাওলানা, মুহাদ্দিসগণ তাঁকে বুঝতে অক্ষম ছিলেন। তবে, একদা তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য জুটেছিল। আমার চাচা ১১ টাকা তাঁকে দেয়ার জন্য দিলে আমি ঐ টাকা নিয়ে নানাজান কেবলার দরবারে হাজির হলাম বাড়ির দু'তলার মধ্যবর্তী করিডোরে। চলছিল বাদে আসর নাস্তা করার আয়োজন। নানাজানকে সালাম করলাম এবং টাকাগুলো দেয়ার সুযোগ পেলাম। নানাজান তৎক্ষণাৎ চা দিতে বললেন- চা-খা। বয় (বস) চা-র জন্য কাঁচের ২টি চা-দানী ছিল। একটিতে

কাল তিক্ত চা অপরটিতে দুধের চা ছিল। সামনে ছিল কমলা, আপেল এবং খুব উন্নতমানের পাউন্ড বিস্কুট। সবখান থেকে আমাকে দিলেন সব খেলাম। তারপর বললেন পড়-সুরা সফ পড়। আমি পড়া শুরু করলে কিছুদূর গিয়ে ইস্‌মুহু আহমদ পর্যন্ত যাওয়ার পর আটকে গেলে তিনি কতগুলো শের পড়ে আহ! আহ! বললেন- বুঝার মত জ্ঞান আমার ছিল না। বুঝতে অপারগ ছিলাম।

তারপর তিনি আমাকে বলে দিলেন, আমি আবার পড়তে পড়তে সূরা শেষ করলাম। ভয়ে আমার শরীরটা কাঁপছিল, আমি মনে করি তাঁরই প্রদত্ত বরকতি খাবারের ওসিলায় আমার স্মরণশক্তি সেদিন থেকে প্রখর হয়েছিল। তাঁরই দোয়ার বরকতে চুনতী মাদরাসার মুহাদ্দিস হওয়ার ভাগ্য কপালে জুটল। তাঁরই বরকতে বাইতুল্লাহর খতিব হতে পারলাম। আমার মনে হয় মানুষের সামনে কথা বলার সাহস তিনিই যোগান দিলেন।

হযরত শাহ্ সাহেব কেবলার রূহানি নির্দেশ :

আমি কামিল পাশ করার পর মসজিদে বাইতুল্লাহয় মুহাদ্দিসে আউয়াল সাহেব হুযুরের তফসির কোর্সে অধ্যায়নরত ছিলাম। তখন ১৯ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল শুরু হল। শাহ সাহেব কেবলার (রহ.) ঘরের উত্তরে, মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে, সীরত বিল্ডিং এর পূর্ব দক্ষিণে, উঁচু জায়গাটা একরাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, ওখানে আমি দাঁড়ালাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) পশ্চিম দিক থেকে এসে আমাকে বললেন, তোমার হুজুর হাফেজ হারুন এর সাথে দেখা কর। তখন আমি জাগ্রত হলাম রাত ৩ টার সময়। সকালে বড় হুযুর কেবলা (আলহাজ্ব হাফেজ হারুন সাহেব) এর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন তোমাকে এ মাদরাসার শিক্ষকতার জন্য রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। পরে ঘটনা তাই হল।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে আমার খুব ভয় লাগে। যে যতই বলুক না কেন তিনি তাদের কথিত মর্যাদার চাইতে অনেক উপরে। সেখানে কেউ পৌছতে পারবে না। তাঁর প্রকৃত মকাম আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ বুঝতে পারবে না।

তাঁর অসংখ্য করামত মানুষের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট সেগুলো বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না তবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্মরণ করছি। (১) ১৯ দিনব্যাপী সীরতুন্নবী (স.) বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ও নবীর সীরত শিখার জন্য ঐতিহাসিক মিলন কেন্দ্র। (২) চুনতী হাকিমিয়া মাদরাসাকে নবীর হাদীসের দরগাহ বানিয়ে শ্রেষ্ঠ কামিল মাদরাসার মর্যাদা দান করা। (৩) মসজিদে বাইতুল্লাহকে বিশ্ব মুসলিমের খোদাপ্রেমের মহান কেন্দ্র বানালেন। (৪) তাঁর ইন্তেকালের পরও দীর্ঘ

২৬ বছর পর্যন্ত তাঁর মোবারক স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র কাজগুলো অব্যাহত থাকা। তাঁর স্মৃতিগুলো আল্লাহ যেন কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন। তার প্রিয় ওলির উসিলায় যেন আমাদেরকে কবুল করেন। আমিন।

✪ আমি ও মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ক্বারী আনিসুর রহমান আনোয়ারা উপজেলার অন্তর্গত হাইলধর মাদরাসায় বেড়াতে গেলে ওখানকার মুহাদ্দিস বাঁশখালী বাণীগ্রামের অধিবাসী আল-জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা মুনির সাহেবের সাথে সাক্ষাত হয়। চুনতী থেকে গিয়েছি জেনে তিনি আমাদেরকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর একটা করামত বর্ণনা করলেন।

মাওলানা মুনির সাহেব পটিয়ায় খতিবে আযম হযরত মরহুম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রহ.) এর ছাত্র থাকা অবস্থার একটা ঘটনা আমাদেরকে বললেন, একদা চুনতীর সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল থেকে ওয়াজ শেষে হুজুর ক্লাশে তশরিফ নিলে ছাত্ররা অভিযোগ করলেন- হুযুর আপনি বেদআতীদের কাছে ওয়াজ করতে যান কেন? মরহুম খতিবে আজম বললেন, আমি আগে চুনতীর শাহ সাহেবকে খাটোচোখে দেখতাম, তুচ্ছ জ্ঞান করতাম। কিন্তু একদিন আমি সীরতের মাঠে ওয়াজ আরম্ভ করলাম। মানুষ মাঠভর্তি হয়ে মনোযোগ সহকারে ওয়াজ শ্রবণ করছে। আকাশও পরিষ্কার ছিল। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এসে বললেন ওবা খতিবে আজম وتركوك قائما ওয়া খতিবে আজম- وتركوك قائما মনে মনে বললাম ওনিতো বড় পাগল। ওয়াজে ব্যাঘাত ঘটায় একটু বিরক্তবোধও করলাম। একথা বলে শাহ সাহেব বাড়ির দিকে চলে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন প্রবল ঝড় তুফান ও বৃষ্টি আরম্ভ হল যাতে সমস্ত ব্যবস্থাপনা ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। আমাকে ফেলে সকলে চারিদিকে দ্রুত চলে গেল। এরপর থেকে আমি হযরত শাহ সাহবে (রহ.) এর ভক্ত হয়ে গেলাম।

ড. মাওলানা হেলাল উদ্দিন মুহাম্মদ নোমান

প্রভাষক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

✪ হযরত রাসূলে করিম (স.) এর মোবারক জীবনের ওপর খন্ড খন্ড বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সর্বপ্রথম হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মাহফিলে সীরতুন্নবীর মাধ্যমে আরম্ভ করেন। ইতোপূর্বে মিলাদ মাহফিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতো এবং বাড়িতে হতো। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রথম এটাকে সর্বসাধারণের জন্য ওপেন করেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সামনে কেউ না'ত রাসূল (স.) পড়লে অকাতরে টাকা পয়সা তাকে দিয়ে দিতেন। সব সময় পকেটে টাকা থাকত। হাত দিলে টাকা পেতেন। তিনি কোন সময় গণনা করে টাকা দেননি। মাদরাসা, মসজিদ ও ফোরকানিয়ার সভায় যোগ দিতেন এবং অকাতরে দান করতেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সব সময় আত্মীয়তার হক আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। এমনকি ফজরের সময়ও তিনি এটা পালন করতেন। তাঁর সহপাঠী ও আত্মীয় সুফি মিয়াজিপাড়ার মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ ইন্তেকাল করলে চারদিন অনবরত তাঁদের বাড়িতে ভাত ও তরকারি পাঠান।

✪ আগেকার সময়ে চট্টগ্রামের যে কোন মাহফিল স্থানীয় বক্তা ও ওয়ায়েজগণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতো। হযরত শাহ সাহেব (রহ.)-ই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বপ্রথম মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.)-এ চট্টগ্রামের গণ্ডী পেরিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বক্তাগণকে দাওয়াত দিয়ে এনে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা করেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দাঁত-মুখ সবসময় পরিষ্কার থাকত। তৈলের কারণে টুপি লাল হয়ে যেত। তিনি ফুলের টুপি ব্যবহার করতেন।

✪ চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণী সর্বপ্রথম ওনার উদ্যোগে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে খোলা হয়। পরে দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী আবার ওনার প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে চালু করা হয়।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) শিক্ষকগণকে বেশি সম্মান করতেন। মেরাজুন্নবী (স.) মাহফিলে মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (রহ.) তশরিফ আনলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিজের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে বসাতেন।

✪ সর্বদা তাঁর দরবারে অসংখ্য আলেম থাকতেন। তিনি আলেম-ওলামা পরিবেষ্টিত থাকতেন। মাওলানা আমিন উল্লাহ (রহ.) মাওলানা মোবারক আহমদ (রহ.) মাওলানা মুহাম্মদ আমিন (রহ.) চুনতী মাদরাসার শিক্ষক প্রমুখ প্রায় সময় তাঁর সাথে থাকতেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) অকুতোভয় ও নির্ভীক ছিলেন। আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। অন্যায়-এর বিরুদ্ধে আপোষহীন ছিলেন। একবার বড় হাতিয়া জবলে সীরত এলাকায় পুনরায় বলি খেলা দেয়ার কথা শুনে খুবই রাগান্বিত হন এবং মাদরাসার অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা শফিক আহমদসহ ছাত্র-শিক্ষকগণকে প্রতিহত করার জন্য পাঠান।

✪ তিনি চাইলে সম্পদের পাহাড় গড়তে পারতেন এবং স্বর্ণের গৃহ নির্মাণ করতে পারতেন। টাকার প্রতি ওনার কোন মোহ ছিলনা।

✪ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ওনাকে সম্মান করতেন। এমনকি মগরা পাহাড় থেকে পাহাড়ি গরু দিয়ে আসত।

✪ একাত্মতার সাথে সালাতসহ অন্যান্য ইবাদতসমূহ পালন করতেন। শরিয়ত বিরোধী কোন কাজ নিজেও করতেন না, কাউকে করতেও দিতেন না।

✪ অনেক সময় মেজাজ একদম ঠাণ্ডা ও খোশ মেজাজে থাকতেন। এ সময় অনেক রসালো আলাপ করতেন। তিনি যেখানে বসতেন সেখানেই মানুষ জমা হয়ে যেত।

✪ মসজিদে বায়তুল্লাহ প্রথমে ছনের ছাউনি ছিল। এ মসজিদে জুমা জায়েয হবে কিনা- আলেমগণের মধ্যে মতভেদ হয়। তখন মাওলানা আমিন উল্লাহ (রহ.) ও মাওলানা ফজলুল্লাহ (রহ.) প্রমুখ জগতবিখ্যাত আলেমগণের উপস্থিতিতে মাওলানা মুফতি ইব্রাহিম (রহ.) জায়েয হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হাতে আংটি পরতেন। ইন্ডিয়ান পাতলা কুরতা, গলাকাটা পাঞ্জাবি এবং হাতের ফুলতোলা পাতলা কাপড়ের লম্বা টুপি, সাদা লুঙ্গি ব্যবহার করতেন। লাল খোশবু তৈল ব্যবহার করতেন। লতিছাঠা চুল রাখতেন। গায়ের রং উজ্জ্বল সাদা ও উচ্চ আকৃতির ছিল।

মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুল হক নিজামী

অধ্যক্ষ, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদরাসা
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

চুনতী মাদরাসায় আমার অধ্যয়নের শুরু থেকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে শাহ সাহেব হিসাবে পেয়েছি।

✪ আমার পিতামহ মরহুম সৈয়দুল্লাহ-এর সাথে উনার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। সে সূত্রে উনি প্রায় সময় আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমরা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে দাদা বলে ডাকতাম এবং উনার কাছ থেকে দোয়া চাইতাম। বিশেষ করে পরীক্ষার সময় আসলে ছুটে যেতাম উনার দরবারে দোয়ার জন্য। আমরা জিজ্ঞেস করতাম, দাদা আমরা কি পরীক্ষায় পাশ করব? উনি তাৎক্ষণিকভাবে বলে দিতেন, "গরিবি গরিবি যা যা" অর্থাৎ পাশ করবি। ঠিকই আমরা পরীক্ষায় পাশ করে ফেলতাম।

✪ তিনি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবনের ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে পঠিত আরবি, ফার্সি উর্দু কবিতাসমূহ এমনকি তাফসির হাদিসসহ বিভিন্ন বিষয়ে হুবহু বলতে পারতেন। দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য ওলামায়ে কেরামগণ যখনই তাঁর দরবারে আসতেন কুরআন-হাদীসের আলোচনা শুনে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁর পানে চেয়ে থাকতেন।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর করামতপূর্ণ জীবনের কয়েকটি ঘটনা (বিভিন্নজনের কাছ থেকে শ্রুত) নিম্নে বর্ণিত হল:

✪ চুনতীর মরহুম পীর সাহেব কেবলা আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) এর সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ঘটনা যা তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, একবার আমি ভাগ্যক্রমে নবী করিম (স.) কে স্বপ্নে দেখেছি। আমার এ স্বপ্ন আমি কাউকে প্রকাশ করিনি। যে রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখলাম তার পরের দিন সকালে আনুমানিক ৯টার সময় আমার ব্যক্তিগত কাজে চুনতী মুন্সেফ বাজারে গিয়েছিলাম। সেখানে মামুন সওদাগরের চায়ের দোকানের সামনে আমার মামা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বসা ছিলেন। তিনি তাঁর অভ্যাসগত প্রায় সময় ঐ দোকানে বসতেন সেখানে তাঁর সমবয়সী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে দেখে ভয়ে অন্যদিকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। হঠাৎ উনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন- 'বাইনা ইক্কা আয়, ওডা বয়, এই মামুন আর বাইনারে চেয়ার দে। আমি ভয়ে চেয়ারে বসতে চাচ্ছিলাম না। তিনি আমাকে জোর করে বসালেন এবং আকস্মিকভাবে বললেন, "অ ভাইনা কালিয়া কেন লাগগিল? ওডা, আঁর রাসূল বেশি মজা ন ওডা, অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন- ভাগিনা কাল রাত্রে তোমার কেমন লেগেছিল, আমার রাসূল (স.) কে দেখা খুব ভাগ্যের এবং মজার ব্যাপার না? আমি উনার কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কিভাবে ওনি আমার স্বপ্নের ব্যাপার জানলেন, আমিতো কাউকে বলিনি।

✪ মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) এর আর একদিনের ঘটনা এভাবেই আমাকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক সময় আমাদের বাড়িতে হযরত আবদুস সালাম আরাকানী (রহ.) তাঁর নিয়মিত সফরে এসেছিলেন। এলাকার অনেকেই উনার কাছে দোয়ার জন্য যাচ্ছিল। এ সুযোগে আমি আমার মামা শাহ সাহেব কেবলাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উনার কাছে এসে বললাম, মামা চলেন আমাদের বাড়িতে আরাকানী সাহেব হুযুর এসেছেন, চলেন একটু দোয়া নিয়ে আসি। তখন তিনি বললেন, "চলছোনা অবাইনা"। আমরা হুযুরের কাছে গেলাম, হুযুরের সামনে আমার মামা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। আমি হুযুরকে

Ghunati.com
online village based website

বললাম, হুযুর মামাকে একটু দোয়া করুন। উনি অসুস্থ। তখন আরাকানী সাহেব হুযুর শাহ সাহেব (রহ.) এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণেই শাহ সাহেব মামা ওখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন। উনি চলে যাওয়ার পর আরাকানী সাহেব হুযুর বললেন, আমি উনাকে কি দোয়া করব উনিত আল্লাহর একজন বড় ওলি। ওনার মরতবা অনেক উপরে। তোমরা উনাকে ভালভাবে দেখাশুনা করিও। এর কিছুক্ষণ পর আমি শাহ সাহেব হুযুরকে তালাশ করার জন্য ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পরে উনাকে আমি মাদরাসার ওখানে পেলাম। কাছে গিয়ে বললাম, মামা আপনি চলে এসেছেন কেন? উনি আমাকে বললেন, অবাইনা, তোর পিরে কি কন্দে? ই-ন নয় ওডা" অর্থাৎ ভাগিনা তোমার পীর কি বলছে উহা ঠিক নয়। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে, মামা ত ওখানে ছিলেন না, তিনি কিভাবে আরাকানী সাহেব হুযুরের কথাগুলো শুনলেন।

✪ আর এক সময়ের ঘটনা যা-মাওলানা হাবিব আহমদ (রহ.) আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন- তিনি বলেন, আমি যখন চুনতী মাদরাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্বে ছিলাম হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রায় সময় মাদরাসায় যেতেন এবং তাঁর নির্ধারিত চেয়ারে বসতেন।

একদিন তিনি তাঁর নিয়ম মাফিক মাদরাসায় আসলেন। আমি তাঁকে বসার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিলাম। বললাম, মামা একটু চা খাবেন, তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি চায়ের জন্য পাঠালাম। পরে দেখলাম উনার গায়ের জামাটা ময়লা হয়েছে। তখন আমি বললাম, মামা কাপড় ময়লা হয়েছে আমাকে দেন আমি উহা ধুয়ে দিই। তিনি বললেন, ধর যা ধুই দে গই। আমি যখন উহা ধোয়ার জন্য নিয়ে গেলাম তখন দেখলাম পকেটে একশত টাকার একটা নোট আছে। আমি উহা নিলাম এবং মনে মনে বললাম ইহা মামী জমালের মায়ের হাতে দেব। আমি টাকাটা আমার পকেটে রেখে কাপড়টা ধুয়ে মাদরাসার সামনে শুকাতে দিলাম। এরপর উনার সামনে আসতেই উনি হঠাৎ করে বলে উঠলেন- বাইনা আর টেঁয়া দে, তুই খেয়াল গইরগছদে ইন নইব" অর্থাৎ হে ভাগিনা আমার টাকা দিয়ে দেয়, তুই যা মনে মনে করতে চেয়েছিস তা হবে না। এই বলে আমার হাত থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। আমার আশ্চর্য্যের সীমা রইল না। পীর সাহেব কেবলা (হযরত মাওলানা হাবিব আহমদ) আমাদেরকে প্রায় বলতেন, উনি একজন জবরদস্ত ওলি ও আশেকে রাসূল।

✪ পুটিবিলা নিবাসী বর্তমানে খালেকিয়া মাদরাসার আরবি প্রভাষক জনাব মাওলানা আইয়ুব সাহেব যিনি শাহ সাহেব কেবলার ভাতিজা জসিমুদ্দিনের মামা

chhunati.com Pioneer in village based website

ওনার বর্ণিত একটা ঘটনা মাওলানা আইয়ুব বলেন- পাকিস্তান আমলে আমি আনসারের কমান্ডার ছিলাম।
একদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রামে আমাকে ঢাকা যেতে হচ্ছে। প্রোগ্রামের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে আগেরদিন চুনতী শাহ সাহেবের বাড়িতে দোয়ার জন্য আসলাম। শাহ মঞ্জিলে গিয়ে উনার সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আমার প্রোগ্রামের কথা জানালাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে বললেন, পরে যাইচ।

✪ আমি অনুমতি না পেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত রয়ে গেলাম। ঐ দিকে রাত ১০টার ট্রেনে আমাকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যেতে হবে। উপায় না দেখে মাগরিবের সময় আবার বললাম মামা আমাকে রাত্রের মধ্যে ঢাকা পৌছতে হবে। কাল সকাল ৮ টায় আমার প্রোগ্রাম। তখন উনি বললেন, যা-ন পরিব ঘরত যাগাই উপায়ান্তর না দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ীর দিকে চললাম। বাড়িতে এসে পোস্ট মাস্টারের কাছে চিঠি পেলাম প্রোগ্রাম ক্যানসেল হয়েছে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, ঢাকায় প্রোগ্রাম ক্যানসেল হল অথচ চুনতীতে বসে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তা জানতে পারলেন কিভাবে?

✪ এভাবে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অসংখ্য বাস্তব করামত যা আমরা উনার ভক্তদের কাছ থেকে শুনি সেগুলো বলে শেষ করা যাবে না। অবশ্য এ সমস্ত ঘটনাবলী যদি উনার ভক্তবৃন্দ রচনাবলীর মাধ্যমে একত্রিত করেন তাহলে তা এক বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হতো।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ছিলেন এক জ্যোতির্ময় নুরের চেহারার অধিকারী। তাঁর চেহারা দর্শনেই সবাই আকৃষ্ট না হয়ে পারত না। তাঁর রং হলুদের উপর লালাভ ছিল। লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় অধিক রস মিশ্রিত ছিল এবং প্রতিটি কথা, বাক্য অর্থবহ ছিল।

✪ আমার জীবনের একদিনের ঘটনা। আমি যখন চুনতী মাদরাসার জমাতে শশুমের ছাত্র (বর্তমান নবম শ্রেণী) জুমার দিন আমি এয়ারগান নিয়ে মাদরাসার পিছনের জমি থেকে একটা সাদা বক শিকার করে চুনতী জামে মসজিদের পুকুরের পাশ দিয়ে আসছিলাম, তখন তিনি ঐ পুকুরে গোসল করতে গিয়ে পুকুরঘাটে ডুব দিয়েছিলেন। পুকুর পাড়ের ঘাটে তাঁর ভাতিজা জসিম উদ্দিন কাপড়-চোপড় নিয়ে দাড়ানো ছিল। তিনি পানিতে ডুব দিলেও তার শরীর পানির ভিতরে দেখা যাচ্ছিল। যেন পানির মধ্যে হতে সোনালী রং-এর আভা ফুটে উঠছিল। আমি সেই অপরূপ দৃশ্যটি অপলক চোখে চেয়ে থাকলাম। এরপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) পুকুর থেকে উঠে যখন আমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন তিনি বলে উঠলেন,

হেই ছৈয়দুল্লাহর নাতী আর জবিনত্যুন বোগা কেয়া মাইরগছ, ইক্কা আয়" অর্থাৎ হে ছৈয়দুল্লাহ- এর নাতী, আমার জমি থেকে কেন বক শিকার করেছিস। এদিকে আয়। আমি কোন উত্তর দিইনি। তিনি বললেন, বকের মাংস খুব মজা না? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি বকটা উনাকে দিয়ে দিতে চাইলাম, উনি বললেন, তোর দাদী বুড়িরে দই" অর্থাৎ তোমার দাদীকে গিয়ে দাও।

আমি বাড়িতে এসে আমার দাদীকে ঘটনা বললাম, দাদী মাকে ডেকে বললেন, বউমা তাড়াতাড়ি করে উহা ভালভাবে রান্না করে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জন্য পাঠিয়ে দাও। মা খুব দ্রুত বকটি রান্না করে আমার মাধ্যমে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর বাড়িতে পাঠালেন। আমি উহা নিয়ে যখন উপস্থিত হই তখনও তিনি পুকুর ঘাটের উপর বসা। আমি উনার সাথে দেখা করে বললাম, দাদা আমার দাদী ইহা পাঠিয়েছেন। তিনি খুব আগ্রহচিত্তে উহার থেকে কিছু খেলেন। বাকিগুলো আমাকে নিয়ে যেতে বললেন এভাবে, 'ই-ন বুড়ীকে খাইত কইছ, তুইয় খাইছ। কী সৌজন্যতা বোধ উনার মধ্যে ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন দুনিয়ার মানুষদের জন্য অত্যন্ত আপনজন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর মর্যাদার আল্লাহ ও রাসূলপ্রেমিক।

মাওলানা মুহাম্মদ রহমত উল্লাহ
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

✪ বাংলাদেশের অলি-আবদাল, গৌছ-কুতুবের মধ্যে মুজাদ্দেদে সীরাত অলিকুল শিরমণি আশেকে রাসূল (স.) হযরতুল আল্লামা শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব (রহ.) একজন অন্যতম আবদাল ছিলেন। চুনতীতে লেখাপড়ার সময় হতেই তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তিনি আমাকে নিজ ছেলের মতন ভালবাসতেন। অন্ততঃ ২০ বৎসর ধরে তাঁর জুতা বহন করেছিলাম।

✪ আমরা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম ভক্ত হযরত মাওলানা শফিক আহমদ সাহেব (সাবেক চেয়ারম্যান, আধুনগর ইউ.পি.) চট্টগ্রাম শহরের বিশিষ্ট শিল্পপতি সুলতান জুট মিলের মালিক জনাব ইউছুফ মিয়া সাহেব এবং আরও একজন ভক্তসহ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে হজ্বের নিয়তে পবিত্র মক্কা শরীফ যাওয়ার জন্য উড়োজাহাজে করে রাত ১টার সময় ঢাকা হতে রওয়ানা হলাম। জাহাজ ত্যাগকালেও জাহাজের অবস্থা ভাল ছিল না। জাহাজ কর্তৃপক্ষের আইন মোতাবেক দুবাই এয়ারপোর্টে নেমে পর সকালে জেদ্দা এয়ারপোর্টে পৌছার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুবাই থেকে রওনা হওয়ার পর অবস্থা এমন হল যে,

জাহাজ উপরে নিচে যাওয়া আসা আরম্ভ করছে। সে অবস্থায় জাহাজ কর্তৃপক্ষ জাহাজের ভিতর প্রচার করছে যে, আমরা জাহাজ রাখতে পারছি না। আপনারা সবাই কলেমা পড়ুন। এ কথা শুনার সাথে সাথে যাত্রীরা হতাশ হয়ে জাহাজে এদিকে ওদিক পড়ে গেল। এমতাবস্থায় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর একজন আবদাল নিয়ে জাহাজ কোনদিন এক্সিডেন্ট হবেনা। এ মসিবতের সময়ও আমরা তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখেছি যে, তাঁর চেহারার কোন প্রকার পরিবর্তন দেখিনি। জল্পনা-কল্পনার সাথে সাথে কোন প্রকারে জাহাজ জেদ্দার পথ ছেড়ে আবার দুবাই এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হয় এবং সহি সলামতে জাহাজ দুবাই এয়ারপোর্টে অবতরণ করে।

এয়ারপোর্টে প্রবেশকালে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর চেহারা একেবারে লাল হয়ে যায় এবং কারও সাথে কথা বলেননি। বলতে লাগলেন এ গাড়ি দিয়ে আর যাবনা। (তিনি জাহাজকে গাড়ি বলছেন) দুবাইয়ের শেঠ কবিরকে তালাশ করুন। ফোনের পর ফোন করার পর কবির শেঠ সাহেব এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, এই গাড়ি দিয়ে জেদ্দা যাব না, অন্যকোন প্রকার কার গাড়ি তালাশ করুন। কিছুক্ষণ পর শেঠ সাহেব স্থলপথে জেদ্দা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আসলেন। এমতাবস্থায়, আছরের সময় ঐ উড়োজাহাজ মেরামত করে জাহাজ চালক নিজেই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে অতি বিনয়ের সাথে বলতে লাগল, হুযুর এখন আমাদের জাহাজ ভাল হয়েছে এখন জেদ্দার পথে চলে যাব।

তিনি কোন প্রকারে রাজি হননি। চালক বারবার চেষ্টা করার পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) রাজি হয়ে গেলেন। আবার জেদ্দার পথে জাহাজ রওয়ানা হয়ে আল্লাহর মেহেরবানিতে হুজুরের ওসিলায় পরদিন রাত ১০ টার সময় সহিসালামতে জেদ্দা এয়ারপোর্টে জাহাজ পৌছে গেল। জেদ্দায় একরাত একদিন অবস্থান করার পর তিনি বললেন, একটি গাড়ি ঠিক করুন যেন আমরা মক্কা শরিফের পথ ছেড়ে রাসূল (স.) এর জেয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা শরিফ যাব। এশার নামাযের পর একটি ভাল গাড়ি দ্বারা জেদ্দা হতে মদিনা শরিফ রওয়ানা হলাম। ঠিক ফজরের নামাযের সময় সহিসালামতে মসজিদে নববীতে পৌছে গেলাম। ফজরের নামায আদায় করার পর জনাব ইউসুফ মিয়াকে বলল, সরকারি-বেসরকারি বাসা ব্যতীত একটা ভাল বাসা ঠিক করে নিন। তাঁর কথা মোতাবেক কাজ করা হয়েছে। কারণ তিনি কোন সরকারি বা কোন লোকের মুখাপেক্ষী নন। প্রথমে মুয়াল্লেম দ্বারা জেয়ারত সম্পন্ন করা হয়। মদিনা শরীফ থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর অনেক করামত দেখেছি যা বর্ণনা করা অসম্ভব।

অন্যান্য হাজীরা মাত্র ৮দিন থাকার পর আইন মোতাবেক মদিনা শরিফ হতে চলে যান। কিন্তু আমরা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে নিয়ে ১৬দিন অবস্থান করেছি। এখন হজ্বের সময় মাত্র ৫দিন বাকি। ১৭তম দিনের ফজরের নামায শেষ করে চা নাস্তা পান করার পর কোন কথাবার্তা ছাড়া তিনি বলতে লাগলেন, ইউসুফ মিয়া, একটা গাড়ি ঠিক করে নিন। জনাব ইউসুফ মিয়া গাড়ি নিয়ে আসলেন। সাথে সাথে মালামাল উঠায়ে প্রস্তুত হলাম। তখন আমরা মসজিদে নববীর উঠানে অবস্থান করছিলাম। এখন বিদায়ী-জেয়ারতের সময়। আমরা তাঁর ভক্তগণ একে অপরের সাথে কথা কাটাকাটি করছি। কে তাঁকে বিদায়ী জেয়ারতের কথা বলবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাঁকে বিদায়ী-জেয়ারতের কথা বলার সাহস পাননি। অবশেষে মাওলানা শফিক আহমদ সাহেবসহ সবাই আমাকে বলার জন্য অনুরাধ জানালেন। এখন আমি কি করতে পারি।

অন্তরের ভিতর ভয় রেখে খুবই আদবের সাথে বলতে আরম্ভ করলাম। আব্বাজান আমরাতো বিদায়ী-জেয়ারত করিনি। এ কথা শুনার সাথে সাথে তিনি একটি বাঘের গর্জনের মত শব্দ করলেন যে, তোমরা কি বলছ? রাসূল (স.) থেকে বিদায় আছে কি? তোমরা এখানে আর আসবে না? আরও অনেকবার আসতে হবে। চল এখন চলে যাই। এ কথা শুনার সাথে সাথে আমরা ভয় পেলাম। আর কিছু বলার সাহস পেলাম না। সবাই গাড়িতে উঠে গেলাম। গাড়িতে উঠে কাঁদতে কাঁদতে সবার বক্ষ ভিজে গেল। যতক্ষণ মদিনা শরিফের ধুলিকণা, গাছপালা দেখা যায় ততক্ষণ ধরে চক্ষুর পানিই পানি। এভাবে মদিনা শরিফ ত্যাগ করলাম।

মক্কা শরিফে পৌছার পর ৪ দিন অপেক্ষা করে হজ্বের জন্য তৈয়ার হয়ে মিনা আরাফাতের দিকে রওয়ানা হলাম। এখানেও বহু করামত দেখেছি যা বর্ণনা করা সম্ভবনয়। পবিত্র হজ্ব শেষ করার পর তিনি আমাদেরকে রেখে চলে আসলেন। আমরা সবাই পরবর্তীতে সহিসালামতে বাড়িতে চলে আসলাম।

✪ পরবর্তীতে আমার অনেকবার মদিনা শরিফ যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এমনকি ৪ বছর যাবৎ মদিনা শরিফ অবস্থান করেছি এবং ৫ ওয়াক্ত নামাযসহ দৈনিক ৫ বার সালাম ও জেয়ারত নসিব হতো।

একমাত্র হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ওসিলায় হয়েছে এটা আমার অন্তরের বিশ্বাস। কারণ হাদীসে কুদসির দ্বারা প্রমাণ আছে যে,আল্লাহর ওলিদের জবান আল্লাহর জবানে পরিণত হয়। তাদের কথা ফেরৎ হয়না। তাদের ভক্তগণের মধ্যে আরও অনেক লোক ছিল। আমার মত বারবার মদিনা শরিফে আসা-যাওয়া করার সুযোগ তাদের হয়নি। একমাত্র আমার বেলায় হয়েছে। এটাই তাঁর জ্বলন্ত করামত। তার চাইতে আর বেশি করামত কি হতে পারে?

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা : প্রতিবছর আধুনগর দক্ষিণ হরিণা মাজার পাড়া জামে মসজিদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমার আম্মাজানের বেশি অসুখের সময় মসজিদের সভার তারিখ পড়েছিল। কি করা যাবে, সভাতো হতে হবে। কিন্তু পূর্ব হতেই জানা গেছে যে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে দাওয়াত দেয়া হবে। তাঁকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে চুনতী রওয়ানা হলাম। দেখা গেল তিনি নতুন বাড়ি হতে সোজা পশ্চিম দিকে চুনতী ফরেস্ট অফিসের পিছনের দিকে পাহাড়ের ভিতরে যাচ্ছেন। আমি পিছনে পিছনে যাচ্ছি। তিনি আমাকে ইশারা করে বললেন, এখানে আসবে না, চলে যাও। আমি চলে আসলাম মাত্র মাগরিবের সময় ১০মিনিট মাত্র বাকি আছে। সোজা বাড়িতে চলে আসলাম। সভারদিন বেলা ১২টার সময় তখন সূর্যের আলো ঝিলিমিলি করছে। দেখা গেল যে, মাওলানা শফিক আহমদ (সাবেক চেয়ারম্যান, আধুনগর ইউ.পি) সাহেব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মাথার উপর একখানা ছাতার ছায়াতলে করে উত্তর দিক হতে নিয়ে আসতেছেন। তিনি সভায় উপস্থিত না হয়ে আমার বাড়িতে সোজা চলে আসলেন। আমি তাড়াতাড়ি একটু রং চায়ের ব্যবস্থা করার জন্য পাকঘরে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি আম্মাজানকে এভাবে গালি দিচ্ছেন যার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। আমার বাড়ি হতে বের হয়ে সভায় উপস্থিত না হয়ে সোজা চুনতীর দিকে চলে আসছেন।

আমি অনেক অনুরোধ করলাম তা না মেনে চলে আসলেন। মনে অনেক দুঃখ নিয়ে কোন প্রকারে সভার কাজ শেষ করলাম। পরদিন দেখা গেল আমার আম্মাজানের অসুখ একেবারেই ভাল হয়ে গেল। এ ধরনের অনেক করামত দেখলাম। তিনি অনেক করামতের অধিকারী, কিন্তু দেখাতে চাননা। আল্লাহর ওলি ঐ ব্যক্তি যারা নিজকে অধম মনে করেন এবং নিজকে মানুষের সাথে পরিচয় দেন না।

মুখে দেখলাম গালি কিন্তু অন্তরে দোয়া এজন্য আল্লাহর ওলির পরিচয় পাওয়া অনেক কঠিন।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাঃ চট্টগ্রাম লোহাগাড়া থানার অন্তর্গত পুটিবিলা ইউনিয়নের হাজিরপাড়ার পূর্ব পার্শ্বে একখানা মাদরাসা স্থাপিত হয়। মাদরাসা স্থাপিত হওয়ার পর হতে মাদরাসার চতুস্পার্শ্বের মাদরাসা পরিচালকগণ প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে ভিতরে অনেক দুশমনি করে আসছে। এ মাদরাসা প্রতিষ্ঠাকাল হতে মাওলানা হাসান আলিসহ আমি অনেক চেষ্টা করে মাদরাসা দাঁড় করেছিলাম। আমি একজন ঐ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। সে সময় হতে আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) রে বিশেষ ভক্ত ছিলাম সব সময় মনের মধ্যে চিন্তা-মাদরাসাকে কি করে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যাবে। মাদরাসা গৃহের মাটির দেওয়াল যখন ৪/৫ হাত

হয়েছে বার্ষিক সভার দিন ধার্য করা হয়। ঐদিন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে সকাল ১০টার সময় মাদরাসার সভায় নিয়ে আসলাম। চতুস্পার্শ্বের লোকেরা দেখে আশ্চার্য হল। সভায় মানুষের ঢল নেমে আসল। সে বছর হতেই প্রতি বছর বার্ষিক সভার দিনই সকাল ১০টার সময় তাঁকে প্রাইভেট গাড়ি দ্বারা সভায় নিয়ে আসতাম। তার পরবর্তীতে চারপাশের দুশমনি একেবারেই শেষ হয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন হল মাদরাসার নামকরণ করা। অনেকে অনেক নাম পেশ করছে কিন্তু আমাদের মনের মতন নাম কেউ উল্লেখ করতে পারেনি। একদিন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট মাদরাসার নাম উত্থাপন করলাম। অন্ততঃ ৩০মিনিট পর হঠাৎ বলতে লাগলেন, মাদরাসার নাম আমার পীর সাহেব হযরত হাফেজ মাওলানা হামেদ হাসনের নাম অনুসারে হামেদিয়া মাদরাসা নামকরণ করলে ভাল হয়। সেদিন হতে মাদরাসার নাম হামেদিয়া মাদরাসা রাখা হয়।

সেদিন হতে মাদরাসাখানা উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগল। এমনকি অল্পদিনের মধ্যে ফাযিল পর্যন্ত সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে গেল। এ মাদরাসা গড়া এবং উন্নতি হওয়া তাঁরই করামত। আসলেই বলতে গেলে তিনি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ববর্তী আউলিয়াগণের জীবনী পড়লে দেখা যায় যে, আল্লাহর ওলিদের হাত দ্বারা কোন কোন ইসলামের কাজ সমাধা করা নেন। যে কাজে আল্লাহর ওলিদের দোয়া বা ওলিদের সহযোগিতা থাকে সে কাজ তাড়াতাড়ি উন্নতি হয়। এ জন্য আমরা মনে করি পুটিবিলা হামেদিয়া ফাজিল মাদরাসা লোহাগাড়া থানার একখানা অন্যতম মাদরাসা হিসেবে পরিচিত। তাই আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পরকালে কবরে ও হাশরে উচ্চ আসন দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সব সময় প্রার্থনা করি এবং পুটিবিলা মাদরাসাও তা কেয়ামত পর্যন্ত উন্নতির সাথে কায়েম রাখার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করি। আমিন

মুহাম্মদ সিরাজুল মোস্তফা

ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রগতি ইন্স্যুরেন্স, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

১৯৭৮ বা ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দ মাস, তারিখ এখন মনে পড়ছে না। দিন ছিল শনিবার, তখন আমি পুবালী ব্যাংক, নানুপুর শাখার ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত। সে সময় সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল রবিবার। ইচ্ছে ছিল সেদিন অফিস ছুটির পর আমার গ্রামের বাড়ি চন্দনাইশ যাব। এর মধ্যে ব্যাংকের কিছু গ্রাহকের মুখে শুনতে পেলাম চট্টগ্রামের রাউজান গহিরা ফাজিল মাদরাসার এক অনুষ্ঠানে চুনতীর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যোগদান করবেন। হুযুর কেবলা সম্বন্ধে অনেকদিন আগে

থেকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিল, কারণ লোকমুখে ওনার অনেক করামত সম্বন্ধে অবগত ছিলাম কিন্তু কোনদিন ওনার সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। সুতরাং সেই দিন গহিরা মাদরাসায় হুযুরের শুভাগমন এর খবরে সেই অনুষ্ঠানে নিজে হাজির হয়ে হুযুরের সাক্ষাতে নিজেকে ধন্য করার সিদ্ধান্ত নিলাম।
সেদিন শনিবার হওয়ায় অফিসের কর্মশেষে বেলা দুটার সময় অফিস থেকে রিক্সাযোগে গহিরা মাদরাসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম কারণ সে সময়ে আমার ব্যক্তিগত গাড়ি ছিল না। এদিকে, রাস্তার অবস্থা ছিল খুবই করুন। মানে প্রতি ঘন্টায় একমাইল রাস্তাও যাওয়া যাচ্ছিল না। সময় যত এগিয়ে যাচ্ছে আমার মনের আবেগ তত বেশি বেগবান হচ্ছে, কারণ ঠিক সময়ের মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে না পারলে হুযুরের দর্শন হবে না এবং এক মহান সাধক ও আল্লাহর ওলির সান্নিধ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত হতে হবে। চলতে চলতে রিক্সা এক সময় গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেছে। মাদরাসা মাঠ তখন কানায় কানায় পূর্ণ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একজন লোকের কাছে জিজ্ঞাস করলাম, হুযুর অনুষ্ঠানে আগমন করেছেন কিনা? উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, হুযুর এখন মাদরাসা ভবনে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সভাস্থলে শুভাগমন করবেন। সুতরাং কিছু সময় হাতে আছে এবং আসর নামাযের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে এ ভেবে আমি নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং নামায আদায় করে জানতে পারলাম, হুযুর ইতিমধ্যেই সভাস্থলে আসন গ্রহণ করেছেন।
তখন মনের মধ্যে এক সুখময় অনুভূতি পেলাম এবং পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করে মসজিদ থেকে বের হয়ে সভাস্থলে যাব এমন সময় সভাস্থলের মানুষ এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল, আর সবাই উচ্চস্বরে বলছিল, "হুযুর চলে যাচ্ছেন" হুযুর চলে যাচ্ছেন।" মুহূর্তের মধ্যে আমার মনের অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, আমার মাঝে আমি নাই। যে মহান আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষের সাক্ষাৎ লাভের আশায় এত কষ্ট করে এখানে আসা সেই মহান ওলিআল্লাহ আমার সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। অথচ আমি অধম গুনাহগার একনজর দেখার সুযোগ পেলাম না এবং অনেক দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে রাস্তায় উঠে দেখতে পেলাম প্রায় অর্ধ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে হুযুর কেবলার গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এবং হুযুর কেবলা গাড়িতে বসে পেছনে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং হাত মোবারক আমার দিকে করে রেখেছেন।
এ দৃশ্য দেখে আমি অতি দ্রুতবেগে হুযুরের হাত মোবারক চুম্বন করে হুযুরের পবিত্র হাতে কিছু নজরানা দেয়ার সুযোগ পেলাম এবং হুযুর কেবলা আমার মাথায় ওনার পবিত্র হাত মোবারক রেখে দোয়া করলেন এবং একটু হাসি দিয়ে আমার

দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন। হুযুরকে বহনকারী গাড়িখানা সামনের দিকে, কিছুক্ষণ পর গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল। হুযুরের সাথে আমার প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ।

এদিনে চট্টগ্রামের রাউজান গহিরা ফাযিল মাদরাসার ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক মাহফিল উপলক্ষে এবং আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি সেদিনের ঘটনা ছিল হুযুর কেবলার কারামত অবশ্যই কারামত। পরবর্তীকালে আরো দু'বার হুযুরের দরবার চুনতীর শাহ মঞ্জিলে যাবার সুযোগ হয়েছিল এবং হুযুরের মাযার শরিফ জেয়ারত করার সময় আমার দুই প্রাণপ্রিয় বন্ধু এবং মুরুব্বী যথাক্রমে চট্টগ্রামের প্রাক্তন মেয়র আলহাজ্ব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী সাহেব এবং পি.এইচ.পি গ্রুপের মাননীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সুফি মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব সফরসঙ্গী হিসেবে থাকতে পারায় আমার সে সফর আরও বেশি দামি ও স্মরণীয় হয়েছিল। পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করি এ মহান ওলির দর্শন এবং পরবর্তীতে ওনার মাজার শরিফ জেয়ারত যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করেন এবং নাজাতের উছিলা হয়ে থাকেন। আমিন

মাওলানা নুরুল ইসলাম (চুনতী)
(প্রকাশ জসিম উদ্দিন)
(হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভাতিজা)

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ২য় শাদির রাত্রে বাদে মগরিব আমাকে বললেন, বাইরে বড় মাওলানা সাহেব এসেছেন কিনা দেখ। তখনও আসেন নি তবে কিছুক্ষণ পর তাশরিফ আনেন। এরপর হযরত মাওলানা মুবারক আহমদ সাহেবও আসেন। ওনাদেরকে ভালভাবে চা-নাস্তা দিতে বললে দিলাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বের হয়ে মেহমানদের সামনে গেলেন। ঘণ্টা-দেড়েক কথাবার্তা বললেন- আবার রুমে চলে গেলেন। এরপর আমাকে সাতকানিয়া জলিল শেঠের কাছে পাঠান গাড়ি নিয়ে আসার জন্য। আমি গিয়ে গাড়ি নিয়ে আসলাম। কিছুক্ষণ পর আমাকে বললেন, টুপিটা পরিবর্তন করে দাও, কাপড়টা বদলিয়ে দাও, একটা পায়জামা পরায়ে দাও। নতুন কাপড়-চোপড় পরিধান করে সকলকে নিয়ে মাওলানা আবদুন নুর সিদ্দিকী (রহ.) এর বাড়িতে গিয়ে খাবার খান। বেশি দেরি হচ্ছে বিধায় আমি বাড়িতে চলে আসলাম। এ পর্যন্ত কেউ কোন কিছু বুঝতে পারেনি। ঘণ্টাতিনেক পর চারিদিকে খবর হয়ে যায় যে, শাহ সাহেব হুযুর মাওলানা আবদুন নুর সিদ্দিকী সাহেবের মেয়ে জয়নব বেগমকে বিয়ে করেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবনের অন্তিম সময়ে আমি সাথে ছিলাম। ৩/৪ দিন ঘুম হয়নি বিধায় সকলকে বললাম, আমি পুরাতন বাড়িতে চলে যাব ঘুমানোর জন্য। যাওয়ার আগে একটু দেখতে গেলে আমাকে বললেন, পুতইন্না আছতো" কোথাও যাবে না। কাছাকাছি থাকবে। এরপর ভাত খান। আমি তরকারি তুলে দিই। হাত পরিষ্কার করায়ে দেয়ার পর সিগারেট দিতে বললে আমি দিলাম। এরপর সোজা করে শোয়ায়ে দিই। ঔষধ খান। আমি চলে যাব বললে কাছে থাকার জন্য বললেন। আধঘন্টা পর রাত ১১টার দিকে নিজে নিজে উঠে যান। ক্রমান্বয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যায়। আমি আস্তে করে লাইট দিলাম। চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ঘাম বের হয়ে টপটপ পড়ছে। তাড়াতাড়ি বের হয়ে বড় আম্মাকে ডাকলাম। গোলাম কবির সাহেব, মোস্তাফিজ সাহেব, মকছুদ মিয়া সকলকে ডাকলাম। সকলে উপস্থিত হলেন। শেষে ওনি বললেন, ওডা আইতো আন না পারির অর্থাৎ আমি আর পারছি না। ঝটকে পড়ে গেলেন। বড় আম্মা ঘাম মুছে নেন। পার্শ্বে থাকা জমজমের পানি থেকে দেওয়া হলে কিছু পান করেন। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলে ১২.১০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যেদিন গাড়িতে এক্সিডেন্ট করেছেন সেদিন সকাল ১১টায় ইউসুফ মিয়ার গাড়িতে শহরে যাওয়ার জন্য উঠার সময় খুব গরম ছিলেন। ড্রাইভারের নাম খোরশেদ। আমি গাড়ির পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে মনে ভাবলাম আমাকে ডাকলে উঠব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাকেননি। চলে গেলেন। পটিয়ায় গিয়ে ভাইয়্যার দীঘির উত্তর পার্শ্বে মাগরিবের পর এক্সিডেন্ট করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা দোহাজারীতে করে আধুনগর নিবাসী জনাব কবির টিম্বার ও অন্যান্যের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, সেদিন মেডিকেল ধর্মঘটের কথা থাকলেও অকস্মাৎ তা খুলে যায়।

মুহাম্মদ শাহ নেওয়াজ

হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম

✪ আমাদের চট্টগ্রাম শহরস্থ হেমসেন লেইনের বাড়ির পার্শ্বে শাহেদা বেগমের বাড়িতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একদিন তাশরিফ এনেছিলেন ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে। তখন আমার পিতা (মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া) আমার বড় ভাই শাহ আলমকে নিয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। আব্বাজান হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সম্মুখে পৌছে শারীরিক প্রেসার বেড়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আব্বার মাথায় হাত রেখে দোয়া করায় আব্বাজান সুস্থ হয়ে যান। ঐদিন হতে আব্বাজান সহ আমরা পরিবারের সবাই হযরত শাহ

সাহেব (রহ.) এর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে অতি দুর্বল হয়ে পড়ি। নিয়মিত চুনতী যাওয়া-আসা করতে থাকি। সময়ে সুযোগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে আমাদের চট্টগ্রাম শহরস্থ হেমসেন লেইন এর বাসায় তশরিফ আনতে তৎপর থাকতাম। তিনি আমাদের বাসায় তশরিফ আনলে আমরা সকলে ধন্য ও গৌরববোধ করতাম।

✪ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারী আম্মাজান (সুলতানা বেগম) ইন্তেকাল করেন এবং ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দর ২৯ সেপ্টেম্বর আব্বাজানও ইন্তেকাল করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আব্বাজানের ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি নিজে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এবং সাথে সাথে মে'রাজুন্নবীসহ অন্যান্য মাহফিল ও চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসায় তাওফিকমত খেদমত করে আসছিলেন। আব্বাজান-আম্মাজানের ইন্তেকাল পরবর্তী আজ অবধি আমরা ভাইয়েরা ১৯ দিনব্যাপী মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এবং মে'রাজুন্নবীসহ অন্যান্য মাহফিলাদি ও চুনতী আলীয়া মাদরাসায় আব্বাজানের অনুকরণে আমরা যথাসাধ্য আর্থিকভাবে খেদমত করে আসছি।

✪ আমি নিজে প্রায় সময় আমাদের "মার্সিডিজ ব্রান্ড" কার চালিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে চুনতী-শহরে আনা-নেয়া করতাম। এমনকি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায়ও আনা-নেয়া করেছি। সামনের সিটের পাশে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বসা অবস্থায় কার চালাতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। সাথে সাথে কার চালাতে নিজেকে নিজে হালকা বা প্রফুল্লবোধ করতাম।

✪ ১৯৭৮/৭৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে কক্সবাজারে মাহফিলে সীরতুন্নবীর কয়েক ট্রাক গরু আটক করা হয়। তখন আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর এজাযত নিয়ে চুনতী থেকে নিজে কার চালিয়ে মাত্র এক ঘন্টায় অনুন্নত সড়কযোগে কক্সবাজার পৌছে যাই। কক্সবাজার শহরে পৌছে সরাসরি এস.ডি.ও'র বাংলাতে চলে যাই। এস.ডি.ও সাহেবকে আমরা মাহফিলে সীরতুন্নবীর গরু আটকানোর কথা বলায় তিনি অনুতপ্ত হন। তিনি আমাদেরকে নাস্তা আপ্যায়ন করায়ে টেলিফোন করে মুহুর্তের মধ্যে উক্ত ট্রাকসমূহ ছাড় করায়ে দেন।
(উল্লেখ্য, ১৯৭৯/৮০ খ্রিস্টাব্দে তথা জাতীয় পার্টির এরশাদ সরকারের আমলের আগ পর্যন্ত এদেশে বৃটিশ আমলের মহকুমা প্রথা প্রচলন ছিল। মহকুমা প্রধানকে মহকুমা প্রশাসক বলা হত এবং মহকুমা প্রশাসককে খ্রীস্টাব্দতে এস.ডি.ও বলা হত। গ্রন্থকার)

✪ আমাদের চট্টগ্রাম শহরস্থ বাসভবনে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তশরিফ আনলে আব্বাজান ও আম্মাজান আমাদের দুবোনের বিবাহের সুপাত্রের জন্য দোয়া চাইতেন। আমরা ৪ ভাই ৩ বোনের মধ্যে ১ বোন বিবাহিত এবং ভাইদের মধ্যে আমি বাদে অপর ৩ ভাই বিবাহিত তখন। আব্বাজান ও আম্মাজান আমাদের

অবিবাহিত ২বোনের জন্য সুপাত্রের কথা বললে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলতেন, আগে আমার বিবাহ হতে হবে তারপর বোনদের বিবাহ।
বাস্তবেও দেখা গেল ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহ্ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকালের পর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আমার বিবাহ হয় চট্টগ্রাম নাসিম মুহাম্মদ চৌধুরী বাড়ির ওবায়দুর রহমান চৌধুরীর নাতনী সাজেদা আক্তার চৌধুরীর সাথে।
চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার পরও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে হজ্বে এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারত সফরে আমি নিজে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর খেদমতের দায়িত্ব পালন করতে পেরে নিজেকে নিজে ধন্য মনে করেছি।

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (আনোয়ার মিয়া)

মল্লিক সোবহান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

আমি নিয়মিত সীরাতুন্নবীতে যাওয়া-আসা করতাম এবং হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর জীবদ্দশায় ওনার দোয়া পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।
সীরত মাহফিলে ছোট ছেলেমেয়েদের খানার ব্যাপারে যে হুজুর অত্যন্ত আগ্রহী থাকতেন সেটা দেখে আমার খুব ভাল লাগত।
সীরতের ৩টি জিনিস আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল-

- একটা হলো রান্না ও খাবারের বিশাল আয়োজন।
- দ্বিতীয়ত: বড়দের আগে ছোটদের খানার ব্যবস্থা করা হতো। ছোটরা বড়দের আলুর চামড়া পরিষ্কার করে দিত। এতেঁ একদিক দিয়ে তাদেরকে কাজেও অভ্যস্ত করা হতো অপরদিকে বিশৃঙ্খলা করার দরজাও বন্ধ হয়ে যেত।
- সীরতের খানা পাকের দায়িত্ব পালন করতে চুনতী গ্রামের পাড়াভিত্তিক ৯টি গ্রুপ। ১৯ দিনে ওনারা ঘুরে ঘুরে পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করতেন।

সৈয়দ আমিনুল ইসলাম (নাতনি জামাই)

নানুপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

- আমি যখন কলেজে অধ্যয়নরত তখন বিভিন্ন স্থানে কাওয়ালী গজলের অনুষ্ঠান করতাম। এ সুবাদে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকের সাথে পরিচয় হয়। সারা বাংলাদেশের বিখ্যাত লোহাগাড়া উপজেলার ঐতিহাসিক চুনতী গ্রামের একজন কাওয়ালী, গজল-প্রিয় ব্যক্তিত্ব মরহুম নেসার আহমদের সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি তার ভাতিজীর বিয়ের অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদে কাওয়ালী পরিবেশন করার দাওয়াত দেন ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে। চট্টগ্রামের হেমসেন লেইন এলাকায়। বিয়ে ছিল চুনতী গ্রামের মেয়ে শাহেদা বেগমের। এই অনুষ্ঠানেই

সর্বপ্রথম চুনতীর হযরত আলহাজ্ব শাহ হাফেজ আহমদ শাহ সাহেব কেবলার সাথে প্রথম পরিচয়।

না'ত এবং কাওয়ালী ভক্ত

এই বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি যখন জানতে পারলেন আমি উপ-মহাদেশের বিখ্যাত আবু কাওয়ালের ছেলে, তিনি তখন বললেন, আবু কাওয়াল সাহেব তো পিয়ারু কাওয়াল সাহেবের শাগরিদ। তুমি আমাকে পেয়ারু কাওয়ালের গাওয়া কিছু কাওয়ালী শুনাও। তারপর আমি একের পর এক পিয়ারু কাওয়ালের গাওয়া কিছু বিখ্যাত কালাম শুনাতে শুরু করলাম।

আমি আশ্চর্য হলাম যে, যখন আমি না'ত শরিফ শুনাচ্ছিলাম, তখন তাঁর চোখের পানি যেন বাধা মানছে না। ছোট্ট বাচ্চাদের ক্ষুধা লাগলে যেমন করে কাঁদে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ঠিক তেমনভাবে কাঁদছেন।

এভাবে বেশ কিছু না'ত শুনানোর পর তিনি আমাকে ভীষণ দোয়া করলেন। এভাবে ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দেই চুনতী না'তের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে চুনতীবাসীর শিক্ষিত, মার্জিত ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। এর পরপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সংস্পর্শে যাবার সুযোগ হলো।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর নাতনীর সাথে বিয়ে

পরিচয়ের পর থেকে ওনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। পর্যায়ক্রমে তাঁর সবচেয়ে আদরের বড় নাতনীর সাথে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬ মার্চ আমার আকদ হয়। যেদিন আমাদের আকদ হয় সেদিন সকাল বেলা, নিচতলার দক্ষিণ দিকের পূর্ব পার্শ্বের কামরায় ছিলাম। পশ্চিমের কামরায় ছিলেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.)। ওনাকে তখন প্লেটে করে কমলা পরিবেশন করছিলেন। ওনি অর্ধেক প্লেট খেয়ে ইউসুফ সাহেবকে দিয়ে বললেন, এগুলো ঐ কামরায় ইসলাম আছে তাকে দাও। এরপর অর্ধেক কাপ রং চা পাঠালেন।

হামদ না'ত প্রিয় শাহ সাহেব কেবলা

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নিজ কণ্ঠে, এরপর সুর ধরে গাইতে শুরু করলেন, "মারহাবা সৈয়্যদ মক্কি মদনিউল আরবী-এরপর তিনি ধরলেন, "বাগোমে বাহার আয়ি।" তারপর তিনি গাইতে শুরু করলেন, নজরুল সংগীত। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, "শুধু আমি নই, আরশে আযমসে ফেরেস্তারাও গান করেছেন।

নবী প্রেমিক শাহ সাহেব কেবলা

আমার জীবনে আমি অনেক আউলিয়ার খেদমতে যাবার সুযাগ পেয়েছি। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মতো নবী প্রেমিক আর দেখি নাই, অর্থাৎ কেউ যদি হুযুরে পাক (স.) এর পবিত্র নাম মোবারক উচ্চারণ করতো, সাথে সাথে শাহ সাহেব কেবলার অশ্রু যেন আর বাধা মানতোনা।

নাতনীর সাথে বিয়ের পরের স্মৃতি

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আমার এক চাচা শ্বশুরের বিয়েতে যাবার জন্য আমার স্ত্রীকে (বড় নাতনী) সহ সালাম করে চট্টগ্রাম আসার অনুমতি চাইলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার স্বামী কোথায়? তাকে ডেকে আন। আমি কাছেই ছিলাম, সুতরাং উনার কাছে গিয়ে সালাম করে বসে পড়লাম। ওনার সামনে তখন ১৫/২০ জনের আলেম, হাফেজসহ ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ আমাকে আদেশ দিলেন, একটা নাত শুনাও। আমি কালবিলম্ব না করে শুরু করলাম- "আয়কে শরহে ওয়া দো দাহা আ'মদ জমালে রুয়েতো।" ফার্সি ভাষায় এই না'ত শরিফটি যেইনা শুরু করলাম, "ওনি, এমনভাবে কান্না শুরু করলেন যেন রাসূল (স.) এর বিরহে এক্ষুণি জানটা বের হয়ে যাবে।" নাত শরিফটি শেষ করার পর, আমি বললাম, এটা "খাজা গরীব-এ নেওয়াজ (রহ.) রচিত। তখন তিনি আরো বেশি জোরে কান্না শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, আরেকটা শুনাও। তারপর আমি হযরত জামী (রহ.) এর রচিত, "মনম আদনা সানা খোয়ানে মোহাম্মদ (স.) এ নাতটি শুনালাম। এভাবে একটার পর একটা নাত শুনাতে শুনাতে সকাল নয়টা থেকে বেলা তিনটা বেজে গেছে। আর বিয়েতে যাওয়া হলনা। আমার জীবনে এ রকম আশেকে রাসূল (স.) ফানাফিল্লাহ নবী পাগল জিন্দা ওলি আমি দেখিনি। তিনি প্রায় সময় একটা না'ত গাইতেন, "হাম মাজারে মোহাম্মদ পে মর যায়েঙ্গে।"

শেষ কথা :

আমি দেখেছি যে, যত লোক ভক্তবৃন্দ ওনার কাছে সাফ নিয়তে গেছেন, প্রত্যেকের মকসুদ পূর্ণ হয়েছে। কোন লোক ওনার 'দরবার' থেকে খালিমুখে বিদায় হতে পারেন নি। হক্বদারের হক্বের প্রতি তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন।

আমি এমনও দেখেছি শাহ মঞ্জিলের মজার খাবার না খেয়ে ওনার পুরানা বাড়িতে (ইউছুফ মঞ্জিল) গিয়ে সৎমাকে বলতেন, মা আমাকে লাল মরিচ পুড়ে, পিঁয়াজ লবণ দিয়ে মেখে ভাত দেন। মরিচপোড়া দিয়ে ভাত খেয়ে তিনি বলতেন, মা! খুব

মজা হয়েছে। পরে পকেট থেকে মুঠো মুঠো টাকা না গুনে সৎ মায়ের হাতে দিতেন।

ওনার আপন ছোটভাই ছালেহ আহমদকে কখনো খালি হাতে ফেরাননি। এমন অনেক ভক্ত আছেন যাদেরকে তিনি টাকা পয়সা দিতেন এবং তা এখনো পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রেখেছেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর করামত বলতে গেলে, কিছু না লিখে শুধু করামত বললেই একটা বিশাল কিতাব হয়ে যাবে। ইনশা আল্লাহ আগামীতে তাই হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শাফেয়া বেগম (শাফু)

নাতনী, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

শৈশব এবং কিশোর বয়সে

আমার মতন, আমার নানাকে আর কেউ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। এর যথেষ্ট কারণ আছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি নানা-নানু এবং মামা আমরা একইসাথে থাকতাম। নানা যখন গোসলের উদ্দেশ্যে বেরুতেন তখন উনার কাঁধের উপর ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যেতেন। আলহাজ্ব মাওলানা হাবিব সাহেবের মসজিদের পুকুরে প্রথমে আমাকে গোসল করিয়ে, মসজিদের বারান্দায় বসিয়ে রাখতেন। তারপর ওনি গোসল সেরে নিতেন। আমার মনে হয় আমার নানা আমাকে বেশি ভালবাসতেন এবং কাছে থেকে জানতেন। আমার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। বিশেষ করে সীরতুন্নবী (স.) মিটিংয়ে আমাকে বসার অনুমতি দিতেন। তখন আমার বয়স প্রায় ১১ বৎসর। কখনো আমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করার আগেই নানা তা পুরণ করে দিতেন।

এস.এস.সি. পরীক্ষার স্মৃতি

আমার সবচেয়ে নানার সাথে গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্ত ছিল আমি যখন এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে সাতকানিয়া থেকে "শাহ মঞ্জিলে" আসি। তখন এক মহিলা আমাকে এক গ্লাস ডাবের পানি খেতে দেন। ডাবের পানি খাওয়ার পর হঠাৎ এমনভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি যে, আমি বাঁচব কি মরে যাব, তা নিয়ে সন্দেহ চিল। চরম বিপদ সংকট মুহুর্তেও আমি অনুভব করতে পারছিলাম নানা আমার পাশে বসে কিভাবে আমার যত্ন, এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করে, কেঁদে কেঁদে, শুধুই একটি কথা বলেছিলেন, 'আহ! আহ্! হইত না, হইত না।" আল্লাহ ফিরিয়ে দিয়েছেন। থাকতো না থাকতো না আল্লাহ দিয়েছেন। সত্যিই আমি সেদিন নতুন জীবন

নানার দোয়ায় ফিরে পেয়েছিলাম। যতদিন আমি কাছে ছিলাম ততদিন কোন কোন সময় ফজরের নামাযের পরপর ওনার জন্য কড়া রং চা (চিনি ছাড়া) দিতাম যা সহজে কেউ খেতে পারে না। সাথে ওনার প্রিয় পিঠা, নাস্তা এবং বিভিন্ন ফল-ফলার নিয়ে যেতাম। এটা হয়ত আমি বড় নাতনী হিসেবে ভাগ্যক্রমে করতে পেরেছি। ভোরে নানাকে নাস্তা খাওয়াতে খুব তৃপ্তি পেতাম এবং নিজেও খেতাম। নানার সাথে আমার এত সুন্দর স্মৃতি রয়েছে যা লিখে শেষ করা যাবে না।

বিয়ের পর

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমি এবং আমার ছোট বোনের বিয়ে একইদিনে, একইসাথে হয়। বিয়ের পর আমার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করার আগেই নাম দিয়েছিলেন 'শরিফ' এবং তদ্রূপ ছেলেই হল। নানা আমাকে একদিন তাঁর মনের ইচ্ছে বলেছিলেন, ওনার প্রবর্তিত মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) কিভাবে ১৯ দিনব্যাপী করা যায়, সেই ব্যাপারে আমার সাথে একান্ত আলাপ করতেন এবং আজকের মসজিদে বাইতুল্লাহকে সাততলা করার চিন্তায় এতই মগ্ন ছিলেন, ওনি প্রায় ২ ঘণ্টা আমার সাথে কথা বলেননি। তখন তিনি দোতলায় ওনার রুমে শুয়ে চোখ বন্ধ অবস্থায় ছিলেন। চোখ খুলে আমাকে বললেন, সব হয়ে যাবে, আল্লাহর কাজ আল্লাহ করবে, যেখানে শুধু মানুষ নয় জ্বিন, ফেরেস্তারা নামায পড়বে, মানুষ গুনে শেষ করা যাবে না।"

ঈদের দিনের স্মৃতি

ঈদের দিনের একটা স্মৃতি যা আমি কখনো ভুলব না। চোখের জল মুছে লিখতে হচ্ছে। প্রত্যেক ঈদের আগে সারারাত নানা আমার সাথে জেগে কাটাতেন। আমি সেলাই করতাম আর আলহাজ্ব হযরত শাহ সাহেব কেবলা ওলি জগতের সম্রাট হয়েও আমার সাথে বসে দুনিয়া, আখেরাত এবং চলন্ত জীবনের সবকিছু উপদেশমূলক কথা বলতেন।

নানার মূল্যবান সম্পদ আমার কাছে

নানা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েন। প্রথমে দোহাজারী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তড়িৎ চট্টগ্রাম মেডিকেলে নিয়ে যায়। আমি ওনাকে দেখতে যাই। তখন ওনার রক্তমাখা মহামূল্যবান পাঞ্জাবী আশরাফ মামা আমার হাতে দিয়ে দেন। তখন আমি কেবলই কান্না করছিলাম। আমি আমার নানার স্মৃতি এখনো বুকে

আঁকড়ে রেখেছি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, এত বৎসর পরও সেই রক্ত মাখা পাঞ্জাবী থেকে এখনও সুগন্ধ বের হয়। কারো যদি ইচ্ছে হয়, সেই জামার সুগন্ধ নিতে আমার বাসার দরজা খোলা রইল ওনি যে আল্লাহর প্রকৃত আউলিয়া এটাও একটা ওনার করামত।

যবনিকা

পরিশেষে, সব বিষয়ে ওনার হাজার হাজার গুণের মধ্যে যে জিনিসটি আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগত তা হল- নানা উনার আশেকান, ভক্তবৃন্দ এবং রক্তের আউলাদদেরকে আলাদা চোখে দেখেন নি। ওনার আধ্যাত্মিক জগতের করামত, ব্যক্তি জীবনের আলাপচারিতা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ এবং মেহমানদারি এতো বেশি ছিল যে, যা লিখে শেষ করা যাবে না। নানার প্রতি অগণিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সালাম জানিয়ে শেষ করার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও শেষ করছি।

মাওলানা শফিক আহমদ চৌধুরী
(নাতনী জামাই)
বাজালিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

প্রথম করামত : সীরাতুন্নবী (স.) এর প্রথমদিকে সব জিনিস সাতকানিয়া থেকে আনা হতো। সীরতুন্নবী (স.) শেষ হবার পর আমার ভাই জনাব লোকমান আহমদ চৌধুরীর পিক-আপ গাড়িতে করে জিনিসপত্র ও তাবারুক নিয়ে আমি হযরত মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ভাই খ্রীস্টাব্দেহ আহমদ আরো কয়েকজনসহ চালক বড়ুয়াকে নিয়ে যাত্রা করার অনুমতির জন্য ওনার কাছে গেলে উনি বললেন, আমিও কিছুদূর তোমাদের সাথে যাবো। এরপর আমি সামনের সিট থেকে পিছনে গিয়ে বসলে, হযরত আমিনুল্লাহ সাহেব কিছুতেই আমাকে পিছনের সিটে বসতে দিতে রাজি হলেন না। উনি আমাকে বললেন, আপনি গাড়ি চালান, বড়ুয়া পিছনে বসুক। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এবং আমিনুল্লাহ সাহেব সামনে বসলেন। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, আমি হাজির রাস্তার মাথায় নামবো।

গাড়ি তখন হাজির রাস্তার মাথা পার হয়ে ব্রিজ পর্যন্ত চলে যায়। তখন আমি গাড়ি ব্রেক করলে, গাড়ির ব্রেক ফেইল হয়ে যায়। তখন গাড়ি অনেক নিচে জমিনে নেমে যাচ্ছিল। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস বলে ডাক দিলে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। গাড়ির পিছনের লোক, এমনকি তাবারুকসহ সব ঠিক

ছিল, কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাকে খুব বকা দিলেন এবং তিনি হাজির রাস্তার মাথায় গিয়ে বসলেন। সবাই বলল, ক্রেইন ছাড়া অত নিচ থেকে গাড়ি উঠানো সম্ভব নয়। তখন ওখানে অনেক লোক সমবেত হয়েছিল। তখন আমি সবাইকে বললাম, এত লোক থাকতে আপনারা সবাই মিলে একটু সাহায্য করলে গাড়ি উঠে যাবে। সেদিন সবার সাহায্যে সাথে সাথে গাড়ি উঠে গেল। তখন আমি না গিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কাছে চালক বড়ুয়াকে পাঠালাম অনুমতির জন্য। তখন তিনি ভীষণ বকাবকি করছিলেন এবং বললেন "চলে যাও।" আমরা প্রথমে সাতকানিয়া গিয়ে মালপত্র বুঝিয়ে দিয়ে, বাজালিয়া আমাদের বাড়িতে চলে যাই। কিছুক্ষণ পর বিশ্রাম নিয়ে আবারো চট্টগ্রাম রওয়ানা দিই। মন পড়ে রইল হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কাছে। মন ছটফট করছিল, এ কি করলাম। যখন চট্টগ্রাম বাসায় পৌঁছলাম, তখন ফোন আসলো, আমার মেজ ভাই জনাব খ্রীস্টাব্দেহ আহমদ চৌধুরী ভীষণ অসুস্থ। ঐ সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর একজোড়া জুতা ছিল ওনার বাসায়। ঐ জুতা তিনি বুকের উপর চেপে ধরে রেখেছিলেন। তখন আমার মনে একটু সান্ত্বনা আসলো যে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হয়ত এই মসিবত থেকে আমার ভাইকে রক্ষা করার জন্য এই দুর্ঘটনাটাকে একটা "উপলক্ষ" বলে আমার বিশ্বাস।

✪ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আমার ভাই লোকমান আহমদ চৌধুরী ইসলামাবাদ সুইং থ্রেড ফ্যাক্টরির ম্যানেজিং পার্টনার হন। কিছুদিন পর শ্রমিক অসন্তোষের মাধ্যমে ধর্মঘট করে বসে শ্রমিকরা। তখন ভাই আমাকে বলল, এখন কি করবো? আমি বললাম, চুনতী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দরবারে যাই। তখন রমযান মাস। আমরা যখন দরবারে পৌঁছলাম, তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এত দয়াবান হলেন যে, তিনি নিজ হাতে তরকারির পেয়ালা এনে আমাদেরকে মেহমানদারী করলেন। রমযান মাস ঘি দিয়ে ভাত খেতে বললেন, আমরা খাওয়া শেষ করে দোয়া ও বিদায় নিলাম। ভাই আমাকে বললেন, কি বুঝলে? আমি বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কি করছি শ্রমিকরা সব খবর রাখছে। আমরা রাত প্রায় ১১টার দিকে চকবাজারস্থ সবুজ হোটেলের পাশে ফ্যাক্টরিতে আসলাম। তখন সব শ্রমিকরা আমাদের গাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বলল, স্যার আমরা সবাই আপনার বাসায় আসছি। আমরা শ্রমিকদের আসার অপেক্ষায় প্রহর গুণতে গুণতে অবশেষে আল্লাহর রহমতে এবং শাহ সাহেব কেবলার দোয়াতে শ্রমিকদের সাথে একটা আপোষ বা সমঝোতা হয়ে গেল, আমি মনে করি এর চেয়ে কারামত তবে কি হতে পারে?

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একদিন বাজালিয়া নিবাসী মকবুল আহমদ চৌধুরীর বাসায় আসছেন খবর পেয়ে দুপুর ১২-৩০ মিনিটের মধ্যে ওনার সাথে দেখা করার জন্য হাজির হলাম। তখন গিয়ে দেখি, ওনার পাশে বসা বড় মাওলানা সাহেব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে লক্ষ্য করে বললেন শফিক আপনার কি হবে? হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, ওতো আমাকে মামা ডাকে (এর আগেই আমি কদমবুচি পর্ব শেষ করেছিলাম)। অবশ্য ওর শাশুড়ি আমাকে আব্বা ডাকে, তা হলে সে আমার নাতনী জামাই হবে?" তখন মনে মনে ভাবলাম, তা হলে যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার মা বোধ হয় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে বাবা ডাকেন। আমি বিদায় নিয়ে আসতে চাইলে, তিনি বললেন, তোমাকে আমার সাথে খেতে হবে। যোহরের নামাযের পর ওনার সাথে খেতে বসলাম। আমাকে ওনার খাওয়া থেকে কিছু তবারুক দিলেন, আমি খুব খেলাম। খাওয়া শেষ করে এরশাদ মামা, ওনাকে হুক্কা বা তামাক খেতে দিলেন। তিনি তামাক খেতে খেতে বড় মাওলানা সাহেবকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, ঐ ছেলেটাকে ডাকেন তো। তখন আমি পড়ি-মরি, এভাবে দৌড়ে গেলাম। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বড় মাওলানা সাহেবকে বললেন, হুযুর জিজ্ঞেস করেনতো,শফিকের বউ সুন্দর না কি? আমি বললাম বেশি সুন্দর না শ্যামলা। তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বড় মাওলানা সাহেবকে বললেন, জিজ্ঞেস করেনতো ওর বৌ কোথায় দেখেছে। তখন আমি বললাম, আমি যখন এক্সিডেন্ট করেছিলাম, তখন সে আমাকে দেখতে এসেছিল তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বলেছিলেন,পঞ্চাশ টাকার বউ লাল হবে। অথচ যা কখনো কল্পনাও করিনি। এর কিছুদিন পর অলৌকিকভাবে ওনার মেয়ের ঘরের মেজ নাতনী শায়েকা বেগম (হীরার) সাথে ওনার কথামত, "লাল বউ" আমার কপালে আল্লাহর অপার মহিমা এবং হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর করামত হিসেবে বিয়ে সংগঠিত হয়। যা তিনি এটা অনেক আগেই জানতেন, আমার সাথে বিয়ে হবে কার সাথে।

✪ স্বাধীনতার পরপর প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচনে আমার চাচাত ভাই আব্দুল জলিল চৌধুরী নির্বাচন করার জন্য আমার গ্রামের বাড়িতে এসে প্রথম ইলেকশনে দাঁড়াবার জন্য সবার অনুমতি প্রার্থনা করছিল। ঈদ থাকায় আত্মীয়-স্বজন সবাই একমত হই যে, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কাছে যাবো। ওনি যদি অনুমতি দেন তা হলে নির্বাচন করব। আমরা ওনার দরবারে গিয়ে নির্বাচনের কথা বললাম। সাথে সাথে ওনি বললেন, এটা তোমাদের কাম না, সাদা কাপড়ে দাগ লাগে। তখন সবাই আমাকে বললেন, হুযুরকে বুঝাবার জন্য। তখন হুযুরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে বললে হুযুর বললেন, দাঁড়িয়ে দেখ কি হয়। আমাদের

জনসমর্থন কম ছিল না। নির্বাচনে দাড়াল। প্রায় হয়ে যায় এই অবস্থায় আমাদের ভোট কেন্দ্রে গোলাগুলি হয় এবং ভোট বন্ধ হয়ে যায়। উপ-নির্বাচনে আমার ভাই হেরে যায়। তখন হুযুর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কথা সবাইকে জানিয়ে দিলাম, আল্লাহর ওলির কথা না শুনে নির্বাচনে হেরে যাওয়া একটা বড় করামত।

✪ একবছর ঈদের সময় নামাযের পর আমরা সবাই ওনার দরবারে যাই। প্রতি বছরের মতো এক গাড়িতে আমার বড় ভাইয়েরা সর্বজনাব লোকমান আহমদ চৌধুরী, ছালেহ আহমদ চৌধুরী এবং ওসমান গণি চৌধুরী। অন্য গাড়িতে আমি, আবদুল জলিল চৌধুরী (বাজালিয়ার চেয়ারম্যান) রফিক আহমদ চৌধুরী এবং পিক আপের পিছনে পাড়ার ১০/১২ জন ভক্তবৃন্দ বসেছিলেন। "শাহ মঞ্জিল" পৌছে হুযুর কেবলাকে সালাম করে চলে আসার অনুমতি চাইলে, উনি আমাদেরকে কিছু খেয়ে যাবার জন্য বললেন। তবুও আমরা চলে আসতে চাইলে ওনি আবারো বললেন, খেয়ে গেলে ভীষণ খুশি হবো। ওনাকে অনেক কাকুতি মিনতি করে বিভিন্নজন, বিভিন্ন জরুরী কাজের কথা বলে, এক ধরনের অনুমতিবিহীনভাবে হাতজোড় করে বিদায় নিয়ে আমি পিক-আপ নিয়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিই। বাকিরা খেয়ে আসবেন বলে ঠিক করলেন।
আমি গাড়ি চালিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর গেইটের কাছে আসতেই গাড়ির লাইট বন্ধহয়ে যায়। লাইট বন্ধ করলে গাড়ি চলে, লাইট জ্বালালে গাড়ি চলে না। এভাবে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে ডেপুটি বাজার নিয়ে যাই। ওই বাজার থেকে লাইট ক্রয় করে কোন প্রকারে লোহাগাড়া গিয়ে, বেটারি চার্জ করি। এরপরও গাড়ি চলে চলে না। অনেক কষ্টে সাতকানিয়া রাস্তার মাথায় লাইন্সম্যান সৈয়দ হোটেলের সামনে আসি। এরই মধ্যে আমার অন্য ভাইয়েরা, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দরবারে খেয়ে আসলো। আমাদের গাড়িতে ওনাদের গাড়ির লাইট পড়ার সাথে সাথে আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করল। ওনাদের আগে-আগে আমরা বাড়ি পৌছি। তখন রাত ১২ টা পার হয়ে গেছে। বাড়িতেও আমাদের শেষ পর্যন্ত খাওয়া হলো না। প্রকৃত আউলিয়াগণের এইসব করামত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছি।

✪ একদিন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমার ভাই লোকমান আহমদ চৌধুরীর বাসায় তশরিফ আনেন এবং দুপুরের খাবারের পর আমাকে বললেন, ফৌজদারহাট তোমাদের মাস্টারহাট, ইন্ডাস্ট্রিজ দেখতে যাব। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হযরত মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব, এরশাদ মামাসহ আমরা রওয়ানা দিই। গাড়ি চালাচ্ছিল বড়ুয়া বাবু। আমরা যেতে যেতে ফ্যাক্টরি পার হয়ে অনেক দূরে ভাটিয়ারির দিকে যেতে বললেন তিনি। তখন গাড়িতে তেল একদম ছিল না

বললেও চলে। তখন আমি দুপুরের ভাত খাবার সময় কাপড় বদলায়ে ফতুয়া পরি। পাঁচ নং বাসা থেকে ভাত খাওয়ার জন্য আজিজ বিল্ডিংয়ে যাই, তখন পকেটের টাকা নিতে মনে ছিল না বললে মিথ্যা বলা হবে। এরশাদ মামা, মাওলানা সাহেবের কাছেও ছিল না। তখন আমার মনে খুব ভয় আসলো। এখন গাড়ি বন্ধ হলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) খুব বকা দিবেন। এ কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, পথে আছরের নামায পড়তে। আমাকে ইমামতি করতে বললেন। আমি ইমামতি করবো ভাবতেও পারিনি। তারপর চলতে চলতে মিটার দেখি, তেল মোটেও নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার তেল ছাড়া গাড়ি যখন আমাদের বাসার সামনে আসল তখন গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যে কত বড় মাপের আউলিয়া ছিলেন তা যারা ওনার পাশেপাশে ছিলেন, শ্রদ্ধা বা ভক্ত ছিলেন তারা জানেন। তেল ছাড়া ওনারা গাড়ি চালাতে পারেন। এর চেয়ে বড় কারামত আর কি হতে পারে?

শেষ কথা : আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর একজন প্রিয় ভক্ত ছিলাম। সেখান থেকে ওনার নেক নজরে নাতীন জামাই হই। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি- হযরত শাহ সাহেব (রহ.) প্রবর্তিত মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর খেদমত করতে গিয়ে আমার তিন বছরের এক নিষ্পাপ মেয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর উছিলায় সীরতুন্নবী (স.) এর সময় খাবারের প্রচণ্ড গরম নলাকাজিতে পড়ে (তানিয়া) শহীদ হয়ে যায়। আমার মতো ভাগ্যবান আর কে হতে পারে? হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কারামত লিখে শেষ করা যাবে না। ওনার সমস্ত জীবনীই কারামত।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর পরিবার এবং ওনার প্রবর্তিত মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এর জন্য আমৃত্যু খেদমত করতে পারি। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আমার জন্য দোয়া চেয়ে শেষ করছি।

শায়েকা বেগম হীরা

নাতনী, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

নানার সাথে শৈশবের স্মৃতি:

✪ হযরত আলহাজ্ব শাহ হাফেজ আহমদ (রহ.) শাহ সাহেব কেবলার অনেক স্মৃতির মধ্যে এখানে কিছু নিজ চোখে দেখা স্মৃতিচারণ তুলে ধরবো। শৈশবে তিনি একবার আমাকে রং চা খাইয়েছিলেন। বললেন একজন বে রোজাদারকে

আনতে। এই যে রোজাদারকে খুঁজতে যখন আমি রুম থেকে বের হলাম, তখন নানার এমন রাগ উঠল যে, তখন দিকবিদিক সবাই পালাচ্ছে। দোতলায় গিয়ে দেখি যে, এরশাদ নানা লুকিয়ে আছে (নানার খাদেম)। ওনি আমাকে বললেন, তুই আমাকে বাঁচা। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর রাগ কমাতে না পারলে আমার অবস্থা খারাপ করে ফেলবে। তখন আমি ভয়ে নানার সামনে গিয়ে বসি। নানার সামনে এককাপ রং চা ছিল, সম্ভবত যার উপর রাগ উঠেছিল সেই বে-রোজাদারকে মানসিক শান্তি দেবার জন্য রেখেছিল। নানার রুমে প্রবেশ করে বসেছিলাম একা একা। তখনো রাগ কমেনি। তখন নানা ঐ রং চা আমাকে খাওয়ানোর পর দেখি নানার মেজাজ একদম নরম হয়ে গেছে।

✪ নানার সৌন্দর্যের বর্ণনা :

আমার নানা দেখতে অদ্ভুত সুন্দর ছিলেন- বলতে গেলে নুরাণী চেহারার অধিকারী ছিলেন। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দৈহিক গঠন, উচ্চতা, ওনার আল্লাহ প্রদত্ত সুন্দর দাড়ি, সুন্দর চুল, সব মিলিয়ে মনে হয় আল্লাহ ওনাকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। তবে নানার নখগুলো ছিল মাংসের সাথে প্রায় লাগানো। ওনার নখ কাটতে গিয়ে নানার ব্যক্তিগত নাপিত প্রায় সময় নানার হাতে মার খেত। নানার রাগ উঠলে চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি বের হত। আবার রাগ কমে গেলে শিশুর মত কোমল হয়ে যেতেন।

✪ নানার পছন্দ এবং অপছন্দ :

আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু তুলে ধরছি। নানার পছন্দের মধ্যে ছিল চিনি ছাড়া কড়া রং চা সহজে কেউ খেতে পারেন না। নানা অসম্ভব ঝাল পছন্দ করতেন। বিশেষ করে মরিচের চাটনি প্রতিদিনের খাবারে থাকতে হবে। কেউ ঘুমালে কোন অবস্থাতেই ছোট বড় যেই হোক তাকে ঘুম থেকে জাগাতে দিতনা। সুন্দর সবকিছু তাঁর পছন্দ ছিল।

✪ নানার আধ্যাত্মিক জীবনের ছোট্ট বর্ণনা :

নানা প্রায় সময় পবিত্র সূরা ইয়াছিন, সূরা আর্-রহমান, সূরা মোজাম্মেল ছাড়াও অনেক সূরা তিনি অনর্গল মুখস্থ প্রায় সময় পড়তেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর নাম কেউ মুখে কিংবা নাত শরিফ শুনালেই উনি বিভোর হয়ে যেতেন। নানা প্রায় সময় মাগরিব কিংবা এশার নামাযের পর কখনোবা যোহরের নামাযের পর মোরাকাবায় মগ্ন থাকতেন। উনি দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন। ওনি সব সময় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (স.) এর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন।

✪ কৈশোর বেলার কিছু স্মৃতি :

নানা প্রায় সময় আমাকে হরিয়া বলে ডাকতেন। আমাকে বলতেন, তোকে আমি কোলে নিয়েছিলাম মনে আছে? আমি একবার সীরতুন্নবী (স.) এর জন্য চাঁদা দিয়েছিলাম। সেই চাঁদার রশিদটা সারাবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করে আমার হাতে দিয়েছিলেন। তিনি সব সময় আমি যে জিনিসগুলো ব্যবহার করতাম (যেমন: জামা/শাড়ি/হাতঘড়ি ইত্যাদি) সেগুলো বেশি সুন্দর বলতেন। আর হাসতেন এমনকি ঈদের সময় কোলাকুলিও করতেন। নানার সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আমার কাছে অবাক লাগত সেটা হচ্ছে ঈদের সময় সবার জন্য তিনি মামা এবং আম্মার পরিবারের জন্য নিজেই একই মানসম্পন্ন জামা-কাপড়-শাড়ি কিনতেন। আমাকে কিংবা আমার মামাতো বোনকে কখনো আলাদা চোখে দেখেননি। আমি মনে করি, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে হক্কুল এ'বাদ পালন করতেন।

বিয়ের স্মৃতি : যেদিন আমাদের বিয়ে হয় সেদিন নানা সকাল থেকে শুধু বিয়ের গান পরিবেশন করছিলেন। বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। একজন আশেকে রাসূল (স.) এর নাতনীদের প্রতি অনুরাগ থাকলে বিয়ের গান নিজ মুখে পরিবেশন করেন।

বিয়ের দিনের সকালের নাস্তা নানা অর্ধেক খেয়ে বাকিগুলো আমার স্বামীর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্বামী নানার জন্য ফুলের মালাটা উপহার দিয়েছিলেন। বিয়ের পর আমি যখন গর্ভবতী হলাম তিনি আমাকে আবদুল হাকিমের মা বলে ডাকতেন। পরে মক্কা শরিফ থেকে চারটা বড় কিতাব এনে বড় ছেলের নাম রেখেছিলেন নুরুল ইসলাম। বিয়ের পরে নাকে নথ দেখে আমার নানীকে নানা প্রশ্ন করলেন "আমি নাক ছেদন করেছি নাকি? নানী বললেন ছোট বেলায় ছেদন করে দিয়েছিলাম। (নাতনী বড় হয়েছে নাকি?) নানা বললেন, আমার নাতনী ৪০ বছরেও বুড়া হবে না।

জীবনের প্রথম শাড়ি নানার টাকায় কেনা হয়। নানার সাথে প্রায় ভাত খেতাম। নানা মেহমানদারি বেশী পছন্দ করতেন।

নানার একটা কারামত :

আমার ছোট ছেলে তানিম যখন গর্ভে তখন আমি নানার নামে ২০ রাকাত নফল নামায পড়ে নানার উদ্দেশ্যে সওয়াব বখশিশ করে পৌঁছে দিয়েছিলাম, আল্লাহর রহমতে আমার সার্জারি করেও পেটে কোন টিউমার পাননি। আমার নানা প্রায় সময় আমার মামা শাহজাদা জমাল আহমদকে বলতেন আমার চেয়ে বড় হবি।

তানিয়ার মৃত্যু:

সে লেখা লিখতে আমার অশ্রু ঝরছিল, সেটা হচ্ছে আমার নানার মৃত্যুর পর আমি তিনবার স্বপ্নে দেখলাম "তুই আমাকে একটা মেয়ে দে-এ রকম বলছেন। সীরতুন্নবী (স.) এর সময় দরবারের পাকঘরের চ্যাপটা লম্বা সাইজের নলাকাজীর প্রচণ্ড গরম টবের ভিতর পড়ে যায় আমার তিন বছরের মেয়ে তানিয়া, ১মিনিটের মধ্যে তুলে ডুলাহাজারা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আমার নানা এবং আল্লাহর রাসূল (স.) এর রাস্তায় ততক্ষণে ওনাদের কাছে চলে গেছে ঘটনাটা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে। তখন তানিয়ার মৃত্যুর পর (শহীদ) আমার মেয়েকে চুনতীতে কবর দেওয়া হয়।

নানার মৃত্যুর পর নানাকে অনেকবার স্বপ্নে দেখেছি এবং স্বপ্নে নানার রুমে বসে বসে "সূরা ইয়াসিন" দোয়ায়ে হাবিবি" দোয়ায়ে গাঞ্জিল আরশ্ পড়েছি। আমার তানিয়ার উছিলায় সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছে আমি আমার পরিবারের সবার জন্য দোয়া কামনা করে শেষ করছি।

তৈয়বুল হক বেদার

নাতি, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

✪ শাহ মঞ্জিল কিভাবে নির্মিত হল: অলিকুল শিরোমনি আলহাজ্ব হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ঐতিহাসিক শাহ মঞ্জিলের ইতিহাস বর্ণনা দিতে গিয়ে কার কি অবদান বলতে গেলে, জীবনীতে শুনতে খারাপ লাগলেও লিখতে হয়। কারণ সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা, শাহ সাহেব কেবলার উপদেশ ছিল। পবিত্র কুরআন শরিফে আছে- "তোমরা জেনে শুনে সত্যকে গোপন করিও না এবং মিথ্যার সহিত সত্যকে মিশ্রিত করিও না।" তাই আমি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শাহ মঞ্জিল নির্মাণের ইতিহাস, কার কি অবদান, তা লিখব না। কেননা এখানে একজনের নামও যদি বাদ পড়ে, তাহলে আমার এই লেখা নিয়ে সমালোচনা হবে এবং আল্লাহর কাছেও মনের অগোচরে পাপী হয়ে থাকব।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ১৭আগস্ট আমার (বেদার) জন্ম হয়। আমার আম্মাজানের মুখ থেকে শুনেছি, তিনতলা বিশিষ্ট ফাউন্ডেশন দিয়ে নানার ভক্তদের ভালোবাসার দানস্বরূপ কম-বেশি ভক্তবৃন্দের অকৃত্রিম পরিশ্রম এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তিলে তিলে গড়ে উঠেছে আজকের এই শাহ মঞ্জিল।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাহ মঞ্জিলের এত বেশি প্রচার ছিল না। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে সারা বাংলায় শাহ মঞ্জিলের প্রচার এবং হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কারামত দেখে অনেক বড় বড় ভক্ত অনুরাগী বাড়তে

Chunati.com Pioneer in village based website

লাগল। আজকের এই শাহ মঞ্জিল নানার জীবনীতে না আসলে জীবনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যেত। সেজন্য একটু তুলে ধরলাম।

সীরতুন্নবী (স.) ইসলামের প্রচার প্রসার:

অনেকে বলতে পারেন, নানার জীবনীতে সীরতুন্নবী (স.) এর গোড়াপত্তন কথা আসবে কেন? হয়তবা এই বিষয়টা নিয়ে অনেকে লিখবেন। তাই আমি আমার আম্মাজানের কাছ থেকে যতটুকু জেনেছি, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সীরতুন্নবী (স.) আরম্ভ হয়, ছোট্ট পরিসরে একদিনের জন্য। সেই থেকে বাড়তে বাড়তে আজকের এই ১৯দিনব্যাপী ঐতিহাসিক সীরতুন্নবী (স.) এর পরিধি চুনতী গ্রাম থেকে সারা বাংলাদেশের ছড়িয়ে পড়েছে। আমি মনে করি, আমার নানাজানের সবচেয়ে বড় কারামত এই সীরতুন্নবী (স.)।

নানার কারামত : প্রকৃত আউলিয়ারা কখনো মৃত্যুবরণ করেন না। আম্মাজান আমাকে বলেছেন- আমার নানা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আম্মাকে শ্বশুর বাড়ি থেকে শাহ মঞ্জিলে নিয়ে আসেন। যদিওবা তখনও শাহ মঞ্জিল হয়নি। মা-কে নানাজান ভীষণ স্নেহ আদর করতেন। একমাত্র কন্যা হিসেবে এটাই স্বাভাবিক। তাই নানাজানের একমাত্র মেয়ে হিসেবে, একমাত্র ছেলের সাথে যৌথভাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে যান। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, প্রায় ৪২বৎসর বোনের পরিবার, ভাইয়ের পরিবার এখনো সুখে শান্তিতে মিলেমিশে বসবাস করে আসছি। অথচ বর্তমানে দুই ভাই একঘরে থাকতে পারে না। সেখানে আমরা এখনো শ্রদ্ধেয় মামাজান এবং আমার আম্মাজানের পরিবার মিলেমিশে নানার দোয়ায়, শান্তিপূর্ণভাবে একসাথে বসবাস করছি যা পৃতিবীর ইতিহাসে বর্তমানে কোন নজির নেই। এটা আমার নানার জিন্দা ওলির কারামত।

নিজ চোখে দেখা কারামত :

আমার আম্মাজন আমাকে বলেছেন, শাহ মঞ্জিলের প্রথম নিচতলায় বসবাস শুরু করেন। তখন আমার আম্মা এবং আমার নানাজান একরুমে থাকতেন। খাটের উপর নানাজান এবং নিচে আম্মা। আমার শ্রদ্ধেয় মায়ের একমাত্র বড় ভাই শাহজাদা জমাল আহমদ তখন গুদামঘরে থাকতেন। রাত আনুমানিক ১২টা থেকে ১টার দিকে নানাজান আম্মাকে বললেন, হারিকেনটা একটু বড় কর, পূর্বের দরজা খোল, ভয় পেয়ো না, আমার আম্মা হারিকেনটা বড় করে আস্তে করে দরজা খোলে দেখেন শাহ মঞ্জিলের ঠিক পূর্ব সূরের মাঝখানে একটা বাঘ হাঁটু গেড়ে মাথানত

করে পশ্চিমমুখী হয়ে বসে আছে। আম্মা ভয় পেয়ে আস্তে করে দরজা বন্ধ করে নানাজানকে সব কথা খুলে বললেন। তখন নানাজান বললেন আমার কাছে দোয়ার জন্য এসেছে।"

অনেক স্মৃতির মধ্যে বাবার সাথে একটা স্মৃতি:

আমার আম্মাজান আমাকে বলেছেন- নানাজানকে আমার মা যখনই সময় পেতেন, ফজরের নামাযের পরে চা-নাস্তা খাওয়াতেন। ভোর ৬/৭টার দিকে নানাজান আমার আম্মাকে প্রায় সময় বলতেন, মা তুমি আমার পাশে বস। একটু কোরান শরিফ তেলাওয়াত করে শুনাও। তখন আম্মাজান আমার নানাজানকে এক পারা কোরান শরিফ তেলাওয়াত করে শুনান। মা বলেছেন, নানাজান ঘুমিয়ে গেছেন। আম্মাজান ৫ মিনিট বসে থাকার পর নানাজান চোখ খুলে উঠে বসলেন। তখন নানাজান এবং আম্মাজান একসাথে অনেকক্ষণ মোনাজাত করেছেন। শেষে নানাজান মাকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন,"তুমি আমার একটাই আদরের মেয়ে, তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। আমার কোন কিছু অভাব নেই। তুমি আমার রুমেই থাকবে এবং রুমে বসে বসে কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করবে।"

আমার নানাজান এবং নানীজান দুইজনই আমার মাকে বেশি আদর স্নেহ করতেন। "তবে এই নয় যে, আমার শ্রদ্ধেয় একমাত্র বড় মামা যিনি এখনো আমাদের বুকে আঁকড়িয়ে জীবনে কোনদিন তুমি থেকে তুই বলেনি, সেই শাহজাদা জমাল আহমদকে আমার নানা আদর স্নেহ করতেন না। আমি নিজেই দেখেছি আমার জান্নাতবাসী পিতা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর একমাত্র জামাই মাওলানা মোহাম্মদ শিবলী এবং আমার দাদা মরহুম এনাম মাস্টার লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং একজন বড় আউলিয়া তথা হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) এর নাতী ছিলেন। তাঁকেও আমার নানা অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে মুনাজাত করছি- হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর আওলাদ, ভক্তবৃন্দ এবং যারা এক মিনিটের জন্য হলেও উনার কাছে এসেছেন, শত ব্যস্ততার মাঝেও এখনও দরবারে আসেন। বিশেষ করে এই জীবনী লিখতে গিয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ে যারা লেখা দিয়েছেন আমি দোয়া করছি সবাই যেন সুখে-শান্তিতে, সৎপথে জীবনযাপন করতে পারেন এবং আল্লাহ যেন সবাইকে হায়াতে তৈয়্যবা দান করেন। আমিন।

ghurai.com pioneer in village based website

হামিদা নুসরাত

নাতনী, হযরত শাহ সাহেব (রহ.)

✪ আমার মা নুরজাহান বেগম এর কাছ থেকে যা শুনেছি আমি আমার মা-বাবার প্রথম সন্তান। আমার বয়স যখন সাত-আট মাস তখন মা আমাকে আমাদের বাড়ির গলিতে বসিয়ে ঘরের কাজ করার জন্য রান্নাঘরে যেত সেই ভোর বেলায়। আমার দাদা চা খেয়ে সেই ভোরে বাইরে ঘুরে এসে আমাকে বসিয়ে রেখেছে দেখলে আমার দাদীর সাথে দাদা রাগ করে আমাকে কোলে নিয়ে আমাদের বাড়ির উঠানে কুরআন শরিফের সূরা পড়ে ঘুরতেন।

✪ ছয়-সাত বৎসর যখন আমার বয়স তখন আমার টাইফয়েড রোগ হয়, প্রায়ই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। সেই সময় দাদা আমায় কোলে নিয়ে দোয়া পড়ে পড়ে ফুঁদিতেন। কান্নাও করেছিলেন। আমার এই অসুখের জন্য ধবধবে সাদা গরু ছদকা দিয়েছিলেন।

✪ আমরা ভাইবোন নয়জন। আমার ছোট ভাই আজাদ যখন দুই-তিন বৎসর বয়স তখন দাদা তাকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যেত। ওখানে দাদা আল্লাহর এবাদতে মশগুল হওয়ার পূর্বে আজাদকে বন-জঙ্গলের বড় বড় হিংস্র জানোয়ারদের দিয়ে ঘোরাত। পশুরা দাদাকে সালাম করতে আসত। সেই পশু প্রাণীদের দাদা যা করতে বলত তাই তারা করত।

✪ আমাদের বয়স যখন একটু বাড়ল, তখন একদিনের কথা খুব মনে আছে। দাদা আজাদকে সেই জঙ্গলে নিয়ে গেলেন এবং বাঘের পিঠে চড়ালেন, আজাদের কাছ থেকে যখন আব্বা (শাহ জমাল আহমদ) জিজ্ঞেস করলেন, আজাদ সবকিছু তাঁকে বলে দিল। সেই থেকে আজাদকে আর জঙ্গলে নেননি দাদা।

✪ আমরা ভাই-বোনেরা পড়তে গেলে দাদা আমাদের ডেকে টাকা দিতেন। আজাদ বলত দাদাকে, আমাকে লাল টাকা দিতে হবে। দাদা লাল টাকাই দিতেন। দশ টাকার এবং পঞ্চাশ টাকার নোট ছিল লাল টাকার নোট। দিনে মাঝে মাঝে ঘুম হতে জেগে ওঠে মাগরিবের নামায শেষে দাদা বসে ওয়াজ নসিহত করতেন।

✪ কখনো কখনো ওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে মহানবীর শানে নাতে রাসূল (স.) পেশ করে এমন গভীরভাবে মশগুল হয়ে যেতেন যে, জোরে জোরে না'তে রাসূল পড়ে গলার স্বর পর্যন্ত পরিবর্তন করে ফেলতেন।

✪ পবিত্র হজ্বের উদ্দেশ্যে গমন করার সময় আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার বিশেষ আয়োজন হত। দাদার সাথে আমিও সি অফ করতে ঢাকা যেতে চাইতাম।

কিন্তু আমাকে নিতেন না। আজাদকে নিয়ে যেতেন। পবিত্র হজ্ব শেষে ফেরার পথে আমাদের জন্য প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন।

✪ আমার আম্মাকে দাদা মা বলে ডাকতেন। আমরা যখন দুই বোন এক ভাই, তখন দাদা দাদীকে বললেন, আমার একটি ভাই আসবে। এভাবে পরপর আমাদের আরো পাঁচটি ভাই আসল। এরপর প্রায় ৪/৫ বৎসর পর দাদার বলে যাওয়া কথা অনুযায়ী আমাদের আর একটি বোন হলো। তার নাম দাদা ইন্তেকাল করার কিছুদিন পূর্বে রেখেছিলেন জমিলা।

✪ আমার পড়ালেখা যখন অষ্টম শ্রেণিতে সে বৎসরই গাড়ি দুর্ঘটনায় দাদা চোখ দুটি হারিয়ে ফেললেন। দাদা আমাদের হাতের স্পর্শে আমাদের ধরে ধরে দেখতেন আমরা কত বড় হয়েছি। আর বলতেন আমার ভাই-বোনেরা কত বড় হয়েছে।

✪ দাদাকে একদিন হাত-পা টিপে দিচ্ছিলাম, অমনি সময় দাদার হাতের আংটি খুলে চলে আসল। তখন আমি বললাম, দাদা আংটিটি যেন আমার কাছে চলে আসতে চাইছে। খুব হাসলেন দাদা, আর বললেন তোমাকে তাহলে এটি দিতেই হয়। একদিন জসীম চাচুকে দিয়ে আংটিটি ঠিকই আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের যে বিষয়, দাদা আমার এক একটি ভাইদের নাম জন্মের পূর্বেই রেখে দিতেন। আমার মা যখন রাগ করতেন তখন দাদা বলতেন আমার ভাইবোনদের আমি আল্লাহর কাছ থেকে খুঁজে নিয়েছি, তুমি কেন রাগ করবে। আমার মা বললেন, খুঁজে নিয়েছেন বললেন কিন্তু ওরা যখন কান্না করে তখনতো আবার রেগে যান। দাদা বললেন রাগ কি এমনি এমনি করি। ওদের কান্নার শব্দে আমার নাড়িতে টান পড়ে যে! সেজন্যেই রাগী।

✪ মাঝে মাঝে আমাদের ডেকে দাদা পকেট থেকে বের করে টাকা দিতেন। আজাদকে ঠিকই লালগুলো দিতেন, আমাকে যে রকম হাতে ওঠত সে অনুযায়ী টাকা দিতেন। আমাদের সেসব টাকা দাদীর হাতে দিতাম। দাদী ঐ টাকা আধুনগর এক ব্যাংকে একাউন্ট খুলেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে হিসাব চালু না রাখায় ঐ টাকার খোঁজখবর নেয়া হয়নি।

✪ চোখের দৃষ্টি হারাবার পর একবার ভারতে আজমীর শরিফ গিয়েছিলেন, সেখান থেকে দাদা আমার জন্য একটা জামা নিয়ে আসেন। সেই জামা পরে দাদার সামনে আসলে তিনি আমাকে হাত বুলিয়ে বললেন- তোমার পছন্দ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, খুব পছন্দ হয়েছে। সেই জামাটা এখনো সযত্নে আমি রেখে দিয়েছি।

✪ দাদা সব ঈদের সময় কাপড় দিতেন। একবার কাপড় এনেছেন কিন্তু সেন্ডেল আনেন নি। আমার ছোট বোন সুরাত রেগে গিয়ে বললেন জামা পরে কি খালি পায়ে হাঁটবো? এখন চলেন বাজারে গিয়ে সেন্ডেল কিনে নিয়ে আসি। তখনই দাদা সুরাতকে দিয়ে আমাদের দুই বোনের জন্য সেন্ডেল নিয়ে আসেন।

✪ যখন আমার কোন ছোট ভাই বোন জন্ম হত তখন দাদা খুব খুশি হতেন, আর নানা-নানীকে খবর পাঠাতেন। নানা-নানী আসলে দাদা-দাদীকে বলতেন "আঁখ খোল নাও" ব্যায়ান আসতেছে দেখতেছনা? ঘরের বরান্দায় বসে নানীর জন্যে মোড়াকে উল্টিয়ে দিয়ে এগিয়ে দিতেন বসার জন্য, খুব হাসতেন। আমার মা আমার নানীর সাথে নাইয়্যর গেলে দাদা একদম সহ্য করতেন না। দু'একদিন যেতে না যেতেই কাউকে পাঠিয়ে মা-কে নিয়ে আসতেন।

✪ মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যেতেন আমাদের নিয়ে। আমি যখন খুব ছোট দাদা মাগরিবের নামায শেষে ভক্ত-অনুরক্তদের নিয়ে বসতেন, ওয়াজ নসিহত করতেন এবং না'তে রাসূল (স.) পড়তেন। এমতাবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। দাদা নিজ বিছানায় শুইয়ে দিতেন এবং রাতে নিজে নিয়ে বাথরুম সারাতেন। আমি ঘুমের ঘোরে উঠতে না চাইলে দাদা বলতেন- বোন ওঠ না। এমনিভাবে আমার দাদার মহৎ ও সুন্দর সুন্দর গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছি।

✪ মা আমাদের শাসন করে পিটালে দাদা রেগে দাদীকে বকা দিতেন। কেউ আসলে মেহমানদারির এক মহাআয়োজন হত। নতুন বউ যদি কেউ আসে আর কথাই নেই অবশ্যই তাকে খাওয়া সেরেই যেতে হবে।

✪ মাঝে মাঝে এমন রাতও কেটেছে আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক লোকজন আসত। আর দাদা আমার মাকে ডেকে কোমল স্বরে বলতেন- মা ওঠ, মেহমান এসেছে। একটু খাওয়া দাওয়া করাতে পারবে? মা জবাব সুরে বলতেন আপনি দোয়া করলে ইনশা আল্লাহ পারব। আর আমার দাদা খুশি হয়ে মেহমানদের বলতেন, "আপনারা না খেয়ে যেতে পারবেন না, আমার মা আপনাদের খেয়ে যেতে বলেছে। অতঃপর আমার মাও যত রাত হউক যত কষ্ট হউক হাসিমুখে রান্না করে খাওয়াতেন। দাদা খুশি হয়ে আমার মায়ের উদ্দেশ্যে বলতেন, তোমাকে আমি অনেক কষ্ট করে খুঁজে এনেছি। দাদা লেখাপড়া করাকেও খুবই ভালবাসতেন। যাকে যতটুকু পারতেন সহযোগিতা করতেন।

✪ দাদা যখন গোসল করতে যেতেন আমাদের বাড়ির পাশের পুকুরে। তখন মাঝে মাঝে পিছনে পিছনে আমরা নাতি-নাতনীরাও যেতাম এবং পিঠে সাবান লাগিয়ে দিতাম। দাদা বলতেন আমার ভাই-বোনেরা অনেক কিছু জানে বলে ধন্যবাদের সুরে কথা বলতেন।

◈ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী

✪ চুনতী গ্রামে একবার খুব ডাকাত পড়ছিল। দাদা তখন ভক্ত-অনুরক্তদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ নসিহত করছিলেন, রাত তখন বারটা হবে সম্ভবত। মসজিদের মাইক হতে ডাকাত পড়ার ঘোষণা আসল তখন আমার বুকের মধ্যে ধুক ধুক করতে লাগল আর মনটাও খুব খারাপ হয়ে উঠল। মনটা খুব খারাপ হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, ডাকাতেরা শুনছি হাফপ্যান্ট পড়ে বড় মাওলানা সাহেবের (মাওলানা আবদুল হাকিম) মাজারের পাশের বাড়িতে ডাকাতি করে চলে যাচ্ছে। সেজন্যে আমি দাদাকে গিয়ে বলছিলাম দাদা, আপনি থাকতে চুনতীতে ডাকাত আসে কেমনে? আপনি দোয়া পড়ে বন্ধ করতে পারেন না? তখন দাদা আমার কথাটি গভীরভাবে শুনে একটু পরে হ অ হ অ ধ্বনি তুলে হাততালি দিয়ে দোয়া পড়ে দিলেন। গভীর জঙ্গল থেকে ডাকাতরা সব ধরা পড়ে। সেই থেকে মহান আল্লাহর রহমতে চুনতীতে ডাকাতি এক রকম বন্ধ হয়েই আছে।

মুহাম্মদ ইসহাক

হুলাইন, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

✪ স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি তখন তদানীন্তন হাবিব ব্যাংকের পটিয়া শাখার ম্যানেজার। স্বাধীনতার পরেই (যা অগ্রণী ব্যাংক হিসেবে পরিচিতি পায়।) আমাকে বদলি করা হল অগ্রণী ব্যাংক আমিরাবাদ শাখার ম্যানেজার হিসেবে। অবিবাহিত যুবক। ব্যাংকের সুসজ্জিত আসবাবপত্র, ব্যাংক কোয়ার্টারেই থাকি। তখন যাতায়াত হত বিভিন্ন পার্টি, বন্ধু-বান্ধবদের বাসায়। প্রফেসর সিরাজ যিনি আমিরাবাদেরই লোক তিনি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন হিসেবে সময়ে অসময়ে আড্ডা দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমার এক শালি আছে তাকে আপনি বিয়ে করেন। বলার সাথে সাথে সাতকানিয়া কলেজে গিয়ে কনে দেখা হয়ে গেল। প্রস্তাব কিন্তু এগুচ্ছেনা। এমনি একসময়ে উনি বললেন, চলো চুনতী শাহ সাহেব কেবলার সাথে এ বিষয়ে একটু দোয়া চাই। তাতেও রাজি হলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় উনার বাড়িতে গেলাম। তিনি তখন বাড়ির ছাদের উপর একখানা চেয়ারে বসে আছেন। যথারীতি সালাম বিনিময়ের পর প্রফেসর সিরাজ কাঙ্ক্ষিত প্রস্তাবখানা পেশ করলেন। শুনলেন এবং হাসলেন ও জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটি খুব সুন্দর নাকি। সনটি আমার ঠিক মনে নেই। ১৯৭১/১৯৭২ এর দিকে হবে।

প্রথম দর্শনের পর আমার মনমানসিকতায় এমন পরিবর্তন দেখা দিল তা প্রকাশ করার মত নয়। আর উনার প্রেমে এমন মুগ্ধ হয়ে যেতে থাকলাম নিজেও কিছু কিছু টের পাচ্ছি। এজন্যই বুঝি জ্ঞানীরা বলে গেছেন। ওলিদের সংস্পর্শে একটি মিনিট ৭০ বছরের নফলিয়া এবাদত হতে শ্রেষ্ঠ। যারা জীবিত ওলির সামনে বসার

সুযোগ পান নাই তারা কবরে গিয়ে হলেও এসে দেখুক, কেমন লাগে। যারা ওলি বিশ্বাস করেনা, তাদের মাজারকে অশ্রদ্ধা করে এমন হীন মানসিকতা পরিহার করে মুসলমানের মত বেঁচে থাকার তৌফিক লাভ করুক। মিসকিন, এ দোয়াই করছি। আস্তে আস্তে কাল গড়িয়ে চলেছে। তখন আমিও অনেক চড়াই-উৎরাই পার হচ্ছি। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ এর দিকে আমিরাবাদ শাখায় এক ক্যাশিয়ার গ্রাহকের সামান্য টাকা চুরি করল। তাকে ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরও করা হল, তারপরও আমার চাকরি গেল। মামলা করে দিলাম চট্টগ্রাম আদালতে অন্যায় ডিসমিসালের বিরুদ্ধে। এমনি এক সময়ে ইনি একদিন হাজী মকবুল আহমদ চৌধুরী বাসায় এলেন। আমার বড় ভাই মোহাম্মদ মুছা তিনি পেশোয়ারী সৈয়দ শাহ হুযুরের সাগরিদ ছিলেন। ত্বরিকতের অনেক উচুঁ আসনে ছিলেন। ইনি আমাকে নিয়ে শাহ সাহেব কেবলার ওখানে গেলেন। শাহ সাহেব কেবলাকে বললেন হুযুর আমার ভাইত চুরি করে নাই তার চাকরিটা কেন গেল বুঝলাম না। তখন শাহ সাহেব কেবলা বললেন, তাহলে চাকরিটা আসুক না। চট্টগ্রাম আদালতে মামলা করেছি। সর্বোচ্চ থেকে আরম্ভ করে সর্বনিম্ন অনেককে আসামী করে। জবাব দিতে পারছিল না। এমনি সময় ব্যাংকের এম ডি আমাকে ডাকলেন। বললেন, আপনার মামলার শুনানী আমার এখানেই হবে। তখন রমজান মাস। বিচার বিবেচনায় নির্দোষ প্রমাণিত হলাম। সব দেনা-পাওনা শোধ করে দিবার হুকুম দিলেন। সাথে সাথেই আমাকে পোস্টিং দিলেন প্রধান কার্যালয়ের হিসেব বিভাগে। সরাসরি কাজ করছি। তখন ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে হবে।

✪ একদিন অফিসে যাচ্ছি, পূর্বাণী হোটেলের সামনে দেখা হয়ে গেল হাজী ছালেহ আহমদ চৌধুরী সাহেবের সাথে। ইনি আমার নিকট পরশি। উনি তখন শিল্প-কারখানা স্থাপনে চট্টগ্রামে কয়েকজনের মধ্যে একজন। উনি ইতিমধ্যে কলেজ, মসজিদ, মাদরাসাসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। দেখে আমাকে বললেন, মাদরাসাটির সভা অমুক তারিখ, আসলে ভাল হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ফাঁকে তাঁকে বললাম অনেক আলেম-ওলেমা ত আসবেন। কোন ওলিকে দিয়ে মাদরাসা জন্য দোয়া করাতে পারলে খুবই ভাল হয়। দরবারে এলাহীতে মাদরাসা রেজিস্ট্রিভুক্ত হলে এটা আর হারিয়ে যাবার বা লুপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকবেনা। দ্বীনদার নেক্কার আলেম পয়দা হবে ইত্যাদি খেয়ালের বশেই তাকে এ প্রস্তাব দিলে ইনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বললেন তাহলে কি করা যায়। যদি সম্ভব হয় চুনতীর শাহ সাহেব কেবলাকে দাওয়াত দেবেন। দোয়া করাতে পারলে সবদিক থেকে মাদরাসা সফলকাম হবে।

শাহ সাহেব কেবলাকে ঐ বছরেই দাওয়াত দেয়া হল। উনার আগমন সংবাদে মাদরাসার মাঠ ছাড়িয়ে অলিতে গলিতে মানুষের আগমন ঘটল। যথাসময়ে উনি

এলেন। হুলাইন গ্রামের মানুষ উনাকে দেখলেন। অনেকে উনার কাছ থেকে শান্তি পেলেন।
জনাব ছালেহ আহমদ চৌধুরী সাহেব এরপর থেকে উনার একজন উঁচু দরজার ভক্ত হিসেবে পরিগণিত হলেন। মিটিংয়ে অথবা কোন জরুরি অবস্থার উদ্ভব হলে উনি যেতেন। ইতোমধ্যে সীরত মাহফিলের বয়স বেড়ে আস্তে আস্তে শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিতে শুরু হল। মানুষ ধারণ করার জন্যে মাঠের প্রয়োজন দেখা দিল। মিটিং হল। এ বিষয়ে মিটিং হলে চৌধুরী সাহেব হাফেজ হারুন সাহেবকে সাথে নিয়ে এলেন। এক লক্ষ টাকার একখানা চেক লিখে দিয়ে বললেন শাহ সাহেব কেবলার নির্দেশ মত যেখানে জমি ক্রয়, পাহাড় সমতল করা ইত্যাদি কাজ যেন তাড়াতাড়ি শুরু করা হয়। যতটুকু জানি সম্ভবত এই ময়দানের যাবতীয় খরচ উনি বহন করেছিলেন (এই বিষয়ে বর্তমানে হাফেজ হারুন সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক তথ্য পাবেন।)
ওলি প্রেমে বিভোর হয়ে যে কাজ উনাকে দিয়ে ঐ দরবারে আল্লাহ করালেন কেয়ামত পর্যন্ত সীরত ময়দান হিসেবে থেকে গেল। উনি দুনিয়াতে নাই। উনি বেঁচে থাকলে হয়ত এ কথাগুলি উনি লিখতেন। উনার হয়ে তথ্যটি জানালাম, উনার জন্য দোয়া কামনা করলাম।

✪ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ এর শেষের দিকে হবে। আমি হেড অফিস থেকে ম্যানেজার হিসেবে বদলি হয়ে আমাদের চট্টগ্রামের পাহাড়তলী শাখায় আসি। এখানে হাজী আমিনুল হক এখনো বেঁচে আছেন। আল্লাহ তার হায়াত দারাজ করুক। একদিন ওনাকে নিয়ে চুনতী গেলাম। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধায় হয়ত কাতর হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছেন কোথায় এলাম। হোটেল মোটেল কিছুই নাই। যার কাছে এলাম উনি ভাতের ব্যবস্থা করবেন কিনা। তখনি কোনখান থেকে শাহ সাহেব কেবলা আমাদের সামনে এসে গেলেন এবং হাজী সাহেবকে উদ্দেশ্যে করে বললেন "মার পেটে যখন ছিলেন তখন কে খাওয়াচ্ছিল? আমরা বিস্ময়বোধ করলাম। আমরা জেনে গেলাম, মনের বিরাজমান কথাগুলিও না বললে, না প্রকাশ করলে ওলিরা শুনে যান।
যথারীতি অতি সমাদরে খাওয়া দাওয়া হল। এ দরবারে অনেকদিন অনেকবার খেয়েছি। মুরগীর মাংস এটা সব সময়ে পেয়েছি। শ্বশুর বাড়ির জামাই-আদর পেয়ে যেন দু'জনে অতি তৃপ্তির সাথে খেলাম। হাজী আমিন খুব বড় ধনী মানুষ। ইনিও হুযুর কেবলার ভক্তে পরিণত হলেন। যদিও ইনি জামালপুরের কোন এক পীরের মুরিদান। এভাবে সীরতের সময় দীর্ঘদিন হাজী সাহেবের গাড়িতে করে গেলাম। দরবারের কিছু কিছু কাজে শরিক হন। এখনও পর্যন্ত সীরতের চাঁদা

সংগ্রহে আবুল কোং'র ছেলে কাসেম সাহেব থেকে উনি সীরতের জন্য চাঁদা আদায় করেন।

একদিন আমি নিজে (তখন আমি অগ্রণী ব্যাংক পাহাড়তলী শাখার ম্যানেজার) নিজের মাঝে কলবে /দেহে অসাধারণ ও বর্ণনা করাযায় না এমন কিছু আলামত অনুভব করলাম। ভাবলাম মৃত্যু হয়ত খুবই নিকটবর্তী। এ ধরনের বিরাজ করছিল। মন চায় আমি উনার শরণাপন্ন হই। ভাবলাম আর ফিরে কি হবে। ইনি যদি ইজাযত দেন তাহলে পাহাড়ের দিকে চলে যাব। এশার বা মাগরিবের পর ইনি বাড়ির সামনে চেয়ারে বসা। ওখানে এক সময় বাঁশের বেড়া দেওয়া একটা ছোট্ট বৈঠকখানা ছিল। ইউসুফ টেক্সটাইলের মালিক ইউসুফ সাহেবও ঐ ঘরে ঘুমাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এ সময়ে উনার চেয়ারের পেছনে দাঁড়ালাম। উনি কোরআনের আয়াত থেকে কিছু পাঠ করে আমাকে বুঝালেন। ঐ আমার মাঝে যে বিকার ছিল, তার সম্পূর্ণ সমাধান পেয়ে গেলাম। আমাকে কিছু বলতেও হয় নি। বুঝাতেও হয় নি যে আমার কলবের অবস্থা এইরূপ। এ রকম লাগছে। বাতেনি এলম জানা লোক এমনভাবে তাদের কাছে কিছু খুলে বলার প্রয়োজন হয় নি। নিজ থেকে বুঝে ফেলেন এবং আপনার রুহানি রোগের সমাধান দেন।

আবু জাফর চৌধুরী
বৈলছড়ি, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

✪ আনুমানিক ১৯৭৮/৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমি সোনালী ব্যাংক লোহাগাড়া শাখায় কর্মরত। প্রায় ২ বৎসরাধিককাল কর্মস্থলে অবস্থান করছিলাম প্রধান কোষাধ্যক্ষ হিসাবে। থাকতাম লোহাগাড়াস্থ লেয়াকত মিয়ার বাড়িতে। লোহাগাড়া সোনালী ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় লেয়াকত মিয়ার বাড়িতে চুনতী শাহ সাহেব হুযুরের নানান করামতের কথা শুনতাম। বারেবারে শুনার ফলে আমার শাহ সাহেব (রহ.) হুযুরের সান্নিধ্যে যাওয়ার আগ্রহ জাগে। আগামী সপ্তাহে যাব এ পরিকল্পনা করে সাপ্তাহিক বন্ধের সময় গ্রামের বাড়ি গিয়ে আমার ১ম পুত্র হাসান ফেরদৌস চৌধুরী (মিঠু) কে আমার কর্মস্থলে নিয়ে যাই। তখন তার বয়স ৭/৮ বছর।

লেয়াকত মিয়ার পরিবারের সদস্যগণকে সঙ্গে নিয়ে আমি চুনতী গমন করি শাহ সাহেব হুযুরের কাছে। সকালবেলা তথায় পৌঁছে তাঁর দালানের উপরের তলায় দোয়ার জন্য গমন করে তাঁর মজযুব হালত দেখে ভীত হই। কিন্তু নিচে লেয়াকত মিয়ার পরিবার অবস্থান করছেন বলে হুযুরকে জানানোর সাথে সাথে শাহ সাহেব হুযুরের মেজাজ স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসে এবং শান্ত হয়ে যান এবং আমাদের

সাথে নিয়ে নিচতলায় নেমে আসেন। লেয়াকত মিয়ার পরিবারকে তাজিম দেখান এবং আমাদেরকে আপ্যায়ন সহ দোয়া করেন। উল্লেখ্য, শাহ সাহেব হুযুর মজযুব থাকা অবস্থায় বন জঙ্গল থেকে হঠাৎ করে নাকি লেয়াকত মিয়ার লোহাগাড়স্থ বাড়িতে চলে আসতেন। ২/১ দিন অবস্থান করে পুনরায় নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। সেই সময় লেয়াকত মিয়ার পরিবারবর্গ হযরত শাহ সাহেব হুযুরকে যথাযথ তাজিম সহকারে আদর যত্ন করতেন।

লেয়াকত মিয়ার বাড়িতে অবস্থানকালীন জানতে পারি, লেয়াকত মিয়া একবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। নানা রকম চিকিৎসায় কোন ফল হচ্ছিল না। তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এতে তার খাওয়া দাওয়াও অনেকটা বন্ধ বলা যায়। এমনি অবস্থায় একদিন হঠাৎ করে শাহ সাহেব হুযুর এ বাড়িতে চলে আসেন। এসে লেয়াকত মিয়ার এরকম অবস্থা দেখে মুহূর্তের মধ্যে চলে যান এবং ২/১ দিনের মধ্যে পুনরায় ফিরে আসেন এবং এসে বললেন, আল্লাহর থেকে লেয়াকত মিয়ার জন্য হায়াত নিয়ে এসেছি এবং পরিবারের সদস্যদের নির্দেশ দিলেন জোরপূর্বক তার মুখ খোলার জন্য। মুখ খোলার সাথে সাথে লেয়াকত মিয়া দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে থাকেন। খাওয়া দাওয়া শুরু করেন। ফলে তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেন।

উল্লেখ্য, লোহাগাড়া সোনালী ব্যাংকে প্রায় ২ বছর কর্মরত অবস্থায় এ লেয়াকত মিয়ার বাড়িতেই থাকতাম। এ পরিবারে থাকা অবস্থায় তাদের আন্তরিকতা মহানুভবতা ভুলবার নয়। এ বাড়ি থেকে ২ বছর সীরতুন্নবী মাহফিলে যোগদান করি এবং শেষ মুনাজাতে শরিক হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি।

আবদুল জব্বার চৌধুরী ও আবদুল করিম চৌধুরী

পিতা-মরহুম আবদুল জলিল চৌধুরী (জলিল শেঠ)
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

✪ ১৯৫২/৫৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাদের সাতকানিয়ার গ্রামের বাড়িতে ও শহরের আছাদগঞ্জের বাসায় আসা-যাওয়া করতেন। তখন তিনি অত্যন্ত মজযুব ছিলেন। আমাদের আব্বাজান ওনার সেবাযত্নে খুব তৎপর থাকতেন। আব্বাজানের কারে করে মজযুব অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করতেন।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসার পর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) চালু হলে আমাদের আব্বাজান বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাজানের ইন্তেকাল পর্যন্ত হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ও সীরতের খেদমতে তৎপর ছিলেন।

নুর আহমদ (হাজী ক্লথ স্টোর)
বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম

আমার বিবাহ হয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে, তারিখ মনে পড়েছ না। বার ছিল সোমবার। তখন চুনতী সীরত মাহফিল চলছিল। আখেরি মোনাজাত মঙ্গলবার দিবাগত রাত। আমি মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় ঘর থেকে বের হওয়ার পথে আমার এক ভাবী বলে, সন্ধ্যা হওয়ার আগে যেন বাড়িতে চলে আসি। বাহিরে রাত যাপন করা নিষেধ আছে। তখন শাহ মঞ্জিলের দক্ষিণ পাশে মাহফিল চলত।

আমি যোহরের নামাযের আগে ওখানে পৌছে যাই। জামায়াত আদায় করি। স্থান পেয়েছি মাঠের সর্বদক্ষিণে এবং একই বৈঠক থেকে আছর ওয়াক্তের জামায়াত আদায় করে বাড়ি আসার উদ্যোগ নিই। আশা ছিল আসার পূর্বে শাহ সাহেবের সাথে মোসাফাহা করে একটু দোয়া নেব। দেখলাম তা সম্ভব নয়। স্টেইজে পরিপাটি এক চেয়ারে শাহ সাহেব বসা। উনার সাথে মোলাকাত করার জন্য অগণিত লোকের তিনটি লাইন। এক লাইন পূর্ব দিক থেকে এক লাইন পশ্চিম দিক থেকে আর এক লাইন সামনে দক্ষিণ দিক থেকে। তখন যাতায়াতের সমস্যা ছিল। বেশি দেরি হলে বাড়ি আসার গাড়ি পাওয়া যাবে না। তাই শাহ সাহেব হুযুরের সাথে মোলাকাতের আশা ত্যাগ করে আমি পশ্চিম পাশের ঢালু পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে মাদরাসার দিকে চলে আসতে মাদরাসার সম্ভবত দক্ষিণ পূর্ব কোণে উপর থেকে নিচে একটি থলি জায়গায় চোখ পড়ে। মনে হয় লাঠিসোটা নিয়ে মারামারি হচ্ছে। তখন আমি একটু ভাল করে খেয়াল করলাম। দেখলাম সেখানে শাহ সাহেব মনে হয় গরু জবেহ করার আগে গরু দেখতে গেছে। সামনের লোকগুলি দু'হাতে রাস্তা পরিষ্কার করতেছে অর্থাৎ মানুষজন সরিয়ে দিচ্ছে। দুই স্থানে একি সাথে শাহ সাহেব হুজুরকে দেখে হতবাক হয়ে যাই।

মুজাম্মেল হক চৌধুরী
বড়ঘোপ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

পরম করুণাময় আল্লাহ তা'য়ালার নামে

একবার ডেমুশিয়ার এক লোক নতুন গাছের এক খোকা ডাব নিয়ে অলিকুল শিরোমণির কাছে উপস্থিত। কিছুক্ষণ ডাবগুলি রাখার পর ঐ লোক ঐ ডাবের পানি গ্রহণ করার জন্য বললে শাহ সাহেব হুজুর বললেন, আমি সব পানি পান করেছি। পরক্ষণে ডাবগুলি কেটে দেখার পর ঐ ডাবে আর পানি ছিলনা।

একবার হযরত শাহ আমানত (রহ.) এর বংশধরদের কয়েকজন কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। চনুতী বাজারের দক্ষিণ দিকে গাড়িতে তাদের সাথে হযরত শাহ সাহেবের দেখা হয়। তিনি দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন তারা তাঁকে সালাম করে বললেন হুযুর আপনি আমাদের সাথে গাড়ি করে শহরে চলেন। তিনি অস্বীকার করে চুনতীর উল্টাদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যেতে শুরু করলেন।

হযরত শাহ আমানত শাহ (রহ.) এর আওলাদেরা যখন শহরের আন্দরকিল্লা মসজিদ পার হচ্ছেন তখন দেখলেন যে, তিনি পায়ে হেঁটে লালদীঘির দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে আসছেন। তাঁরা তাকে দেখে হতবাক হলেন। এরকম বহু ঘটনা লোকমুখে শুনেছি।

মুহাম্মদ আব্বাছুর রহমান

বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

✪ ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে দেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হচ্ছিল তখন আমি সম্ভবত পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। নির্বাচন উপলক্ষে বড়হাতিয়া মনুফকির হাটে চেয়ারম্যান প্রার্থীগণের নির্বাচনী ক্যাম্প ছিল। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে রিক্সাযোগে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) হঠাৎ করে তথা এসে উপস্থিত।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) তথায় পৌঁছার সাথে সাথে সকল নির্বাচনী ক্যাম্পে হুযুরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলে আগ্রহ সহকারে এগিয়ে আসে। ঐ সময় আমার আব্বাজানের সাথে আমি তথায় উপস্থিত দেখলাম হযরত শাহ সাহেব (রহ.) রিক্সা থেকে নেমে মাত্র ১ মিনিটের জন্য এক চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্যাম্পে গিয়ে বসেন। চেয়ারে বসবার মুহূর্তে আমার আব্বাজান নিজের গায়ের শাল বিছিয়ে দিলেন। পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যে প্রার্থীর ক্যাম্পে বসেছিলেন উক্ত প্রার্থীই জয়লাভ করেন।

✪ আমি সম্ভবত চুনতী হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা সৈয়দ আলী আহসান সীরত মাহফিলে তশরিফ আনেন। ঐ দিন স্কুল বন্ধ থাকার পরও স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্কুলে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতে আমিও স্কুলে উপস্থিত ছিলাম। তখন সীরত মাহফিল চলাকালীন ক'দিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকত। শিক্ষকগণের নেতৃত্বে আমরা ছাত্র-ছাত্রীরা আগত শিক্ষা উপদেষ্টাকে স্বাগত জানাতে স্কুল প্রাঙ্গণে লাইন ধরে দাঁড়াই। ঐ সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) শিক্ষা উপদেষ্টাকে সাথে করে চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা পরিদর্শন করায়ে আমাদের স্কুলের দিকে নিয়ে আসেন। তখন আমরা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) জিন্দাবাদ, শিক্ষা উপদেষ্টা জিন্দাবাদ সমস্বয়ে গগণবিদারী শ্লোগানে মুখরিত করছিলাম।

ঐ সময় আমি একজন ১০ম শ্রেণীর ছাত্র হয়েও হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর প্রতি শিক্ষা উপদেষ্টার তাজিমমূলক আচরণ লক্ষ্য করে অবাক হয়ে যাই। শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় আমাদের উদ্দেশ্যে দুই-চার কথা বলে শেষের দিকে বললেন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সম্মানার্থে আজকের জন্য আমাদের ছুটি দেয়া হল। সাথে সাথে আমাদেরকে মাহফিলে গিয়ে কাজ করতে নির্দেশ দিলেন।

মুহাম্মদ ফরিদুল আলম

করাইয়ানগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

আমি যখন দশম শ্রেণির ছাত্র তখন একদিন মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) এ যাই। আমার এক আত্মীয় চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরসাার ছাত্র। নাম আবদুল করিম। গেইটের নিকট থেকে টাকা দিয়ে কিছু খেতে ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমার আত্মীয় আমাকে সীরত মাহফিলে তবরুক হিসেবে ভাত খাওয়াতে চেয়েছিলেন। মাটির বাসনে গোশত ও ভাত একসাথে একবারে সরবরাহ করা হল। বা তৃপ্তি সহকারে খেলাম। এ খাবার আমার কাছে খুবই মজাদার মনে হয়েছিল যা আজও আমার মনে জাগরুক রয়েছে। সীরত মাহফিল যেমনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কারামত তেমনি তাঁর মেহমানদারি জারি থাকাও তাঁর অন্যতম কারামত মনে করি।

সীরত মাহফিলে শেষরাতে একসাথে যিকর ও আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি আমার মনে এ বেহেশতি পরিবেশ বলে অনুভূত হয়।

সরওয়ার উদ্দিন

১৪৫ মাঝিরঘাট রোড, পূর্ব মাদারবাড়ি, চট্টগ্রাম

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস। আমার অবিবাহিত জীবন, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমন একটা উন্নতি করতে না পেরে বিদেশ চলে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার কয়েকদিন আগে খবর পেলাম, ঘাটফরহাদবেগ এলাকার এক ব্যবসায়ীর দাওয়াতে এসেছিলেন সে কালের জিন্দা ওলি চুনতীর হযরত শাহ সাহেব (রহ.)। খবর পেয়ে দোয়ার জন্য গিয়েছিলাম। এমন সময় আমি গিয়ে পৌঁছেছিলাম-মানুষের কোন ভিড় ছিল না। একা বিছানায় শুয়েছিলেন।

আমি সোজা ওনার বিছানার পাশে গিয়ে ওনার পায়ে যখন হাত দিয়েছিলাম, ওনি হাত তুলে ফেলতে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার হাত এত গরম কেন? সে সময় আমার শরীরের অবস্থা এমন ছিল কেউ হাত দিলে মনে করতো আমার ভীষণ জ্বর। আমি বলেছিলাম এমনিতেই আমার শরীর এ রকম গরম থাকে। উনি আমাকে এক গ্লাস পানি দিতে বললেন, আমি পানি দিই। গ্লাসের

অর্ধেক পানি তিনি পান করে বাকি পানিগুলো আমাকে পান করতে বলায় আমি পান করে নিই, সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি সুস্থ আছি।
বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে দোয়া করেছিলেন, বিদেশে ২৪ বৎসর কাটিয়েছি। নিজ পরিবারকে সাথে নিয়ে, সুন্দর সচ্ছল জীবন যাপন করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওলিগণের দোয়া কোনদিন ফিরায়ে দেন না। আমি উপকৃত। জীবিত মানুষের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ ওলিদের দুনিয়াতে পাঠান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শোকর গুজার করি, সত্যিকার ওলির সান্নিধ্যে যাওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

✪ তিনি সব সময় আল্লাহর রাসূলের (স.) চিন্তায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন এবং মানুষের মুক্তির পথের চিন্তায় থাকতেন। মেহমানদারি, আপ্যায়নে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে মসজিদ, পবিত্র কবরস্থানে, পাহাড়ে, বনজঙ্গলে গভীর রাতে, দিনে, শহরে, বন্দরে, ধনী, গরিব, অসহায় পরিবার পরিজনের সাথে গমনাগমন করতে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নিকট দোয়া কামনার জন্য প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে গভীর রাত্রে ও দিনে তাঁর নিকট গমনাগমন করতাম এবং তিনি আমাকে দোয়া করতেন।
আমি যখন বাল্যকালে পবিত্র রমজানের ই'তিকাফে স্থানীয় চুনতী শাহী জামে মসজিদে অবস্থান করি তখন তিনি গভীর রাত্রে উক্ত মসজিদে গমন করতেন। তিনি এবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর প্রার্থনা শেষে আমি তাঁর কাছে অবস্থান করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, কেমন আছ? দোয়া করি ভয় করো না।

✪ আমার বাল্য অবস্থায় দেখামতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে পাগল বলে অনেকে দুর্ব্যবহার করতেন। অনেকেই সৎ ব্যবহার করতেন কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকারের আল্লাহ ও রাসূলের (স.) পাগলপ্রেমিক। ইহা সত্যি প্রমাণের প্রতীক প্রস্ফুটিত বর্তমান ১৯ দিনব্যাপী বিশ্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সীরত মাহফিল (স.)। মসজিদে বাইতুল্লাহ ও চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসা পরিপূর্ণতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ।

✪ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতে রাত্রে-দিনে আসতেন এবং আমাদের মাতাপিতার সাথে সৎ ব্যবহার, সদাচরণ ও ভালবাসতেন।
যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন বাংলাদেশে আল্লাহ ও রাসূলের (স.) ইসলামের কথা বলাতে মানুষের সাহস ছিল না। আল্লাহ ও রাসূলের (স.)

আনুগত্যকারীদেরকে কথায় কথায় আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে পতিত হতে হয়েছিল এবং ইসলাম ধর্ম পালনের কঠিন মুহূর্ত অতিবাহিত হয়।

তখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সারাদেশব্যাপী হতে প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম, পীর মশায়েখ, ধনী-গরীব, সরকারি-বেসরকারি, জনগণ, কর্মচারী নিয়ে ইসলামের দাওয়াত সীরত মাহফিল (স.) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ ও রাসূলের (স.) উপর দৃঢ় বিশ্বাসী। তাই তিনি নির্ভয়ে ইসলামের এই কঠিন সময়ে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের সত্যের দাওয়াতে একাত্ম হন। এই মহতী কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি আমাদের মাঝে চিরদিন সম্মানের পাত্র হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মাওলানা মাহমুদুল হাসান আনছারী

অধ্যক্ষ, পদুয়া আইনুল উলুম দারুচ্ছুন্নাহ ফাযিল মাদরাসা
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

✪ খোদাপ্রাপ্তির ছুলুকের ব্যাপারে হযরত আলহাজ্ব শাহসুফি মাওলানা হাফেজ আহমদ (শাহ) সাহেব চুনতী (রহ.) এর দিকনির্দেশনা।

তরিকতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- وصول الى الله- حصول رضاء مولى

অর্থাৎ খোদাপ্রাপ্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আমি পারিপার্শ্বিক কারণে ছোটবেলা থেকেই আউলিয়ায়ে কেরাম এবং ত্বরিকতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১১ বৎসর বয়সে কুতবুল এরশাদ হযরত আলহাজ্ব শাহসুফি মাওলানা আবদুল মজিদ (বড় হুজুর রহ.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি। তৎকালে মরহুম হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর বেলায়ত প্রকাশ পেতে থাকে।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আলিম পরীক্ষার পর আমি শাহ সাহেবের কাছে ভাল ফলাফলের জন্য দোয়া চাইলে তিনি সাথে সাথে ভাল ফলাফলের ইঙ্গিত প্রদান করেন। ফল প্রকাশের পর দেখতে পাই যে, আমি ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি।

* গারাংগিয়া দরবারের অন্যতম খলিফা হযরত এ.কিউ.এম মহিউদ্দিন মুজাদ্দেদী একবার কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, তিনি চট্টগ্রাম শহরের কোন এক বাড়িতে চুনতী হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর মোলাকাত লাভ করেন। ঐ মোলাকাতে হযরত মুজাদ্দেদি সাহেব আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে নানান কথা বলে যেতে লাগলেন। মুজাদ্দেদি সাহেব দীর্ঘক্ষণ ধরে বললেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (রহ.) নীরবে শুনে থাকা বাদে প্রতিউত্তরে একটি কথাও বললেন না।

দীর্ঘদিন পর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ঢাকায় বিচারপতি সিদ্দিক আহমদ চৌধুরীর বাসভবনে অবস্থান করছেন জেনে হযরত মোজাদ্দেদি সাহেব মোলাকাত

করতে যান। ঐ সময় ঐ বাড়ির বৈঠকখানায় প্রচুর লোকজন উপস্থিত ছিল। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) অবস্থান করছিলেন ভিতরের কক্ষে।
মোলাকাত প্রার্থীগণের মাঝে চট্টগ্রাম থেকে যাওয়া জনাব মকবুল আহমদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর অন্যতম ভক্ত। এদিকে হযরত মুজাদ্দেদি সাহেবেরও অতি আপনজন জনাব মকবুল আহমদ চৌধুরী, হযরত মুজাদ্দেদি সাহেবকে দেখামাত্র ভিতরে গিয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে তার আগমনের কথা জানান।
এতে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানায় চলে আসেন এবং মুজাদ্দেদি সাহেব হুযুরকে নিম্নোক্ত কথাগুলি অনর্গল বলে যেতে লাগলেন- এক মোরাক্বাবায় দশ বছর থাকতে হবে, আপনি পারবেন, আপনি পারবেন, আপনি পারবেন, আল্লাহ থেকে কিছু চাইবেন না, শুধু দোজখের আগুন থেকে পানাহ পেতে চাইবেন। আল্লাহ কবুল করবেন। আল্লাহর সাথে আমার কথা হয়ে গেছে, আল্লাহ আমাকে দোজখে দিবেন না, আল্লাহ মিথ্যা কথা বলেন না।"

মুহাম্মদ এরশাদুল হক
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

✪ সেই ছোটবেলা থেকেই (ষাট এর দশক) দেখে এসেছি শাহ সাহেব মামা মজযুব অবস্থায় ইচ্ছেমতো পাহাড়-জঙ্গল, লোকালয়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং মুখে সর্বক্ষণ হাম্ মাযারে মুহাম্মদ পে মর যায়েঙ্গে- পংক্তিটা সুর করে আওড়াতেন যার অনুসরণ এখনও সে ষাটের দশক থেকে শুরু করে মজযুবত হালতে আমার কানে বাজে।

✪ শাহ সাহেব মামা যখনই চুনতী গ্রামে আসতেন অবশ্যই আমাদের বাড়ি আসতেন। শাহ সাহেব মামা রাতের বেলায় আমাদের বাড়িতে ঢুকলে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যেত এবং আমরা সবাই উনার সামনে বসে থাকতাম। শাহ সাহেব মামা অনেক ধরনের কথাবার্তা বলতেন এবং আমরা সবাই একাগ্রচিত্তে উনার মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম। আম্মা কিছুক্ষণ পরপর রং চা দিতে থাকতেন। কাপ থেকে প্লেইটে চা ঢেলে পান করতেন। মাঝে মাঝে প্লেইটে থাকা কিয়দংশ চা আমাদের কাউকে খেতে বলতেন। আমরা পরম ভক্তি সহকারে এ চা-টুকু খেতাম।

✪ খাটে অথবা চেয়ারে বসে শাহ সাহেব মামা অনবরত নানান তথ্য ঘটনার কথা বলতে থাকতেন যেগুলো আমাদের বোধগম্য হউক আর না হউক আমরা একাগ্রচিত্তে শুনে থাকতাম। শাহ সাহেব মামার বক্তব্যের অধিকাংশ জুড়েই হযরত রাসূল করিম (স.) ও সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনাবলী বর্ণনা থাকত। শাহ

Chunati.com Pioneer village based website

সাহেব মামার আগমন প্রায়শই মাঝরাতে ঘটত। যতক্ষণ শাহ সাহেব মামা আমাদের বাড়িতে অবস্থান করতেন ততক্ষণ আমরা উনার সামনে মাটিতে বসে থাকতাম। আমাদের বাড়ির প্রতি শাহ সাহেব মামার একটা আলাদা সুনজর ছিল। একটা ঘটনা বললেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ষাটের দশকের শেষদিকের ঘটনা। একদা রাত্রে শাহ সাহেব মামা আমাদের বাড়িতে এসে কিছুক্ষণ অবস্থান করে রাত ১২ টার দিকে চলে গেলেন। ঐ রাত্রের শেষ প্রহরে আমাদের বাড়িতে সিদ কেটে চোর ঢুকে। আমার ছোট বোন নন্নীর হঠাৎ ঘুম ভাঙলে অন্ধকারে টর্চের আলো দেখতে পায়। সে ভীত হয়ে তার পার্শ্বে ঘুমন্ত আমার নানীকে জোর করে ঠেলে বসিয়ে দেয়। এতে নানী বিরক্তি প্রকাশ করলে সে চোর ঢোকার কথা বলে।

নানী চোর চোর বলাতে জেগে উঠা আম্মাও হাঁকডাক দিলে আমরাও জেগে উঠি। ইত্যবসরে চোরেরা সব পালিয়ে যায় এবং অবাক বিস্ময়ে আমরা লক্ষ্য করি সবগুলো দরজা খোলা থাকলেও বাড়ির কোন মালপত্র চোরেরা নিয়ে যেতে পারেনি। শাহ সাহেব মামার প্রতি আমার আম্মার অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। আম্মার একটা অভ্যাস ছিল আমাদের পারিবারিক যাবতীয় সমস্যাসমূহ সবিস্তারে শাহ সাহেব মামাকে জানিয়ে দোয়া চাওয়া।

কিছুক্ষণ পর ভোর হয়ে এলে আম্মা পায়ে হেঁটে অল্প দূরে শাহ সাহেব মামার বাড়ি পৌঁছে দেখেন শাহ সাহেব ঘুমাচ্ছেন। শাহ সাহেব মামার সহধর্মিণী (আম্মার জ্ঞাতি বোন) এত ভোরে আম্মাকে দেখে অন্দরে ডেকে নেন এবং বলেন যে ভোর হওয়ার একটু পূর্বেই শাহ সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন। উনি আরও বলেন যে শেষরাতে শাহ সাহেবের ভয়ঙ্কর গর্জন, গালিগালাজসহ ধ্বংস হয়ে যাবি- কোন বাড়িতে ঢুকছস বুঝতে পারিসনি ইত্যাদি বলতে বলতে ক্রুদ্ধস্বরে সারাবাড়িতে পায়চারি করেছেন এবং বাড়ির কেউই শেষরাত থেকে ঘুমাতে পারিনি।

আমার আম্মা যখন আমাদের বাড়িতে চোর ঢোকার কথা জানালেন তখন শাহ সাহেবের স্ত্রী বলে উঠলেন, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম শাহ সাহেব কেন এমন রাগতস্বরে গর্জন করতে করতে ঘরময় পায়চারী করছেন। এসব ঘটনার কথা আম্মা প্রায়ই বলতেন।

✪ দূর দূরান্ত থেকে শাহ সাহেব মামার কাছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লোকজন আসত দোয়া চাইতে। আমরাও হরহামেশা শাহ সাহেব মামার কাছে গিয়ে বসে থাকতাম। শাহ সাহেব মামার নিকটে গিয়ে একটু দোয়া করে দিতে বললে আমার মাথায় হাত দিয়ে দোয়া কালাম পড়ে ফুঁ দিয়ে মাথা ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলতেন দাদার কাছে যাও, উনারা জিন্দা ওলি এবং উচ্চ মরতবাসম্পন্ন।

উল্লেখ্য যে, আমার দাদাজান পীরে কামেল হযরত মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) হযরত হামেদ হাছন আলভী আজমগড়ী পীর সাহেবের প্রথম খলিফা ছিলেন এবং

কথিত আছে আধ্যাত্মিক যোগাযোগের মাধ্যমে এতদাঞ্চলে হযরত আজমগড়ী (রহ.) এর নির্দেশ মতে মুরিদানদের পরিচালিত করতেন।

✪ শাহ সাহেব মামা সম্পর্কে লিখতে গেলে কয়েকশত পৃষ্ঠা লিখেও শেষ করা যাবে না। কারণ সেই ষাটের দশক থেকে শুরু করে উনার ইন্তেকাল পর্যন্ত সময়ে উনার সাহচর্যে থাকার সুযোগ হয়েছে এবং শাহ সাহেব মামা প্রবর্তিত সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল এর প্রাথমিক পর্যায় থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এখানে একটা ব্যাপার অবতারণা করাটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শাহ সাহেব মামার বাড়ির জায়গাটা এককালে দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জঙ্গলপূর্ণ এবং উত্তর-পূর্বাংশ ক্রমশঃ ঢালু পরিষ্কার মাঠ ছিল। ঐ মাঠে আমরা খেলাধুলা করতাম। সেই সময়ের একরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমাদের প্রিয় নবীজী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স.) এর চেহারা মোবারক শান্ত সৌম্যরূপে পশ্চিমাংশের জঙ্গলাপূর্ণ অংশ থেকে দৃষ্টিদান করেছেন। পরবর্তীতে যখন শাহ সাহেব মামার বসতভিটা ও বাড়ি উক্ত স্থানে হল এবং পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবীর (স.) প্রবর্তন এখান থেকেই শুরু হল। তখনই আমি আমার স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। (সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম)।

✪ এখানে আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই। সময়টা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র এ.বি.এম. মহিউদ্দিন চৌধুরী ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের পটপ্পরিবর্তনের পর চট্টগ্রামকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকার তথাকথিত চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক আদালতে ১৪ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। মহিউদ্দিন চৌধুরী তখন আত্মগোপনে চলে যান।

এখানে উল্লেখ্য যে, ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন আন্দোলনে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠক হিসাবে একসাথে কাজ করার কারণে মহিউদ্দিন চৌধুরী ও আমার মধ্যে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। সে হিসেবে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে আত্মগোপন অবস্থায় মহিউদ্দিন চৌধুরী শাহ সাহেব মামার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে একদিন দুপুরে বেবি টেক্সিযোগে চুনতী গ্রামে আমাদের বাড়িতে আসেন। মহিদ্দিন চৌধুরীকে নিয়ে আসর ওয়াক্তের পূর্বে শাহ সাহেব মামার কক্ষে যাই।

আমি জানতাম শাহ সাহেব মামা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে পছন্দ করতেন। জিয়াউর রহমান সাহেবও শাহ সাহেব মামার সাথে সাক্ষাত করতে চুনতী শাহ মঞ্জিলে এসেছিলেন। খাটে উপবিষ্ট শাহ সাহেব মামার পায়ের কাছে আমি ও মহিউদ্দিন চৌধুরী বসলাম। অতঃপর আমি শাহ সাহেব মামাকে বললাম

যে, এই মহিউদ্দিন চৌধুরী গরিব মেহনতি মানুষের খুবই আপন লোক। নির্যাতিত গরিব শ্রমিকের পক্ষ নিতেন বলেই হয়ত জুলুমবাজ মিল মালিকেরা তাকে ঘায়েল করতে ষড়যন্ত্র করে মিলিটারি সরকারকে ভুল বুঝিয়ে ১৪ বছরের কারাদণ্ড প্রদানে ভূমিকা রাখে।

আসলে মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম অঞ্চলকে স্বাধীন করার কোন ষড়যন্ত্র করেননি। আপনি একটু দোয়া করে দেন যাতে বিপদমুক্ত হন।

শাহ সাহেব মামা একনজরে কিছুক্ষণ মহিউদ্দিন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে কাছে ডেকে নেন মাথায় হাত রেখে চোখেমুখে অনেক্ষণ দোয়া কালাম পড়তে পড়তে উত্তেজিত অবস্থায় হঠাৎ বললেন অডা গেইয়ই যা (হে বেটা চলে গেছে, এখন যা) বলে হাতে ধরা মাথাটা ঠেলে দিলেন।

মহিউদ্দিন চৌধুরী আমার দিকে তাকালে আমি চলে যাওয়ার ইশারা করি এবং শাহ সাহেব মামাকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিই। বাড়ির বাহিরে আসলে মহিউদ্দিন চৌধুরী আমাকে বললেন, কি বুঝলেন। আমি বললাম, আপনার মামলা সম্ভবতঃ খতম হয়ে যাবে। এই ঘটনার মাসখানেক পরে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের সংসদ অধিবেশনে এমন একটি আইনপাশ হয় যার পরিণামে চট্টগ্রাম ষড়যন্ত্র মামলার রায় হওয়ার সামরিক অধ্যাদেশটি বাতিল হয়ে যায়।

✪ শাহ সাহেব মামা আমাদের পরিবারের সবাইকে খুবই স্নেহ করতেন। আমরাও শাহ সাহেব মামাকে অত্যাধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতাম। আমাদের বাড়িতে শাহ সাহেব মামার আগমনকে আমরা সৌভাগ্য মনে করতাম। একরাত্রে শাহ সাহেব মামা আমাদের বাড়িতে আসলে আমরা উনার সামনে বসে পড়ি। হঠাৎ উনি একটা ঘটনার কথা বলেন। ঘটনাটা হল- শাহ সাহেব মামা একরাত্রে গভীর জঙ্গলে চোখ বন্ধ করে বসা ছিলেন। (সম্ভবতঃ আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন)। একসময় অনুভব করলেন উনার শরীরটা ঠাণ্ডা স্পর্শের কিছু একটা চেপে ধরেছে চোখ মেলে উনি দেখতে পেলেন বিরাট এক অজগর উনাকে পেঁচিয়ে আছে।

উনি প্রথমেখুবই ভীত হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি ভয় তাড়িয়ে উনি চোখ বন্ধ করে দোয়া কালাম পড়তে লাগলেন। আল্লাহপাকের হাতে নিজেকে সপে দিলেন। এক পর্যায়ে অজগর সাপটা উনার সারা মুখমন্ডল লেহন করে উনাকে মুক্ত করে দিয়ে ধীরে অন্ধকার জঙ্গলে বিলীন হয়ে যায়। অতি সংক্ষেপে আমি ঘটনাটা বিবৃত করলাম। যদিওবা শাহ সাহেব মামার ভয়ঙ্কর অনুভূতি ও আল্লাহর ধ্যানের বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। শাহ সাহেব মামার মতো একজন আল্লাহর ওলির সাহচর্য পাওয়াসহ আমি এবং আমাদের পরিবারের সবাই উনার স্নেহধন্য হতে পারাটা আমরা খুবই মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করি।

Ghunati.com

শাহ সাহেব মামার মতো এত উঁচুমানের আশেকে রাসূল (স.) ওলি আল্লাহর সাহচর্য পাওয়াটা আমাদের জন্য একটা নেয়ামতস্বরূপ।

আহমদ কবির চৌধুরী

টিম্বার ব্যবসায়ী

লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

১৯৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে কক্সবাজারে ফরেস্ট বিভাগের ডি.এফ.ও এর অধীনে গর্জনিয়াতে একটি বৃহদাকারের কাঠের লট নিলাম ডাকি। বন বিভাগ বড় বড় গাছের এরিয়া নিয়ে লট হিসেবে নিলাম দিত। বন বিভাগ ও নিলাম বন্ধ করে দিয়েছে কাঠের স্বল্পতার কারণে।

৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে কক্সবাজার বন বিভাগ লট নিলাম দিচ্ছে জেনে একাধিক লটের মধ্যে বড় লটটি অন্য ডাককারীদের চেয়ে বেশি টাকায় নিলাম ডেকে পেয়ে যাই। নিলাম ডাকার পরক্ষণে জানতে পারি একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ চক্র একতাবদ্ধ হয়ে আজ তাদের রেইটে লটগুলো নিলাম ডেকে নিবে। আমি তাদের ডিঙ্গিয়ে নিলাম ডাকার কারণে আমার উপর ক্ষেপে যায় এবং হুমকি দেয়- কি করে আমি গর্জনিয়া থেকে কাঠ কেটে আনব।

আমাকে শাসায়, দেখে নেবে তারা, আমি ভীত হয়ে পড়ি। রামু থেকে প্রায় ১৫কিলোমিটার ভিতরে গভীর জঙ্গলে লটের স্থানে পৌছতে হয় পায়ে হেটে বা বাকখালী খালে নৌকাযোগে। ভীত অবস্থায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে দেখা করে বিস্তারিত বুঝাই। এতে তিনি আমাকে তিনবার করে বললেন, আমাকে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। এতে আমার টেনশন চলে যায়। আমি সাহস করে লটের স্থলে গমন করি। বারেবারে যাওয়া-আসা করে সমুদয় গাছ কেটে নিয়ে আসি। আমার কোন গাছ চুরিতো নয়ই বরং কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়া লাভবান হয়ে সমুদয় গাছ কেটে যথাযথভাবে নিয়ে আসতে সক্ষম হই।

নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী (নুরু সিদ্দিকী)

চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

✪ চুনতী শাহ সাহেব (রহ.) এর নাম মনে পড়লেই তার দ্যুতিমান নুরানি চেহারা আমার সামনে জ্বলজ্বল করে উঠে। উনার ওফাতের সময় আমার বয়স ১৫ বৎসর হলেও ছোটবেলা থেকে উনাকে শতবার দেখেছি। তাঁর প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমার সামনে ভেসে উঠে যেন তাঁর দৃশ্য। আমার মায়ের কাছে জেনেছি আমার নাম রেখেছিলেন তিনি। সে কারণে তার প্রতি আমার কতৃজ্ঞতাবোধ বেশি।

✪ একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসলেন তখন আমি সম্ভবত ৩য়/৪র্থ শ্রেণির ছাত্র। তিনি সোফায় না বসে একটি কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন। উনাকে আমরা একনজরে তাকাচ্ছিলাম। তিনি বিশেষ কোন কথা বলেন নি কিন্তু মুখ নেড়ে যাচ্ছিলেন অনবরত। পরবর্তীতে একদিন আমাদের রান্নাঘরে হঠাৎ করে আগুন লেগে বাইরে ছড়িয়ে অথবা তেলের চুলার স্টোভটি উল্টে যায় এবং সাথে সাথে পাশে থাকা ডাইনিং টেবিলের সাথে শাহ সাহেবের বসা চেয়ারটিতে আগুন ধরে যায়। পরবর্তীতে আগুন নেভানো হলে আমরা লক্ষ্য করি যে, চেয়ারটির অধিকাংশ জায়গায় আগুনের পোড়া দাগ লাগলেও পাটাতনে কোন আগুনের দাগ নেই। এ ব্যাপারটি পরবর্তীতে আমরা প্রায়ই বলাবলি করতাম যে উনি চেয়ারটিতে বসেছিলেন। তাই ঐ জায়গায় আগুন লাগতে পারেনি।

✪ চুনতী শাহ সাহেব (রহ.) একজন নিখাদ আল্লাহর ওলি। তাঁর জ্যোতিময় চেহারা যে কাউকে আকর্ষণ করে। এই বুযুর্গানেদ্বীনের ওফাতের সময় আমি বিয়ের বয়স অতিক্রম করছি। তাঁর কিছু স্মৃতি আমি আজীবন স্মরণ রাখবো। আমার দাদির ইন্তেকালের পর মেজবান উপলক্ষে আমি উনাকে দাওয়াত করার জন্য গিয়েছিলাম, আমার সাথে অন্যান্য কয়েকজন ছিলেন। দাওয়াতের কথা শুনে তিনি উনার সাথে বসা একজনকে বললেন কিছু কিনে আমাদের বাড়িতে পাঠানোর জন্য।

পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিনি একবার টাকা বের করে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন কত হয়েছে (টাকার অংক আমার সঠিক মনে নেই) উত্তর তার মনপুত না হওয়ায় তিনি একই পকেট থেকে আরো টাকা বের করলেন আবার জিজ্ঞেস করলেন, কত হয়েছে, এবারও উত্তর মনপুত না হওয়ায় তিনি একই পকেট থেকে টাকা বের করলেন। আবারও জিজ্ঞেস করলেন কত হয়েছে? এবার তিনি অন্য পকেট থেকে টাকা বের করে বললেন যাও কিছু কিনে পাঠাও।

আমার মায়ের কথা

✪ চুনতীর শাহ সাহেব (রহ.) আমার মায়ের দাদীর (হযরত মাওলানা নজির আহমদ শাহ (রহ.) এর স্ত্রী) অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং শাহ সাহেব (রহ.) ও উনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি প্রায়শ মাওলানা নজির আহমদ শাহ (রহ.) এর বাড়িতে যাতায়াত করতেন এবং এখানে দীর্ঘদিন থেকে যেতেন। কখনো এমন হয়েছে শাহ সাহেব (রহ.) একনাগাড়ে দুই/তিন দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতেন।

✪ আমার মায়ের দাদির শেষ অবস্থায় শাহ সাহেব (রহ.) অত্যন্ত মুষড়ে পড়েন। এই অবস্থা চলাকালীন আমার মা নামাযের সময় এই বলে দোয়া করলেন যে "হে

আল্লাহ, তুমি আমার দাদিকে আসান করে দাও।" এর কয়েকদিন পর উনি মৃত্যুবরণ করলে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

অধ্যাক্ষ, আল কোরআন একাডেমি
কধুরখিল, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এইচ এস সি পাশ করে সমস্যায় পড়ি ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়া নিয়ে যেহেতু সারাদেশে ২ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের একসাথে ভর্তি পরীক্ষা নেবে। কাজেই আমি চট্টগ্রাম সিটি কলেজে বি.এসসিতে ভর্তি হই। এদিকে, আমার মন-মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় নিয়ে ডাক্তারি পড়ার চেয়ে বিদেশে গিয়ে টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করব। এই ভেবে সেমতে বিদেশে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এবং আমার যথাযথ তথ্য আবুধাবিতে পাঠিয়ে দেই। এখন শুধু ভিসা আসার অপেক্ষায়।

এমনি অবস্থায় একদিন আমার বন্ধু জামাল উদ্দিনকে নিয়ে আমি দোয়ার জন্য চুনতী গমন করি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কাছে। আমার বিদেশ গমনের কথা বললে বকার স্বরে বললেন কি বিদেশ টিদেশ দেশে থাক। হযরত শাহ সাহেব হুযুরের কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি এবং বিদেশ যাওয়ার চিন্তা বাদ দিই।

মহান ওলির দোয়ার বরকতে নিজস্ব ব্যবসার পাশাপাশি এ আল কুরআন একাডেমির খেদমতসহ অন্যান্য ধর্ম ও সেবামুলক কাজে নিয়োজিত রয়েছি। বিদেশে গেলে হয়ত এসব ভাল কাজে জড়িত থাকা সম্ভব হত না।

কাজী আজিজুল হক

কাজেম আলী লেইন, ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সম্পর্কে আমার মামা শ্বশুর হন। যেহেতু শাফেয়া খানম আমার শাশুড়ি। তাঁর মেয়ে রহিমা বেগম আমার স্ত্রী।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে সাতকানিয়ার শ্বশুর বাড়ি থেকে আমার স্ত্রী ও শাশুড়িসহ চুনতী গমন করি। তথায় দোয়ার জন্য হযরত শাহ সাহেব হুযুরের নিকট যাই। তিনি আমাকে দোয়া করেন এবং পাশে বসায়ে দুপুরের খানা খাওয়ান। এর পর হতে আমি চুনতী গমন করে সীরতুন্নবী (স.) মাহফিলে অংশগ্রহণ করি। আখেরি মোনাজাতেও শরিক হই।

* হযরত শাহ সাহেব (রহ.) যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিন চট্টগ্রাম শহরে হরতাল/কারফিউ ছিল। তারপরও প্রতিকুল যোগাযোগ ব্যবস্থায় চুনতী গমন করে লক্ষাধিক জনতার সাথে নামাজে জানাযায় শরিক হই এবং হুযুরের নুরানী চেহারা মোবারক দেখে নিজেকে ধন্য মনে করি।

ইঞ্জিনিয়ার সুফি মুহাম্মদ সাকেব
১৮/পি, কাতালগঞ্জ, আ/এ, চট্টগ্রাম

এইচ, এস, পি পাশ করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আগ্রহী হই। এমনি অবস্থায় চট্টগ্রাম থেকে আব্বার (ইঞ্জিনিয়ার সুফি আবু মুহাম্মদ ওয়াহিদ) সাথে কক্সবাজার যাওয়ার পথে চুনতীতে যাত্রাবিরতি দিই হযরত শাহ সাহেব হুযুরের সাথে দেখা করে দোয়া নেবার উদ্দেশ্যে। ঐ সময় শাহ মঞ্জিলের সম্মুখে একটি বেড়ার ঘর ছিল ছনের ছাউনিযুক্ত। ঐ ঘরে অনেকের মাঝে আব্বা আমাকে নিয়ে বসলেন। সকলে নানা মকছুদ নিয়ে দোয়াপ্রার্থী।

কিছুক্ষণের ব্যবধানে হযরত শাহ সাহেব হুযুর শাহ মঞ্জিলের উপরতলা থেকে সরাসরি আমাদের অবস্থান করা ঘরে আসলেন। সাথে সাথে আব্বাকে চিনে ফেললেন এবং আব্বাকে খুব সম্মান দেখালেন। ঐ মুহূর্তে আব্বা আমার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়ার কথা বললে হযরত শাহ সাহেব হুযুর হয়ে যাবে বললেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে।

উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে কয়েকজনকে বকাঝকা করলেন। এ মোলাকাতের পর আব্বা খুবই খুশি হলেন, আমিও খুশি হলাম। আল্লাহর ওলির দোয়ায় আমি বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) হয়ে পেশাগত দায়িত্বে রত আছি।

মুহাম্মদ সিরাজুল কবির
মহাসচিব, বিভাগীয় সমাজকল্যাণ ফেডারেশন, চট্টগ্রাম

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ। আমি বাঁশখালীর পুকুরিয়া আনছারুল উলুম মাদরাসার শিক্ষক। শুনলাম চুনতীতে একজন শাহ সাহেব আছেন। তিনি মজযুবে খ্রীস্টাব্দেক। সে বৎসর তিন দিনব্যাপী সীরতুন্নবী (স.) মাহফিল হচ্ছে। হযরত (স.) এর জীবনের এক এক অংশের উপর আলোকপাত করে বিশদভাবে আলোচনা করবেন দেশের খ্যাতনামা ওলামা মশায়েখ ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ।

পরস্পর আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল মাদরসাার সুপার মাওলানা নুরুল মুনির চৌধুরী, হেড মাওলানা আবদুল হাফেজ চৌধুরী ও আমি তিনজনই একসঙ্গে যাব। যথাদিন বিকালে মাহফিলস্থলে পৌঁছে দেখি জমজমাট অনুষ্ঠান চলছে। মাঠের সামনের কোণায় তিনজন সুবিধামত স্থান দেখে আড়াআড়িভাবে বসে বয়ান শুনেছি। মাগরিবের নামায শেষে পরবর্তী অধিবেশন শুরু হলো। মঞ্চে সুরম্য ৩টি

টেবিল, ৩টি চেয়ার। একটিতে শাহ সাহেব কেবলা, মধ্যে সভাপতি বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ আবদুল জব্বার (রহ.) অপরটি বক্তার। তখন বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত মুফতি আল্লামা আমিন উল্লাহ (রহ.) বয়ান হচ্ছিল: কোন মানুষের নামে মানত করা পশু-পক্ষী খাওয়া জায়েয কিনা?

মনোযোগ দিয়ে বয়ান শুনার ফাঁকে দেখি শাহ সাহেব কেবলা ছাতা দিয়ে একজনকে বেদম প্রহার করছেন। কারণ জানতে পারলাম লোকটি সেজদার কায়দায় হুযুরকে কদমবুচি করেছিল। রাতে খানার প্রশ্ন উঠলো। কিন্তু নিকটে কোন দোকান-পাট, হোটেল, টি-স্টল কিছুই নেই। মাহফিল মাঠের অপরদিকে মেজবান চলছিল। চুনতী মাদরসার ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে মেহমানদের খাওয়াচ্ছিল। লম্বা লাইনে লোক দাঁড়িয়েছে।

আমরা তিনজন খানার প্যান্ডেল গেইটের কোণে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়। মাওলানা আবদুল হাফিজের এককথা লাইনে দাঁড়িয়ে খাবেই না। তখন মাহফিলের একজন ব্যাজপরা স্বেচ্ছাসেবক এসে জিজ্ঞেস করলেন এখানে আমরা কেন দাঁড়িয়েছি। তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো পাশে কাছে কোন হোটেল আছে কিনা? তখন তিনি বললেন, তাঁর সাথে যেতে। তিনি একদিকে খানার প্যান্ডেল বেড়ার কোণা ফাঁক করে তিনজনকে ঢুকতে বললেন ঢুকে একটি টেবিলে বসলাম। মাটির প্লেটে ভাত, ভাতের উপর গোশত। খেয়ে দেখি পরিমাণ যথেষ্ট। কেউ দ্বিতীয়বার চাচ্ছে না।

তারপর গেলাম হযরত মাওলানা ফজলুল হক ও হযরত মাওলানা নজির আহমদ (রহ.) এর কবর জেয়ারতে। ছোট একটি টিলা পাহাড়ে কবর। কবরের চারদিকে ইট বসানো শুধু ইটের কোণা তুলে তুলে সাজায়েছে। কোন ওয়াল নেই ছাদও নেই। ঐ সময় ২ জনের সহযোগিতায় লাঠিতে ভর দিয়ে যেয়ারতের জন্য উঠেছিলেন দারুল উলুম মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস মুফতি মুহাম্মদ আমিন (রহ.)। তাঁকে তথায় প্রথম দেখলাম। পরেরদিন তাঁর বয়ান শুনারও সুযোগ হয়।

শাহ সাহেব কেবলাকে পরের বৎসর দেখি জাফরাবাদ মাদাসার সভায়। ঘন্টাখানেক বসে চলে যাচ্ছিলেন। প্রিন্সিপাল মাওলানা শামসুল ইসলাম হেলালীর হাতে কিছু খুচরা টাকা ও পয়সা দিতে দেখি।

মাওলানা মুহাম্মদ সরওয়ার কামাল আজিজী
অধ্যক্ষ পদুয়া জামেয়া হেমায়েতুল ইসলাম মাদরাসা,
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

❽ চুনতীর মুন্সেফ বাজারে খতিবে আজম সাহেব এর মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। আমি অনেকবার দেখেছি শাহ সাহেব হুযুর ওয়ায়েজের পার্শ্বে এসে চেয়ারে বসে থাকতেন এবং ওয়াজ শুনতেন।

✪ শায়খুল আরব ওয়াল আজম আলহাজ্ব মাওলানা শাহ ইউনুস সাহেব (রহ.) ও শাহ সাহেব আলাপ আলোচনা করতেন আপনাদের মধ্যে মুহাব্বত করতেন। আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসার বিখ্যাত মুফতি হযরত মাওলানা মুফতি ইব্রাহিমের সাথে অত্যন্ত মুহাব্বত রাখতেন। মুফতি সাহেব হুযুরকে সীরতুন্নবী মাহফিলের বক্তাদের বক্তৃতার উপর রিপোর্ট লিখতে বলতেন। মুফতি সাহেব হুযুরকে রিপোর্ট লিখতে আমরা দেখেছি। চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদরাসার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হযরত শাহ সাহেব হুযুর। তাঁর প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম চুনতী মাদরাসায় কামিল ক্লাস খোলা হয়।

✪ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা শাহ আবুল মোজফ্ফর সাহেবের ইন্তেকালের পর শাহ সাহেব হুযুর জেয়ারতের জন্য আসেন এবং উস্তাদ হিসাবে সম্বোধন করে জেয়ারত করেন। সাথে বহু লোক ছিলেন। তখন শাহ সাহেব হুযুর বলতে লাগলেন– তিনি বড় বুজুর্গ ছিলেন, তিনি বড় আলেম ছিলেন।

লোকমান আহমদ চৌধুরী (এডভোকেট)

বাজালিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

✪ চার বৎসর বয়স হতে কলিকাতায় ২৮ বৎসর ছিলাম। বিগত জানুয়ারী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নিজ দেশে চলে আসি। আমার পরিবারের সবাই শাহ সাহেবের একান্ত ভক্ত, আমি একদিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে চুনতী গেলাম, আমারও খুব ভক্তি লাগল এভাবে যাওয়া-আসা হতে লাগল।

✪ আমি কলকাতা হতে আসবার সময় আমাদের মক্কেলের নিকট হতে কয়েকটা চিঠি নিয়ে আসি এবং যাদের নিকট চিঠি দিয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা করি। কয়েকজনের চিঠি মত ইনকামটেক্সের কেইস দিয়েছিল। কিন্তু এক ভদ্রলোক আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল আমি যেন ওনাদের ফ্যাক্টরির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হই। অনুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা করা গেল না তাই যোগদান করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একদিন হঠাৎ করে এক ম্যাজিস্ট্রেট এসে উক্ত ফ্যাক্টরি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে সিল করে দিল। তখন তাড়াতাড়ি করে চুনতী গিয়ে শাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলি। তিনি বললেন, চিন্তা করো না মামলা কর, ফ্যাক্টরী ফেরৎ পাবে।

ওনার কথামত মামলা করলাম এবং এক বৎসরের মধ্যে আমাদের অনুকূলে রায় হল। ফ্যাক্টরী ফেরৎ পেলাম, তখন হতে ওনার এত ভক্ত হলাম যে, প্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার চুনতী গিয়ে উনার সাথে দেখা করতাম।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সুতা ইমপোর্ট করার জন্য মুম্বায়ের এক কোম্পানীর অনুকূলে ব্যাংকের মাধ্যমে এল.সি. খুলেছিলাম। খোলার পর ঐ কোম্পানী চিঠির মাধ্যমে

Chunati.com Pioneer in village based website

আমাকে মুম্বাই যাওয়ার ইনভাইট করল। আমিও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে চুনতী গিয়ে শাহ সাহেবের অনুমতি চাইলাম এবং বললাম, আমার ইচ্ছা আগে আজমীর শরিফ যাব ঐখান থেকে মুম্বাই যাব। উনি বললেন দিল্লি হয়ে যাবে এবং দিল্লি জামে মসজিদের ইমাম সাহেবকে আমার সালাম বলবে। কাজেই দিল্লি পৌঁছে আমার প্রথম কর্তৃব্য হিসেবে ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ওনার সালাম জানাই, ইমাম সাহেব বলেন ওয়ালাইকুম আস্সালাম। তখন আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, আপনার সঙ্গে আমাদের শাহ সাহেবের কিভাবে আলাপ-পরিচয়? ওনি আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমাকে অবশ্য ভাল করে চা-নাস্তা খাওয়াচ্ছিলেন। আমি ফিরে এসে আমার কৌতুহল হিসেবে শাহ সাহেবকেও জিজ্ঞাসা করি ইমাম সাহেবের সঙ্গে কোথায় আপনার আলাপ পরিচয় হয়েছে। শাহ সাহেবও একইভাবে সরাসরি উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, কাজেই তাঁদের ব্যাপার আল্লাহ ভাল জানেন, আমাদের মত লোকের বুঝার উপায় নেই।

✪ যতদুর মনে পড়ে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে শাহ সাহেবের একজন ভক্ত জনাব মরহুম সাহাব উদ্দিন সাহেব (খুব বড় অন্তরের মানুষ ছিলেন) প্রস্তাব করলেন, শাহ সাহেবকে হজ্বে নিয়ে যাবে পি জাহাজের মাধ্যমে। কিন্তু ভিসা লাগবে, তখন পর্যন্ত সৌদি সরকার বাংলাদেশে দূতাবাস খুলেনি। কাজেই প্রথমে দিল্লি যেতে হবে এবং সৌদি হাই কমিশনারের নিকট হতে ভিসা নিতে হবে। শাহ সাহেব ছাড়া জনাব সাহাব উদ্দিন সাহেব, মাওলানা নুরুল ইসলাম, হাফেজ সাহেব ও মাওলানা নাসির উদ্দিন সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

জনাব সাহাব উদ্দিন সাহেব বিশেষভাবে আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন অন্তত দিল্লি পর্যন্ত গিয়ে ভিসা করে দিয়ে আসি। কারণ আমি অনেক বৎসর পর্যন্ত ভারতে ছিলাম। তাঁর বিশেষ অনুরোধে যাওয়ার জন্য রাজি হলাম।

উপরে উল্লিখিত সকলে ও আমি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর প্লেইনে রওনা হলাম। আমিও জনাব শাহ সাহেব পাশাপাশি সিটে বসেছিলাম।

প্লেইন উপরে উঠার পর একজন স্টুয়ার্ট নাম মানসিং (মুন্ডা সিং) বারবার আমাদের সিটের কাছে আসে এবং শাহ সাহেবকে খুব ভাল করে দেখতে লাগল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়ে আদমী বহুত বুজুর্গ আদমী মালুম হোতাহে। আমি বললাম, অবশ্য বুজুর্গ আদমি। তখন আর একবার এসে আমাকে বলল, আমার একটা উপকার করবেন? আমি বললাম কি উপকার? সে বলল, আমি যখন ৮ বৎসরের ছেলে ছিলাম তখন আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন আমা বাবা দিল্লিতে এক পীর সাহেবের নিকট নিয়ে যায়। পীর সাহেব আমাকে একটা তাবিজ দেন। ঐ

তাবিজ শরীরে দিলে একেবারে সুস্থ হয়ে যাই। আজকের দিন পর্যন্ত এখনও কোন অসুখ হয়নি।

কিন্তু দুই মাস আগে ঐ তাবিজটা হারিয়ে গেছে। তাই আমি খুব চিন্তার মধ্যে আছি, অথচ ঐ পীর সাহেবের মুখ এবং আপনার শাহ সাহেবের মুখ একেবারে এক রকম। তাই আমার মনে হয় উনার নিকট হতে তাবিজ নিলে আমার কাজ হয়ে যাবে। তখন আমি তাকে বললাম, ওনি তাবিজ দেন না। আপনার মাথাটা দেন,উনি আপনাকে দোয়া করে দিবেন এবং আপনার তাবিজের কাজ হয়ে যাবে। তখন তার মাথায় হাত দিয়ে শাহ সাহেব দোয়া করলেন। তখন একে একে সব এয়ার হোস্টেস, ক্যাপ্টেন (প্লেইনচালক) ও অন্যান্য স্টাফরা দোয়া নিয়েছে, পরে তারা যে যা পারে উপহার হিসেবে আপেল, কমলা লেবু, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে আসতে আরম্ভ করে। পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, হাফেজ সাহেবও নাসির উদ্দিনকে গামছা দিয়ে দুই গাঁট্রি বাঁধতে হল।

দিল্লি গিয়ে একদিন পর সৌদি হাই কমিশনারের অফিসে আমরা সবাই যাই, ভিসার জন্য লাইন এত লম্বা যে মনে হচ্ছিল লাইনে দাঁড়ালে ভিসা কাউন্টারে পৌঁছতে বেলা ৫টা বেজে যাবে এবং কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাবে।

আল্লাহর কি মর্জি হঠাৎ করে এক অফিসার এসে বললেন,আমার সঙ্গে আপনারা চলুন। উনি হাই কমিশনারের রুমে নিয়ে গেলেন। হাই কমিশনার দাঁড়ায়ে গেলেন এবং বললেন, আপনারা সবাই বসেন। সবাইকে চা, নাস্তা দিতে বললেন এবং ২০ মিনিটের মধ্যে সকলের ভিসা আলাদা আলাদাভাবে পাসপোর্টে লাগিয়ে দিলেন। আমরা সবাই অবাক, আল্লাহর কি মেহেরবানী।

দিল্লিতে অনেক জায়গায় যাচ্ছিলাম কিন্তু আমার ভাল লাগছিল না, এ কারণে যে নিজাম উদ্দিন সাহেবের মাজারে কেন যাচ্ছিলেন না। এক সময় মাগরিবের নামাযের জন্য একটা খুব ছোট মসজিদে নামায আদায় করে ঐ মসজিদের ইমাম সাহেবকে পকেট হতে একটি ১০ টাকার নোট দিলেন এবং বললেন এ মসজিদকে বড় করে ফেল। ইমাম সাহেব ১০ টাকার নোটটা নিলেন এবং বললেন, জ্বি হুযুর, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। দশ টাকায় মসজিদ কিভাবে বড় করবে আমরা কিন্তু কিছু বুঝলাম না, আল্লাহ সব জানেন।

এর পরে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলতে লাগলেন, জোরে জোরে চালাও। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম শাহ সাহেবকে, কোথায় যাব আমরা হুযুর। উনি বললেন, কেন নিজাম উদ্দিন সাহেবের কাছে। আমি মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

গাড়ি দরগাহের গেইটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক সাদা কাপড় পরা, সাদা পাগড়ীওয়ালা গাড়ির নিকট এসে বলতে লাগল, আইয়্যে শাহ সাহেব আইয়্যে এবং আমাদেরকে সোজা নিজাম উদ্দিন সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন (ঐখানে

আরও অনেক মাযার আছে) এবং টুপি দিয়ে জেয়ারত পরিচালনা করলেন। আমরা সকলে উনার সঙ্গে মোনাজাত করলাম। কোন কথা না বলে উনি চলে গেলেন, আমরা কেউ বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ ভাল জানেন ভদ্রলোক কে? কি তার পরিচয়?

মাওলানা মুহাম্মদ সাইয়েদ নুর

শিক্ষক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম

✪ বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন ও ওয়ায়েজ হযরত মৌলানা হাবিব উল্লাহ মিসবাহ সাহেব সীরত মাহফিলে বক্তৃতাকালে মাহফিলের আকর্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ১৯ দিনব্যাপী সীরত মাহফিলের ব্যক্তি বিশেষ বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণ রয়েছে। অতএব, কেউ ওয়াজ নসিহতের আকর্ষণে আসে,কেউ দোয়া মুনাজাতের আকর্ষণে আসে, কেউ খাওয়া-দাওয়ার আকর্ষণে আসে। কিন্তু আমি আসি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) একজন মজযুব হয়েও প্রত্যেক নামাযের আযান হওয়ার পর জম'আতের সময় হলে তিনি জম'আতে হাজির হয়ে যান এবং খুযু খুত, তা'দিলে আরকানের সাথে নামায আদায় করেন। আমার জন্য এটাই প্রধান আকর্ষণ।

✪ তিনি শিরক, বেদআত ও শরিয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ডের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমনকি কদমবুচি করাও আদৌ পছন্দ করতেন না। একবার আমি স্বচক্ষে দেখেছি এক লোক এসে কদমবুচি করার চেষ্টা করার সাথে সাথে লোকটিকে বারণ করলেন এবং বললেন (চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায়) উহ তাজিম গরঅদ্দেনে উড়া, তা'জিম গইস্তে গইস্তে দুনিয়ান শেষ গরলি।" অর্থাৎ উহ! তুমি কি আমাকে সম্মান প্রদর্শন করছ? এভাবে সম্মান করতে করতে দুনিয়াটা নাশ করলে।

বর্তমান যুগে তথাকথিত কিছু পীর সাহেব, শাহ সাহেবকে দেখা যায় তারা আল্লাহ ও রাসূলের চেয়ে ধনসম্পদ ও টাকা-পয়সাকে বেশি ভালবাসে। আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে ধনী ও প্রভাবশালী মুরীদানের সন্তুষ্টিকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। প্রচুর পরিমাণে তোহফা হাদিয়া পাওয়ার জন্য মুরিদানের খুশিমতে চলেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ তার বিপরীত। তিনি কোনদিন ব্যক্তিপূজা, অর্থপূজা করেননি। পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য দ্বীন ও শরিয়তকে কখনো জলাঞ্জলি দেননি। কোন শিল্পপতি, কোটিপতি,প্রভাবশালী মিয়া, চৌধুরী অর্থ ও দানের দাপট প্রদর্শন করার সাহস করেনি। আল্লাহ ও রাসূল ছাড়া কারো ধার ধরতেন না।

✪ ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর আদৌ কোন লোভ মোহ ছিল না। তিনি টাকা-পয়সা গণনা করা তো দূরের কথা, ভাঁজ করে পর্যন্ত পকেটে নিতেন না। পরিত্যক্ত বা ছিড়া কাগজ যেভাবে মুঠোর ভিতর নিয়ে ফেলে দেয়া হয় সেভাবে পকেট থেকে

টাকা বের করতেন। কোথাও দেয়ার প্রয়োজন হলে মুঠভরে দিতেন, মুঠোর ভিতর কত টাকা যাচ্ছে তা গণনাও করতেন না, জানতেনও না। তিনি অত্যন্ত উদার ও দানশীল ছিলেন। মুক্ত হস্তে মাদরাসা মসজিদ, ধর্মীয় কাজ, গরিব দুঃখীকে দান করতেন। আজীবন এভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাদীসের উপর আমল করে গেছেন।

✪ ৭০ দশকের পরের কথা। তখনও চুনতী মাদরাসায় কামিল ক্লাস চালু হয়নি। আশেকে রাসূল হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সিহাহ সিত্তার দরস চালু করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হলেন এবং বারবার তাগিদ দিতে লাগলেন। ফলে কর্তৃপক্ষ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সে দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করে। কামিল ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা নিকেতন দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসার সুযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ শায়খুল হাদিস ওস্তাযুল আসাতিযা হযরতুল আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আমিন সাহেব (রহ.)
তিনি বুখারী শরিফের প্রথম হাদীস দ্বারা কামিল ক্লাসের উদ্বোধন করেন। সে শুভ অনুষ্ঠানে বুখারী শরিফের দরসে অধম একজন অযোগ্য শিক্ষার্থী হিসাবে বসার সুযোগ হওয়াটাকে জীবনে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য বলে মনে করি। কামিল ক্লাসে কিতাবের মতন পড়ার একটি প্রচলিত নিয়ম রয়েছে। সে নিয়মানুসারে আসাতিযায়ে কেরাম ও উপস্থিত মশায়েখিনে এজামের দোয়াপ্রাপ্তির মাধ্যম বলে মনে করি।

✪ আরো একদিনের ঘটনা। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে আমি কামিল প্রথম বর্ষের ছাত্র। একদিন হঠাৎ হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আমাদের ক্লাসে প্রবেশ করে চেয়ারে বসে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন এ ঘন্টা কি? আমরা বললাম, তিরমিযী শরিফ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন কে পড়ান? আমরা বললাম, নাজেম আ'লা সাহেব হুযুর (হযরত আল্লামা ফজলুল্লাহ (রহ.)। অতঃপর হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, তিরমিযি শরিফে একটি কধুর হাদিস আছে না? আমরা বললাম, হ্যাঁ আছে। কিছুক্ষণ বসার পর উঠে চলে গেলেন। সেদিনের অম্লান স্মৃতি আজীবন ভুলার নয়। তখন থেকে অদ্যাবধি সিহাহসিত্তার দরস সুনাম ও সার্থকতার সাথে চালু রয়েছে। মহান আল্লাহ জল্লা শানুহুর মহান দরবারে অনন্তকাল এ কানুন যেন প্রস্ফুটিত থাকে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সিহাহ সিত্তার সবক চালু থাকে তজ্জন্য অন্ত রের অন্তস্থল থেকে বারংবার ফরিয়াদ জানাই।

মাওলানা আবদুস সালাম

সাবেক অধ্যক্ষ, সৈয়দাবাদ দুদু ফকির সিনিয়র মাদরাসা,
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

আমার সাথে এক লোকের জায়গা-জমি নিয়ে শত্রুতা ছিল। যে কোন রকমে জমি উদ্ধার করতে না পারায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে রাতে আমার বাড়িঘর ঘেরাও করে এবং আমার কাছ থেকে জোরপুর্বক দেড় টাকা মূল্যের সাদা ৩টি স্ট্যাম্পে দস্তখত সংগ্রহ করে।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সনে ঐ ৩টি স্ট্যাম্প নিয়ে আমার কর্তৃক সাড়ে চার কানি জমি লিপিবদ্ধ করে সাতকানিয়া আদালতে আমার নামে বায়নানামায় মামলা দায়ের করে। নোটিশ প্রাপ্তে আমি হাজির হই এবং বায়নানামার দরখাস্ত পড়ে দেখি ঠিকই আমার দস্তখত। আমি জবাব দাখিল করি। জবাবে তার শত্রুতা ও বিরোধের কথা উল্লেখ করে মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে যে দস্তখত নিয়েছিল সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত উল্লেখপূর্বক আমার ঐ দস্তখত বলে স্বীকার করে জবাব দাখিল করি। মামলার বিচারের জন্য দিন ধার্য হয়। এই বিষয়ে মামলায় কি হবে তা নিয়ে সাতকানিয়া ও চট্টগ্রাম শহরে উকিলের সাথে দেখাশুনা ও আলাপ-আলোচনা করি। উকিল মহোদয়গণ মোকদ্দমা ডিক্রি হওয়া ছাড়া কোন উত্তরও দেন না। ইহা শুনে নিরুপায় হয়ে আমি হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর কেবলার নিকট হাজির হই। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে অনুনয় বিনয়ের মাধ্যমে মামলার পূর্ণ বিবরণ বর্ণনা করি।

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সামান্য চুপ থেকে আমাকে পিঠে হাত দিয়ে বলে যে, যা এটি থাকবে না ও রাখতেও পারবে না। ভয় করিওনা তখন আমি চলে আসি।

মোকদ্দমার বিচারের দিন উভয়পক্ষের উকিলবৃন্দ ও বাদী-বিবাদীর সাক্ষীবৃন্দ আদালতে হাজিরা দেয়। মামলার নথি মুন্সেফ সাহেবের সম্মুখে রাখা হয়।

জনাব মুন্সেফ সাহেব নথি হাতে নিয়ে আর্জি ও জওয়াব দেখাশুনা করতে আরম্ভ করে। মুন্সেফ সাহেব দেখেন যে, দলিলে যে আমার দস্তখত ছিল দস্তখতটি উধাও হয়ে গিয়েছে। মুন্সেফ সাহেব নথিটি বাদীর উকিলকে দিয়ে বললেন যে, দেখ তোমার দলিল। উকিল সাহেব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। মুন্সেফ সাহেব বাদীর উকিলকে বলল যে, ব্যাপার কি? উকিল সাহেব একখানা দরখাস্ত দিলেন। দরখাস্তে লিখলেন যে, হুযুর আদালতে বন্যার জলের স্রোতে বিবাদীর দস্তখত চলে গিয়েছে। ইহা একটি হযরত শাহ সাহেব (রহ.)- এর উজ্জ্বল করামত।

মাওলানা আবু ছালেহ মুহাম্মদ সলিমুল্লাহ
উপাধ্যক্ষ, পতেঙ্গা ইসলামিয়া আলীয়া মাদরাসা

✪ আশির দশকের মাঝামাঝি একদিন আমরা ক'জন সীরত মাঠে সমবেত হলাম। বা'দ মগরিব একজন ওয়ায়েজ অতীব সুললিত কণ্ঠে তকরির পেশ করছেন। তিনি বলছেন, "আল্লাহপাক যত নবী পাঠিয়েছেন সব নবীকে নাম ধরে ডেকেছেন যখন ডাকার প্রয়োজন হয়েছে। যেমন: ওয়ামা তিলকা বিয়ামিনিকা ইয়া মুসা ইত্যাদি। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নাম ধরে ডাকেননি এবং বলেছেন, ইয়া আইয়্যুহাল মুজ্জাম্মিলু, ইয়া আইয়্যুহাল মুদদাসসিরু ইত্যাদি উপাধিতে... । এ কথাগুলো বলার সাথে সাথে দেখলাম এক জান্নাতী পুরুষ মঞ্চে বসে শুধু ঘাড় নাড়ছেন আর বলছেন ওহ... ওহ... তিনিই শ্রেষ্ঠ... তিনিই মহান। যাঁকে বলা হতো আশেকে রাসূল (স.) রাসূলপ্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর জীবনেই প্রত্যক্ষ করা গেছে সমধিক হারে। মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে তিনিই উদ্ভাবন করেছেন। এতে বিশ্বনবী (স.) এর পুরো জীবনচরিতের উপর আলোচনার জন্য বাংলাদেশের শীর্ষ ওলামা মশায়েখ এবং ওয়ায়েজীন তাঁর আহ্বানে নির্ধারিত সময়েই সমবেত হতেন যার সিলসিলা এখনো বিদ্যমান।

✪ উনার ইন্তেকালের দিন জনতার ঢল নামে। আমরা তখনো ছাত্র এবং কম বয়সী কিশোর। মাঠের একপার্শ্বে খুব কষ্টে দাঁড়িয়ে আছি। যুগশ্রেষ্ঠ আল্লাহর ওলি আশেকে রাসূলের আজ শেষ বিদায়। দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসার শায়খুল হাদীস মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.) সেদিন কবিত্ব সূরে বলেছিলেন-

"যমী রুতি, যঁমা রুতা, ফলক আঁসু, বাহাতা, হ্যায়
চুনতী কা সিতারা খাক মেঁ মদফুন হোতা হ্যায়।"

চুনতীর উজ্জ্বল নক্ষত্র শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) আজ সৃষ্টি জগতের সবকিছুকে শোকসাগরে ভাসিয়ে মহান প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিতে কবর জগতে পাড়ি জমাচ্ছেন। একজন আশেকে রাসূলের সবচেয়ে বড় পাওনা সুন্নতে রাসূলের পুর্ণ অনুসরণ ও চর্চা। আজ তাঁর তিরোধানের পরও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। ১৯ দিনব্যাপী মাহফিলে সীরতের মধ্যে তিনি জীবন্ত হয়ে আছেন। ইলমে দ্বীনের অন্যতম গুলশান চুনতী হাকিমিয়া আলীয়ার কামিল হাদীস বিভাগ ও হাদীসে নববী (স.) এর অব্যাহত দারস প্রদানে তাঁরই খুশবু অম্লান হয়ে থাকবে। আল্লাহপাক তাঁর দরজাত (মর্যাদাসমূহ) আরো বৃদ্ধি করে দিন। আমিন।

কলামিষ্ট অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম রফিক

খতিব, হিলভিউ জামে মসজিদ ষোলশহর, চট্টগ্রাম

১৯৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দ। তখন আমি চন্দ্রঘোনা তৈয়বিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করছি। আমার হুযুর লিচু বাগান মসজিদের ইমাম আনোয়ারুল ইসলাম সাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন চুনতীর মাহফিলে। সেখানে একটি মাদরাসার দোতলায় বেশ ক'জন সুপরিচিত আলিম ওলামা পরিবেষ্টিত আছেন একজন সুন্দর সুপুরুষ বয়োবৃদ্ধ আলিম। সবাই তাঁকে মামু বলে ভক্তির সাথে সম্বোধন করছেন। আমার হুজুর আমাকে ইশারা করে বললেন, 'ইনিই শাহ সাহেব, দোয়া নাও। এরপর থেকে চুনতীর মাহফিলের প্রতি আমার আসক্তি বেড়ে যায়।

নিকট অতীতে আমাদের দেশে যেসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও হযরত মুহাম্মদ (স.) এর পবিত্র হাদিস, সুন্নাহ আখলাকে হুসনা ও তাঁর মহান সাহাবাদের (র.) বাণী, সংস্কারসমূহের ইশাআত ঘটছে এর মধ্যে একটি বিপ্লবী উদ্যান হল চুনতী সীরত মাহফিল। এ মাহফিলের স্বপ্নদ্রষ্টা ও উদ্যোক্তা ছিলেন হযরত মাওলানা হাফেজ আহমদ প্রকাশ শাহ সাহেব কেবলা চুনতী (রহ.)।

শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল হালিম আল মাদানী

পীর সাহেব, বাগদাদিয়া খানকাহ, চকবাজার, চট্টগ্রাম

✪ আমি চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসার ৭ম শ্রেণিতে পড়ি। শহরে থাকাবস্থায় জানতে পারি ঘাটফরহাদবেগ এলাকায় মকবুল মিয়ার বাড়িতে এক শাহ সাহেব হুযুর এসেছেন। তাঁর বাড়ি সাতকানিয়া (বর্তমানে লোহাগাড়া) চুনতী। খবর নিয়ে ঐ বাসায় পৌঁছে হযরত শাহ সাহেব হুযুরের মোলাকাত করে দোয়া নিয়ে ধন্য হই। সে হতে চট্টগ্রাম শহরে একাদিকবার শাহ সাহেব হুযুরের সাথে মোলাকাত করি দোয়া নেয়ার উদ্দেশ্যে।

✪ আরেকবার সংবাদ পেয়ে ঘাটফরহাদবেগস্থ মকবুল মিয়ার বাসায় যাই। সকাল বেলা পৌছলে বলা হল নিদ্রা থেকে হুজুর উঠেননি। ফলে, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ফিরে এসে পরদিন সকাল বেলা আবার যাই। তখনো ঐ নিদ্রা থেকে হুজুর উঠেননি। আমি ১২/১৪বছরের ছাত্র হিসেবে এতে কৌতুহলী হই। কিন্তু তখনো একই অবস্থায় হুযুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।

এভাবে সকাল-সন্ধ্যা ৫/৭ বার যা ওয়ার পর ৭ম দিনের দিবাগত রাত্রে শাহ সাহেব হুযুর নিদ্রা থেকে উঠলে অনেকের সাথে আমিও মোলাকাত করি এবং তথায় হুযুরের সাথে রাতের খাবার খাই।

আমার বয়স বাড়ার সাথে সাথে বুঝতে পারি একাধারে ৭দিন বিছানায় শুয়ে থাকা কোন স্বাভাবিক মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। এ ৭দিন প্রস্রাব-পায়খানা, খানা-পিনা না করা, শুয়ে থাকতে থাকতে অসহনীয় না হওয়া সম্ভবের বাইরে। এ একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের ওলির করামত। ওনি এ সাতদিন মোরাক্বাবা তথা আল্লাহর ধ্যানে কাটিয়েছিলেন বলা যাবে।

✪ আমার ছাত্র জীবনে আরেকবার চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের বারান্দায় দেখি হযরত শাহ সাহেব হুযুর তথায় তশরিফ এনেছেন এবং তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন। আমি হুযুরের নিকটতম স্থানে কয়েক রাকাত নামায আদায় করি। হুযুরের নামায সমাপ্ত হলে আমি মোলাকাত করতে পারব এই আশায় প্রতীক্ষায় আছি এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। কিন্তু তিনি দু'রাকাত করে নামায পড়তেই রয়েছেন। আমি কৌতুহলী হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। তার নামায পড়া শেষ হচ্ছে না কিন্তু আমিও দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে রয়েছি। শাহ সাহেব হুযুর ২ রাকাত করে নামায পড়তেই ছিলেন। মনে হল একশত রাকাত-এর বেশি বাদে কম হবেনা। দীর্ঘক্ষণ পর নামায পড়া শেষ হলে আমি মোলাকাত করে দোয়া নিই।

✪ শাহ সাহেব হুযুরের সুন্দর পোষাক, নুরানি সুরত মোবারক, নুরানি চেহারা কেন জানি আমাকে মোহিত করত। ফলে চট্টগ্রাম শহরে যেখানে তিনি তশরিফ রেখেছেন বলে সংবাদ পেতাম সেখানেই চলে যেতাম হুযুরের মোলাকাত লাভে ধন্য হবার মোহে।

✪ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় জামাতে উলা পড়ি। থাকি হোস্টেলে। একদিন বেলা ১০টার পর মাদরাসায় চলে আসেন হযরত শাহ সাহেব হুযুর। হুযুরকে দেখে দৌড়ে তাঁর নিকটে যাই। তিনি আমার থেকে হযরত মুফতি আমিন সাহেব হুযুর (প্রধান মুহাদ্দিস) কোথায় জানতে চান। এতে আমি হযরত মুফতি সাহেব হুযুরের ঘন্টায় তথা ক্লাস রুমে নিয়ে যাই। শাহ সাহেব হুযুর কক্ষের ভিতর প্রবেশ করা মাত্র মুফতি আমিন সাহেব হুযুর দাঁড়িয়ে যান। সাথে সাথে ছাত্ররাও দাঁড়িয়ে যায়। ঐ মুহূর্তে মুফতি সাহেব হুযুর আমাকে দেখা মাত্র নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার নিয়ে আসতে। আমি দৌড়ে গিয়ে চেয়ার নিয়ে এসে মুফতি সাহেব হুযুরের চেয়ারের নিকটে রাখতে গিয়ে দেখি শাহ সাহেব হুযুর ছাত্রদের পাশে বেঞ্চে বসা। মুফতি আমিন সাহেব হুযুর বারবার বলার পরও শাহ সাহেব হুযুর বেঞ্চ থেকে উঠে এসে চেয়ারে বসেননি।
উল্লেখ্য হযরত শাহ সাহেব হুযুর এককালে হযরত মুফতি আমিন সাহেব হুযুরের ছাত্র ছিলেন।

ঘন্টা শেষ হলে মুফতি সাহেব হুযুরের সাথে হযরত শাহ সাহেব হুযুর পিছনে পিছনে অধ্যক্ষের কক্ষে চলে যান। যেহেতু মুফতি সাহেব হুযুর মাদরাসা চলাকালিন অধ্যক্ষের কক্ষে বসতেন।

হযরত শাহ সাহেব হুযুর আসাতে কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক ঐ কক্ষে যান। আমি ছাত্র মানুষ বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি। হযরত শাহ সাহেব হুযুর নানান কথা বলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে চট্টগ্রাম শহরের এক বুযুর্গের অসুখ প্রসঙ্গে বললেন, অসুখ থাকলে আল্লাহকে ডাকবে কি করে?

হযরত শাহ সাহেব হুযুর চলে যাওয়ার পর অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান (রহ.) ওজু করাকালীন আমি পাশে ছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আবদুল হালিম ইয়ে ওয়াকেয়ী আল্লাহকা ওলি হ্যায়।" (৩বার বললেন) আরো বললেন, ইয়ে ওয়াকেয়ী মজযুব হ্যায়।"

উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান (রহ.) দীর্ঘদিন দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত চাঁন্দ মিয়া সওদাগরের পুত্র হন।

✪ দীর্ঘদিন আমার মদিনা শরিফে রওজাপাক ও মসজিদে নববীতে কর্মরত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এমনি অবস্থায় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে এসে আবার কর্মস্থল তথা মদিনা শরিফে ফিরে যাচ্ছিলাম। যে দিবাগত রাত্রে ঢাকা রওয়ানা হয়ে জেদ্দার ফ্লাইট ধরার প্রোগ্রাম এর আগেরদিন সকাল বেলা সাক্ষাৎ হয় তাহের সোবহান সাহেব ও জমজম ট্রাভেলের জিয়াউদ্দিন সাহেবের সাথে। তারা বললেন চুনতীর হযরত শাহ সাহেব হুযুর শহরে এসেছেন হেমসেন লেইনস্থ ইউসুফ মিয়ার বাসায় আছেন।

পরদিন সকাল ১১টার দিকে তাহের সোবহান সাহেব, জিয়াউদ্দিন সাহেবসহ আমরা ৪/৫ জন ইউসুফ মিয়ার বাসায় যাই হযরত শাহ সাহেব হুযুরের মোলাকাতের উদ্দেশ্যে। গেইট দিয়ে প্রবেশ করা মাত্র বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর সাহেব হযরত মাওলানা কুতুবউদ্দিন সাহেবসহ ৪/৫ জনের দেখা। তারা ২ ঘন্টা আগে এসে দেখা না পেয়ে চলে যাচ্ছিলেন। যেহেতু হযরত শাহ সাহেব হুযুর নিদ্রায় রয়েছেন। সকালে আরো কয়েকজন এসে ফিরে গেছেন।

তখন আমি ইউসুফ মিয়ার সাথে পরিচিত হয়ে তাঁকে অনুরোধ সহকারে বললাম, আজ রাতে আমি ঢাকা হয়ে মদিনা শরিফ চলে যাব। আমার ছুটি শেষ। হযরত শাহ সাহেব হুযুরের সাথে আমি মোলাকাত পাব না? আপনি মেহেরবানি করে শব্দ না হয় মত দরজা খুললে আমি নীরবে তাঁর কক্ষের দরজার কাছে গিয়ে তাঁকে একনজর দেখে চলে আসব।" আমার কথায় তিনি রাজি হওয়ায় আমি তাঁর সাথে সাথে তাঁরই দালানের উপরতলায় চলে যাই। নীরবে তাঁর দরজার কাছে গিয়ে হযরত শাহ সাহেব হুযুরের দিকে দৃষ্টি দিতে দেখি তিনি ডানকাত হয়ে শুনে

আছেন। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে শব্দবিহীন দরজা বন্ধ করতে করতে হযরত শাহ সাহেব হুযুর উঠে বসে পড়েন এবং ডাক দেন। এতে হতচকিত হয়ে ইউসুফ মিয়া কক্ষে প্রবেশ করেন। পিছনে পিছনে আমিও প্রবেশ করি। শব্দ শুনে নিচতলায় মোলাকাত প্রার্থী সবাই উপরের তলায় আসে। আমি মোলাকাতকালীন "আজ রাত্রে মদিনা শরিফ চলে যাচ্ছি দোয়া করবেন" বলায় তিনি অঝোর নয়নে কাঁদতে শুরু করেন। আর বলতে লাগলেন 'আমি কি দোয়া করব? আমার নবীর কদমে আমার সালাত-সালাম কদমবুচি এভাবে বারেবারে বলে যেতে লাগলেন, মনে হয় এভাবে একাধারে ৪/৫ মিনিট হবে এবং ছোট শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন।

আমি মদিনা শরিফ চলে গিয়ে প্রায় দু'মাস পর সাতকানিয়ার এক লোক থেকে জানলাম হযরত শাহ সাহেব হুযুর ইন্তেকাল ফরমায়েছেন।

আমি রওজায়ে পাকে তাঁর সালাত যেমনি পৌছিয়েছি তেমনি ইন্তেকালের পরে সালামান্তে দোয়া করি।

আবুল কালাম আজাদ

পশ্চিম কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

শাহ সাহেব কেবলার করামত

✪ আমি ছোট বেলায় সবুজ সাথী নামক বইটি মুখস্থ করে ফেলি। ছোট বেলায় প্রায় সময় কবিতা-ছড়া পড়ে বেড়াতাম। এতে আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠে মাশা' আল্লাহ ছেলেটি অনেক জ্ঞানি হবে, তার মেধা অনেক প্রখর হবে। পরবর্তীতে ২/১ দিনের মধ্যে আমি প্রায় বোবা হয়ে যাই। আমার আব্বা ও আম্মা আমাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যান। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আলহাজ্ব মাস্টার কবির আহমদ এর পরামর্শে শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আমাকে চুনতীর শাহ সাহেব কেবলার কাছে নিয়ে যান। আমার আম্মাজান আলহাজ্ব আকতার বেগমের কাছে শুনেছি,শাহ সাহেব কেবলা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করেন এবং আমার মুখে দু'টি ফুঁ দেন। বলেন, চলে যাও তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে। কথা বলতে পারবে। পরবর্তীতে আমি আল্লাহর রহমতে এবং শাহ সাহেব কেবলার করামতিতে ভাল হয়ে যাই। একথা আমার সারা জীবন ধরে স্মরণ থাকবে। প্রায় সময় আমি শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর মাজার জেয়ারত করতে চাই। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাকে স্মরণ করি। ওনার দোয়ায় আমি বর্তমানে লোহাগাড়া প্রেস ক্লাবের সভাপতির দায়িত্বে আছি।

Chunati.com Pioneer in village based website

শামসুল আলম
বারদোনা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

✪ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ। আমার বয়স তখন ১১/১২। ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। পেট ব্যাথা (কামড়ি) থামছেনা। আমার আব্বা একাধিক ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নেয়ার পরও উপশম হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় স্থানীয় একজন রিক্সাচালক আব্বাকে পরামর্শ দিল আমাকে সাথে নিয়ে চুনতীর শাহ সাহেব হুযুরের কাছে যাওয়ার জন্য। ফলে পরদিন সকালে আমাদের বারদোনা সাতকানিয়ার গ্রামের বাড়ী থেকে উক্ত রিক্সা চালকের রিক্সাযোগে চুনতী রওয়ানা হই। চুনতীর কাছাকাছি পৌঁছামাত্র রিক্সাচালক বলল সামনের দিক হতে শাহ সাহেব হুযুর রিক্সাযোগে আসছেন। শাহ সাহেব হুজুর আমাদের রিক্সা অতিক্রম করতে করতে বলে গেলেন 'বরশ-হ-গই' বরশ হ-গই। অর্থাৎ বরশ খাওয়ার জন্য বললেন।

এতে আমরা আশ্চার্যান্বিত হয়ে যাই। যেহেতু আমরা কার কাছে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, এসব কিছু শাহ সাহেব হুযুরের কাছে জানা হয়ে গেছে বিধায়। আমরা রিক্সা নিয়ে শাহ মঞ্জিলে গিয়ে বুঝতে পারলাম উনি রিক্সা নিয়ে কোথায় গেছে তা অজানা এবং কবে ফিরবেন তাও অজানা। তখন চুনতীর এক বাড়ী থেকে 'বরশ' কিনে আমাকে খাওয়ানো শুরু করলেন এতে আমি দ্রুত সুস্থতা লাভ করি।

ঐ হতে আমার আর কোন দিন পেট কামড়ি হয়নি এবং হযরত শাহ সাহেব হুজুরের উচিলায় আমি ব্যবসা বাণিজ্য সহ নানা বিষয়ে সফলতা লাভ করি। বিশেষ করে চট্টগ্রাম রেয়াজুদ্দিন বাজার তামাকুন্ডি লেন বণিক সমিতির সেক্রেটারী পদে থেকে সেবাদান করছি।

মুজিবুর রহমান খান
চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

কিছু স্মৃতি কথা

✪ তখন আমি ৭/৮ বৎসরের ছেলে। আমার বড় ভাই আয়ুব খান আমার ২/৩ বৎসরের বড়। মায়ের নানার বাড়ি আমাদের গ্রামেই। মায়ের নানারা আমাদেরকে নানার মত আদর স্নেহ করতেন। বাড়িতে আমার ও বড় ভাইয়ের শীত পিঠা খাওয়ার দাওয়াত। ভোর হতেই আমরা ছুটে গেলাম বড় নানার বাড়ি। ভাবা পিঠা (ধুই পিঠা) ইলিশ মাছ ও মোরগের গোস্ত সহ খেজুর রসের বিরাট আয়োজন। আমরা দুই ভাই সম বয়স্ক ছেলেরা সহ বয়স্করা ও শীতপিঠা খাওয়ার অনুষ্ঠানে

উপস্থিত আছে। পিঠা খাওয়ার কোন সীমারেখা নাই। যে যা পারে খাবে। অনুষ্ঠান শেষ হলো প্রায় ৯ ঘটিকার দিকে। ঠিক সে সময়ে হাফেজ মামু (তখন মাদরাসার ছাত্র) উপস্থিত হন। তাঁর সমবয়সী এবং সহপাঠি বড় নানার মেঝ ছেলে ইকরাম মামা বললেন, হাফেজ বদ্দা, তুমি বিরাট শীত পিঠা খাওয়ার আয়োজন করেছ।" তখন হাফেজ মামা কপালে হাত দিয়ে বললেন, কুরআন শরিফ নিয়ে বসেছিলাম বিধায় আসতে দেরী হয়ে গেল। আসলে ফজরের নামাযের পর পবিত্র কুরআন পাঠ না করে কোথাও বের হতেননা তিনি।

✪ আমার ছোট বোন হোছনে আরা খানমের বিয়ের পূর্ব রাত্রে মাগরিবের নামাযের পর আমি আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে বাড়ির সামনে কাচারির দক্ষিণ পানে লিচু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন মনে মনে শাহ সাহেব মামুর কথা ভাবতে ছিলাম। পরের দিন বিয়ে। ঘরবাড়ি চার্জ লাইটের আলোতে আলোকিত করা হয়েছে। মহল্লার লোকেরা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। একদল পুথি পাঠ করছে। আমার মনে বারে বারে শাহ সাহেব মামুর কথাই যেন দোলা দিচ্ছিল। ভাবছিলাম পরের দিন শাহ সাহেব মামুর সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করব।
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অলৌকিকভাবে কোন দিক থেকে কিভাবে শাহ সাহেব মামু মুজিব মামু বলে আমার সামনে উপস্থিত হলেন, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নাই। আমি কিছুটা হতচিত্তে তাঁকে সালাম জানালাম।
হেসে হেসে বললেন, তোরাত গ্রামকে শহরে পরিণত করেছিস। তবে সময়ে চুনতি গ্রাম শহর হবে। মামুকে ঘরে নিয়ে গেলাম। সকলেই এসে দেখা করল। আব্বার সাথে দেখা হলো। আব্বার সাথে অনেক ঠাট্টা তামাসা করলেন। সম্পর্কে আব্বার শালা হয় এবং তিনি হন শাহ সাহেব মামা। চা খেয়ে চলে গেলেন শাহ সাহেব মামা। সে সময়ে রাত্রেই তিনি দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন আল্লাহই জানেন একমাত্র।

✪ একই রকম ঘটনা আরো একদিন ঘটেছিল। তখন মনে হয় রোজার ঈদ অথবা কোরবানের ঈদ উপলক্ষে সপরিবারে বাড়ি এসেছিলাম। আছরের নামাযের পর আমি ছেলেকে নিয়ে গ্রামের স্কুল-মাদরাসা ইত্যাদি দেখাবার জন্য বের হই। স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্কুল মাদরাসা প্রসঙ্গে এবং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান প্রধান উদ্যোক্তাদের প্রসঙ্গে ধারণা দিচ্ছিলাম। কথা প্রসংগে শাহ সাহেব মামুর কথাও আলোচনা হচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম ছুটি প্রায় শেষ হয়ে গেল। কিন্তু শাহ সাহেব মামুর সাথে দেখা হলোনা। ভাবছিলাম তাঁর সাথে দেখা করার সময় নির্ধারণ করতে হবে। মনে মনে ভাবছিলাম শাহ সাহেব মামুর সাথে দেখা না করে যেন বাড়ি থেকে না যাই। ভাবছিলাম বাড়ি ফিরার পথে তিনি বাড়িতে আছেন

কিনা খোঁজ নিব। এমন সময় তাঁর জামাতা মাওলানা শিবলি দক্ষিণ দিক থেকে আসলেন। বললেন বদ্দা কেমন আছেন? তাঁর সাথে কথাবার্তা বলছিলাম। সে ছেলেকে আদর করছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম শাহ সাহেব মামু বাড়িতে আছেন কিনা? উত্তরে তিনি বললেন তিনিত এখন আছেন কিনা সন্দেহ। কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে না। প্রায় মাগরিবের সময় হয় হয়। আমরাও ফিরবার চিন্তা ভাবনা করছিলাম। ঠিক এমনি সময়ে উত্তর পূর্ব দিক থেকে শাহ সাহেব মামু এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, মুজিব মামু কখন আসিছ? ছেলেকে একটু আদর করলেন। শিবলিকে বললেন, তুই কোথায় গিয়েছিলি। আমি কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। তখন শাহ সাহেব মামুকে অত্যন্ত উগ্র এবং দুর্বল দেখাচ্ছিল। কথাবার্তা বলতেও ভয় ভয় লাগছিল। তিনি কিন্তু গুণগুণ করে কুরআন শরিফ পড়ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কেমন আছেন। বললেন আমি ভাল থাকলে কি হবে দেশত ডুবে যাচ্ছে। পানি-পানি। সব দিকে পানি আবার একটু হাসলেনও। জিজ্ঞেস করলেন ক'দিন থাকব। বললাম, ছুটি প্রায় শেষ। শেষ কথা বললেন, মাদরাসার প্রতি যেন নজর রাখি। কথা বলতে বলতেই আবার উত্তর পূর্বদিকে চলে গেলেন। দূর থেকে দেখা গেল কবর স্থানের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছেন। তিনি কত বড় ওলি ছিলেন সাধারণ মানুষের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়। আর তাঁর সাথে দেখা করার জন্য তাঁর বাড়িতে যেতে হয়নি।

✪ তারিখ মনে নেই। তখন আমি বাড়িতে। বড় পুকুরের উত্তর পশ্চিম পাড়ে আমাদের বাড়ির সামনে একা একা দাঁড়িয়ে আছি। খুব সম্ভব সিগারেট পান করছিলাম। শাহ সাহেব মামুকে দেখলাম, দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে থামলেন। সালাম দিলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে আমাকে সহ হাঁটতে থাকলেন। নিজে নিজে অনেক কথা বলছেন। আমাকে যা বললেন, তা আমার কাছে খুব বোধগম্য হচ্ছেনা। আমি হ্যাঁ হাঁ করে তাঁর কথার প্রতি সমর্থন দিচ্ছিলাম। তিনি কিন্তু আমাকে চাড়ছেন না। কাজেই তাঁর সংগে সংগে আমিও চলছি। চলতে চলতে পাহাড়ের ভেতর ঢুকে পড়লাম। আমি কিন্তু তখন অত্যন্ত ভীত অবস্থায় আছি। ভয়ে ফিরে আসবার প্রস্তাব দিতে পারছি না। তিনি কিন্তু খুব উগ্রমেজাজে শুধু বলছেন বুঝলিত। আমি শুধু হাঁ হাঁ করছি। বাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে চলে গেছেন। তখন আমি মামুকে বললাম, আমাকে কতদুর যেতে হবে। তখন তিনি কিছুটা হাসিমুখে আমাকে আদর করে ফিরে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। পরে আমি কিছুটা অনুতপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসলাম। সাথে থাকলে হয়ত কিছু দেখবার সুযোগ হতো।

✪ পূর্বে বলেছি আমার পিতা মরহুম মোহাম্মদ ইউনুছ খান একদিকে শাহ সাহেব মামুর ভাই আর একদিকে শ্যালক ছিলেন। তবে শ্যালক হিসাবে যেন তাঁরা রসিকতা বেশি করতেন। দেখা হলেই খুব উৎফুল্ল চিত্তে উভয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলত। একদিন খুব অল্প সময়ের অসুস্থতায় আব্বা মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময় শাহ সাহেব মামা বাড়িতে ছিলেন না। তিনি বাহির থেকে আব্বার মৃত্যুর একদিন পরে বাড়িতে আসেন। পিতার চার দিনের ফাতেহার দিন আমি মহল্লার মানুষদেরকে বলেছিলাম শাহ সাহেব মামুর উপস্থিতিতে গরু জবেহ করতে হবে। দুই তিনটা গরু যথাসময়ে জবেহ করে মেহমানদেরকে খাওয়ান খুবই সময়সাপেক্ষ এবং কঠিন কাজ। গ্রামবাসীরা গরুগুলি মাঠে নিয়ে জবেহ করার নিমিত্তে প্রস্তুতি নিবার সময় আমি তাদেরকে কিছুটা অপেক্ষা করার জন্য বলে শাহ সাহেব মামুর অনুসন্ধানে তাঁর বাড়ি যাই। কিন্তু বাড়িতে তিনি না থাকাতে খোঁজ নিতে নিতে বেশ দূরে এক বাড়িতে তাঁকে একখানা চৌকিতে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পাই। তাঁর পাশে বসার জন্য বাড়ির লোকেরা আমাকে একটা চেয়ার দেন। প্রায় দেড় দুই ঘন্টা তাঁর পাশে বসে আছি। মনে মনে ভয় লাগছে। হঠাৎ তিনি ঘুম থেকে উঠে বসলেন। আমাকে দেখে মুজিব মামু তুই কেন এসেছিস বলে একটা ঘুমের আমেজ পূর্ণ হাসি দিলেন। তারপর বললেন, তার কি হয়েছিল। সব খুলে বর্ণনা দিলাম। তিনি আবার শুয়ে পড়লেম। আমি আমার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা দিলাম।

তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পবিত্র কুরআন শরিফ পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রায় ঘন্টা দুই ঘন্টা অনর্গল কুরআন পড়তে পড়তে তাঁহার শরীর দিয়ে ঘাম বের হচ্ছিল। হঠাৎ কুরআন পাঠ বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে বললেন আর পড়বো? তোর আব্বা অনেক উপরে চলে গেছে। তোরা চিন্তা করিস না। তুই যা, আমি আসতেছি। আমি চলে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে দেখি মহল্লার লোকেরা গরু জবেহ করে তাদের কাজ অর্ধেক শেষ করেছে। তারা আমাকে বললো আমার জন্য অপেক্ষা করলে সময় মতো কিছুই হবেনা। অনেক্ষণ পরে শাহ সাহেব মামু আসলেন। এসেই আমার সাথে মজাক করতে থাকেন। আমি আসলে আমাকে একটা খোলা বিস্কুটের প্যাকেট দিয়ে বললেন বসসু। বসসুর অর্থ গ্রামে কিছু উপহার যা সাধারণত বাচ্চাদেরকে দেয়া হয়। বিস্কুটগুলি ঘরের ভিতরে নিয়ে সকলকে বিলিয়ে দিলাম। নিজেও খেলাম। তারপর শাহ সাহেব মামু সকলের সাথে কথাবার্তা বললেন। আব্বার কামরায় গিয়ে বসলেন। চা নাস্তা খাওয়ার পর একা একা আমার আব্বার কবরের দিকে চলে গেলেন। আমাদের সাথেও নিলেন না। রাত্রে বা সকালে তাঁকে পাওয়া গেল না। পরের দিন প্রায় ১২ ঘটিকার সময় তিনি

উপস্থিত হলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রায় রাত পর্যন্ত ছিলেন। দুর-দুরান্ত থেকে ভক্তরা এসে আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হতে থাকে। একজন লোক তাঁকে পায়ে ধরতে চাইলে তিনি রেগে উঠেন এবং বললেন আমি কি খোদা হয়েছি? তাকে বকা দিলেন।

✪ চুনতির সীরতুন্নবীর মাঠ এবং শাহ সাহেব মামুর মাজার বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে। সীরতুন্নবীর মাঠ এবং শাহ সাহেব মামুর মাজার ও মসজিদ যেখানে অবস্থিত তা ছিল ধানের জমি এবং কিছু টিলা পাহাড়। ধানের জমির মধ্যে সাড়ে ৪ কানি জমির মালিক ছিলেন আমার বড় ভাই মরহুম মোহাম্মদ আয়ুব খান এবং বাকী জমি ও টিলাপাহাড়ের মালিক ছিলেন মরহুম রফি উদ্দিন খান ও তাঁর ছোট ভাই ছালাহুদ্দিন খান। শাহ সাহেব মামুর শুভার্থী এবং ভক্তগণ উক্ত জমি খরিদ করে সীরতুন্নবীর মাঠ, মসজিদ ও মাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এ ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের শিল্পপতি মরহুম মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব ও মরহুম শিল্পপতি ছালেহ আহমদ চৌধুরীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহ সাহেব মামু জীবিত থাকা অবস্থায় একদিন তাঁর মাজারের স্থানে ধানক্ষেত মাঠে বাঁশ কুপিয়ে চিহ্নিত করার দৃশ্য অনেকেই দেখেছেন, উক্ত দৃশ্য থেকেই বিজ্ঞ মানুষেরা তথায় শাহ সাহেব মামুর মাজার হবে বলে ধারণা করে রাখেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে তথায় দাফন করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে মাজার, মসজিদ এবং মাঠ উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

রাশেদুল হক (টিপু)

চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

শাহ সাহেব কেবলা দুনিয়াবী কাজে গুরুত্ব না দিলেও তাঁর পরিবার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত আন্তরিক এবং স্নেহপরায়ণ ছিলেন। নিম্নে এ ব্যাপারে কিছু উদাহরণ বর্ণনা করছি।

✪ আমার নানী মরহুমা হামিদা বেগম (শাহ সাহেবের (জেঠিমা) বার্ধক্যজনিত রোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়। শাহ সাহেব উনাকে দেখতে উপস্থিত হলে, আমার নানী তাঁর কাছে দোয়া চাইলেন যেন সহজভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারে। সংগে সংগে শাহ সাহেব বললেন, আপনি এখন মরতে পারবেন না-আমি এ বছর হজ্বে গমন করব এবং ওখান থেকে ফিরে এসে আপনাকে দেখতে আসব। উনি হজ্ব পালন শেষে সত্যি সত্যি আমার নানীকে দেখতে আসলেন এবং উনার উপস্থিতিতেই আমার নানী পরলোক গমন করেন। অতঃপর কবরের জায়গা

দেখিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর উনি হঠাৎ তাড়াহুড়া করে কবরের জায়গায় উপস্থিত হয়ে কবর খননকারীদের ধমক দিয়ে বললেন, বেকুবের দল (আংশিক খননকৃত) কবর ভরাট করে দে। আর একটু পশ্চিমে কবর খনন কর।তার কারণ হিসাবে উনি বললেন আমার জেটিমা, মরহুম হাজী শামছুল হুদার মুরব্বি, তাই মুরব্বিকে হাজী সাহেবের পায়ের দক্ষিণে কবর দেয়া কি উচিৎ? একটু পশ্চিমে খনন কর। তারপর আমার নানীর পূর্বপার্শে আমার আব্বাজান মরহুম একরামুল হক এবং তার পূর্বপার্শে মাত্র একটি কবরের জায়গায় আমার আম্মাজান (শাহ সাহেব কেবলার জেঠাতো বোন) মরহুমা ছাবেরা খানম চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে উক্ত তিন কবরবাসীদের কবরের জায়গা শাহসাহেব কেবলাই অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

✪ শাহ সাহেব কেবলা হযরত মরহুম ফজলুল হক (রহ.) (খলিফা হযরত আজমগড়ি (রহ.) এর পরিবারের সাথে স্বীয় পরিবারের অতি সুন্দরভাবে বন্ধন রচনা করে গেছেন। যেমন- শাহ সাহেব কেবলার একমাত্র মেয়ে শাহজাদী আমেনা বেগমের সাথে মরহুম ফজলুল হকের (রহ.) এর আপন বড়ছেলের ঘরের নাতি আ.ন.ম. শামছুদ্দিন মুহাম্মদ শিবলীর এবং একমাত্র ছেলে মরহুম জমাল আহমদের সাথে তাঁর (আমার দাদা মরহুম মাওলানা ফজলুল হক (রহ.) ভাতিজার মেয়ে মরহুমা নুরজাহান বেগম (লুলু) এর শাদী মোবারক সম্পন্ন করেন।

✪ আমার ছোট বোন নাছিমা ফরহাতের বিয়ের ব্যাপারে আমার আম্মা শাহ সাহেব কেবলার কাছে দোয়া চাইলেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাবের কথা বললেন। শাহ সাহেব কেবলা বললেন, তোর মেয়েকে বাড়ীর কাছেই বিয়ে দিতে হবে। আমার আম্মা তখন বললেন, আমার মেয়েত কালো। শাহ সাহেব বললেন চোখের সুরমা ও কালো, তুই চিন্তা করিসনা। অতঃপর খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাদের আত্মীয়ের মধ্যে জনাব শফিকুল আজীম খাঁ ছিদ্দিকী (উপ সচিব অবসরপ্রাপ্ত) এর সাথে বিয়ে হয়ে যায়।

✪ আমার স্ত্রী বিয়ের পরে এস.এস.সি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। পরীক্ষা শেষে শাহ সাহেবের দোয়া চাইতে গেলে তিনি বললেন, তুই আউয়াল নম্বরে পাশ করবি। সত্য সত্যিই দেখা গেল আমার স্ত্রী ১ম শ্রেণিতে পাশ করেছে। এই পাশের খবরটা সর্বপ্রথম চুনতীতে টেলিফোনের মাধ্যমে পৌছালেন আমার শ্রদ্ধেয় দাদা জনাব মরহুম আইয়ুব খান (কাজেম আলী হাই স্কুলের হেড মাস্টার)

Chunati.com Pioneer in village based website

মহান অলি আশেকে রাসূল (স.) হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.)

অধ্যক্ষ দ্বীন মুহাম্মদ মানিক
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, চুনতী মহিলা (ডিগ্রি) কলেজ।

"আল্লাহ যারে বড় করে, সে জানেনা সে কেমন করে উঠছে,
যে ফুল নিয়ে সবাই খুশী, সে জানেনা সে কেমন করে ফুটছে।"

অলিকুল শিরোমনি আশেকে রাসূল (সা.) শাহ শাহেব কেবলাকে উপলক্ষ করে আমার লেখা এ গানটির দু'টি লাইন তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

পরিচিত স্বত্তার পরিচিতি নিয়ে পরিমিত জ্ঞানে পরিশীলিতভাবে পরিপক্ক প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে নয়। তদুপরি প্রিয়জন মহান ব্যক্তিটি যদি পরিবার বা বংশভুক্ত কেউ হন, তাহলে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বর্ণনাতেও সংশয় জাগে- "পাছে লোকে কিছু বলে।" শাহ সাহেব কেবলাকে নিয়ে আমার লেখার প্রয়াসও সে পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত...।

পিতামহের দিক হতে বেঁচে থাকা বংশগত বয়োজ্যেষ্ঠের একজন হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে বেশকিছু জ্ঞাত থাকা স্বাভাবিক হলেও এ নিবন্ধে সবকিছু লিখার অবকাশ নেই। শাহ সাহেব কেবলার জীবনীগ্রন্থ সংকলনের কর্ণধার পরম শ্রদ্ধেয় ও স্নেহভাজন আত্মীয় নিবেদিত ইতিহাস গবেষক জনাব আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর একান্ত আগ্রহকে মূল্যায়ন করে আমি বইটির নতুন সংস্করণে হাজির হলাম মাত্র। ভবিষ্যতে পরম করুণাময় আল্লাহ তাওফীক দিলে মহান অলিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ ও আত্মশুদ্ধির দিক নির্দেশনামূলক একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশের বাসনা অধমের আছে।

জীবন বা ইতিহাস কারো জন্যে থেকে থাকেনা। প্রিয় সম্পাদক দক্ষতার সাথে এ গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। জনাব চৌধুরী একজন অভিজ্ঞ সুলেখক এবং সংগঠক। সর্বোপরি নিঃসন্দেহে তিনি অলিভক্ত মানুষ। দায়িত্ব অর্পিত হলে তিনি সেটা পালন করেই ছাড়েন। স্বীকার করি, শাহ সাহেব কেবলার একনিষ্ঠ ভক্ত হলেও জীবদ্দশায় তিনি তাঁর নিত্যসান্নিধ্যে বেশি ছিলেন না। তাই তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে শাহ সাহেব কেবলার সংকলনটি

বের করতে তাঁকে অনেক কঠিন ও সন্তর্পণে কাজ করতে হয়েছিল। মূল্যবান শ্রম ও সময় ক্ষেপণ করে নিঃস্বার্থভাবে এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বইটিতে শাহ সাহেব কেবলার জীবনের মোটামুটি একটি সম্যক ধারণা পেতে অসুবিধা হবে বলে মনে হচ্ছেনা। তাই একই কথা চর্বিত চর্বন করে উৎসুক পাঠকের বিরাগভাজন হতে চাই না। তবে এ যুগের প্রবীন ও নতুন প্রজন্মের জানার স্পৃহাকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু বিবেচ্য তথ্য সন্নিবেশিত করে সাময়িক দায়মুক্ত হতে চাই।

হযরত শাহ সাহেব কেবলার জন্মস্থান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলাধীন লোহাগাড়া উপজেলার অন্তর্গত চুনতী গ্রামে। যেখানে তিনি চিরশায়িত আছেন। তাঁর মূল নাম হাফেজ আহমদ। পিতার নাম হাজী সৈয়দ আহমদ এবং মাতার নাম হাজেরা খাতুন। কলকাতার আলীয়া মাদরাসা থেকে তিনি লেখাপড়া শেষ করেন। দুই সহোদরের ঘরে পিতামহের সূত্রে আমরা একই দাদার নাতি। আবার তিনি আমার ভগ্নিপতিও বটে। (বড়বোনের জামাই) তাই বয়সের অনেক ব্যবধান সত্ত্বেও পারিবারিক সূত্রে তাঁকে কাছে থেকে দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়েছে।

প্রত্যেক কিছুর সৃষ্টি, স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠার বেলায় তার প্রসব বেদনা থাকে। রাষ্ট্র, ইতিহাস, সভ্যতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সবার বেলায় কথাটি প্রযোজ্য। একজন মহান অলিও এর উর্দ্ধে নয়। মানুষ সহজেই কাউকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। অনেক যাচাই-বাছাই, কাটখড় পুড়ানোর পর এ স্বীকৃতি আসে। শাহ সাহেব কেবলার বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

হযরত শাহ সাহেব কেবলা ছিলেন একজন সহজ সরল, অনাড়ম্বর আত্মভোলা মানুষ। আল্লাহ ও রাসূলের প্রেমে এতই মশগুল থাকতেন, যে দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম মাফিক চলাফেরা, তাঁর কাছে আশা করা যেত না। আহার-নিদ্রা, স্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদির কোন ঠিক ঠিকানা ছিলনা। নির্জনতা, অন্ধকার এবং বেশিরভাগ বন জঙ্গল ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই ছিল তাঁর পছন্দ। বুজর্গীর প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত গরম হালতে

ছিলেন। সারাক্ষণ আপন মনে না'আত, গজল ও বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করে যেতেন। কদাচিৎ লোকালয় বা বাড়ীতে এলে ভয়ে লোকজন দূরে দূরে থাকত। কাকে কখন কি বলে (গালাগাল), কোন জিনিস তছনছ করে, তার কোন ইয়াত্তা থাকত না। তাই তাঁকে আসতে দেখলে লোকজন ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করতেন ঝামেলা এড়ানোর জন্য।

পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং উনার এহেন মযযুবি হালতের কারণে বড়বুবু ছেলেমেয়ে নিয়ে (জমাল ও আমেনা) আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। শাহ সাহেব কেবলাকে কাছে পেলে তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে গায়ের ময়লা জামা বদলিয়ে ধুয়ে দিতে ও নাপিত ডেকে দাঁড়িগোফ ছাটাই করে গোসল করাতে দেখতাম। আমরা তখন অনেক ছোট আমাদের সাথে কিন্তু কখনো গরম মেজাজ দেখাতেন না। শুনেছিলাম জমাল, আমেনা ছাড়াও তাঁদের সংসারের আর একটি কন্যা জন্মেছিল। বাল্যাবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ছিল সবেধন নীলমনি নিজঘরে পরবাসী বড়বুবুর সংসার।

ক্ষুদ্র পরিসরে বড়বুবুর সংসার জীবনের ত্যাগ ও ধৈর্য্যের কাহিনী অনুল্লেখ্য রেখে এখন সামান্য আলোকপাত করতে চাই একজন কামেল বুজর্গ হিসেবে শাহ সাহেব কেবলার জীবন নিয়ে। দুনিয়াবী লোভ লালসা ত্যাগী এ মহান অলি চাইতেন না মানুষ তাঁর পিছে পিছে ঘুরুক। কিন্তু প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে একদিনের জন্যও মানুষ তাঁর পিছু ছাড়েনি। তিনি যতই চেয়েছেন নির্জনে থাকতে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে লোক সমাগম। আখেরাতের শান্তির চেয়ে দুনিয়াবী মকছুদে মানুষ তাঁর কাছে আসতো বেশী। মানুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় বড়ই হিসেবী। লাভের হাতছানি না পেলে কেউ বিনিয়োগ করতে চায়না। অলিউল্লাহ্ গণের দরবারে অকাতরে দিয়ে যাওয়ার যে ব্যাপার আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখি, সে ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য, যদিও তাঁরা (অলিগণ) আল্লাহছাড়া কারো মুখাপেক্ষী নন।

তিনি নিজকে বড় করে দেখাতে কখনো চাননি। চেয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর হাবিব রাসূল (সা.) কে সন্তুষ্ট করতে এবং এ জন্যে কিছু করে যেতে। তাইতো তিনি প্রবর্তিত করে গেছেন ১৯দিন ব্যাপী পবিত্র সীরত মাহফিল।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে অনুরোধ করবো, যারা কখনো ঐতিহাসিক এ মাহফিলে আসেননি, অন্তত একবার এসে আত্মোপলব্ধিতে এর ব্যবস্থাপনা দেখে যেতে। এখানে নেই বাদ্যবাজনা, লালসালু আবৃত গরু, সেমা, শিরকি কার্য্য কলাপ। নেই তাযিয়া সাজিয়ে জৌলুস, মিছিল....। নেই কফথুথু, কবর সেজদা, পবিত্র গোছল শরীফের (?) প্রচলন। আছে কর্মসূচী অনুযায়ী প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরামের মহানবী (স.) এর জীবন বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আর আছে ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায ও মেহমানদারী। এমনকি তাঁর মাজারে গদ্দীনশীন বা দানবাক্স জড়িয়ে ধরে নেই কোনো মোতাওয়াল্লী....। তাবিজ-কবচ, পানিপড়া, শিরনি, মানত ইত্যাদি নিয়ে ভন্ডামী করতেও দেখা যায় না কাউকে....। অলি আল্লাহগণের অবর্তমানে স্বার্থান্বেষী মহলের পেটপূঁজার জন্য সৃষ্ট তাবৎ কু-সংস্কার থেকে নিজ ও সীরত সহ অনুষ্ঠেয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহকে (শব-ই-মেরাজ, শব-ই-ক্বদর ইত্যাদি) পবিত্র রাখার তাগিদ অনুভব করে তিনি চুনতী মাদরাসাকে কামিল পর্যায়ে উন্নীত করে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন কোরান-হাদীসের আলোকে তাঁর প্রবর্তিত মাহফিল সমূহের প্রতি সুনজর রাখতে....।

শেষ জীবনে একটি মোটর দুর্ঘটনায় শাহ সাহেব কেবলার দুচোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইন্তেকালের সময় তিনি নিজের বা পরিবারের জন্য তেমন কিছুই রেখে যাননি। রেখে গেছেন দুনিয়ার অগণিত ধর্মপ্রাণ মানব জাতির জন্য প্রায় ১৫.০০ একর বিস্তৃত সুরক্ষিত এক বিশাল মাঠ, যা সীরত ময়দান হিসেবে পরিচিত। এখানে আছে এক বিশাল মসজিদ, সীরতের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য অফিস, খাওয়ার প্যান্ডেল, মুসাফির খানা ও অন্যান্য অবকাঠামো। মসজিদের দক্ষিণ পাশে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে চির শায়িত এ মহান অলি। সবেমিলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে এক স্বর্গীয় পরিবেশ এবং চুনতিকে দিয়েছে সুষমামণ্ডিত ঐতিহাসিক মর্যাদা...।

পরিশেষে এ মহান অলিকে কেন্দ্র করে আমার জীবনের একটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করে লেখা শেষ করতে চাই। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে অসুস্থতা বোধ করলে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমার

হৃদরোগ ধরা পড়ে। তখন এ দেশে এর উন্নত চিকিৎসা না থাকায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাঁচানোর আশা ত্যাগ করে আমাকে বিদায় দেয়। বাড়িতে গিয়ে আরো অসুস্থ হয়ে পড়লে বড়বুবু ও শাহ সাহেব কেবলা গিয়ে আমাকে তাদের (বর্তমান) বাড়ীতে নিয়ে আসেন। দিন দিন আমার অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছিল। আমার এহেন দুরবস্থা দেখে তৎকালীন স্থানীয় ডাক্তারগণের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের ব্যবস্থা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু শাহ সাহেব কেবলা আমাকে শহরে নিতে রাজী হচ্ছেন না এবং যেহেতু আমাকে অক্সিজেন দিয়ে চিকিৎসা চালানো প্রয়োজন, সেহেতু শাহ সাহেবের বাড়ী না থাকা অবস্থায় এ্যাম্বুলেন্স এনে আমাকে শহরে নিতে হবে। সেই সময় তিনি (শাহ সাহেব) গিয়েছিলেন প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এক ভক্তের বাড়ীতে দাওয়াত খেতে। ডাক্তারদের এ সিদ্ধান্ত রূহানী শক্তি দিয়ে অবগত হয়ে তিনি সামনে আনীত খানাপিনা ত্যাগ করে সোজা বাড়ী চলে এলেন। তখন কি গরম হালত তাঁর...। ডাক্তারসহ সবাইকে সাতগোষ্ঠীর উদ্ধার করছেন গালিগালাজ করে। ডাক্তারগণ পেছনের দরজা দিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেলেন, "অনেক দূরে অবস্থান করেও যিনি সব জানতে পারেন, তাঁর কথা ঠেলে রোগীকে (আমাকে) যেন শহরে না নেয়া হয়। আমাদের (ডাক্তারী) চিকিৎসা এখানেই শেষ। আল্লাহর কাছে চেয়ে হায়াত বাড়ানোর জন্য শাহ সাহেব মামুর ইচ্ছার উপর তাকে সোপর্দ করুন।

তারপর বলতে গেলে অনেক কথা। যাহোক ধীরে ধীরে তাঁর ঐকান্তিক দোয়ায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বিবাহ সংসারসহ দীর্ঘ কর্মজীবনের দায়িত্ব পালন করে বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছি এবং সর্বোপরি শোকরিয়া যে, আজো বেঁচে থেকে এ লেখার মাধ্যমে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি...।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, ভবিষ্যতের অনন্ত কালেও যেন তাঁর মাজার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিরূপ সমালোচনার উর্দ্ধে থাকে...। তাঁর বংশধরগণ জীবিকা নির্বাহের জন্যে যেন মাজার নির্ভরশীল না হয় এবং মাজারের স্বকীয়তা বজায় রেখে সম্মানজনক জীবন যাপন করে।

মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী

সাবেক মেয়র ও এম.পি. চট্টগ্রাম

আমার অভিভাবক হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর করামতসমূহ

✪ **১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের** ৭ মে আমার বিবাহের দিনে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর উপস্থিতিতে হযরত মাওলানা আমিনুল্লাহ সাহেব (রহ.) (বড় মাওলানা) আকদ পরিচালনা করেন। ঐ বিবাহ মজলিশে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর নির্দেশে পবিত্র মিলাদ শরিফ পাঠ করা হয়।

✪ আমার বৈবাহিক সম্পর্কের সুবাদে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর পটিয়ার হুলাইন নিবাসী স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব হযরত সালেহ আহমদ চৌধুরীর মাধ্যমে আমি শাহ সাহেব কেবলার (রহ.) এর সান্নিধ্যে আসি। অবশ্য আমার শ্রদ্ধাভাজন বড়ভাই আলহাজ্ব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী অনেক পূর্ব থেকেই হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর কাছে যাতায়াত করতেন।

✪ **১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের** জুন-জুলাই মাসের দিকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে হারবাংস্থ আজিজনগরে রয়েল টেক্সটাইল নামে একটি স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিল বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারিকরণ মিল হিসাবে আলহাজ্ব ছালেহ লিমিটেড নামকরণে আমার মরহুম শ্বশুর খরিদ করেন। উক্ত কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক হিসাবে আমি ও আবার সম্বন্ধি জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী একদিন বৃহস্পতিবার হযরত শাহসাহেব কেবলা (রহ.) কে দাওয়াত করতে গেলাম। যেহেতু পরদিন শুক্রবার উক্ত রয়েল টেক্সটাইল মিলটি সরকার থেকে খরিদ করার সুবাদে আমাদেরকে হস্তান্তর করা হবে, সেহেতু বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে উক্ত শুক্রবারে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর উপস্থিতির জন্য আমরা তাঁর নিকট নিবেদন পেশ করলাম। উত্তরে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) বললেন, রয়েল টেক্সটাইল মিল ইহা দুনিয়াদারীর কাঁজ কিনা? এবং যদি তা হয়ে থাকে আমরা শুক্রবার কেন নির্ধারিত করলাম? তিনি বলেন, তিনি যেতে পারবেন না এবং ইহার হস্তান্তর ও দখল নেওয়া যেন শনিবারে করা হয়।

এদিকে যেহেতু শুক্রবার সে সময় অফিস আদালত খোলা ছিল সে সুবাদে ঢাকা থেকে এতদসংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ শুক্রবারে উপস্থিত থেকে আমাদের বরাবরে মিল হস্তান্তর করবেন এবং অন্যদিকে আমাদের সকল প্রস্তুতি শুক্রবার দিনকে কেন্দ্র করে জুমার নামাযের পরে ছিল। সেহেতু আমরা আমাদের কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার জুমার নামাযের পরে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাগণসহ আনুষ্ঠানিক মিল হস্তান্তরের পূর্বে হঠাৎ করে উক্ত মিলের গুটিকয়েক পুরাতন শ্রমিক মিল হস্তান্তরে আপত্তি জ্ঞাপন করে বসে। তখন উক্ত মিলে আমরা দখল না পেয়ে ফেরৎ আসলাম।

রয়েল টেক্সটাইল মিল আজিজনগর এলাকায় তৎকালীন বান্দরবান মহকুমা এবং রাঙ্গামাটি জেলার অধীনে ছিল। সেই কারণে প্রশাসনিক দিক থেকে সমস্ত কিছু সম্পন্ন

Chunati.com Pioneer village based website

করে ঢাকার কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মাসখানেক পরে উক্ত মিলের দখল বা হস্তান্তর যেদিন হয় সেদিন শনিবার ছিল। তখন মনে মনে প্রশ্ন জাগল হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) বলেছিলেন, শুক্রবার বাদ দিয়ে শনিবারেই মিল নেয়া ঠিক হবে।

✪ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে আমি তখন চট্টগ্রামের ১ম শ্রেণির অবৈতনিক হাকিম (অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট)। রয়েল টেক্সটাইলের শ্রমিকদের মাসিক বেতন দেয়ার জন্য একটি টয়োটা করোলা ছোট প্রাইভেট কারে করে আজিজনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম জুমার নামাযের পর। গাড়ির ড্রাইভারের নাম ছিল পেয়ার মুহাম্মদ, নোয়াখালী বাড়ি। আমি গাড়ির পিছনের সিটে বসা, সামনের সিটে বাঁশখালী মানিকপাঠান নিবাসী আমার দীর্ঘদিনের সাথী মরহুম আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী বসা ছিল। দুপুরের খাওয়ার পর শ্রমিকদের বেতনের টাকা নিয়ে ড্রাইভারকে বললাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিলে পৌঁছাতে। ড্রাইভারের বয়স ছিল কম। সে খুব দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল। কালুরঘাট রেলওয়ে ব্রিজ পার হয়ে বোয়ালখালী মিলিটারি সেতু পার হওয়ার পর হঠাৎ এক বৃদ্ধ লোক গাড়ির সম্মুখে রাস্তা পার হতে গেলে সাথে সাথে ড্রাইভার খুব জোরে গাড়ির ব্রেকে চাপ দেয়। অমনি গাড়ি উপর দিকে কিছুদুর উঠে উল্টে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে একটি খাদের মধ্যে পানিতে পড়ার মুহূর্তে আমি অনেকটা হতবিহ্বল অবস্থায় নিজেকেও উল্টানো গাড়ির ভিতরে পা রাখার জায়গায় পড়ে অবচেতন অবস্থায় দেখতে পাই চুনতীর হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর চেহেরা। একটা আঙ্গুল দিয়ে আমাকে ধরে রেখেছেন। যে গাড়ী কক্সবাজারমুখী যাচ্ছিল সে গাড়ি উল্টে চট্টগ্রামমুখী হয়ে ফিরে গেল। গাড়ির আয়না চুরমার হয়ে গেল। ড্রাইভারের মাথা ফেটে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। সামনের লুকিং গ্লাস ভেঙ্গে ড্রাইভারের মাথায় ঢুকে গেছে। বেহুশ অবস্থায় তাকে নিয়ে একটি টেক্সিযোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে চলে আসি। সামনে বসা আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী অক্ষত ছিল। এক মাসের অধিককাল সময় ড্রাইভার পেয়ার মুহাম্মদ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরে সে কোনদিন সেই গাড়ি দুর্ঘটনার কথা স্মরণে আনতে পারেনি। পরবর্তীকালে কয়েক বছর পরে উক্ত ড্রাইভার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অন্য একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে।

✪ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭মার্চ আমার প্রথম সন্তান রনা জন্মলাভ করে। আমার মরহুম শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর তাঁর ১ম নাতনি হিসাবে আমার মেয়ের আক্বিকা নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করান। ঐ সময় আমি আমার কম বয়সের কারণে অনেকগুলো নামের সংমিশ্রণে আমার মেয়ের নামকরণ করি। আমার মেয়ের বয়স যখন প্রায় ২ মাসের কম তখন চট্টগ্রাম শহরের ঘাটফরহাদবেগে জনাব মকবুল সাহেবের বাসায় হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর সাথে আমার স্ত্রীসহ সাক্ষাৎ করতে যাই। সে সময় হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) আমার এ নবজাতক মেয়েকে কোলে নেন এবং তার হাতে সে আমলের দশ টাকার একটি নোটসহ ১১ টাকা দেন। আমি ইতস্তত করলে তিনি বলেন, কোন নবজাতককে উপঢৌকন দেয়া ভাল।

সাথে সাথে তিনি আমার মেয়ের নাম বদলিয়ে আমার স্ত্রীর নামের সাথে মিলিয়ে নুরজাহান নামকরণ করেন। সেই হিসাবে আমি আবার আরেকটি আকিকার মাধ্যমে তার নাম নুরজাহান রাখি।

মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শোকরিয়া যে, আল্লাহর এ মহান অলির সংস্পর্শ পেয়ে আমার এই মেয়ে সম্পূর্ণ ইংরেজি মিডিয়ামে লেখাপড়া করেও আমেরিকার মত দেশে মাথায় হিজাব ছাড়া চলাফেরা করে না এবং আমার মায়ের মত প্রায় সময় ফরজ আদায়ের পরপর বিভিন্ন রকমের নফল এবাদতে মশগুল থাকে।

✪ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে আমি স্বপ্নে দেখছি, হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) আমাকে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। ২য় দিনে স্বপ্ন দেখলাম যে, শহীদ জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে আমার বাড়ি থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য টানাটানি করছেন।

৩য় দিনে দেখলাম আমার মরহুমা আম্মাজান আমাকে দোয়া করে দিচ্ছেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করছেন আমাকে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য। খুব কম বয়সেই মহান আল্লাহপাক আমাকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আমি খুব সহজেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হই। আল্লাহর এ মহান ওলি হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) আমাকে প্রায় সময় আদর করে নাতনি-জামাই হিসাবে সম্বোধন করতেন।

✪ ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে আমি তখন প্রাক্তন সংসদ সদস্য। দেশে সামরিক আইন চলছে। আমি চট্টগ্রাম শহরের হেমসেন লেইনে বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রদ্ধাভাজন মরহুম ইউসুফ মিয়া সাহেবের বাসায় হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর সাক্ষাতের জন্য যাই। সে সময় তিনি এক সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় তাঁর চোখ দুটি কাজ করছিল না। তাঁর দুটি চোখই বস্তুতঃ বন্ধ ছিল। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে বললেন, নাতি তুমি আমার চোখ ঠিক কর। আমি পরের দিন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নুরুল ইসলাম মজুমদার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলাম। ডা. নুরুল ইসলাম মজুমদার সাহেব তাঁর চোখ দুটি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) কে জানালেন যে, তা ভাল হওয়ার নয়। তখন হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) আমাকে বললেন, নাতি তোমাকে আমার চোখ এনে দিতে হবে। তোমার উপর দায়িত্ব থাকবে ভবিষ্যতে তুমি আমার চোখ এনে দেবে। তিনি এও বললেন, চট্টগ্রামে তোমার একখানা সুন্দর বাড়ি হবে, সে সময় চট্টগ্রাম শহরে আমি কোন বাড়ির নকশাও তৈরি করি নাই। জায়গাও রেজিষ্ট্রি করি নাই। তিনি এও বললেন, ঐ বাড়িতে অনেক নামিদামী এবং নানান দিক থেকে ধর্মীয় ও দুনিয়াবীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ আসবেন। বাস্তবে হয়েছেও তাই এরপর ১৯৮৭-৮৮ খ্রিস্টাব্দে আমার নতুন বাড়ি হয়। চট্টগ্রাম শহরের আমার এ বাড়িতে হযরত বড় পীরের (বাগদাদ) সাজ্জাদানশীন, আজমীর শরিফের খাজা সাহেবের সাজ্জাদানশীন, হযরত ছোট হুযুর কেবলা (মাওলানা আবদুর রশিদ রহ.) হযরত

আল্লামা তাহের শাহ কেবলা, রেফায়ী ত্বরিকার প্রধান হযরত ইউসুফ রেফায়ী (কুয়েত) সহ অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দেশি-বিদেশি ওলিয়ে কামেল ও বুযর্গানেদ্বীন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসহ অনেক রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিগণসহ অনেক বিচারপতি ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মার্কিন, ভারত, কানাডা, ইউরোপসহ অনেক দেশের রাষ্ট্রদূতগণ অনেকবার যাওয়া-আসা করেছেন।

তিনি আরও বলেছিলেন, চট্টগ্রামের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে তোমার আবির্ভাব হবে। পরবর্তীতে তোমার কিছু সমস্যা হবে। সে সময় স্থিরচিত্তে ধৈর্যধারণ করবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন সময় তোমাকে যোগদানের জন্য আহ্বান জানালে তুমি ধৈর্যধারণ করে স্থিরচিত্তে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান না করে অপেক্ষা করবে। ইহার সময় দীর্ঘও হতেপারে। কিন্তু তোমার ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া চলবে না।

বর্তমান পর্যায়ে আজকের দিনে দেশের রাজনৈতিক যে অবস্থা অর্থাৎ মার্চ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে জরুরী অবস্থা যা বিরাজ করছে তা দেখে মনে হয় এ মহান আল্লাহর ওলি আমার অভিভাবক হিসেবে আমাকে এক মহান পথনির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন।

পরিশেষে উপরের করামতসমূহ বর্ণনার পরেও আরও অনেক ঘটনা আছে যা আমি লেখক হিসেবে দুর্বল বিধায় পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে পারছি না। তাঁর সীরত মাহফিলের প্রবর্তন এবং সীরত ময়দান তৈরির জন্য আমার মরহুম শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর স্বনামধন্য শিল্পপতি ও সমাজসেবক হযরত ছালেহ আহমদ চৌধুরী আমাকে অতি আপনজন এবং কাছের হিসেবে জেনে আমার সাথে পরামর্শক্রমে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) এর সন্তুষ্টি ও আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের নিমিত্তে অত্র সীরত ময়দানের জায়গা খরিদের জন্য সম্পূর্ণ টাকা যোগান দেন এবং সীরত ময়দানে আর এক মহান দানবীর ও স্বনামধন্য শিল্পপতি জনাব মরহুম ইউসুফ মিয়া বিপুল অর্থব্যয়ে মসজিদে বায়তুল্লাহর ইমারত তৈরি করেন।

যে দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) আল্লাহর নবীর নেয়াজপ্রাপ্ত আল্লাহর হাবিবের প্রশংসায় মশগুল হয়ে যে তাছাউফের বাগান সৃষ্টি করেছেন আশা করি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এ মহান ওলির পদাংক অনুসরণ করে আল্লাহর হাবিবের প্রেমে মশগুল হয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে আল্লাহর সৃষ্টির খেদমতে নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে নিজেদেরকে সমর্পিত করতে উৎসাহবোধ করবেন। আল্লাহর এই মহান ওলি নিঃসন্দেহে একজন উচ্চ স্তরের ফানাফির রাসূল ছিলেন বলেই ১৯ দিনব্যাপী রাসূল (স.) এর গুণগান বর্ণনার জন্য মিলাদ বা সীরত তিনি চুনতীর মাঠিতে প্রচলন করে দিয়েছেন। এলমে তাসাউফ হাসিলের জন্য চুনতীর শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) কে যারা দেখেছেন কাছ থেকে, তারা তা অনুধাবনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তা বুঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

"ইন্না রাহমাতাল্লাহি ক্বরিবুন মিনাল মোহসেনীন।"

কসিদা

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইন্তেকাল ও মাযার সম্পর্কে দারুল উলূম আলীয়া মাদরাসার সাবেক প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.) কর্তৃক রচিত কসিদা

زمیں روتی زماں روتا فلک آنسو بہاتا ہے
چنوتی کا ستارہ خاک میں مدفون ہوتا ہے

جنازہ کیا سمندر تھا بنی آدم کی موجیں تھیں
کہ منظر دیکھلے کیسے ولی اللہ سے ملتا ہے

یہی ہے روضۂ خاکی شہنشاہ چنوتی کا
یہاں مخفی ہے مخزن لؤلؤ و مرجان و موتی کا

ولی واصل حق موجد سیرت کا مرقد ہے
چمکتا ہے یہ تربت سے ستارہ نیک بختی کا

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর ইছালে সওয়াব মাহফিল

উপলক্ষে হযরত মাওলানা কুতুব উদ্দিন, পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ কর্তৃক রচিত কসিদা

حضرت شاہ چنوتیؒ کی یاد میں

شاہ صاحب ہیں ہمارے اولیاء کے تاجدار   محفل سیرت، چنوتی مدرسہ ہے یادگار

عاشق رب العلیٰ، خیر الوریٰؐ وہ تھے بہم   زاہد راشد وہ عابد تھے سدا لیل ونہار

تھی نہ کچھ حرص وہوا فیاض تھا بے حس وہ   تھی سخاوت دایاں بایاں انکی بس دور وکنار

شاکر اللہ نمبر اول ہیں توکل میں متین   ہر مصیبت میں شکیبائی حلیم وبردبار

کی عطا حق نے انھیں اعلیٰ فراست مستقر   صاف دل، قلب سلیم، آسودہ خاطر مشکبار

دور اندیش وبڑا غمخوار امت بے ریا   مشعل ایماں جلایا ہے یہ سیرت لالہ زار/ شاندار

یہ چنوتی معدن اخیاروکان اولیاؒ   شاہ صاحبؒ ہیں خلف جو تھے سلف یاں نامدار

گلستان مہرو الفت میں جو تھی ام جمالؒ   مہرباں وسائباں وپاسباں ورازدار

مہتمم صاحب وما در چل بسے وہ یک بیک   صدمۂ فرقت کلیجے کو بنایا داغدار

چل بسے میدان خالی ہوگیا ہے سر بسر   ناظم اعلیٰ امین اللہؒ جو تھے یار غار

کل من ہے فان یہ اعلان قران میں پڑا   پی لئے جام محبت ہوکے محو کردگار

یہ یقیں کامل عقیدت اولیاؒ کی آس ہے   جتنے دستگیر ہیں ہر مشکل آساں بیڑا پار

آئے خدائے دو جہاں انکی قبر معمور ہو   نور احمدؐ سے ابدتک ہو صلہ دار القرار

جنپہ انکی جاں فدا تھی سید الابرار ہیں   وہ مدینہ کا چمک انوار منزل ہو مزار

ناظم خستہ پراگندہ طبیعت پر گناہ   قطب دیں ہے خاکپائے عاشقاں اک خاکسار

بمورخۂ ۳۰/۸/۱۹۹۲ع بروز شنبہ بعد نماز فجر بتقریب ایصال ثواب شاہ صاحب قبلہؒ مطابق ۲۳ صفر ۱۴۱۳ھ۔ تحریر کردہ شد ۱۲

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর শানে

মাওলানা মুসলিম খান চুনতী কর্তৃক রচিত
কসিদা

شاہ حافظ احمدؒ

نقارۂ سیرت کا یہ پھیلا منادی
جب جبکہ دیا حب نبی کا وہ جلا کر
حافظ کے محبت کے مثیل ملنا ہے مشکل
گردون حوادث سے کبھی ترساں نہیں تھے
آنکھوں کو جبکہ کھوے اف تک زباں سے نہ بولے
در پہ خدا کے ایک التجا تھا انکا
چہرہ جو تھا پر نور لب پہ تبسم
کسنے کہا ہے تو شاہ چنو تی
مسلم کو کیا علم ہے پہچانے تیرے بھید

شاہ چنوتی نے دیا حافظ قلندر
یہ خطہ چنوتی کا جگایا ہے مقدر
ہر آن میں وہ عشق نبی میں تھے ڈبوکر
افلاک کے کرشمہ سے وہ راضی برضا تھے
شان خدا کو ڈھونڈے دشت وجبل نہ چھوڑے
یہ خطہ چنوتی کو خدایا قطعۂ محشر دے
بے گور وکفن بعد نزاع سب نے یہ دیکھا
اقلیم کے ولایت کو دیا تجھکو خدا نے
حافظؒ کے تعارف سے وہ حد سے بہت دور
مسلم خان

Ghunati.com Pioneer in village based website

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর শানে তাঁর নাতনী-জামাই
সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, (ইসলাম কাওয়াল) কর্তৃক রচিত
কসিদা

منقبت دوشان شاہ صاحب قبلہؒ

حافظ احمد شاہؒ کا دربار کیا دربار ہے
نورحق نور نبی سے پرسخی سرکار ہے

آپ کی شان سخاوت بے نظیر و بے مثال
ان سے منگتا جو بھی مانگا وہ ہوا سرشار ہے

لو لگایا جس نے ان سے اسکو یہ کہتے سنا
اس جہاں کی شان وشوکت کچھ نہیں درکار ہے

واہ کیا شان ولایت در پہ جتنے آئے ہیں
سبکے لب پر دیکھئے اب ذکر ہے اذکار ہے

شاہ صاحبؒ کا ہے کہنا جھوٹا دھوکا باز جو
۔ اسکا اس دربار میں آنا ہی تو بے کار ہے

آستانہ ان کا ہے میخانہ جام نبی ﷺ
جام وحدت اسکو حاصل ہے کہ جو میخوار ہے

وہ مجدد محفل سیرت کے ہیں زندہ ولی
جان ہیجاں ان سے کہہ جو بھی تجھے درکار ہے

سید امین الاسلام
ہیجان چاٹگامی

হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর শানে

মাওলানা আবু ছালেহ মুহাম্মদ সলিম উল্লাহ
উপাধ্যক্ষ, পতেঙ্গা ইসলামিয়া আলীয়া মাদরাসা কর্তৃক রচিত

কসিদা

قصيدة الرثاء على فقيد زبدة الصالحين وقدوة الشاكرين وخير العاشقين لرسول رب العالمين الشاه العلامة حافظ احمد رحمه الله ونور الله مرقده وجعل أعلى الجنة مثواه

حمدت الله رب الصالحين   واصلى على افضل العالمين
والأواصحابا واعوانا كراما   وعلى التابعين ومن تبعهم أجمعين
كان الحافظ مشائخ مخلصين   عاشق النبى ومعشوق المخلوقين
هواحمد الملقب بشاه   صاحب المجد وخير السالكين
نور صنوتى بضوئه ثم من   فى بلادنا من أحب الأرضين
كان داعيا مخلصا ومرشدا   كاملا بالعلم ومعرفة العاشقين
كان لايخاف الله لومة لائم   لاف المجتمع ولا فى الحاكمين
تخضع له اعناق كل باغ   حتى من هم سادات الظالمين
وكان مرغوبافى الثقلين   حتى فى نسمات غير الناطقين
وافيال وحيات ومن بغابة   يزدلفن رضاله كالطايعين
وحب اليه الخلاء دائما   مع ربه ليكون من الفائزين
خدماته اشتات لنماء بقاع   من علم وعرفان ومبانى للراغبين
التصق دورة لأحاديث صحاح   لمن يرغب اليها مع المحدثين
بمدرسة صنوتى الحكيمية العالية   ام المدارس فى البقاع للعارفين

وحفلة سيرة التاريخية لكون　　اسمها لخطابة الدعاة الماهرين

كما اسمها لتكون ذريعة نجاة　　فى الدارين وفلاحا للحاضرين

قامت هى بزمن من شاقة　　ضيقت الأرض بها للمؤمنين

تستغرق هى لتسعة عشر　　هى كأحرف البسملة للعاذين

تبدأ من الحادى عشر للربيع　　غايتها بالتاسع والعشرين

فيها المواعظ والخطب عديدة　　مع الضيافة العامة للقادمين

ويكثر فيها الأطفال والصبيان　　هم عنادل الحدائق للناظرين

ونسوة فيها بالقوافل اتيات　　لهن مثل ماللضيوف والشاركين

جزى الله كل خير وفضل　　على موسها ومن عليها ساعين

وشيخنا الحافظ فى جوار ربه　　بفردوس العلى مع الصالحين

زاده الله مجدا وشرفا　　باعلى عليين مع النبيين

ملاالله مرقده بنور ومسك　　ليكون طيبا للرائحين

ادام الله صدقاته باقية　　الى يوم يقوم للحاشرين

وسليم خاطى بكل عيب　　يتمنى حشره مع المنعمين

ابوصالح محمد سليم الله

Chunati.com Pioneer in village based website

গ্রন্থের প্রচ্ছদে লিখিত শ্লোক (যা হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বার বার আওড়াতেন) ও ১৫ পৃষ্ঠায় পূর্ণাঙ্গ গজল প্রথম প্রকাশে হযরত মাওলানা আবদুন নুর সিদ্দিকী (রহ.) কর্তৃক রচিত হায়াতে হযরত শাহ সাহেব কেবলা (রহ.) গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠা থেকে চয়ন করা হয়েছে। তার সমর্থন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচলিত সংকলিত কাব্যগ্রন্থ সোগমায়ে হাবিব (স.) গ্রন্থের ৬১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। তবে চেরাগে মাহফিল ৩য় খণ্ড ও হোসনে মাহফিল নামক কলিকাতা থেকে প্রকাশিত কিতাবের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় জনাব নুর সাহেব কালু কাওয়াল কর্তৃক রচিত কবিতায় উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সাথে সামান্য গরমিল থাকায় গ্রন্থত্রয়ের উক্ত পৃষ্ঠা সমুহের কপি পাঠক মহলের জ্ঞাতার্থে এখানে ছাপিয়ে দেয়া হল- গ্রন্থকার।

৪৪

জুতো ছাড়া চলেন নাই। ঝড় বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করিতেন না। অনেকেই দেখিয়াছেন যে তাঁহার কাপড় চোপড়ও ভিজে নাই। আব্বার জমালী হালতের পর মধ্যে মধ্যে ছাতাও ব্যবহার করিতেন। স্ত্রী পুত্র, ঘর বাড়ী, মা-বাপ, আত্মীয় স্বজনের কোন চিন্তাই ঐ সময়ে তাঁহার ছিলনা। শুধু সব সময় বলিতেন এই শ্লোকটি বার বার। যে এই শ্লোকটি তাঁহার রাত দিনের জিকির হইয়াছিল। ইহা বড় বড় করিয়া বলিতেন-

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے ★ زندگی میں یہی کام کر جائینگے

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے

হাম মজারে মুহাম্মদ পে. মরজায়েঙ্গে
জিন্দেগী মে এহী কাম করজায়েঙ্গে।

বহুক্ষণ প্রথম শে'র (শ্লোক) পড়ার পর ২য় শ্লোক পড়িতেন।

জিন্দেগী মে এহী কাম কর জায়েঙ্গে-

এই উর্দু এশকিয়া কবিতার পূর্ণ আশ আর কবিতা সমূহ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রথম কবিতার পর-

আরছায়ে হাশর মে ধুম হুগী বড়ী
হুর ও গেলমান মনায়েঙ্গে মিল কর খুশী
খোল্দ মে জব শাহে বাহরোবর জায়েঙ্গে
বখশোওয়ানে কো উম্মতকী জুরমো খাতা।

٦١

رسالت نرالی

از حضرت الحاج مولانا محمد فضل اللہ صاحب ناظم اعلیٰ جنوبی حکیمیہ عالیہ مدرسہ چاٹگام

رسولِ خدا کی تھی عظمت نرالی ۔ جہاں میں تھی ان کی رسالت نرالی
بشارت ہے حاصل ہمیں یہ کہ ہوگی ۔ قیامت میں ان کی شفاعت نرالی
خدائی حکومت کی قائم انھوں نے ۔ رہی اسکی پھر شان و شوکت نرالی
لگائے بہت زور اعدا نے لیکن ۔ تھی اسلام والوں کی صولت نرالی
بھروسہ خدا پر رہا ان کا نرالا ۔ اٹل عزم تھا اور ہمت نرالی
ثبات قدم انکا بے مثل دیکھا ۔ تھی غزووں میں انکی شجاعت نرالی
نرالا تھا لطف و کرم ان کا دائم
مروت نرالی تھی شفقت نرالی

ہم مزار محمد پہ مر جائینگے

ہم مزارِ محمد پہ مر جائینگے ۔ زندگی میں یہی کام کر جائینگے
عرصۂ حشر میں دھوم ہوگی بڑی ۔ حور و غلمان منائینگے ملکر خوشی
خلد میں جب شہ بحر و بر جائینگے
بخشوائیںگے امت کی جرم و خطا ۔ تاج پہنے شفاعت کا روزِ جزا
پیش معبود خیر البشر جائینگے
انبیا، اولیا ہونگے سب ساتھ ساتھ ۔ لیتی جائیگی رحمت بلا ساتھ ساتھ
حشر میں میرے مولا جدھر جائینگے
نورد یگانہ جینے یہ رنج ہمیں ۔ گر بلائیں نہ آقا، مدینے ہمیں
ہند میں جاں سے ہم گذر جائینگے

آئیے یا حبیب خدا آئیے | ان نگاہوں سے دل میں سما جائیے
ورنہ فرقت میں گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے

یا محمد حبیب خدا آپ ہیں | پیشوا آپ ہیں رہنما آپ ہیں
چھوڑ کر ہم یہ چوکھٹ کدھر جائیں گے

ساری دنیا خلاف ان سے ہو جائے گی | ان سے راضی خدا بھی نہ ہوگا کبھی
جو نگاہِ نبی سے اتر جائیں گے

جیسے وحشی کو روکے گی شرم و حیا | دیکھنا صبر خستہ جگر دیکھنا
جس طرح ہو در یار پر جائیں گے

جناب فیض رضا صاحب کالو قوال کلکتوی

نام احمد [illegible] کے صدقے اتر جائیں گے | زندگی میں یہ اک کام کر جائیں گے
ہم مزار [illegible] پہ مر جائیں گے

عرصۂ حشر میں [illegible] معصوم ہوگی بڑی | حور و غلمان منائیں گے مل کر خوشی
خلد میں جب شہ بحر و بر جائیں گے

بخشوانے کو امت کے جرم و خطا | تاج پہنے شفاعت کا روز جزا
پیشِ معبود خیر البشر جائیں گے

ہوں گے ہمراہ اولیا انبیا ساتھ ساتھ | لیتی جائیں [illegible] بلا ساتھ ساتھ
حشر میں میرے مولا جدھر جائیں گے

داغِ عشق نبی ہوگا بہرِ ضیا | ورد لب کر کے نام شہ دوسرا
پل سے بے خوف ہم پار اتر جائیں گے

نور دیکھا نہ یہ رنج جینے ہمیں | گر بلائیں نہ آقا مدینے ہمیں
ہند میں جب [illegible] ہم گزر جائیں گے

এখানে উল্লেখ্য, গজলটি কোন কিতাবে কি রকম আছে তা মূল বিষয় নয়। বরং হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কি যিকর করতেন সেইটি আমাদের বিবেচ্য বিষয়। চুনতীর প্রবীণ ওলামায়ে কেরাম ও গুণীজন থেকে জানা যায় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) শ্লোকটি গ্রন্থের কভারে যেভাবে আছে সেভাবে পড়তেন-

গ্রন্থকার।

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) সম্পর্কে অভিমত

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

শিক্ষা উপদেষ্টা

মাহফিলে সীরতুন্নবী (স.) হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান স্মৃতিচারণ করেছিলেন। তাঁর একটি স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন-

চট্টগ্রাম শহরে যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সেসব জায়গায় আমি গিয়েছি, শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলেও গিয়েছি। এই রকম একটি জায়গা ছিল চুনতী। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে প্রায় মাঝামাঝি বাঁ-দিকে পাহাড়ী এলাকা সেটাই চুনতী। এককালে প্রচুর গাছপালা ছিল। এখনও আছে। তবে বাড়িঘর তৈরির ফলে অনেক জায়গা-জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে। চট্টগ্রামাবাসীদের কাছে চুনতী এলাকার কথা খুব শুনতাম। চুনতীর শাহ সাহেব নামে আল্লাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ একজন সাধু এখানে বাস করতেন। তিনি অল্পবয়সে রেঙ্গুন ছিলেন। রেঙ্গুনেই পড়াশুনা করেন এবং ধর্মীয়শিক্ষায় দক্ষতা লাভ করেন। যুবক বয়সে কলকাতায় পড়াশুনা করেন এবং ধর্ম শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি সুফিতত্ত্বে দীক্ষিত হন এবং তারই এক পর্যায়ে সংসার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন।

দীর্ঘ ৩ দশকের অধিককাল তিনি লোকালয়ের বাইরে ছিলেন। কখনও কখনও লোকালয়ে তাঁকে দেখা গেলেও বেশিক্ষণ তিনি লোকালয়ে থাকতেন না। অনেকে তাঁকে পাগল ভাবতো। কিন্তু ক্রমশ লোকেরা তাঁর নানাবিধ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পায় এবং অবশেষে চুনতীতে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। তিনি গৃহবাসী হন। আমি তাঁর সাথে পরিচিত হই এবং তাঁর সঙ্গে আমার একটি হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।

তিনি কাউকে মুরিদ করতেন না। তিনি বেশী কথা বলতেন না এবং যখন বলতেন তখন খুব দ্রুত বলতেন। আমি তাঁর কাছে বসে শান্তি পেতাম। তিনি গৃহবাসী হলেও মূলত সংসারত্যাগী ছিলেন। সকল শ্রেণীর লোক তাঁর কাছে আসতো এবং তাঁকে ঘিরে বসে থাকতো দীর্ঘ সময় ধরে। তিনি হয়তো কিছু

বলতেন অথবা বলতেন না। কিন্তু লোকেরা তাঁকে দর্শন মাত্র স্বস্তি পেত এবং উৎফুল্লিত হত।

আমি এর কথা বলছি এ কারণে যে, চট্টগ্রাম থেকে আরম্ভ করে জীবনের বিভিন্ন কর্মে আমার যে পদক্ষেপ সে সকল পদক্ষেপের সময় আমি তাঁর আশ্বাস এবং আশীর্বাদ পেয়েছি। তিনি ওয়শ করতেন না। কিন্তু বছরের রবিউল আউয়াল মাসে পক্ষকাল ধরে সীরত মাহফিল করতেন। এই সীরত মাহফিলে লক্ষাধিক লোক হত। মাহফিলের শেষদিন ফজরের নামাযের আগে থেকে মোনাজাত আরম্ভ হত। সুদীর্ঘ দুই ঘণ্টাব্যাপী মোনাজাতের পর ফজরের নামায পড়া হত এবং তারপর মাহফিল ভাঙতো। এই মোনাজাতে আমি একবার অংশগ্রহণ করেছিলাম। যে ভদ্রলোক মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন তিনি দীর্ঘ সময় ধরে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় আল্লাহর গুণকীর্তন করেন, রাসূলের প্রশংসা করেন এবং মানুষের সকল পাপের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। প্রার্থনার এই ক্ষমা ভিক্ষার পর্যায়ে মোনাজাতে অংশগ্রহণকারী অগণিত জনগণ ক্রন্দনে আপ্লুত হত। আমি এই মোনাজাতে অংশগ্রহণ করে অভিভূত হয়েছিলাম।

আমার মনে হয় মানুষের জীবনে এই প্রার্থনার অসম্ভব গুরুত্ব আছে। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রার্থনাতুল্য আর কিছুই নেই। উষালগ্নের এই প্রার্থনা চিত্তকে পরিচ্ছন্ন করে এবং মানুষ তখন সত্যিই সকল পাপমুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে নিবেদন করতে সক্ষম হয়। চুনতীতে এই সীরত মাহফিলের আখেরি মোনাজাতের কথা আমি কখনই ভুলব না। বহুদিন পর্যন্ত এর প্রভাব আমার মনের মধ্যে ছিল। চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে আসার পরও চুনতীর সঙ্গে যোগসূত্র আমার ছিল এবং চুনতীর শাহ সাহেব আমাকে তাঁর ওখানে যাবার জন্য প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন। আমি সব আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি কিন্তু আরও দু'একবার চুনতীতে গিয়েছি। চুনতীর শাহ সাহেবকে আমি আল্লাহর প্রতি একজন নিবেদিত পুরুষ হিসেবে পেয়েছি।

(পালাবদল ম্যাগাজিন থেকে সংগৃহীত)

পবিত্র মাহফিলে সীরতুন্নবী (সঃ)-এর পটভূমি ও উদ্দেশ্য

আল্লামা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ (রহ.)
নায়েমে আ'লা, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন :

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন কথা, তাঁর প্রতিটি আদেশ নিষেধ, উঠাবসা, চলাফেরা, ব্যক্তিগত অভ্যাস- তথা পছন্দ- অপছন্দ আচার- আচরণের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত উম্মতের হেদায়তের প্রধানতম উৎস।

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকার ভাষায় মহানবীর জীবন চরিত ছিল পবিত্র কুরআনের বাস্তব রূপায়ণ। কেননা আল- কুরআনের প্রতিটি পর্যায়ই বাস্তব ও জীবন্তরূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দৈনন্দিন জীবনে। কুরআনের অনুশাসনকে যদি কেউ জীবনে বাস্তবায়িত করতে চায় তবে তার পক্ষে মহানবীর (স.) জীবনালেখ্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই। মহানবী (স.) এর পূত পবিত্র জীবনের কোন দিক বা আলেখ্যই এখন মানবচক্ষুর অন্তরালে নেই। প্রত্যেকটি মুহূর্তই সকলের সামনে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। দীর্ঘ তেরশ বছর ধরে মহানবী (স.) এর আদর্শ জীবনের উপর চলছে বিস্তর গবেষণা এবং ব্যাপক আলোচনা। যুগে যুগে মানব সমাজে কোনো নৈতিক অধঃপতন ও ধর্মীয় বিপর্যয় দেখা দিলে তখন উহা দূরীকরণের নিমিত্ত নবীজীবনের ঐ দিকটা বিশেষভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশেষ করে যখন কোন সময় দেশময় ধর্মীয় বিপর্যয় দেখা দেয়, অত্যাচার অনাচার মাথা চড়া দিয়ে উঠে, জনসাধারণ ধর্মীয় অনুশাসনকে ভুলে গিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত হয়ে, একে অন্যের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠনের জন্যে হন্যে হয়ে উঠে, মানুষ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে নেমে আসে পশুত্বের স্তরে; তখন মহানবীর (স.) এর আদর্শ শিক্ষার বিশদ আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয় যেন জনসাধারণকে ইহা সঠিক পথের দিক নির্দেশ করতে সক্ষম হয়।

এমনিতর একটি অবস্থা বিরাজ করেছিল আমাদের এই বাংলাদেশে- স্বাধীনতার পূর্বাপর সময়ে। মুসলমান মুসলমানের প্রতি ছিল খড়গহস্ত- ইসলাম হয়েছিল দেশের অধিকাংশ জনতার কাছে একটি অত্যন্ত অপ্রিয় বস্তু। সত্য ও ন্যায়ের

কথাটি ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত তিক্ত। ইসলামের কোন কথা বলার সাহসটুকু যেন কারো ছিল না। প্রাক- ইসলামী যুগের তথা আইয়ামে জাহেলিয়াতের নমুনা যেন এখানে বাস্তবরূপে দেখা দিয়েছিল। এ জাতি যে আবার কখনও ধর্মীয় অনুভূতি ফিরে পাবে তা ছিল অকল্পনীয় বস্তু। জাতীয় ঐক্যের প্রবক্তারা যারা ধর্মীয় দিকে দেশবাসীকে আহবান করেছিল মাত্র এটুকু অপরাধে অনেকের জীবন দিতে হয়েছে আর অনেককে হতে হয়েছে দেশত্যাগী। এহেন জাতীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে এ অধঃপতিত জাতিকে ধর্মীয় ও নৈতিক অবনতির অতল গহবর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত করার দুরসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন যিনি তিনি হলেন হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ (চুনতীর শাহ সাহেব কেবলা) তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন ও সুতীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়ে দেখতে পেলেন এ জাতির পরিত্রাণের ব্যবস্থা একমাত্র সীরত আন্দোলনের মাধ্যমেই করা যেতে পারে। বিশ্বমানবতার ত্রাণকর্তা রাহমতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ জীবনের সঠিক চিত্রটুকু জনতার সম্মুখে তুলে ধরাই এর একমাত্র পন্থা।

তাই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (স.) এর জীবনের বিশেষ বিশেষ দিনসমূহের উপর আলোচনার উদ্দেশ্যে ২৪ ঘন্টার একটা দীর্ঘ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করলেন। পরবর্তী বছর নবীজীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমুহ সুচিন্তিত ভাবে বিন্যস্ত করতঃ তিনদিন ব্যাপী এক সীরত মাহফিলের ব্যবস্থা করলেন। যা পরবর্তী বছরসমূহে পাঁচ দিন সাত দিন, দশ দিন এমন কি এবার তা বার দিনের এক দীর্ঘ কোর্সে উন্নীত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ সীরত মাহফিল কোন নিছক অনুষ্ঠান নয়- ইহা একটি বাস্তব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Training Course)। এ সীরত মাহফিলের আয়োজনের পেছনে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এর প্রধান উদ্দেশ্যও এই, জনসাধারণ যেন কয়েকদিন একনাগাড়ে পার্থিব কায়- কারবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ মাহফিলে দেহ- মন নিয়ে উপস্থিত হয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলামের পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারণা নিয়ে যেতে পারে। যার উপর ভিত্তি করতঃ তার পরবর্তী জীবনটুকু যেন সেই আদর্শে ঢালাই করার জন্য সচেষ্ট হয়। এ সীরত মাহফিলে নবীজীবনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সুবিন্যস্তভাবে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়।

এ মাহফিলের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই, আন্যান্য মাহফিলের মত ইহা শুধু আলোচনা সভায় সীমাবদ্ধ নয়- বরং এখানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত শ্রোতাদের জন্য বিশেষ এন্তেজামের সাথে ব্যবস্থা হয় দু'বেলা খাবারও। কারো নিকট থেকে নেয়া হয় না কোন বাধ্যতামূলক চাঁদা বা কখনও জিজ্ঞাসাও করা হয়

না কোন চাঁদা ইত্যাদি আদায় করেছেন কিনা। এমনকি মাহফিল কর্মীদের কেউ নামাজ খেলাপ করেছে বা শরিয়ত বিরোধী কোন কার্য করেছে বলে জানা গেলে তাকে বহিস্কার করা হয় সাধারণ কর্ম তালিকা থেকেও । আশ্চর্যের বিষয় হলো- এই প্রতি বছর যে পাঁচ ছয় লাখ টাকা নগদ এ মাহফিল উপলক্ষে ব্যয় হয় তার ব্যবস্থা হবে কিনা এ বিষয়ে হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কে কোনদিনই এতটুকু ভ্রূকুঞ্চিত করতেও দেখা যায়নি। তাঁর মুখে একটি মাত্র কথা- ইহা মহানবীর (স.) পবিত্র মাহফিল আমার তোমার ভাবনা কিসের? বরং কেউ কোনরূপ ব্যয় সংকোচনের প্রস্তাব দিলে তিনি তা সজোরে এ বলে প্রত্যাখান করেছেন যে- ইহা মহানবীর কাজ, এতে আবার কার্পণ্য কেন? সত্যিই এ মাহফিলের এত সুবৃহৎ' কাজের আঞ্জাম ও ফান্ডের ব্যবস্থা কিভাবে যে হয়ে যায় তা আমাদের কল্পনাতীত। এ ফান্ড উসুলকৃত টাকা- পয়সা থেকে একটা পয়সাও অন্য খাতে খরচ করতে তিনি এতো কঠোর বিরোধী যে একে তিনি কবিরা গুনাহ্ বলে মনে করেন। এ ধরণের একটা মাহফিলের আয়োজন একমাত্র ঐ মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব, যার রয়েছে মহানবী (স.) এর প্রতি অগাধ মুহাব্বত, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও অসামান্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। এসব গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হলেন হযরত আলহাজ্ব শাহ মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব। তাঁর এ মহান সীরাত আন্দোলনের ফলে আজ বাংলাদেশের আনাচে কানাচে দিবারাত্রি সীরত মাহফিলের একটা আলোড়ন পড়ে গেছে। দেশবাসী সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের ভুলভ্রান্তি ও মহানবীর মহান শিক্ষার মূলকথা, আর তাতে করে এ বাঙ্গালি জাতি তার অধঃপতনের অতল গহবর থেকে আবার আলোর পথে পা বাড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

অল্লাহ তাঁর এ সীরত আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ, ধর্ম ও জাতির সর্ববিধ কল্যাণ সাধন করুন। অমিন।

(১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সীরত স্মরণিকা থেকে সংগৃহীত)

Life Sketch
Hazrat Shah Saheb ® of Chunati

Hazrat Alhaj Mawlana Shah Hafez Ahmad ®, a real lover **of the prophet** (sm) and reformer of Mahfil-E-Siratunnabi **(sm), Known as** Chunti shah saheb ® was born in a **conservative noble** family of Chunati, a reputed village in **South Chittagong** in 1907 according to an opinion. His **ancestors are** the descendants of Hazrat Omar (RA). His **father is** Hazrat Mawlana Sayed Ahmad; grandfather is **Hazrat Kazi** Mawlana Muhammad Yusuf Ali ®. One of his **ancestors** Hazrat Allamah shah Alam Al – Muhazir Al – **Muballig Al** Arabi migrated to Chittagong from the holy **land of Arab.** He stayed shortly at the village of Gahira, **Anwara** Upazila wherefrom he came to Kalipur of **Banskhali** and started living there. It was his competent son **Hazrat** Ibrhim Khandakar who transforme his residence to **this** Chunati village and settled there. His son was **Muhammad** Abdur Rashid Talukdar, father of Muhammad **Abdul** Gani sikdar, father of sufi Muhammad Muqim, father of Munshi Kasem Ali Sikdar.

Munshi Kasem Ali had two sons and one daughter : (1) Hazrat Mawlana Kazi Muhammad Yusuf Ali ®. (grand father of Hazrat shah shaheb), (2) Munshi Wahed Ali (father of Khan Bahadur Muhammad Hasan). The only daughter of Munshi Kasem Ali, Musammat Farhatunnisa`s husband was Khan Bahadur Waziullah sami.

Kazi Mawlana Muhammad Yusuf Ali, the honourable grandfa–ther of Shah Saheb was the renowned zemindar of Akiab. He accompanied by, Hazrat Mawlana Sayed Ahmed, father of Hazrat Shah saheb went on a pilgrimage

Chunati.com

in 1907. There at the time of performing hajj, Kazi Mawlana Muhammad Yusuf Ali ® passed away. Since boyhood, Hazrat shah Saheb had been brought up under the care and supervision of his own father and noble elders. He received his primary education at his native village. Then fin-ished his study up to class Haptum at Satkania Afzal Nagar Madrasah, and next went to Banskhali Chanua Madrasah. At that time the head teacher of the Madrasah was Mawlana Fazlul Haq ®. One of the aged Khalifas of Hazrat Azamgari ®, Living at Chunati. There, studying for one year under the care of Mawlana Fazlul Haq, Hazrt Shah sahieb enrolled in Darul Ulum Alia Madrasah in Chittagong Town. Thereafter he took admission to Kalkata Alia Madrasah and successfully completed his student life. On returning home, he wished to get married and took Musammat Mahmuda Khatun, the eldest daughter of his uncle **Hazrat Mawlana Basher Ahmad ® in marriage.**

After marriage he had been rendering service of an Imam in the Zemindar Bari Mosque of his maternal grandfather-in-law at Ilishia, Chakaria

Hazrat Azamgari ® used to come to chunati once a year and stayed at shah saheb`s residence. Taking advantage of maintaining the zemindary of his father, Hazrat shah saheb`s uncle Hazrat Mawlana Foyez Ahmad ® became familiar with Hazrat Azamgari ® coming from the Northern province of India, during the Latter`s stay at his work – place Akiab. There upon became his follower being attracted to his guidelines and principels. Hazrat Azamgari used to preach the doctrines of Tariquat on his way to Akiab from the Northern province. In those days, Hazrat shah saheb`s uncle Hazrat Mawlana Foyez Ahmad ® used to take his honourable peer from Chittagong town to Chunati, firstly by river–way, then by train via Dohazari in

the purpose of proclaiming the principles of Tariquat. This **religious tour continued** till 1938 without in terruption.

Hazrat shah saheb had been kept in home when he was **found insance and** abnormal for some days after shah **Jamal Ahmad was born.** At that time Hazrat Azamgari ® **appeared and affirmed** shah saheb to be heal and hearty and **out of mental disorder** and asked to set him free, and on **getting fully recovered** he visited their Zemindery estate at **Akiab. Thereafter** he was appointed Imam for the short **term at Bammu** town in Myanmar. Again on the 27th of **Ramadan in the** holy night of Qadar, he sank into the state **of Mazjub** (an oblivious state of the saints)/ Thereupon, **having got the** news, his younger brother Mawlana Saleh **Ahmad started** for Bammu immediately and took shah **Saheb back** to Chunati undertaking great pains and **sufferings.** Then exercised various sorts of treatment upon **him but all** efforts were in vain to prove true Hazrat **Azamgari's** assurance that Shah Saheb had not lost his **normal state** or had gone mad. He spent nearly 20/25 years **loitering about** in the woods and jungles, appearing at times **in public. Later,** he was seen suddenly turns up in any **public place** or nearby areas of southChittagong or Cox's **Bazar chanting** the famous following couplet composed in honour of the holy prophet (sm):

[Ham mazare Muhammad (sm), peh mar jayenge
Zindegi me yahi ikam kar jayenge.
[I'll die on the shrine to Muhammad (sm)
That is the very task I'll perform in life.]

Many miraculous incidents (karamat)are revealed from him during the 20/25 year long period of his state of Mazjub. Consequently people could break their mistake about him that he was a mad realizing that he had been a real lover of the prophet (sm) and a self–denying saint on the way of

His holy messenger (sm). Since the demise of Hazrat Mawlana Nazir Ahmed ®, Hazrat Arkani ® used to visit Chunati most often with a view to preach the teachings of Tablig-E-Tariquat. He was one of the most renowned khalifas of Hazrat Azamgari ®/ He said many a time that Hazrat Shah Saheb`s state of Mazjub would not last long. He would regain his normal state and his saintliness would spread far and wide, and that prediction came true.

At the end of 50th decade he got back his normalcy. In 1959 his present house was transformed from the ancient paternal home- stead to the present one. He took attempt to develop Chunati Madrasah from Fazil level to Kamil. But it was hampered by political unrest of the time. During the libereation war and the post war period people belonging to both the groups found shelter in his house. He performed hajj six times in his life; first time in 1970, second in 1972, third in 1974, fourth in 1976 via India getting hajj visa from Delhi, fifth in 1978 and the sixth time in 1979 as a stateguest of Zia government. He visits India individually in 1980. In 1972 he started the first One- day long Mahfil-e Siratunnabi (sm) that is still going on withe very cash and comfort.

In 1976 he succeeded in getting Chunati Madrasah improved into Kamil level from Fazil by taking a new attempt. Though till 1976 Mahfil-e Siratunnabi (sm) had been held beside the southern part of his house (Shah Manzil), it was got to held on a newly bought hilly side over a spacious area of 32 kani that was reshaped into a level ground in order to gain a firm foothold for the Mahfil. With the exception of the field of Tongi World Iztema, such a big and vast field for any religious meeting is not found all over the country. Side by side this Mahfil-e Siratunnabi (sm), Hazrat Shah Saheb also commenced the discussion

meeting on Mirazunnabi (sm), Lailatul Barat, Lailatul Qadar and so on during his lifetime that are going on till now.

He is the first man to introduce Mahfil-e Siratunnabi (sm) in public surroundings instead of holding it in home bound setting. Besides, it could be said, coming of religious propagandists from the remote areas of the country to Chittagong and visiting of overseas religious orators to attend numerous regional and international Mahfils in the country was set in motion by this Mahfil-e Siratunnabi (sm). In a word, truly speaking, it was Hazrat Shah Saheb who made a way for the communication between the religious persons home and abroad in local and international sphere. Throughout its 44 years of continuity, a good number of religious individuall including presidents ministers and chief justices attended the Mahfil. Side by side, a large number of renoewned religious scholars of different opinions along with peers and mashayekhs also attended this gigantic religious festival. It is presently counted as a karamat on part of Hazrat Shah Saheb that ever since his death, this 19-day long Mahfil-e Siratunnabi (sm) has been going on very nicely and smoothly. He dreamt a dream of setting up a mosque and on the west of the vast field for the Mahfil-e Siratunnabi (sm) he started the work of its construction that was later completed after his demise. This great saint took departure in 1983, on the 23rd Safar, 1404.

I remain very grateful to Allah for enabling me to finish writing a biography of this great man after 24 years of his departure that is going to be published very soon.

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

* হযরত মাওলানা আব্দুন নূর সিদ্দিকী (রহ.) রচিত 'হায়াতে হযরত শাহ সাহেব কেবলা' চুনতী, চট্টগ্রাম।
* চুনতী থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ম্যাগাজিন ।
* প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
* প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
* মাস্টার আবু জাফর মুহাম্মদ সিদ্দিক, চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
* হাফেজ হারুনুর রশিদ, খাদেম, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বারদোনা, সাতকানিয়া।
* কাজী মাওলানা নাসির উদ্দীন, খাদেম, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
* এ. বি. এম. আশরাফ উল্লাহ, সন্দীপ, চট্টগ্রাম।
* এ. ডি.এম. আবদুল বাসেত দুলাল (চুনতী), যুগ্নসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
* মাওলানা হাফিজুল হক নিজামী, অধ্যক্ষ, চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
* মাওলানা আবু নছর আতীক আহমদ, উপাধ্যক্ষ, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
* মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ শাহে আলম, মুহাদ্দিস, চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
* মাওলানা ফারুক হোছাইন, মুহাদ্দিস, চুনতি হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
* ড. মাওলানা হেলাল উদ্দীন মুহাম্মদ নোমান, প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম।
* শাহ নেওয়াজ, হেমসেন লেইন, চট্টগ্রাম।
* মাহবুবুল হক, নোয়াপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।
* তৈয়বুল হক বেদার, নাতি, হযরত শাহ সাহেব (রহ.), চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
* মাওলানা আবদুল মালেক মুহাম্মদ ইবনে দীনার (নাজাত), নাতি, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চুনতী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লেখক আহমদুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালীস্থ খান বাহাদুর বাড়িতে (সাবেক উজির বাড়ি)। পবিত্র আরব ভূমি থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বের এতদঞ্চলে আগত মহান হযরত সৈয়দ আবদুর রহমান সিদ্দিকী (র.)'র এর বংশধর তিনি। বৃটিশ আমলে দু'দুবারের পার্লামেন্ট সদস্য, উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতিমান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব আমিরুলহজ্ব খান বাহাদুর বদি আহমদ চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র।

দেশের বহু প্রচারিত দৈনিক পূর্বকোণে সাপ্তাহিক কলাম লেখা ছাড়াও তিনি ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে আসছেন।

জনাব চৌধুরীর এ পর্যন্ত ২৯টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও ৯/১০টি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তার প্রবন্ধের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি একাধিক স্মরণিকা/স্মারক গ্রন্থের সম্পাদনা, দিকনির্দেশনা দান করেন।

জনাব আহমদুল ইসলাম চৌধুরী জীবনের বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নিয়ে ১৪টি ধর্মীয়, শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তৎমধ্যে বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমা ফাজিল মাদ্‌রাসা ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

এতদ্ব্যতীত, তিনি পিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঁশখালী বৈলছড়ি নজমুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সভাপতি পদে অসীন থেকে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণে অবদান রেখে আসছেন। তিনি দেশে বহুল পরিচিত সাড়া জাগানো ৭/৮টি সংগঠন দাঁড় করিয়ে মানব কল্যাণে সেবাদান করে আসছেন।

বর্তমানে তিনি দেশের ১০/১১টি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আজীবন দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তেমনি তিনি দেশের প্রতিষ্ঠিত ৭/৮টি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের আজীবন সদস্য।

এসবের পরেও তিনি দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক সভাপতি ও সদস্য হিসেবে জড়িত থেকে সেবা দিয়ে আসছেন।

তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ সফর করেন। তৎমধ্যে ইরান ও তুরস্কে রাষ্ট্রীয় অতিথি হয়ে সফর করেন।

Chhunati.com
Pioneer in village based website